# স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শব্দসৈনিক

সংকলক বিপ্রদাশ বড়ুয়া



# স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র
# ও
# শব্দসৈনিক

সঙ্কলক ও সম্পাদক
বিপ্রদাশ বড়ুয়া



পার্ল পাবলিকেশন্স

সম্পাদকের উৎসর্গ

মৃত ও জীবিত
বিদেশী ও দেশী
নারী ও পুরুষ
সকল শব্দসৈনিক
মুক্তিযোদ্ধা
ও
জয়বাংলা
সমর্থকদের

# সূচিপত্র

শিরোনাম : ১. স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র* প্রচারিত অনুষ্ঠান (অংশ)।

সূত্র : টেপ থেকে উদ্ধৃত তারিখ : ২৬—৩০ মার্চ, ১৯৭১

# টেপ থেকে উদ্ধৃত

"এবার তোমাদের বিদায় নিতে হবে, তবে অক্ষত অবস্থায় নয়। যে রক্ত এতদিন তোমরা নিয়েছো, সে রক্ত এবার আমরাও নেব।" বলেছেন বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

"বাঙালি রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ বাহিনী, মুক্তিসেনা—এগিয়ে যাও। তোমাদের সাথে রয়েছে বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা। এরা সবাই রক্ত দিতে প্রস্তুত, আজ এরা রক্ত দেবেই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর এরা আক্রমণ চালাবে।" বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

"পাক সৈন্যদের খতম করুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। যে পতাকা একবার বাংলাদেশের মানুষ উড়িয়েছে, শেষ রক্তবিন্দু থাকতেও সেই পতাকা কোনোদিন তারা ভুলে যাবে না।" বলেছেন স্বাধীন বাংলার ছাত্র পরিষদের চারজন নেতা।

মনে রাখবেন, শত্রুসৈন্য ধ্বংস হওয়া না পর্যন্ত এই যুদ্ধাবস্থা চলবেই। তাই আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়ে, রাতের ঘুম হারাম করে আপনারা আপনাদের বিজয়ের পথে এগিয়ে যান।

পশ্চিমা হানাদারেরা এখনো চিনতে পারেনি বাঙালি রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ বাহিনী আর মুক্তিসেনা কি জিনিস! তারা ভুলে গেছে, এই বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে যে শৌর্য ও বীর্য দেখিয়েছে তা তারা এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। আমরা দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, যে সমস্ত হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য এখনও রয়েছে তাদের বাঙালিরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। জয় বাংলা।

সংগীত : জয়, জয়, বাংলার জয়...।

---

* স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচারের পর হানাদার বাহিনীর বিমান আক্রমণে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় এবং চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চল থেকে দ্বিতয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৫ মে থেকে মুজিব নগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বেতার সম্প্রচার পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রাম চলেছে। বাংলার বীর সৈনিক, ইস্ট বেংগল রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী এবং এদেশের প্রতিটি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা, হানাদার পশ্চিমা গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করে চলেছে। এবং বাংলার বীর সৈনিকদের আক্রমণে দিশেহারা পশ্চিমা বাহিনী পিছু হটে চলেছে এবং মর্টার, কামান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা করে চলেছে। পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন প্রতিটি আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে গতকাল রাত্রে হাসপাতালে পর্যন্ত বোমা বর্ষণ করেছে—বাংলার সাত কোটি মুক্তিপাগল মানুষের উপর যেভাবে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে চলেছে, তার প্রতিরোধে বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তাই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন বাংলার মুক্তিপাগল জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। আপনাদের অবগতির জন্য আমরা আরও জানাচ্ছি যে, পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল টিক্কা খান—যাকে বাংলার বীর জনতা গভর্নর হিসাবে মেনে নিতে... (অস্পষ্ট) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সেই কুখ্যাত টিক্কা খানকে বাংলার বীর সৈনিকেরা হত্যা করেছে। বাংলার বীর জনতা প্রতিটি অলিতে-গলিতে অস্ত্র হাতে শত্রুদের মোকাবিলা করে চলেছে। বিশ্ববাসী, আপনারা আসুন, বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আমরা জানি, ইনশাল্লাহ্ জয় আমাদের হবেই। জয় বাংলা।

আপনারা বাংলার প্রতিটি জনসাধারণকে জানিয়ে দিন যেন শত্রুর মোকাবিলায় তারা সর্বাত্মক সাহায্য করেন। বাংলার বীর সৈনিকেরা যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে চলেছে, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনারা কেউ শহর থেকে যাবেন না। যে যেরূপ ভাবেই পারেন বাংলার মুক্তিপাগল মানুষকে সাহায্য করুন।...আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খাদ্য ও যেসব সামগ্রী সংগ্রহ করা আছে, আপনারা যদি পারেন, সেখানে খাদ্য ও সামগ্রী জমা দিন।

সংগীত : ...

ঘুম পাড়ানো তোতা পাখি লও বিদায়, লও বিদায়।

... ...

I Major Zia of Bengal Liberation Army, This is Major Zia, the Leader of Bengal Liberation Army, speaking on the support of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's liberation movement.

The Pakistan Army consisting mainly of Punjubi traitors are killing the Bengalee civilians of all ages, and they [acted in most ruthless manner. They have not speard the unarmed Bengalees—those are chiefly—those unarmed Bengalee officers and men of the army, navy and air force, some of whose families have not been killed]* The massacre started on the night of last Thursday

* বন্ধনীযুক্ত অংশের টেপ অস্পষ্ট ও বাংলা ভাষণের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

when attacked and started killing the unarmed soldiers, navy, airmen and civilian population all over Swadhin Bangladesh. They have been using. American, Russian and Chinese armaments including artillery gun and tank including Russian tank which is presented, which was so generously given by the Indonesian during the last 1965 war. All these acts uncivilised and cruel. They had a very well conceived plan of killing the senior political, civil, military leaders of Bengal. The need of the hour is that the important personalities of Bangladesh should go underground and work from there. Voice of America has announced that Beluchistan and Pakhtunistan with North-West Frontier Province has seceded from Pakistan to support the cause of Swadhin Bangladesh. At this moment we have to fight united. By the grace of God, we will capture all Punjabi traitors in a matter of one or two days and free Bangladesh of these menaces. Joi Bangla.

This is—you are listening the taped broadcast by Major Zia of Bengal—Bengal Liberation Army leader. The broadcast coming to you from Free Radio Bengal.

আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। এবার আপনাদের মুক্তি—বাঙালি মুক্তিসেনা বাহিনীর নায়ক মেজর জিয়া আপনাদেরকে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন।

আমি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত স্বাধীন বাংলা প্রসংগে বলছি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানত...* পাঞ্জাবি সৈন্যরা বাংলার বেসামরিক মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তারা অফিসার এবং নিরস্ত্র সৈন্যদের হত্যা করেছে। এমনকি তাদের পরিবারদেরকেও রেহাই দেয়নি। তাদের এরকম হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার থেকে। সেদিন থেকে তারা বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করে এবং সমস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের উপর জুলুম চালাতে থাকে। তারা আর্টিলারি কামান, আমেরিকান, রাশিয়ান ও চীনা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এছাড়াও তাদের জুলুমের ভয়াবহ সামগ্রীগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়ান ট্যাংক, যেটি তাদেরকে গত উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের তথাকথিত যুদ্ধে মহান দেশ ইন্দোনেশিয়া আমাদেরকে দিয়েছিল। দুশমনদের এ সমস্ত কাজ যেমন বর্বরোচিত তেমনি জঘন্য। এই সমস্ত বর্বর হানাদারদের এখন সুপরিকল্পিত মতলব হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান রাজনীতিক নেতাদের, বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনাদের হত্যা করা। এই চরম মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদিগকে আন্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন কাজে চলে যেতে হবে এবং সেখান থেকে দুর্বার আক্রমণ গড়ে তুলতে হবে।

---

* এই অংশে টেপ অস্পষ্ট।

কিছুক্ষণ আগে ভয়েস অব আমেরিকা বেতারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ন্যায্য আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করে বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনিস্তান তথাকথিত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই সময় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে মহান সংগ্রাম গড়ে তোলা। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা পাঞ্জাবি দেশদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করবো। এই পাঞ্জাবি দেশদ্রোহীদের বিধ্বস্ত করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র একদিন কিংবা দুইদিন। এবং এভাবে স্বাধীন বাঙলাদেশকে আমরা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবো। জয় বাংলা।

This is... This Lt. Shamsher of Bengal Liberation Army—I hereby pass a message from Major Ziaur Rahman of the Bengal Liberation Army. He says it is reported that more Pakistani Pubjabi Force and arament have been brought to Chittagong and Dacca by the sea and by air—I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace-loving country of the world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh... Under the circumstances I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidance of Sheikh Mujib. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement with increased vigour and intent devotion. By the grace of God the victory is ours—Joi Bangla.

Here is an announcement : All civilians of Chittagong are reqeusted to collect at Laidighi Maidan with whatever weapons they have and report to Captain Bhuiya and Captain Naser of the Bengal Liberation Army.

চট্টগ্রামে অবস্থানরত সমস্ত নাগরিকদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে যে, তারা দুপুর বারোটার মধ্যে লালদিঘীর ময়দানে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাপটেন ভূইয়া এবং ক্যাপটেন নাসের...(অস্পষ্ট) হাজির হন। তিনারা দুপুর বারোটা পর্যন্ত আপনাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করবেন। দুপুর বারোটার মধ্যে আপনারা সবাই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘীর ময়দানে হাজির হয়ে যান। সেখানে ক্যাপটেন ভূইয়া ও ক্যাপটেন নাসের আপনাদেরকে আদেশ ও নির্দেশ দেবেন। অস্ত্রশস্ত্র পারতপক্ষে লুকিয়ে আনবেন—সাধারণ নাগরিক যাতে তা না দেখেন। আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে আনবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া লালদিঘীর ময়দানে যাবেন না। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে শুধু তারাই লালদিঘীর ময়দানে যেয়ে হাজির হবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কেউ ওখানে যাবেন না।

আর একটি বিশেষ ঘোষণা : কুমিরায় অবস্থানরত স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনীর সংগে ক্যাপটেন ভূইয়া—ক্যাপটেন ভূইয়া দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর সংগে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের তিনশত সিপাই নিহত হয়েছে। তারা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। কোনও বেসামরিক নাগরিক তাদেরকে সাহায্য করবে না। পাঞ্জাবি কোনও সৈনিককে বেসামরিক নাগরিক সাহায্য করবেন না। এখানেও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর জয় হয়েছে। জয় বাংলা।

... স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশে আমাদের আবেদন, আপনারা কোনও অবস্থাতেই বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাদের উৎসাহ ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখুন। শান্তি ও শৃংখলার সাথে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের নাগরিক বাংলার মুক্তিবাহিনীর কাজে সহায়তা করুন। আমাদের মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতায় সমগ্র এলাকা মুখর। আমাদের ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট চালু করেছেন যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুলভে পাওয়া যায়। ঔষধপত্রের দোকানগুলো খোলা হচ্ছে। আপনারা যদি পরাজিত শত্রু বাহিনীর কোনো বর্বর সৈন্যকে বিক্ষিপ্তভাবে কোনোস্থানে যে কোনো বেশে চলাচল করতে দেখেন তাকে উচিত সাজা দিন। তাদের সাথে কথা বলে তাদের ভাষা পরীক্ষা করবেন। তারা আমাদের বাংগালি সামরিক বিভাগের জোয়ানদের ওপর জুলুম করেছে। তাদের ক্ষমা নেই। ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! নেবো! নেবো! আমাদের মুক্তিবাহিনী, কুমিরায় তিনশত বেঈমান পাঞ্জাবি জোয়ান যখন পালাচ্ছিল, ক্যাপটেন ভূইয়ার নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

দুশমনরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর পোশাক পরে চোরের মতো স্বাধীন বাংলাদেশ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকরা সজাগ দৃষ্টি রাখুন এই হানাদারদের ওপর। এদের যেখানেই পান, সাথে সাথে এদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দিন। এদের চেনার উপায় হচ্ছে—যেখানেই দেখেন বেশ দূরত্বে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এদের সাথে কথা বলবেন, সামনে যাবেন না প্রথমে। সন্দেহজনক লোক দেখলে বেশ দূরত্ব থেকে কথা বলে এদের পরিচয় জেনে তারপরে যদি সন্তুষ্ট হন, ছেড়ে দেবেন। নয়তো হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করুন।

... ...

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর শুনুন—

স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, স্বাধীন বাংলার গ্রাম ও শহরের কোনও ব্যক্তি যেন কোনও প্রকার গুজবে কান না দেন বা কোনও গুজবে বিভ্রান্ত না হন। কেননা, শত্রুসৈন্যরা ছদ্মবেশে শহরে ছড়িয়ে পড়ে এসব গুজব ছড়াতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থা স্বাধীন বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর হানাদার পাঞ্জাবিদের অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন। গত পাঁচদিন ধরে শত্রুসৈন্যরা পানি, খাদ্য, বিদ্যুৎ বঞ্চিত হয়ে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তাদেরকে ভাতে পানিতে মারাই হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিশোধ। এই উচিত সাজাই হবে তাদের প্রাপ্য। আসাম বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত এহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রচারের বহু পরে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বিপ্লবী পরিকল্পনা কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। মুক্তিবাহিনী প্রধান নির্দেশ দিয়েছেন—বেসামরিক লোক, যাঁরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানেন না, তাঁদের হাতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আছে, তা প্রত্যেক জেলার ই.পি.আর. বাহিনীর হাতে অবিলম্বে জমা দিতে হবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাখতুনিস্তানে অবস্থানকারী সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক বাঙালি লোকজন সম্প্রতি আশংকার কোনও কারণ নেই বলে আসাম বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী প্রধানের খবরে প্রকাশ, নিহত টিক্কা খানের চারজন সহকারীও নিহত হয়েছে। এ খবর আপনারা শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর পাঞ্জাবি হানাদার সৈন্যদের অমানুষিক ও দস্যুসুলভ আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার শরণ সিং পূর্ববাংলার উপর পশ্চিমাদের সামরিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কোনও আবেগ প্রকাশ না করার অর্থ এই নয় যে, ভারতবাসীদের মনে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি ও আবেগের অভাব রয়েছে এবং এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার অর্থই হচ্ছে তারা আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। মিসেস গান্ধী স্বাধীন বাংলার মুক্তিকামী জনতার ওপর পাঞ্জাবি দস্যুদের ট্যাংক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভয়েস অব আমেরিকার খবরে প্রকাশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাখতুনিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এই সম্পর্কিত তথাকথিত পাকিস্তান রেডিওর খবর সর্বৈব মিথ্যা।

খবর শুনলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের পরবর্তী ঘোষণার জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোনও প্রাইভেট গাড়ির জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন।

আমি আবার বলছি, বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোনও প্রাইভেট গাড়ির জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন। এই সংগে অন্যান্য নির্দেশ হচ্ছে, রাত্রে কেউ বাতি জ্বালাবেন না। কোনো ঘরের আলো যেন আকাশ থেকে দেখা না যায়। সারা বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রদীপ থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকটি গাড়ি চেক করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিমানবন্দরের রানওয়ে যেকোনও ত্যাগের বিনিময়ে বিমান নামার পক্ষে অনুপযোগী করে

তুলুন। রাত্রে কোনও বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক কোনও গোলাগুলির আওয়াজ করবেন না। কোনও অবস্থাতেই কোনও সক্ষম ব্যক্তি শহর ছেড়ে গ্রামে যাবেন না। ঘোষণাটি আবার পড়ছি... ...

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘোষণা :

এখন থেকে আমরা প্রতিদিন নিয়মিত তিনটি অধিবেশন আমাদের সংগ্রামী জনতার উদ্দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি অধিবেশন আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। প্রতিদিন সকাল ন'টায় আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করা হবে, বেলা একটায় দ্বিতীয় অধিবেশন ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু করা হবে। আবার বলছি... ...

প্রত্যেক অধিবেশনে আপনারা খবর, দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া, সংগীত ইত্যাদি শুনতে পাবেন। মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর মেজর জিয়ার নির্দেশ শুনতে পাবেন। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ান এবং বেসামরিক ব্যক্তিবিশেষের সংগে সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিশেষ ঘোষণা ও খবর প্রচার শেষ হলো। জয় বাংলা।

... ...

Bangladesh Liberation Army—I will now read out an appeal made by Major Ziaur Rahman of the Bangladesh Liberation Army. It says—it is reported that more Pakistani Punjabi troops and armaments have been brought to Chittagong and Dacca by Sea route and by air—I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace loving countries of the world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh. Under circumstances however I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidince of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement. I will repeat...

সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি—যারা গাড়ি চালানো জানেন, তারা অবিলম্বে রেস্ট হাউজে আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হোন।

... (নারীকণ্ঠ)—বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলার সব পুরুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এদের সাহস ও উৎসাহ যোগাতে হবে আমাদের। নিজ নিজ ঘরে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখুন, এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাড়িতে পুরুষদের উজ্জীবিত করে প্রমাণ

করুন—এ সংগ্রাম শুধু বাংলার পুরুষদের নয়, মা-বোনেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনারা প্রমাণ করুন প্রতিটি বাঙালি ললনা বীর নওজোয়ানদের মা-বোন, বীরাঙ্গনা। আপনারা বর্গীর হাংগামার সময় যেভাবে হানাদার বর্গীদের বিরুদ্ধে তেজের সংগে রুখে দাঁড়িয়েছেন, রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন, তা এখন বৃথা যেতে দেবেন না। আপনারা সবক্ষেত্রে প্রাণপণ সাহায্য করুন। প্রতিটি ঘরে দুর্গ তৈরি করেছেন, আজ দেশদ্রোহী পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আপনাদের সন্তানদের প্রেরণা দিন, সাহস দিন, তাদেরকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়তে দিন। আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমাদের স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় সারা বাংলাদেশ এখন আমাদের হাতে আমাদেরই আছে, আমাদেরই কাছে। আপনারা এদেশ রক্ষা করুন, আপনারাও রক্ষার কাজে পার্টিসিপেট করুন, অংশগ্রহণ করুন—অংশ নিন। আপনারা মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের সব রকমের সহায়তা করুন। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। জয় ন্যায়ের ও বিনাশ অন্যায়ের হবেই হবে, এ আমাদের মনে রাখতেই হবে। জয় বাংলা।...

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার এখনকার মতো এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আমরা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

... ...

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন।

স্বাধীন বাংলার ভাই-বোনেরা, আসসালামু আলায়কুম—

মহান মহানায়ক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সারা বাংলাদেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার জনসম্পদ লুণ্ঠন করার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে এখনও শোষণ অব্যাহত রাখতে চায় ওরা। তাই তারা সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্যভাবে প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নজির নেই। আজ সারাদেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ*...হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার তস্করের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এ শত্রুবাহিনী তাদের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই.পি. আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলায় প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ মুক্তিপাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার নিকট আহ্বান জানাই—শত্রুসেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন।

---

* টেপ অস্পষ্ট

শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধা মতো স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুঁড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে দিন, হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃংখলাবদ্ধভাবে মুক্তিসেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সর্বতোপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন। বন্ধুগণ!...

আজকে আমরা দেখতে পাই, নিরপরাধ নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, দেখা মাত্র গুলি করছে, হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে তার নজির এ বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাবো, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাবো, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ করে থাকবেন না। আসুন বিশ্ববাসী, সাড়ে সাত কোটি এই পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের বাঁচাবার জন্য আপনারা আমাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই—আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন। হে বিশ্বের অধিবাসী, তোমরা দেখ, কিভাবে পশ্চিমা এই গণবিরোধী শক্তি, এই শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ পশ্চিম—এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালেরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে কিভাবে তাদের নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না, আসুন আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন। বন্ধুগণ, আমি সারা বাংলার স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান জানাবো, বাঙালি ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদেরকে শরিক করুন এবং হানাদার দুশমনদের খতম করুন। যেখানে যে যে অবস্থায় আছেন, যার হাতে যে অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র তুলে নিন। মা-বোন বাপ-ভায়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বার হন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে শত্রুসেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন। আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে—সেদিন আর সুদূরপরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাবো, এই দেশ এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হবে—অন্য কোনও কারও নির্দেশ বাঙালিরা কোনওদিন বরদাশত করবে না এবং কোনও মার্শাল ল' বাঙালিরা মানে না। আমি আহ্বান জানাবো—বাংলার প্রতিটি নরনারী সকলের কাছে—আপনারা মার্শাল ল' মানবেন না, মার্শাল ল'র কোনও আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক। স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলা—জয়।

... ...

...অনুষ্ঠান শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলা খবর।

স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার থেকে খবর বলছি। আমাদের বিপ্লবী গণবাহিনী শত্রুর দুর্ধর্ষ আক্রমণকে প্রতিহত করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সামরিক ঘাটিতে এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সামরিক বিধি-বিধান, ভয়-ভীতি, সবকিছুকে তুচ্ছ করে আমাদের বিপ্লবী বাঙালি সৈন্যবাহিনী শত্রুদের হটিয়ে চলছে। বাংলাদেশের মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে বাংলার মাটি আজ দুর্জয় ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম এবং আরও কয়েকটি জেলায় সামরিক ঘাটি আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে এসে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত মানবতার সহায়তা আমরা পাচ্ছি। খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র* থেকে। আমাদের বীরসেনানীরা বিপুল বিক্রমে দুশমন সৈন্যকে প্রতিহত করে চলেছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুক্তির আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি থানার পুলিশ বাহিনী আমাদের সাথে লড়ছেন। ই.পি.আর বাহিনী, বেংগল রেজিমেন্ট, বাংলার বীর স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, বাংলার মা-বোনেরা, বাংলার যুবক সম্প্রদায় প্রত্যেকে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে আছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আজকের মতো খবর এখানেই শেষ করছি। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।

... ...

শত্রুবাহিনী উপায়ন্তর না দেখে ট্যাংক ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে, আঘাত হানার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বাঙালিদের আয়ত্তে। (একজনের হাততালি ও বাহবা) কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম পৌঁছে গেছে। এদেশের অন্যান্য সকল স্থান বাঙালিদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে এসে গেছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এখন খবর পড়ছি—

বাংলাদেশের পথে পথে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ জনতার সাহায্য নিয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ করে চলেছে। ঢাকার সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান হানাদার সেনাবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ টিক্কা খান দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে হানাদার সৈন্যদের মুখপত্র পাকিস্তান রেডিও থেকে যে খবর পৌঁচেছে যে শেখ মুজিব ধৃত হয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। টিক্কা খান তার দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বাঙালিদের আয়ত্তাধীন। কুমিল্লা থেকে একদল সৈন্য চট্টগ্রামের পথে পালাবার সময় বাংলার বিপ্লবী ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর ও পুলিশ বাহিনী তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে ও তারা এখন তাদের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে বিভিন্ন অবস্থায় পালিয়ে রয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু

---

* [২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে প্রথম চালু হয়।]

এক নির্দেশ জারি করেছেন যে পলায়নরত সৈন্যরা যাতে কোনোক্রমেই রেহাই না পেতে পারে। চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাঙালি সৈন্যদের আয়ত্তাধীন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য বিভিন্ন অবস্থানে লুকিয়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের বীর জনতা, বেংগল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ তাদের ধ্বংস করে দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। গতকাল চট্টগ্রামের বিভিন্ন অবস্থান থেকে হানাদার বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় এবং এতে করে হানাদার বাহিনীর বেশ কয়েকটি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যশোর, রংপুর, সিলেট এসব শহরেও এখন পর্যন্ত প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে এবং হানাদার সৈন্যদের এখন মূল লক্ষ্যস্থল হলো বেতার কেন্দ্রগুলো। তারা বেতার কেন্দ্রগুলো দখল করে সেখান থেকে ভুয়া প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু বাংলার বীর জনতা তাতে মোটেই বিভ্রান্ত না হয়ে তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকার পথে পথে এখন মুক্তিসেনা এবং বেংগল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর ও পুলিশদের সাথে হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, টিক্কা খান তার দলবলসহ নিহত হয়েছেন। সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যের নির্দেশ অমান্য করে জনসাধারণ স্বাধীন বাংলার পাহারাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশক্রমে চলছেন এবং তারা বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত প্রত্যেকটি নির্দেশকে হুবহু মেনে চলছেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘের কাছে এক আহ্বানে বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে তাই জাতিসংঘের এখন উচিত বিদেশী সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে হটানোর ব্যাপারে বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে সহযোগিতা করা। আপনারা এ খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে।

টিক্কা খান সদলবলে নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তার নির্দেশ জারি করে চলেছেন। তার সর্বশেষ নির্দেশ হলো যে, আপনারা জনসাধারণ যে যেখানে আছেন সেখান থেকে পশ্চিমা সেনাবাহিনীর অবস্থান নির্দেশ করুন। এবং পশ্চিমা সেনাবাহিনী কোথায় আছে সেটা জেনে তাদের ধ্বংস কাজে লিপ্ত থাকুন। ই.পি.আর, বেংগল রেজিমেন্ট ও পুলিশ বাহিনীকে খাদ্য-পানীয় দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন। যার ঘরে যা আছে, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, প্রয়োজনবোধে সেটা ই.পি.আর অথবা বেংগল রেজিমেন্টের হাতে তুলে দিন আর আপনারা যারা চালানো জানেন তারাও তৈরী হয়ে থাকুন এবং যেখানেই পশ্চিমা সেনাবাহিনী দেখবেন তাদের উপর আক্রমণ করুন। তবে একটি জিনিস মনে রাখবেন যে, কোথাও বাঙালি বা অন্য কোথাও কোনও সৈন্য দেখা গেলে তার প্রতি গুলি করবেন না এবং এসব করার আগে ই.পি.আর, বেংগল রেজিমেন্ট অথবা পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করুন। গত রাত্রেও সারা বাংলাদেশের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলেছে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা পশ্চিমা হানাদার সৈন্যদের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদেশের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এটাকে দখল করে নিতে চাইছে। তাই প্রত্যেকটি দেশের উচিত এ অবস্থায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা ও সাহায্য করা এবং পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা

অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর এক নির্দেশে একথাও জানিয়েছেন যে...ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে। অন্যথায় বাংলার মাটি থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এবং যাতে করে তারা বাংলাদেশ থেকে পালাতে না পারে তারও সম্পূর্ণ নির্দেশ তিনি জারি করেছেন। জয় বাংলা। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার আপাতত এখানেই শেষ হলো।

Here is an announcement from Radio Free Bangladesh. Our leader Sheikh Mujibur Rahman had declared the independence of Bangladesh. Now Bangladesh is an independent and sovereign state. After the declaration of independence the Pakistani anti-people forces have become mad like dog and are out to massacre our people, thus creating a reign of terror in Bangladesh. But the gallant forces of Bangladesh under the guidance of Sheikh Mujibur Rahman are fighting them out of the homeland of ours. East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and Police forces with all efforts and help of the people of Bangladesh, are restricting them, stricking hard on them throughout the whole Bangladesh. Chittagong is completely under the control of Bangla Regiment as well as other sectors such as Comilla, Rajshahi, Sylhet, Jessore, Rangpur. In Dacca, heavy fighting is going on and our gallant forces are marching towards victory. We appeal to the people residing in towns and cities not to leave their places and to prepare themselves with whatever they have and create baricades at every road-corner by which enemy may travel. Do not allow them to move an inch forward without resistance. All the people in the villages those who have fire arms of any kind are requested to proceed to the town and cities. People of all walks of life are specially requested to extend their help specially by giving food to our gallant fighting forces.

Now, this is an appeal on behalf of Free Bangladesh to the people of peace-loving countries throughout the world specially our neighbouring countries to help with whatever they can so that we can become masters of our own destiny. We also appeal to the big powers to intervene and see that seventyfive million people of Bangladesh can become free from injustice, hardship, deprivation from legal right and oppression and torture by forces of Pakistani aggression. We also appeal to the United Nations to immediately... (Noise)...

শিরোনাম : ২. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান। সূত্র : ১. 'বেতার বাংলা' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯। ২ ও ৩। 'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। তারিখ : ২৬ ও ২৮ মার্চ এবং ২১ এপ্রিল, ১৯৭১।

১

# ২৬শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে

## আবদুস সালাম

"নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসুলিহিল কারিম"

আস্‌সালামু আলায়কুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা— তারা মৃত নহে, অমর।

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

আল্লার ফজল করমে বাংলা আপামর নরনারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি— তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তাদের এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোনও অবাঙালি সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না।

মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোনও গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়জন মিলে কোনও পশ্চিমা মিলিটারির মোকাবেলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি যুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে— তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানায়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

"নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব"। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী॥

শিরোনাম : ২. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান। সূত্র : ১. 'বেতার বাংলা' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯। ২ ও ৩। 'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। তারিখ : ২৬ ও ২৮ মার্চ এবং ২১ এপ্রিল, ১৯৭১।

১

# ২৬শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে

## আবদুস সালাম

"নাহ্মাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসুলিহিল কারিম"

আস্সালামু আলায়কুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা— তারা মৃত নহে, অমর।

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

আল্লার ফজল করমে বাংলা আপামর নরনারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি— তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তাদের এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোনও অবাঙালি সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না।

মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোনও গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়জন মিলে কোনও পশ্চিমা মিলিটারির মোকাবেলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি যুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে— তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানায়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

"নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব"। আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী ॥

২

# স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কথিকা

বেলাল মোহাম্মদ

কবির ভাষায় :

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃংখল বলো কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।'

দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। স্বাধীনতা-বঞ্চিত জীবন থেকে তারা স্বাধীন জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার পথ দুর্গম, দুর্বার। এই যাত্রাপথে কোনো শাসক-শোষকের দমননীতি, কোনো অশুভ শক্তির বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জীবনজয়ের অভিযাত্রীদের কে বাধা দেবে? কে এই অভিযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে? সেই সাধ্য কারু নেই, সেই দুঃসাহস দেখাবার সকল 'পশ্চিম পাকিস্তানি দাপট' আজ ছিন্ন-ভিন্ন, পর্যুদস্ত।

ভাবতে অবাক লাগে, তেইশ-তেইশটি বছর কিভাবে সেই তথাকথিত পাকিস্তান সরকার বাংলার মা-বোন, বাংলার শিশু-বৃদ্ধ, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতী, কামার-কুমার— মেহনতি মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টিম-রোলার চালিয়েছে। আমার সন্তানের দুধ ওরা কেড়ে খেয়েছে, আমাদের ক্ষেতের ফসল ওরা লুটে নিয়েছে, ওরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তথাকথিত সংহতির ধুয়া তুলে ওরা আমাদের নিরীহ জনপদের ওপর শাসনের নামে চালিয়ে গেছে শোষণ।

বাংলার মানুষকে ওরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অবহেলা দিয়ে দিয়ে নিজেদের জাতিগত দুশ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছে।

আজকের স্বাধীন বাংলার পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় বীর জনতার গড়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানি গুপ্তচর, বর্বর সৈন্যদের প্রত্যেক প্রবেশ-পথ আজ রুদ্ধ। ওদেরকে যেখানেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠছে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে বুলেট— আজ ধরাশায়ী হচ্ছে এক-একটি হানাদার দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই— ক্ষমা নেই।

স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের মা-বোনেরাও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। দুশমনকে উচিত সাজা দেবার জন্যে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই সদাপ্রস্তুত।

বাঙালি আজ জেগেছে। দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা—

'এবার বন্দি বুঝেছে,
মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে
উঠিতেছে এক তান;
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান ॥'
জয় স্বাধীন বাংলা।

প্রচার : ২৮-৩-৭১

৩

# সাম্প্রদায়িকতা : সামন্তবাদ প্রসঙ্গ

মোস্তফা আনোয়ার

সামন্তবাদ সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়। বাংলাদেশেও একদিন ছিল সামন্ততন্ত্র। ছিল জমিদারের শাসন ও শোষণ। এই জমিদারদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। পরগাছার মতো এই জমিদার-শ্রেণী বেঁচে ছিল লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই জমিদাররা নিজেরাই এক জাতি— নিজেরাই একটা শ্রেণী। এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এরা রক্তপায়ী এক জীব। এরা দরিদ্র মুসলমান কৃষককে শোষণ করেছে— নিরন্ন হিন্দু কৃষককেও ক্ষমা করেনি। এদের রক্তলোলুপ থাবা থেকে কেউ-ই রেহাই পায়নি। সম্পর্কটি ছিল জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক— হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নয়। হিন্দু জমিদারের মধ্যে যেটা কাজ করেছে সেটা শ্রেণীস্বার্থ—জমিদাররূপে অত্যাচারিত কৃষকের রক্ত-পানের উদগ্র নেশা।

হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের অত্যাচারের এটাই বাস্তব চিত্র। শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের এটাই আসল চেহারা। রাশিয়ায় বা আমেরিকায় এই সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের কাহিনী রক্তলেখায় লেখা আছে ইতিহাসে ও সাহিত্যে।

(বিশ্বের প্রতিটি দেশে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে এই জমিদার শোষকগোষ্ঠী দ্বারা। কিন্তু এই অমানিশারও শেষ আছে। মানুষের মুক্তির সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারিত মানুষ জেগেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে দৈত্যপুরীর রাজকন্যার। অবশেষে কবর রচিত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের। অত্যাচার আর নিপীড়নের হয়েছে অবসান। শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে সংগ্রামী মানুষ।)

আমরা আগেই বলেছি, সামন্তবাদ বা জমিদার-তন্ত্র সভ্যতার ইতিহাসের একটি মৃত অধ্যায়— যাদুঘরের সামগ্রী। যে জমিদার অত্যাচার করেছিল, সে জমিদার শেষ হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই রক্তপায়ী জোঁক শ্রেণী। ব্যাপারটি হচ্ছে শ্রেণী-সংঘর্ষের— হিন্দু-মুসলমানের নয়।। এবং সর্বহারা কৃষকের জয় ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখের অবসান হয়েছিল। বাংলার কৃষকের চোখে নেমেছিল নতুন ফসলের আশা। বাংলার কৃষক দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ তাণ্ডবলীলা, দেখেছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণির বিধ্বংসকে। তবু সে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার। পদ্মাপারের মানুষ ধ্বংসকে ভয় করে না, তার হাতে আছে দুর্জয় সৃষ্টির মন্ত্র।

---

* চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপিত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

কিন্তু এতবড় দুর্যোগ কি কেউ কোনোদিনও দেখেছে? নিজের দেশে, নিজের ঘামঝরানো পয়সায় কেনা গুলি এসে বেঁধে নিজেরই বুকে। কারা চালালো গুলি? হিন্দু জমিদার— নাকি সেই দস্যু বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার? কারা পুড়িয়ে দিলো কৃষকের সাজানো সবুজ ক্ষেতকে— কারা কামান ও গোলায় গুঁড়িয়ে দিলো কৃষকের কুটির— কারা কেড়ে নিলো নবান্নের উৎসব— কারা, কারা, তারা কারা?

ইতিহাসের কবর থেকে উঠিয়ে আনা হচ্ছে জমিদারকে। জমিদার তো অত্যাচার করেই ছিল আর তার শাস্তিও পেয়েছে গণ-মানুষের হাতে। কিন্তু তোমাদের শাস্তির দিনও যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে— তা কি জানো?

তোমরা কি ভেবেছ জমিদার ও কৃষকের শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাসটি মুছে দিয়ে আজকের জাগ্রত শ্রেণী-সচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে? ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করে দাঙ্গাবাজ রাজনীতি এদেশের মাটিতে আজ অচল।

আজ প্রতিটি বাঙালি জানে, এ যুদ্ধ তার বাঁচার জন্য। এ যুদ্ধ তার চিরদাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে তাই ইতিহাসের কবরে পচে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে গুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

তথাকথিত পাকিস্তান আর নেই। পাকিস্তানের নিশান আমরা পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছি। আমরা উড়িয়েছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। রক্তে আমাদের স্বাধীনতার আগুন দগদগ করছে। চোখে আমাদের প্রতিশোধের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখে আমাদের স্বাধীনতার বাণী চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে শত-কোটি কণ্ঠে।

এই মহান বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তাই উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওদের রসদ কই? হ্যাঁ, আছে বস্তাপচা রাজনীতি— হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-বাধানোর অপচেষ্টা। বুকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সমস্ত বাঙালি জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে মেতে, অখণ্ডতার প্রলেপ মাখানো আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ভূত দেখানোতে।

এক কথায়, দাঙ্গাবাজি, লুটতরাজ, নারী-হরণ প্রভৃতি অসামাজিক পৈশাচিক নারকীয় পশুত্বের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় ওরা লক্ষ শহীদের রক্তভেজা বাংলার মাটিতে। যে জাতি সূর্যতেজে জেগে উঠেছে সে কি অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছে দাসত্বের জন্য হার মানে? অদ্ভুত ওদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। অদ্ভুত ওদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। অদ্ভুত ওদের বে-পরোয়া গণ-হত্যার নজির।

দাঙ্গাবাজি কলা-কৌশল আর চলবে না। লাঞ্ছিত নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালি গণ-মানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি। পশুও বুঝি এত নগ্ন নয়— এত বিশ্রী, এত কুৎসিৎ, এত বীভৎস নয়।

ওরা মানুষ হত্যা করেছে— আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

জয় বাংলা।

প্রচার : ২১-৪-৭১

শিরোনাম : ৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (মুজিব নগর) এর অনুষ্ঠানপত্র শুরু (অংশ)।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র। তারিখ : ২৫ মে— ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

আজ মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, ২৫ মে ১৯৭১ সাল।

(signature tune)

7-00 A.M. আস্‌সালামো আলায়কুম।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি।
অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে... মিটারে... কি. সা. এ।
অধিবেশনের প্রথমে শুনুন তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা।

7-10 A.M. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ঘোষণা। আজ থেকে সকাল ৭টা ও সন্ধ্যে সাতটার দুটি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান :

* বাঙলা খবর প্রচারিত হবে সকাল সোয়া সাতটায়।
* ইংরেজি খবর শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে।
* 'চরমপত্র' শুনতে পাবেন সকাল ৭টা বেজে .... মিনিটে।
* বঙ্গবন্ধুর বাণী থেকে পাঠ শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে।
* জাগরণী : দেশাত্মবোধক গান শুনবেন সকাল পৌণে আটটায়।

আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সূচি শুনলেন।
আপনারা এ অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র থেকে... মিটারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর শুনতে পাবেন— প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজিতে।

7-05 A.M. (News in Bengali)

7-25 A.M. (News in English)

7-30 A.M. সকাল সাড়ে সাতটা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আজ এগারই জ্যৈষ্ঠ। বিদ্রোহী কবি নিপীড়িত জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এ উপলক্ষে এখন কবি রচিত কবিতা থেকে আবৃত্তি ও গান শুনুন অগ্নিশিখা অনুষ্ঠানে।

7-40 A.M. Slogans & Sayings of Sk. Mujub.
SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA
(Cue Sheet)

**Date : 26.5.71** Trans—1

| | |
|---|---|
| 6-57 P.M. | Signature Tune |
| 6-59 P.M. | Opening of the station & Programme Summary. |
| 7-00 P.M. | AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.<br>(a) Message from<br>(b) "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"— Nazrul Islam's Song.<br>(c) Agiye Chalo : Talk on inspiration.<br>(d) Special News Bulletin.<br>(e) Patriotic Song. |
| 7-20 P.M. | CHARAMPATRA :<br>Counter Programme |
| 7-30 P.M. | News in Bengali |
| 7-40 P.M. | News in English |
| 7-45 P.M. | AGNIBINA : A special programme on observance of the birth anniversary of poet Nazrul Islam. |
| 8-15 P.M. | Slogans & Sayings of National Leaders. |
| 8-20 P.M. | ....Alor Diganta : A talk in Bengali. |
| 8-25 P.M. | Fleshes & music. |
| 8-30 P.M. | Close down. |

২৭ শে মে, ১৯৭১

| | |
|---|---|
| 6-59 P.M. | Signature Tune & Opening of the station & Programme Summary. |
| 7-00 P.M. | AGNISHIKAH : A composite programme for the freedom fighters.<br>(a) Darpan : A talk in Bengali.<br>(b) Oikatan : Patriotic Song.<br>(c) Kabikantha : Self-composed Poems.<br>(d) Ranaveri : News of the Sectors.<br>(e) Patriotic Song. |
| 7-20 P.M. | Talk in Bengali |
| 7-30 P.M. | News in Bengali |
| 7-40 P.M. | News in English |
| 7-45 P.M. | RAKTASWAKKHAR :<br>Self-composed Poems & Patriotic Song. |

7-50 P.M. CHARAMPATRA : Counter Programme.
7-55 P.M. BISWAJANAMAT : Bengali talk.
8-00 P.M. Close down.

৩০ মে, ১৯৭১

6-58 P.M. Signature Tune.
6-59 P.M. Opening of the Station.
7-00 P.M. AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.
(a) Darpan : Talk in Bengali.
(b) Oikatan : Patriotic Song.
(c) Recitation
(d) Ranaveri : Reports from Sectors.
(e) Patriotic Song.
7-20 P.M. News in English
7-30 P.M. স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা :
Talk in Bengali : Mr. A. Mannan. MNA.
7-40 P.M. RAKTASWAKKHAR :
Self-composed poems.
(a) Belal Mohammed.
(b) S. I. Noor.
7-45 P.M. News in Bengali.
7-55 P.M. Samayeeki : News Commentary in Bengali.
8-00 P.M. Falk Song : Shah Ali Sirker.
8-05 P.M. বাঙ্গালি জবাব দাও : Talk in Bengali
8-15 P.M. Patriotic Song.
8-20 P.M. Biswa Janamat.
8-25 P.M. CHARAMPATRA : Counter Programme.
8-35 P.M. Slogans & Patriotic Song.
8-40 P.M. Close down.

৩১ মে, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশন :

৬-৫৯ মি. সূচকধ্বনি ও উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০০ মি. অগ্নিশিখা : মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।
(ক) দর্পণ : বাংলা কথিকা
(খ) জাগৃতি : দেশাত্মবোধক গান

(গ) আবৃত্তি
(ঘ) রণভেরী : যুদ্ধের খবর
(ঙ) বজ্রকণ্ঠ : শেখ মুজিবের বাণী
(চ) দেশাত্মবোধক গান

৭-২০ মি. ইংরেজি সংবাদ
৭-৩০ মি. বিশ্বজনমত
৭-৩৫ মি. পল্লীগীতি : শাহ্ আলী সরকার
৭-৪০ মি. রক্তস্বাক্ষর : স্বরচিত কবিতা পাঠ
(ক) বেলাল মুহম্মদ
(খ) শিকদার ইবনে নূর

৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ
৭-৫৫ মি. দেশাত্মবোধক গান ও বিশেষ ঘোষণা
৮-০৫ মি. যন্ত্রসঙ্গীত
৮-১৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও দেশাত্মবোধক গান
৮-২০ মি. চরমপত্র
৮-৩০ মি. সমাপ্তি।

**৭ জুন, ১৯৭১**
**দ্বিতীয় অধিবেশন :**

৬-৫৯ মি. পরিচিতি সুর
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৫ মি. অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-১০ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ : বাদশা
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি : নূরে আলম
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন : কামাল লোহানী
(ঙ) নির্দেশাবলী
(চ) সঙ্গীত

৭-৩০ মি. বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ মি. সাময়িকী/কথিকা
৭-৫০ মি. ইংরেজি খবর
৭-৫৭ মি. বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ মি. সঙ্গীত
৮-১৫ মি. ... ...
৮-৩০ মি. জাগ্রত বাংলা

৮-৪০ মি. চরমপত্র
৮-৪৭ মি. বিশ্বজনমত
৮-৫১ মি. রক্তস্বাক্ষর : ৭ই জুন (ক) কথিকা— শহিদুল ইসলাম
(খ) কবিতা
৮-৫৫ মি. সমাপ্তি।

১৯ জুন, ১৯৭১
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ : ইসলাম ও পাকিস্তানের রাজনীতি : কথিকা— কামাল মাহবুব
(খ) সংগীত
(গ) সংবাদ
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
৭-২৫ মি. বিশ্বজনমত
৭-৩১ মি. সঙ্গীত
৭-৪০ মি. দৃষ্টিপাত : কথিকা— ড. মজহারুল ইসলাম
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ : পড়বেন কামাল লোহানী।
৭-৫৫ মি. বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
৮-২৫ মি. শ্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৩০ মি. চরমপত্র
৮-৪০ মি. সঙ্গীত
৮-৪৫ মি. রক্তস্বাক্ষর :
(খ) শহীদ মিনার : আলেখ্য— মোস্তফা আনোয়ার
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

২৭ জুন, ১৯৭১
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি

(ঘ) রণভেরী : সংবাদ বুলেটিন
(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ

| | |
|---|---|
| ৭-২৫ মি. | বিশ্বজনমত : পর্যালোচনা |
| ৭-৩০ মি. | সঙ্গীত |
| ৭-৩৫ মি. | দৃষ্টিপাত : অধ্যাপক আবদুল হাফিজ |
| ৭-৪০ মি. | সঙ্গীত |
| ৭-৪৫ মি. | বাংলা সংবাদ, সঙ্গীত ও শ্লোগান |
| ৮-০০ মি. | ইংরেজি অনুষ্ঠান |
| ৮-২৫ মি. | বজ্রকণ্ঠ ও সঙ্গীত |
| ৮-৩০ মি. | চরমপত্র |
| ৮-৩৫ মি. | সঙ্গীত |
| ৮-৪০ মি. | ইসলামের দৃষ্টিতে : সৈয়দ আলী আহসান |
| ৯-০০ মি. | জয় বাংলা। |

৩০ জুন, ১৯৭১

সকাল :

| | |
|---|---|
| ৭-০০ মি. | (ক) উদ্বোধনী |
| | (খ) কোরান তেলাওয়াত |
| ৭-১০ মি. | (ক) অনুষ্ঠান সূচি |
| | (খ) বাংলা সংবাদ |
| | (গ) ইংরেজি সংবাদ |
| ৭-৩০ মি. | জাগরণী : সঙ্গীতানুষ্ঠান |
| ৭-৪০ মি. | ত্রিপিটক : কথিকা অথবা আবৃত্তি |
| ৭-৪৫ মি. | বিশ্বজনমত |
| ৭-৫০ মি. | বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান |
| ৭-৫৩ মি. | চরমপত্র |
| ৮-০০ মি. | জয় বাংলা। |

সন্ধ্যা :

| | |
|---|---|
| ৭-০০ মি. | উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। |
| ৭-০৫ মি. | অগ্নিশিখা : |
| | (ক) দর্পণ |
| | (খ) সংগীত |
| | (গ) আবৃত্তি |
| | (ঘ) রণভেরী : সংবাদ বুলেটিন |
| | (ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী |

৭-২৫ মি. বিশ্বজনমত : পর্যালোচনা— আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ মি. সঙ্গীত
৭-৩৫ মি. দৃষ্টিপাত : কথিকা— অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ মি. সঙ্গীত
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
৮-২৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৮-৩০ মি. চরমপত্র
৮-৩৫ মি. সঙ্গীত
৮-৪০ মি. রক্তস্বাক্ষর : ষড়যন্ত্রের অন্তরালে : পাকিস্তানের কবর রচনার জন্য দায়ী কে?— অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী।
৮-৪৫ মি. শ্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

৫ জুলাই, ১৯৭১

সকাল :

৭-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী
(খ) কোরান তেলাওয়াত
৭-১০ মি. (ক) অনুষ্ঠানসূচী
(খ) বাংলা সংবাদ
(গ) ইংরেজি সংবাদ
৭-৩০ মি. জাগরণী : সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪০ মি. আবৃত্তি
৭-৪৫ মি. বিশ্বজনমত
৭-৫০ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৭-৫৩ মি. চরমপত্র
৮-০০ মি. জয় বাংলা।

সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ : আজকের মুক্তিযুদ্ধ : সূর্যসেনের স্মৃতি— কথিকা : রণেশ দাশগুপ্ত
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন
(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী

৭-২৫ মি. বিশ্বজনমত : আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ মি. সঙ্গীত
৭-৩৫ মি. দৃষ্টিপাত : কথিকা— অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ মি. সঙ্গীত
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ : সালেহ্ আহমদ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান : পরিচালনা— আলমগীর কবীর
(ক) ...
(খ) বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি : আলী জাকের
(গ) গান
(ঘ) ইংরেজি সংবাদ : পারভীন হোসেন
৮-২৫ মি. বজ্রকণ্ঠ
৮-৩০ মি. চরমপত্র : কথিকা— এম, আর আখতার।
৮-৩৫ মি. সঙ্গীত
৮-৪০ মি. রক্তস্বাক্ষর : ...
৮-৪৫ মি. সঙ্গীত
৮-৫০ মি. ইসলামের দৃষ্টিতে : সৈয়দ আলী আহসান
৮-৫৫ মি. শ্লোগান ও দেশাত্মবোধক গান
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

**১০ জুলাই, ১৯৭১**

**সকাল :**

৭-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী
(খ) কোরান তেলাওয়াত
৭-১০ মি. (ক) অনুষ্ঠান পরিচিতি
(খ) বাংলা সংবাদ : আলী রেজা চৌধুরী
(গ) ইংরেজি সংবাদ : পারভীন হোসেন
৭-৩০ মি. জাগরণী : সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪৫ মি. বিশ্বজনমত
আমিনুল হক বাদশা
৭-৫০ মি. বজ্রকণ্ঠ ও
৭-৫৩ মি. চরমপত্র
এম, আর, আখতার (পুনঃপ্রচার)
৮-০০ মি. জয় বাংলা।

সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন : মনজুর কাদের
৭-২৫ মি. বিশ্বজনমত : আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ মি. সঙ্গীত
৭-৩৫ মি. দৃষ্টিপাত : জামিল শারাফী
৭-৪০ মি. সঙ্গীত
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ : সালেহ আহমদ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান : পরিচালনা— আলমগীর কবীর
(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি
(খ) পর্যালোচনা
(গ) ইংরেজি সংবাদ : পারভীন হোসেন
(ঘ) সঙ্গীত
৮-২৫ মি. সাম্প্রদায়িকতার উপর উর্দু কথিকা— শহীদুর রহমান
৮-৩০ মি. দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রী এম, মনসুর আলীর ভাষণ
৮-৪০ মি. দেশাত্মবোধক গান
৮-৪৫ মি. চরমপত্র : এম, আর, আখতার
৮-৫০ মি. বজ্রকণ্ঠ
৮-৫২ মি. শ্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

২৩ জুলাই, ১৯৭১

সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন : শহীদুল ইসলাম
৭-২০ মি. সংবাদ পর্যালোচনা : আমীর হোসেন
৭-২৫ মি. আলাপন : শ্রোতাদের চিঠির জবাব
৭-৩০ মি. সঙ্গীত

৭-৩৫ মি. দৃষ্টিপাত : অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ মি. সঙ্গীত
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ : সালেহ আহমদ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান : পরিচালনা— আলমগীর কবীর
(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য
(খ) পর্যালোচনা
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) ইংরেজি সংবাদ : পারভীন হোসেন
৮-২৫ মি. উর্দু সংবাদ : শহীদুল হক
৮-৩০ মি. চরমপত্র : এম, আর আখতার।
৮-৩৫ মি. সঙ্গীত
৮-৪০ মি. মানবতার নামে : কথিকা : আবু মাসুদ
৮-৪৫ মি. বজ্রকণ্ঠ, শ্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

২৭ জুলাই, ১৯৭১

সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন : শহীদুল ইসলাম
৭-২০ মি. (ক) আমাদের সংগ্রাম : আবু শহিদ
(খ) শ্লোগান ও সঙ্গীত
৭-৩৫ মি. দৃষ্টিপাত : অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ মি. সঙ্গীত
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ : সালেহ আহমদ
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান : পরিচালনা— আলমগীর কবীর
(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য
(খ) পর্যালোচনা
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) ইংরেজি সংবাদ : পারভীন হোসেন
৮-২৫ মি. উর্দু সংবাদ : শহীদুল হক
৮-৩০ মি. শ্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৩৫ মি. শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন : আহমদ রফিক

৮-৪৪ মি. বজ্রকণ্ঠ, শ্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৫৩ মি. চরমপত্র : এম, আর, আখতার
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

১৮ আগস্ট, ১৯৭১
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা :
(ক) দর্পণ : আশরাফুল আলম ও মোস্তফা আনোয়ার
(খ) সংগীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন :
৭-২৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা : আমির হোসেন
৭-৩০ মি. সঙ্গীত
৭-৩৫ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে : কামাল লোহানী
৭-৪৫ মি. বাংলা সংবাদ :
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান : পরিচালনা— আলমগীর কবীর
(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের পর্যালোচনা
(খ) সঙ্গীত
(ঘ) ইংরেজি সংবাদ
৮-২৫ মি. উর্দু সংবাদ
৮-৩০ মি. সঙ্গীত
৮-৩৫ মি. শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন : লিখিত—সলিমুল্লা, পড়বেন—মোস্তফা আনোয়ার
৮-৪৪ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৮-৪৭ মি. জল্লাদের দরবার
৯-০০ মি. জয় বাংলা।

২৮ আগস্ট, ১৯৭১
দ্বিতীয় অধিবেশন :
১-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচি
(খ) বাংলা খবর
(গ) ইংরেজি খবর
১-১৫ মি. সঙ্গীতানুষ্ঠান / পল্লী :
১। শেখ মুজিব সত্যযুগের...
২। মুজিব বাইয়া...
৩। ওরা কোথায়...

১-৩০ মি.   বিশ্বজনমত
১-৩৫ মি.   রবীন্দ্র সঙ্গীত :
১-৪৫ মি.   রক্তস্বাক্ষর : আশরাফুল আলম।
১-৫০ মি.   পুঁথিপাঠ : মোহাম্মদ শাহ বাঙালি
২-০০ মি.   জয় বাংলা।

তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি.   উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচি
৭-০০ মি.   অগ্নিশিখা : পরিচালক : আশরাফুল আলম
(ক) সংবাদ বুলেটিন : মনজুর কাদের
(খ) সঙ্গীত : বীর বাঙালি অস্ত্র ধর
(গ) দর্পণ : আশরাফুল আলম
(ঘ) আবৃত্তি : কামাল লোহানী
(ঙ) পুঁথিপাঠ : মোহাম্মদ শাহ বাঙালি
(চ) মুক্তিযোদ্ধাদের ডায়েরি থেকে : মোস্তফা আনোয়ার
(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ মি.   বাংলা খবর : আলী রেজা চৌধুরী
৭-৫৫ মি.   সংবাদ পর্যালোচনা : শহীদুল ইসলাম
৮-০০ মি.   ইংরেজি অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত : 'দুর্জয় বাংলা'
(ঘ) খবর
৮-২৫ মি.   উর্দু খবর
৮-৩০ মি.   'সোনার বাংলা' : গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্যে অনুষ্ঠান
৮-৪৫ মি.   পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৮-৫২ মি.   বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৮-৫৫ মি.   চরমপত্র
৯-০০ মি.   জয় বাংলা।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি.   উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি.   অগ্নিশিখা

(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ : রণজিৎ
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত
(চ) মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি থেকে : মোস্তফা আনোয়ার
(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা : শহীদুল ইসলাম
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
সঙ্গীত : ...
খবর : ইংরেজি
৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. উর্দু কথিকা
৮-৩৫ মি. রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা / পল্লীগীতি
৯-০০ মি. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা : মেহের খোন্দকার
৯-০৭ মি. সঙ্গীত :
৯-১৭ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৯-২০ মি. চরমপত্র
৯-৩০ মি. সমাপ্তি

**২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**
**প্রথম অধিবেশন :**

সকাল :
৭-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা
(খ) তেলাওয়াত
(গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ মি. (ক) খবর : বাংলা
(খ) খবর : ইংরেজি
৭-৩০ মি. জাগরণী : সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪৫ মি. 'রুস্তমের মা আমার মা' : কথিকা : কামাল লোহানী (পুনঃপ্রচার)
৭-৫৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৮-০০ মি. সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ : মোস্তফা আনোয়ার
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) বাংলার মুখ : জীবন্তিকা
(চ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) ডাইরি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর
৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
৯-০০ মি. কথিকা
৯-০৭ মি. সঙ্গীত
৯-১৭ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৯-২০ মি. চরমপত্র
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত (২টি)

(চ) আমরা গেরিলা (২)
(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর
৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. (ক) আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা : বেগম উম্মে কুলসুম
(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৫০ মি. সোনার বাংলা
(ক) কথোপকথন
(খ) পল্লীগীতি
৯-০০ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ মি. সঙ্গীত
৯-১৭ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান
৯-২০ মি. চরমপত্র
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

**২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**
**তৃতীয় অধিবেশন :**
**সন্ধ্যা :**

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত (২টি)
(চ) আমরা গেরিলা (২)
(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান

(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর

৮-২৫ মি. খবর ঃ উর্দু

৮-৩০ মি. (ক) ইয়াহিয়া জবাব দাও (১) শওকত ওসমান
(খ) সঙ্গীত

৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
(ক) কথোপকথন
(খ) পল্লীগীতি

৯-০০ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

৯-০৭ মি. সঙ্গীত

৯-১৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান

৯-২০ মি. সমাপ্তি।

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আজ ছ'মাস পূর্ণ হলো।

ছ'মাস আগে ২৫শে মার্চের কাল রাতে জঙ্গী ইয়াহিয়া তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ আর শিশু হত্যার এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে জঙ্গীশাহী সমগ্র বিশ্ববাসীকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার জবাব দিতে বাংলার ছাত্র, যুবক, ইপিআর, আনসার আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ানরা গড়ে তোলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিবাহিনী। প্রতি রণাঙ্গনে তারা প্রচণ্ড আঘাত হেনে চলেছেন শত্রু বাহিনীর উপর। চূড়ান্ত বিজয় এখন সন্নিকটে।

সোনার বাংলার সোনালী আকাশ, রূপালী নদী আর শ্যামল প্রান্তরে তাজা রক্তের অর্ঘ দিয়ে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা শত্রু হননের দৃঢ়প্রত্যয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের দুর্বার শপথে যাঁরা অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করছি।

বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এ মরণজয়ী সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন এবং যারা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী সালাম জানিয়ে আজকের অগ্নিশিখা অনুষ্ঠান শুরু করছি। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির উপর সেদিন নেমে এসেছিল শতাব্দীর ভয়াবহতম বিভীষিকা। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি পশুশক্তি বনমানুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর। কিন্তু সংগ্রামী বাঙালি জাতি সে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে। সংগ্রাম চলেছে

অবিরাম— ১ দিন— ২দিন— ১মাস — ২ মাস। আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর। মুক্তি সংগ্রাম আজ সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করলো দীর্ঘ ৬টি মাস। সংগ্রাম চলছে, চলবে— যতদিন না দেশ থেকে শেষ শত্রুসৈন্যটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই গৌরবমণ্ডিত দিনে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখন পরিবেশিত হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠান 'রক্তশপথ'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র—

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে শহীদানের প্রতিটি রক্তবিন্দু আজ উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতার সূর্যকে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনা আর কোটি কোটি বীর বাঙালিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আজকের এ অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।

আবার আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো আজ বেলা ১টায়। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র—

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘোষণা :

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়টি এখন হারিকেনের আকার ধারণ করেছে এবং তা আজ সন্ধ্যায় সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

০ চালনার সমুদ্র-বন্দর থেকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সঙ্কেত দেখাতে হবে।

০ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সমুদ্র-বন্দরগুলো থেকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সঙ্কেত দেখাতে হবে।

০ খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ থেকে ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপদ সঙ্কেত দেখাতে হবে।

০ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার নদী-বন্দরগুলো থেকে ২ নম্বর নৌ সতর্ক-সঙ্কেত দেখাতে হবে। খুলনা জেলার সমুদ্রকূলবর্তী এলাকায় যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করছি।

সমুদ্রে অবস্থানরত জেলে-নৌকা ও ট্রলারসমূহের আরোহীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন নৌযানগুলোকে বন্দরে নিরাপদ আশ্রয়ে ভিড়িয়ে রাখেন।

ঘোষণাটি শেষ হলো।

**২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

**প্রথম অধিবেশন :**

**সকাল :**

৭-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা
(খ) তেলাওয়াত
(গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি

৭-১০ মি. (ক) খবর : বাংলা
(খ) খবর : ইংরেজি

৭-৩০ মি. মুক্তিযুদ্ধের সফল অর্ধবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত রাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে যে বেতার ভাষণ দেন, তার ইংরেজি অনুবাদ।

৮-১৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও শ্লোগান

৮-২০ মি. সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন :

বেলা

১-০০ মি. (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
(খ) খবর : বাংলা
(গ) খবর : ইংরেজি

১-১৫ মি. (ক) ঐকতান : কোরাস

১-৩০ মি. (ক) 'এবার মায়ের পূজোয় আমরা' : বিশেষ কথিকা— রণজিৎ পাল চৌধুরী।
(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত

১-৪৫ মি. রক্তস্বাক্ষর : স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি— শামীম চৌধুরী

১-৫০ মি. পুঁথিপাঠ

২-০০ মি. সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন :

সন্ধ্যা :

৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি

৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ : মাহমুদ ফারুক
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত
(চ) স্বাধীন বাংলা বেতার পরিক্রমা
(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা

৭-৫৫ মি. প্রতিধ্বনি : শহীদুল, ইসলাম

৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর

৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. কথিকা : উর্দু
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
৯-০০ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ মি. সঙ্গীত
৯-১৫ মি. জল্লাদের দরবার
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

১ অক্টোবর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) আবৃত্তি
৭-৩৫ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৭-৪৫ মি. বাংলা খবর
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
৮-২৫ মি. উর্দু সংবাদ
৮-৩০ মি. কথিকা : এ,বি,এম, শাহাবুদ্দিন
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
৯-০০ মি. জল্লাদের দরবার
৯-২৫ মি. জয় বাংলা
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

২ অক্টোবর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশন :
সকাল
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৩ মি. তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা
৭-০৮ মি. অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ মি. বাংলা সংবাদ

৭-২০ মি. ইংরেজি সংবাদ
৭-৩০ মি. জাগরণী
৭-৪৫ মি. কথিকা (পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে)
৭-৫৫ মি. বজ্রকণ্ঠ, সঙ্গীত
৮-০০ মি. সমাপ্তি।

আজ শনিবার, ১৬ই আশ্বিন ১৩৭৮ সন, ২রা অক্টোবর ১৯৭১ সাল। অধিবেশনের শুরুতে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন মো. মুজিবুর রহমান জেহাদী ও তার বাংলা তরজমা পড়ছেন মো. খায়রুল ইসলাম যশোরী।

তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা (মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
(ক) বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত (দুর্জয় বাংলা)
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান : মেজর মঈনের সাথে
(চ) সোনার বাংলা (গান)
৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা : আমির হোসেন
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
৮-২৫ মি. উর্দু সংবাদ
৮-৩০ মি. সঙ্গীত
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা (পল্লীর শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
৯-০০ মি. সঙ্গীত
৯-০৫ মি. কথিকা : আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী
৯-১৩ মি. বজ্রকণ্ঠ
৯-১৫ মি. চরমপত্র
৯-২৫ মি. জয় বাংলা
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি

৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) বুলেটিন
(খ) দর্পণ
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান
(ঙ) সোনার বাংলা (গান)
৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. প্রতিধ্বনি
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. উর্দু কথিকা
(খ) সঙ্গীত
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
৯-০০ মি. সঙ্গীত
৯-০৫ মি. পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-১৩ মি. সঙ্গীত
৯-১৮ মি. দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলাম : কথিকা
৯-২৫ মি. বজ্রকণ্ঠ ও সঙ্গীত
৯-৩০ মি. জল্লাদের দরবার
৯-৫০ মি. জয় বাংলা
৯-৫৫ মি. সমাপ্তি।

৪ অক্টোবর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশন :
সকাল
৭-০০ মি. উদ্বোধনী
৭-০৫ মি. কোরান তেলাওয়াত ও তরজমা
৭-১০ মি. অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১১ মি. খবর : (ক) বাংলা (খ) ইংরেজি
৭-৩০ মি. জাগরণী
৭-৪০ মি. নিমজ্জমান ব্যক্তিদের তৃণ আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা : কথিকা (পুনঃপ্রচার)
৭-৪৯ মি. বজ্রকণ্ঠ
৭-৫০ মি. নজরুল গীতি
৭-৫৫ মি. জয় বাংলা
৮-০০ মি. সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন :
১-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
১-০৫ মি. খবর : (ক) বাংলা (খ) ইংরেজি
১-১৫ মি. ঐকতান
১-৩০ মি. কথিকা : ইলিয়াস আহমেদ
১-৩৮ মি. রবীন্দ্র সঙ্গীত
১-৪৫ মি. সাহিত্যানুষ্ঠান : রক্তস্বাক্ষর— শামিম চৌধুরী
১-৪৮ মি. পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি
১-৫৫ মি. জয় বাংলা
২-০০ মি. সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন :
সন্ধ্যা :
৭-০০ মি. উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ মি. অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) আমরা গেরিলা (৪)
(চ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ মি. খবর : বাংলা
৭-৫৫ মি. সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ মি. ইংরেজি অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর
৮-২৫ মি. খবর : উর্দু
৮-৩০ মি. সঙ্গীত
৮-৪০ মি. সোনার বাংলা
৯-০০ মি. কথিকা
৯-০৭ মি. সঙ্গীত : পল্লী
৯-১৭ মি. বজ্রকণ্ঠ
৯-২০ মি. চরমপত্র
৯-৩০ মি. সমাপ্তি।

৮ অক্টোবর, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশন :

১-০০ মি. উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি

১-০৫ মি. খবর : (ক) বাংলা (খ) ইংরেজি

১-১৫ মি. ঐকতান

১-৩০ মি. ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ ও ইয়াহিয়া (২য় পর্ব): আবু রাহাত মো. হাবিবুর রহমান

১-৩৬ মি. নজরুল গীতি

১-৪৫ মি. পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি

১-৫৫ মি. জয় বাংলা

২-০০ মি. সমাপ্তি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

একটি বিশেষ ঘোষণা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত শনিবার মুক্তাঞ্চলে অনুষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর অফিসার ক্যাডেটদের প্রথম শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এর উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে আমাদের আজকের রাতের অধিবেশনে।

ঘোষণাটি এখানেই শেষ হ'ল।

**শিরোনাম : ৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ।**
**সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র। তারিখ : ২৬ মে—৫ জুন, ১৯৭১।**

## বাংলা সংবাদ

২৬-৫-৭১

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি।

(২) ওয়ার অন ওয়ান্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ব্রিটিশ এম-পি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন।

(৩) বুদাপেস্টের শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশে পাকিস্তানি হামলার নিন্দা করেছে।

(৪) মুক্তিফৌজ গানবোট দখল করেছে, কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছে, পাক ফাঁড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।

(৫) আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে।
(৬) বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক পৌঁচেছেন।
(৭) পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রধান উ'থান্টের কাছে বাংলাদেশের বৌদ্ধহত্যার কাহিনী জানিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসার নিশ্চয়তা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্য সরিয়ে নিতে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য বিশ্ব সরকারসমূহের প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল যে আবেদন জানিয়েছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বিরাট সংখ্যক নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ যে পাক-দস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়েছে উ'থান্টের আবেদনে তার স্বীকৃতি রয়েছে। সেক্রেটারি জেনারেলের বিবৃতি থেকে এও প্রতীয়মান হয়, কি নিদারুণ পরিস্থিতিতে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন যে উ'থান্ট বাংলাদেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবেন যে পরিবেশে দেশত্যাগী শরণার্থীর পূর্ণ মর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আবার দেশে ফিরে আসতে পারবেন। উক্ত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার এই বক্তব্যের দ্বারা আমি এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে জাতিসংঘ পাকিস্তান সরকারের উপর এমন একটা চাপ সৃষ্টি করবে যে চাপের মুখে বাংলাদেশ থেকে পাক হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সে অবস্থাতেই দেশত্যাগী লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু স্বদেশে ফিরে আসতে পারবে।

বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী ৫৫টি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করেছেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের এবং গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন।

আবেদনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যদানের জন্য এবং তারা যাতে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেন সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সরকারসমূহের

ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান হয়েছে। তারা বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সামরিক শাসকচক্রের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাংক্ষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তারা পাক সামরিক শাসকচক্রের প্রতি আহ্বান জানান। তারা সিয়াটো-সেন্টো জোটের মার্কিন এবং অন্যান্য সদস্যরা যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করেন তার জন্যও দাবী জানিয়েছেন। বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম. এ. সামাদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বর্তমানে লন্ডনের পথে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিলেতের War on Want প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মি. ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এবং শ্রমিক দলের পার্লামেন্ট সদস্য মি. মাইকেল বার্নস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান বলতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কি বোঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ এম.পি-র কাছ থেকে বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করেন বলে জানা গেছে। ব্রিটিশ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষার বাস্তবায়নকেই তাঁরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বলে মনে করেন। বাংলাদেশ থেকে বাঙালিদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটা শাসন চাপিয়ে দেওয়ার নাম রাজনৈতিক সমাধান নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় সদর দফতর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সেনাদের একখানা গানবোট দখল করে নিয়েছে। গানবোটযোগে খানসেনারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানবোটের আরোহী সব ক'জন খানসেনাই পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুক্তিবাহিনীর জোয়ানেরা বরিশালে একটি থানা আক্রমণ করেন এবং বাঙ্গালির দুশমন খানসেনাদের কয়েকজন স্থানীয় দোসরকেও হত্যা করেন।

রংপুর সেক্টরে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল ধরলা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজ তাদেরকে বাধা দেয়। সংঘর্ষকালে বেশ কয়েকজন খানসেনা নদীতে ডুবে মারা যায়।

রাজশাহীর কাছে একটি কালভার্টে মুক্তিফৌজের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা জিপ ধ্বংস হয়েছে। জিপের আরোহীরা গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি কনভয়ের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুপক্ষের ৭ খানা যানবাহন ধ্বংস হয়। বিয়ানীবাজার এবং বড়লেখায় মুক্তিফৌজ খানসেনাদের ১৭ জন স্থানীয় দালালকে হত্যা করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি কুমিল্লার কসবা অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ একটি পাক-হানাদার বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাদের হটিয়ে দেয়।

এই অঞ্চলে মন্দভাগ নামক এক জায়গায় পাক-হানাদারদের একটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্র আর খাদ্যদ্রব্য যাচ্ছিল। মুক্তিফৌজ সেটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। বল্লভপুরে পাক-ঘাঁটির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ দু'জন প্রহরীকে হত্যা করেছেন। কাঁঠালবাড়িয়াতে মুক্তিফৌজের হামলায় পাক-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন পাক-হানাদার খতম হয়েছে। ময়মনসিংহ এলাকায় শ্রীবর্দীতে মুক্তিফৌজ একটি পাকা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে।

সিলেট সেক্টরে দু'টি পাক-ঘাঁটি মুক্তিফৌজ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই ঘাঁটি দুটির নাম জামকান্দি ও লালাপুঞ্জি। কুমিল্লায় বিবিরবাজারে মুক্তিফৌজ মাইন ফেলে পাক-হানাদারদের একটি ট্রাক বিধ্বস্ত করে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। হিলি আর পাঁচবিবির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের মুক্তিফৌজ বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় মুক্তিসংগ্রামরত বাঙালি ছাত্ররা পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের হুশিয়ার করে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছে। পোস্টারের ভাষা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার সেনাদের খতম করো—ওদের খতম কর—খতম কর। অবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে না গেলে হানাদার সৈনিকদের সবাইকে খতম করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে আলোচনা সভা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আজকের সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নজরুলের ওপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মি. জ্যোতিপাল মহাথেরো জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ' থান্টের কাছে বাংলাদেশে পাক সৈন্য কর্তৃক বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এই হত্যাকাণ্ড থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বাদ যাচ্ছেন না। মহাথেরো জানিয়েছেন, বৌদ্ধদের গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। আর স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা পাক ফৌজের সক্রিয় সহায়তায় বৌদ্ধদের সহায়-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়েছে। মহাথেরো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের রক্ষা করার জন্য উ' থান্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

26-5-71

1. Syed Nazrul Islam, the acting President of People's Republic of Bangladesh, said : In the recognition of the freedom and sovereignty of Bangladesh, lies the key to the restoration of normalcy in this part of the world.
2. The Chairman of the War on Want organisation and a Labour M. P. had called on the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed.
3. The Budapest Peace Conference condemned the Pakistani atrocities in Bangladesh.
4. The 72nd birthday of Poet Nazrul Islam is being celebrated throughout Bangladesh today.
5. The Liberation Forces captured a gunboat, shaltered a culvert and burnt Pakistani checkposts.
6. The Chief of the Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha has cabled U Thant about the plight of the Buddhists in Bangladesh.
7. Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a Bangladesh special envoy to the U. N. O. has proceeded to New York.
8. Terror stalks every corner of East Bengal today, says the London Times.
9. The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday.

The acting President of the People's Republic of Bangladesh, Syed Nazrul Islam has said that in the recognition of the independence and sovereignty of Bangladesh lies the key to the restoration of normalcy in that part of the world. He has expressed his hope that the United Nations will not fail to bring in pressure on the Pakistani Government to pull Pakistani forces out of Bangladesh.

The acting President of Bangladesh was talking to a special correspondent of United Press International.

While commenting on the Secretary General U Thant's appeal seeking relief for the Bangalee evacuees in India, Syed Nazrul Islam said that the appeal of U Thant is an admission that a large number of Banglaees had to leave their hearth and home under a terrible situation perpetrated by the military junta

of Pakistan. The unbearable circumstances that warrants the people to leave their homeland is also evident in the Secretary General's appeal itself.

Syed Nazrul Islam told the U.P.I. correspondent that he hoped the Secretary General of the U. N. O. will take up the responsibility of creating such conditions inside Bangladesh to enable the evacuees to return home. By this he meant that the U.N.O. should bring pressure upon the Pakistani Government so that the Pakistani Occupation. Army is withdrawn from Bangladesh and the freedom and sovereignty of Bangladesh is recognised. Only in that condition can normalcy be restored in Bangladesh.

The Chairman of the War on Want Organisation of England,Mr. Donald Chesswerth and a Labour Party M. P., Mr. Michael Burns called on the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed yesterday. The British leaders spent at least three hours with our Prime Minister and discussed points of mutual interest. The question of recognition of Bangladesh by the British Government is believed to have figured prominently in the discussions. Our Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed wanted to know from the British leaders what they understood by a political settlement of Bangladesh issue. The British leaders told the Prime Minister that fulfillment of the hopes and aspirations of the majority of people in Bangladesh is considered to be the political settlement of the Bangladesh issue. They said that by driving a considerable number of Bengalees out of their own country, a political solution cannot be imposed on them in any case.

125 representatives of 55 participating countries in the World Peace Conference in Budapest have jointly issued an appeal to the world governments to extend relief and succour to the Bengalee evacuees in India. The conference also invoked the good offices of the world governments to create a situation congenial for the evaeuees to return home. The signatories of the appeal consists of Ministers, Members of Parliament, lawyers, doctors and leaders of Afro-Asian freedom fighters and neutral powers. They held the Government of Pakistan responsible for the unprecedent carnage and genocide in Bangladesh and condemned the action with all the emphasis at their command.

They have called upon the Pakistan military junta to be respectful to the democratic hopes and aspirations of the people of Bangladesh. They have also called upon the United States sponsored SEATO and CENTO Organisations to stop helping Pakistan's ruling military junta. Mr. M. A. Samad, M. N. A. has represented Bangladesh in this peace conference in Budapest. He is now supposed to be on his way to England.

An Awami League Working Committee Member, Mr. Molla Jalaluddin, M. N. A. , is presently touring Patna. He held talks with State Government Leaders and will continue to do so during his stay there.

The news is coming to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

Reports reaching here from the Southern sectors of the Liberation Army, suggests that after a tense fighting the Liberation Army has captured an enemy gunboat which was patrolling the coastal areas of Barisal. All the Pakistani troops in the gunboat were drowned in the water. The jawans of the Liberation Army made a severe attack on a Police Station in the District of Barisal, captured it and vanquished the local quislings.

In the Rangpur sector, Pakistani Forces were taken to task when they were trying to cross the River Dharla. Near Rajshahi a culvert has been blown away due to a mine operation and an enemy jeep was destroyed. In the Sylhet sector the Liberation Army conducted a guerilla attack on an enemy convoy. Seven enemy trucks were destroyed in the operation.

In the Kasba sector, the Mukti Fouj, attacked an enemy lorry full of ammunition and food and set fire to it. The Ballavpur Pakistan outpost was suddenly attacked by Mukti Fouj and two of its guards were killed. At Kathalbaria, a Pakistan army captain and a few of his followers were killed. At Sreebardi, the Mukti Fouj has successfully blown a concrete bridge. In Jamkandi and Lalapunji, two Pakistani outposts were burned by the Mukti Fouj. At Bibirbazar of Comilla sector, an enemy lorry was destroyed by mine operation.

The President of Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha and Pakistan Regional Centre for the World Fellowship of Buddhists, Mr. Joytipal Mohathero, sent a cable to U Thant the

Secretary General of the U.N.O. describing the plight of the Buddhists of Bangladesh. He invited protection for the Buddhists of Bangladesh immediately from the world organisation. The cable said : "Many Buddhists including Bhikkus of East Bengal brutally killed by Pakistani troops. Temples demolished, Buddihst villages burnt to ashes. Property looted by miscreants actively aided by Pakistani troops. Please arrange for their protection."

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a special envoy of the People's Republic of Bangladesh to the U. N. O. has gone to New York from London to take up his assignment. He will present the case of Bangladesh to the Council of Nations. Mr. Justice Choudhury will also present a pen-picture of the planned genocide and preconceived extermination of the youth and intellectuals in Bangladesh by the belligereent Pakistan Army, to the press and people of the U. S. A.

All over Bangladesh the 72nd birthday of the Rebel Poet, Nazrul Islam is being celabrated today. The cultural and social organisations of Bangladesh have drawn up various programmes like seminars, cultural functions etc. on the occassion. The Swadhin Bangla Betar Kendra will broadcast a special programme on Nazrul Jayanti in its evening transmission today.

The Times of London has carried an exhaustive on the grim social conditions prevalent in Bangladesh today. Times correspondent Peter Hazelhurst writes : Terror stalks every corner of East Bengal today. Millions of people have been left homeless, famine is around the corner and there are not enough doctors left to combat an expected epidemic.

The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday on a two day visit for talks with President Anwar Sadat on 'he latest Middle East crisis.

More than or pound 1 million donated by the British public for the victims of a cyclone disaster in Bangladesh last November, is still lying in Banks in London even after six months after the catastrophe. Oxfam, one of the largest British relief agencies, says that the money is lying idle because the Pakistan Government has refused to allow relief workers into the area.

শিরোনাম : ৫. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর নিয়মিত কথিকামালা (অংশ)।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র। তারিখ : ৩০ মে-২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

# বিশ্ব জনমত

৩০ মে, ১৯৭১

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকার ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র জনতার উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে—ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আর সে রাতের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিশ শতকের ইয়াজিদ ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার যে চক্রান্ত সাবেক পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়েছিল একাত্তরের মার্চ মাসে ঘটল তারই নগ্ন প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা তাই আর কোনও কিছু রেখে ঢেকে রাখতে চায় না। এজন্য তারা কামান-বন্দুক-মেশিনগান-বোমারু বিমান মায় যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বাঙালিদের সামনে একটি মাত্র পথ সে পথ স্বাধীনতা রক্ষার সশস্ত্র লড়াই। বাংলার বীর জনতা সে দায়িত্ব পালন করেছে। আজ তাই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। এ সত্য বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রাণের মন্ত্র—বাংলাদেশের বাঁচার শপথ।

বিগত ২৪ বছর বাংলাদেশ শোষিত হয়েছে ধর্ম আর সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠী লুণ্ঠন করেছে বাংলার সম্পদ—ধ্বংস করেছে বাংলাদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। আর এ পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা। কিন্তু পাট চাষিরা তাতে কোনও উপকৃত হয়নি। বাংলার গরিব চাষি-শ্রমিকেরা আরও গরিব হয়েছে—তাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতনের চরম দণ্ড।

বাংলাদেশ এবং বাংলার জনগণকে বাঁচাবার জন্যই আজ তাই শুরু হয়েছে মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শরীক বাংলার বুদ্ধিজীবী, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র সবাই।

বাঙালির এ সংগ্রামকে আজ নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অধিকাংশ সদস্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বাংলার জনগণের প্রতি তাঁদের সমর্থন। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটের ফুলব্রাইট এবং আরও কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন—পাকিস্তানের জংগী সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তাকে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত কমিটি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। ইসলামাবাদের খুনী সরকারের

বিশেষ দূত এম. এম আহমদ হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর সাথে দেখা করার সকল আবেদন-নিবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ঘাতকেরা অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ত্বরান্বিত করেছে। যুদ্ধের খরচ দৈনিক দেড় কোটি টাকা। অতএব—চাই—চাই— সাহায্য চাই। সাহায্যের জন্য ভিক্ষা পাত্র নিয়ে দেশপরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ইয়াহিয়ার দোসর এম,এম আহমদ কিন্তু সবখানেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি শূন্য হাতেই ফিরেছেন।

অন্যদিকে যতই দিন যাচ্ছে বাংলায় মুক্তি বাহিনীর আঘাত দুর্বার হয়ে উঠছে। হানাদার শত্রুরা গেরিলা আক্রমণে হয়ে উঠছে দিশেহারা। সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এগিয়ে আসছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্যে। কয়েকদিন আগে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শান্তির কংগ্রেসের অধিবেশন পৃথিবীর বহুদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছেন—বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সর্বাত্মক সাহায্য করবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে।

সুইডেনের সকল রাজনৈতিক দল যুক্তভাবে ঘোষণা করেছেন—বাংলাদেশে ইসলামাবাদের লেলিয়ে দেয়া জল্লাদের নির্বিচার হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে। বাংলার নির্যাতিত জনগণকে তাদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাঁরা জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সুইডেনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দল-মত নির্বিশেষে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শুভ বিবেকের এই কণ্ঠস্বরকে জানাচ্ছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতা উদ্দীপিত হয়ে উঠছে—স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের লড়াই আজ তাই সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পিকার মি. জাইচেক বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে বাংলাদেশের সপক্ষে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের ইয়াহিয়ার হানাদার সেনারা বর্বরতা ও নৃশংসতার যে বীভৎস ইতিহাস রচনা—করেছে তিনি তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির উপর অকারণে ইয়াহিয়ার সেনারা যে নির্যাতন চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আওয়াজ তোলার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। তিনি বলেছেন, বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে—শাসকগোষ্ঠীর এ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন কোনও বিবেকসম্পন্ন মানুষই করতে পারে না।

দেশে দেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বিবেকের উচ্চস্বর আজ বহুদেশে উচ্চকিত। ব্রিটেনের শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্নসও বিশ্ববিবেকের সাথে ঘোষণা করেছেন একাত্মতা। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসহায় জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে যে কোনও রকম সাহায্য দান বন্ধ রাখুন।'

বাংলাদেশের যে সমস্ত লোক পশ্চিম পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি স্বচক্ষে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। মি:

মাইকেল বার্নস বলেছেন, ব্রিটেনের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

১০ জুন, ১৯৭১

হংকং এর ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

দৈনিক ডন এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইম্‌স্‌সহ পশ্চিম পাকিস্তানের পত্র পত্রিকা স্বীকার করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবর রহমান ও মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আলোচনা চলাকালে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ এ কথা প্রচারও করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের চারটি যুক্তিসগত দাবী মেনে নিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমানের এই চারটি দাবী হলো :

এক—সামরিক শাসন তুলে নেয়া

দুই—সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

তিন—নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দেয়া

চার—সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র জনসাধারণ হত্যার তদন্ত করা।

এই দাবীগুলো মেনে নেয়ার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিতান্ত গোপনে ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে বিমান যোগে করাচি ফিরে গেলেন। এবং আওয়ামী লীগকে বে-আইনি ঘোষণা করে ও পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এর কোনও যুক্তি সংগত ব্যাখ্যাও প্রেসিডেন্ট দিতে পারলেন না। এতে পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল যে, আলোচনার নামে সময় নিয়ে ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলায় সৈন্য আমদানী করলেন—যাতে বাংলাদেশের অধিকার সচেতন মানুষ ইয়হিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর সামনে আর মাথা তুলে আর দাঁড়াতে না পারে। এ সকল কারণে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর প্রতি সকলে সন্দেহ পোষণ করলো।

কানাডার দৈনিক মনট্রিল স্ট্রিট পত্রিকায় বলা হয় :

ঢাকার ব্যাপক গণহত্যা পরিকল্পনায় স্বয়ং ইয়াহিয়া খানসহ পাক-সেনাবাহিনীর সব জেনারেল জড়িত ছিল। মূলত গৃহযুদ্ধ দমনের পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় এই জেনারেলরা পুরোপুরি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই হত্যাযজ্ঞ কেবল মাত্র টিক্কা খানের নিজস্ব ও একক উদ্যোগ নয় এটা আসলে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে সংগঠিত একটি মিলিটারি অভিযান। বাঙালি হত্যার সামরিক আদেশ সেনাবাহিনীর সকল ইউনিট কমান্ডারের কাছে যাতে প্রত্যক্ষভাবে এবং লিখিত ভাবে পৌছে সেজন্য প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ বিকেল দুটো পর্যন্ত নিজেই খোঁজখবর নিয়েছিলেন। সন্ধ্যে সাতটায় প্রেসিডেন্ট বিমানবন্দরের উদ্দেশে বাসভবন ত্যাগ করেন। রাত এগারটায় ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার গানসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়।

জাপানে ডেইলি জাপান টাইমস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে : পূর্ব বাংলার পাক-সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণেই এ রক্তক্ষয়ী অভিযান চলছে। জাপানে আসাহি শিম্বুন পত্রিকা বলেছেন, বাংলাদেশের নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও সেখানে যে নির্বিচার গণহত্যা চলছে, তা নজীরবিহীন।

নেপালের দি নিউ হেরাল্ড পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে : পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক চক্র পূর্ব বাংলার যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে এবং গণজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে তাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের প্রতি বিশ্ববাসী সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মুক্তিকামী জনতাকে এভাবে হত্যার ফলে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক চিরতরে তিক্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর কাণ্ডকারখানার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, পূর্ববাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এবং তারা প্রাণ দিচ্ছেও।

তুরস্কের দি ডেইলি জুনাইদিন পত্রিকা মন্তব্য করেছেন যে, একদিকে প্রায় লক্ষ সুসংগঠিত, সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য, অপরদিকে সাতকোটি নিরস্ত্র বাঙালি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখনো কতল করতে পারবে না। বাঙালির মুক্তি অবধারিত।

## ১৭ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা ও ব্যাপক গণহত্যার অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র এক ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার ঘৃণ্য অপরাধ ঢাকা দিতে তারা 'ইসলাম বিপন্ন ইসলামী দেশ বিপন্ন" বলে ধূয়ো তুলেছে। এই ধুয়ো তুলে তারা মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশসমুহের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। "ইসলাম বিপন্ন—ইসলামী দেশ বিপন্ন, বলে তারা ওইসব দেশের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানের কবরে শোয়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। কিন্তু সবরকমের সাবধানতা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের এই হীন দুরভিসন্ধি ঢাকা পড়েনি। বাংলাদেশে গণহত্যার রক্তাক্ত হাত তারা লুকাতে পারেনি। গোপন করতে পারেনি তাদের জঘন্যতম অপরাধ।

বিভিন্ন আরব দেশের পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আরব জনগণকে প্রতারিত করার যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যার প্রতিবাদে আরব দুনিয়া থেকে এটাই হলো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি ও প্রতিবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো আবার।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তথা বাঙালিদের বিপুল বিজয়ের বর্ণনা করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবার এবং জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইয়াহিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের ওপর গণহত্যা ও পাকবাহিনীর বর্বরতা ঐক্যের ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত হেনেছে।

আরব দুনিয়ার ওই পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। বাঙালি মুক্তিসেনাদের বীরোচিত লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও সাহায্য দানের জন্যে সংহতিমূলক প্রচার সংগঠিত করার এবং ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনীর গণহত্যার মুখোশ খুলে ধরার জন্যে আরব জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরব যুব সংস্থাগুলি দাবি করেছেন যে, বাংলাদেশে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রকে বাধ্য করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

বিবৃতিতে সিরিয়ার ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব ইউথ, ইরাকের ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন, ইয়েমেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আস্সালাফি যুব আন্দোলন, সুদানের ইউথ ইউনিয়ন ও লেবানন ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের ১২০ জনের বেশি সদস্য বাংলাদেশে গণহত্যার জন্যে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে এককভাবে দায়ী করে এক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন।

ব্রিটেনের ক্যাবিনেট মন্ত্রী জন স্টোনহাউস এই প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বাংলাদেশে আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তির পথে মারাত্মক হুমকি ও জেনেভা কনভেনশনের পরিপন্থী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকেই প্রকৃত সরকার বলে মর্যাদা দিতে হবে।

মার্কিন প্রতিনিধি সভার এশিয়া বিষয়ক সাবকমিটির চেয়ারম্যান মি. কর্নেলিয়াস গ্যালাবার পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে গতকাল একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। মার্কিন সিনেটেও এ ধরনের একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এদিকে ইউরোপের বহু দেশ সুস্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে একতরফা সমাধান চাপিয়ে দিতে পারে না।

সুইডেন, হল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি সমেত ইউরোপীয় দেশগুলি এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর একতরফাভাবে কোনও সমাধান চাপিয়ে দিতে পারে না। ইউরোপের এইসব দেশগুলি তাদের মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে একত্রে মিলে ইয়াহিয়া সরকারকে তাদের এই মনোভাব জানিয়ে দেবে।

১৯ জুন, ১৯৭১

....বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ এক মাস ধরে সফরের পর মাত্র কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে ফিরে এসেছেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ গিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ ও সরকারের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতার করুণ চিত্রটি তুলে ধরতে এবং দেশ থেকে পশ্চিম

পাকিস্তানি হানাদারদের উৎখাতের জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ যে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে তার প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করতে।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বুদাপেস্ট অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সম্মেলন সার্থক হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে এই সম্মেলনে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পরিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আইনসঙ্গত ও ন্যায্য সংগ্রাম ও তাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ল্যামব্রাকিস' পদক উপহার দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বুদাপেস্ট সম্মেলনের পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং ওইসব দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও গভীর সহানুভূতি প্রত্যক্ষ করেছেন।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বিশ্ব এটাও বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির সমাধান না হলে সমগ্র বিশ্বে এর বিস্ফোরণ ছড়িয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়াশাহীর অবসান ঘটবে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নির্মূল হবে এবং তাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটবে— এই মূল সত্যটি বিশ্ববাসী আজ উপলব্ধি করেছেন।

**২০ জুন, ১৯৭১**

...পাক সেনারা বাংলাদেশে যে অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন চালিয়েছে তাকে 'কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কার্যকলাপ' বলে বিভ্রান্তিকর খবর রটিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের মানুষ তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত সাংবাদিক, কূটনীতিক, শান্তি ও সমাজসেবী সংস্থাসমূহ এবং পর্যটক প্রকৃত ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা দেখেছেন বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর লোমহর্ষক নৃশংসতার চিহ্ন। ভারতের সীমান্তে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ইয়াহিয়া সরকার ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বলে বর্ণনা করেছিল তারা সকলেই যে প্রকৃতই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত এবং ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর অত্যাচারেই যে তারা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছে এটা তারা প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর সকল দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে এর প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের কোনো মানুষই ইয়াহিয়া সরকারের জঘন্য প্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা মানব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়— মানব ইতিহাসের এই কলঙ্ক মুছে দেয়া সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের এই মন্তব্যের কয়েক দিন পরেই জাতিসংঘ ত্রাণ ও সাহায্য দফতরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন

আগা খাঁ ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।

ভারত সীমান্তে বিভিন্ন শরণার্থী শিবির সফর করার পর সদরুদ্দীন আগা খাঁ নিজেই বললেন : বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে কোনোরকম নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত স্বদেশে ফিরতে পারে না। বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এই স্মারকলিপিটিতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা বলেছেন যে, যতদিন পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে থাকবে ততদিন স্বদেশে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আজও সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে, আজও তারা সেখানকার সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পদ ধ্বংস করছে— নারীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের এই বর্বরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা ও এর অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হবার জন্যে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. রিচার্ড নিক্সন ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মি. রজার্সের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সিনেটর কেনেডি বলেন, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের সৃষ্ট এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকারের নীরবতা মানব ইতিহাসের এক করুণ ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে ইয়াহিয়া সরকার তা সবই বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

সিনেটর কেনেডি বলেন, আর কালবিলম্ব না করে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সক্রিয় হতে হবে। বর্তমান জরুরি অবস্থাই ইয়াহিয়া সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রকৃষ্ট সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

### ২১ জুন, ১৯৭১

...সম্প্রতি হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর সভ্যতা ও মানববিরোধী সামরিক তৎপরতার জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধ্বংস ও লুন্ঠন বন্ধ করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতি বৈঠকে আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এই মর্মে দাবী জানান যে তারা যেন পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেন।

বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে এক আবেদনে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বলেন, যারা মানবিকতার নীতিকে অস্বীকার করে,

যারা মানবতাকে হত্যা করে— বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র, সভ্যতা ও মানবতাকে একসঙ্গে খুন করেছে তাদের ক্ষমা নেই।

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'শান্তি ও মানবতার প্রতি আজও যারা শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রত্যেকেরই উচিত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে এমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির দাবী করা, যাতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাদের স্বদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতিসহ ফিরে যেতে পারেন।'

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেছেন। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বাংলাদেশের সংগ্রামকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে বিশ্বের সকল শান্তি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু মানবদরদী ও শান্তি সংস্থা সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। এইসব তারবার্তায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী যেহেতু 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়' সেই কারণেই বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অথচ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ইয়াহিয়া সরকার তার বেতার, টেলিভিশন ও কূটনৈতিক মিশনসমূহের মাধ্যমে এই ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রচার করছিল। বাংলাদেশে তাদের সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যাকে তারা বাঙ্গালি-অবাঙ্গালির মধ্যে সংঘর্ষ ও কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কার্যকলাপ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে অপকীর্তি বিশ্ববিবেকের চোখে এখন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। জানি না ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার এই কেলেঙ্কারির পর আবার কোন্ ছেঁদো কাহিনীর আশ্রয় নেবেন— তবে সত্য ঢাকতে গিয়ে, অপরাধ গোপন করতে গিয়ে তারা যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন পরিণতি তাদের একই হবে। কারণ, খোঁড়ার পা গর্তেই পড়ে।

### ২২ জুন, ১৯৭১

সম্প্রতি বার্লিন থেকে প্রকাশিত জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের এক ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতনের ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী আর যাতে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য না হয় এবং ইতিমধ্যেই যে ৬০ লক্ষ বাঙালি দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে তারা যাতে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে এবং বাংলাদেশে যাতে তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হয় তার জন্য

কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যাতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইসব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই বাস্তবসম্মত, উপযুক্ত এবং স্থায়ী সমাধানের পথ নিহিত আছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং সেখানকার গণনির্বাচিত নেতৃবর্গের পরামর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক সঠিক ও সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারকে বিশ্বের সকল দেশের রাজনৈতিক মহল দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাঁরা বলেন, এই ইশতেহারে বাংলাদেশ থেকে যেসব শরণার্থী ভারতে চলে গেছে তাদের সমস্যাকে শুধু যে কেবল আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এই ইশতেহারে দাবী করা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমান সহ সব রাজনৈতিক নেতার মুক্তি, আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি।

ইউরোপ ও আমেরিকার পত্রপত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনসমূহের প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্যে বলা হয় : গত ২৫শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে বর্বরতা চালিয়েছে তাতে বাংলাদেশ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশছাড়া হতে বাধ্য হবে।

গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল তাতে আনুমানিক ১৮ থেকে ২০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং এই ব্যাপক প্রাণহানির মূলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রচ্ছন্ন কারসাজি ছিল। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যুর হাত থেকে শতকরা ৯৫ জন অব্যাহতি পেতে পারতো, পশ্চিম পাকিস্তানিরা তথা ইয়াহিয়া সরকার ইচ্ছা করেই সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকি ব্যাপক প্রাণহানির খবরটুকু পর্যন্ত চেপে গেছে। বাইরের জগত যেটুকু জেনেছে তা বাংলাদেশের বেসরকারি কতগুলো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের খবর থেকে। গত ২৫শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালালো, এর খবরও তারা চেপে গেছে। ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ১০ লাখ নরনারীকে গুলি করে ও আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা থেকে এই তথ্য উদ্ধৃত করা হয়। অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার এরকম মন্তব্য করা হয়েছে যে, পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত মূসার (আ.) যুগে মিশরের উপর পর পর যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় এসেছিল তাতেও এত প্রাণহানি ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ পর্যন্ত যত বাঙালি খুন করেছে তার দ্বিতীয় কোনও দৃষ্টান্ত নেই। এত নরহত্যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি।

২৮ জুন, ১৯৭১

বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে আর কোনও আর্থিক সাহায্য দেবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি প্যারিসে পাকিস্তানকে সাহায্য দানকারী কনসার্টিয়ামভুক্ত ১১টি দেশের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কনসার্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ স্থির করেছেন যে, বাংলাদেশে সবদিক থেকে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে নতুন করে কোনও রকম আর্থিক সাহায্যদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং পাকিস্তান এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ঋণ নিয়েছে সেগুলোই সুদে-আসলে আদায় করা হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আর্থিক সাহায্যলাভের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে পাকিস্তান যত কান্নাকাটিই করুক না কেন, এ ব্যাপারে কনসার্টিয়ামের আর কোনও বৈঠক বসবে না।

'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর প্যারিসস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে উক্ত বৈঠকে বেলজিয়াম, কানাডা ও ব্রিটেন একথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাদের জনমত প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং পাকিস্তানকে কোনও রকম সাহায্যদানের তারা ঘোর বিরোধী। অতএব নিজেদের দেশের জনমতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক বর্বরতা চালানোর সহযোগিতা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।— অর্থাৎ পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসার্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের অভিমত হলো : ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গী সরকার যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন বন্ধ না করবে, বাংলাদেশ থেকে যতদিন পর্যন্ত তাদের রক্তভেজা লোমশ হাতগুলো গুটিয়ে না ফেলবে এবং যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন আমরা কেউই পাকিস্তানকে একটি কানাকড়ি পর্যন্ত দিচ্ছি না।

হল্যান্ড সরকারও এই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। হল্যান্ডের উন্নয়ন সাহায্য সংক্রান্ত মন্ত্রী মি. জে, বি, উডনিক হেগস্থ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানের সরকার তার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিহত করেছেন, যেহেতু পাক সরকার তার নিজের দেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ও শহর-গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করেছে এবং যেহেতু পাক সরকার নিজেই নিজের দেশের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদটিকেই বুলেট-বেয়োনেটের আঘাতে শেষ করে দিয়েছে, সেই কারণেই পাকিস্তানকে নতুন কোনও সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করা যায় না।

মি. উডনিক বলেন, পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসার্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েই তার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, যেসব সাহায্য দেওয়ার কথা ইতিপূর্বেই হয়েছিল তা এখন পুনর্বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।...

৪ জুলাই, ১৯৭১

......ভাটিকানের মহামান্য পোপ পল থেকে শুরু করে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট এবং পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ধিক্কার আর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার একদিকে যেমন বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা ও অবর্ণনীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে অন্যদিকে তারা বাংলাদেশ থেকে বাইরে সংবাদ যাওয়ার সকল পথ রুদ্ধ করে চরম অপপ্রচার ও ভুয়ো কল্পকাহিনী ছড়িয়েছে। এইসব পরস্পরবিরোধী চিত্র ও প্রচারণার জন্যেই সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল পাক-অধিকৃত এলাকাসমূহ এবং বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফরে এসেছিলেন। এই ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন শ্রমিক দলের প্রভাবশালী সদস্য মি. আর্থার বটমলি।

মি. আর্থার বটমলি ছিলেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব। এখন তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের একজন প্রভাবশালী সদস্য।

বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে মি. বটমলি সাংবাদিকদের বলেছেন : ইয়াহিয়া তার সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন তা স্রেফ ধাপ্পা মাত্র। ইয়াহিয়ার ওই বেতার বক্তৃতায় রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ও ধরনের প্রস্তাব বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারেন না।

মি. বটমলি বলেন : আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে সমাধানের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের অন্যতম সদস্য মি. টোবি জেসেল ও বিশিষ্ট সদস্য মি. আর্নেষ্ট প্রিন্টিসও এ ব্যাপারে মি. বটমলির সঙ্গে একমত।

মি. টোবি জেসেল বলেন : রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা বিপজ্জনক। অবিলম্বে এ সমস্যার সমাধান যদি না করা হয়, তাহলে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ হতে বাধ্য। তিনি বলেন, পাকিস্তান এখন এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসের পিছনে ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা রয়েছে বলে পাকিস্তান যে ডাহা মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যগণ সকলেই তার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে ধ্বংসের যে বীভৎস চিত্র আমরা দেখে এসেছি তা কোনোক্রমেই ভারতীয়দের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়।...

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের অপর সদস্য প্রাক্তন ব্রিটিশ সমর সচিব মি. জেমস র‍্যামসডেন বলেন : বাংলাদেশে পাক সামরিক বাহিনী যা করছে তা বীভৎস। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এতই বিপজ্জনক ও দুর্বিসহ যে সেখান থেকে আরও অধিক সংখ্যায় শরণার্থী ভারতে বা প্রতিবেশী দেশে চলে যেতে পারে। এর ফলে শরণার্থী সমস্যা আরও গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে। আর তা দেখা দিলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

পাকিস্তানের পক্ষে আসবে এক দারুণ মরণ আঘাত। সে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যই বলেন : পাকিস্তানের আজ এটা উপলব্ধি করা উচিত যে পাকিস্তান বর্তমানে এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মাঝ দিয়ে চলেছে। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের ওপর জঙ্গী শাসন চাপিয়ে রেখে এর সুরাহা হবে না, হতে পারে না। মি. আর্থার বটমলি বলেন : পাক বাহিনী কেন, পৃথিবীর কোনও শক্তির পক্ষেই সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-সচেতন মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।...

**৯ জুলাই, ১৯৭১**

বিশ্বজনমত অনুষ্ঠানে মার্কিন সাময়িকী 'নিউজউইক'-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কিত একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টের অংশবিশেষ আমরা উল্লেখ করেছিলাম। "দা টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান" বা "টিক্কা খানের বীভৎস রক্তস্নান" শিরোনামের এই রিপোর্টে "নিউজউইক" সংবাদদাতা টনি ক্লিফটন বাংলাদেশে পাক বর্বরতার একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরেছেন। রিপোর্টে তিনি বাংলাদেশে যে মর্মান্তিক ঘটনাবলীর কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কোনও রকম মন্তব্য না করে আমরা শুধু তার বাকী অংশটুকু তুলে ধরছি।

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : পাক বর্বরতার যেসব বীভৎস স্বাক্ষর আমি প্রত্যক্ষ করেছি ও পাক-হানাদারদের পৈশাচিকতার যেসব লোমহর্ষক কাহিনী আমি শুনেছি তাতে আমার শুধু একথাই মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে কয়েক হাজার মাইলাই ও কয়েক হাজার লিডিসেস সংঘটিত হয়ে গেছে। আমার আজ আর কোনও সন্দেহ নেই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত এমন বর্বরতা কখনও সংঘটিত হয়নি। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং এমন কি গত দুটো বিশ্বযুদ্ধেও এতখানি বিপর্যয় কখনও ঘটেনি। আমার মনে হয়, পাক বর্বর বাহিনী বাংলাদেশে যে হাজার হাজার মাইলাই আর লিডিসেস সংঘটিত করেছে তার শেষ এখানে নয়— বাংলাদেশে আরও অনেক মাইলাই, আরও অনেক লিডিসেস অচিরেই সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

টনি ক্লিফটন বলেন : এইসব দেখে-শুনে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো— আমি হতবাক, স্তব্ধ হয়ে গেছি। আমি যা দেখেছি যা শুনেছি তাতে ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমি হতবাক হয়ে গেছি— বার বার বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি— এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড আর এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায় একজন মানুষের কোনও চেতনা থাকা কি সম্ভব?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক-হানাদারদের হত্যা, নির্যাতন ও ব্যাভিচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের একটি সর্বহারা বালিকার এক মর্মান্তিক কাহিনী তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন : লালফুল ও সবুজ লতাপাতা আঁকা গোলাপী রঙের একপা ছেঁড়া ফ্রকের আট-ন'বছরের বালিকা ইসমত আরার মুখে আমি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করেছি। আমি তাকে দেখলাম শরণার্থী শিবিরের অনতিদূরে একটি হাসপাতালে।

শত শত আহতদের ভিড়ের এক প্রান্তে সে দাঁড়িয়েছিল। দিশেহারা দুটি ভীরু চোখ দিয়ে চারিদিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সে যে আহত আমি তা দূর থেকেই লক্ষ করলাম। মনে হলো শীর্ণ আলোর একটি রেখার মতো এই মেয়েটি তো কারও বিপদের কারণ হতে পারে না? এই ছোট্ট মেয়েটি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে কি এমন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যার জন্যে তারা এভাবে আঘাত করেছে? একজন পাকিস্তানি সৈন্য বেয়োনেট দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করেছে। তার শ্বাসনালী কেটে দিয়েছে। সে তার গলার ব্যান্ডেজের ওপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। আমি এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি বললো : আমার নাম ইসমত আরা। আমার বাবার নাম মরহুম ইশাক আলী। কুষ্টিয়ায় আমার বাবার দোকান ছিল। দু'মাস আগে বাবা আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে কুষ্টিয়ায় গেছেন। কিন্তু তার পর থেকে আর তিনি ফিরে আসেননি। যেদিন বাবা কুষ্টিয়ায় রওয়ানা হয়েছিলেন সেই রাতে আমি ঘুমোবার আগে বাইরে কোলাহল আর ভারী ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে যাওয়ার আগেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো পাক সৈন্য আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা আমাদের ঘরে ঢুকেই আমার দাদাকে গুলি করে। আমার দাদা বি.এসসি পাস করেছিল। তারপর তারা আমার মা ও বোনদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের শেষ পর্যন্ত বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে। একজন সৈন্য লাফ দিয়ে এসে আমাকে আঘাত করে। তারা বেয়োনেট দিয়ে আমার গলায় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়ে যাই এবং মৃতের ভান করি। তারপর সৈন্যরা চলে গেলে পরের দিন একজন লোক গিয়ে আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে। এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কেমন হয়ে পড়েছিল। সেই বীভৎস দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সে তা সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। আর তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার ওয়ার্ডের ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করলাম। ডাক্তার আমায় জানালেন, একদিন এক ভদ্রলোক তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে নিয়ে আসে। এরপর হাসপাতালে আহত শরণার্থীদের ভিড় ঠেলে আমি যখন বাইরে বের হচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় ইসমত আরা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার দুচোখের কোণায় জল টলমল করছিল। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে সে আমায় জিজ্ঞেস করলো : বলুন না এখন আমি কি করবো? জানেন আমরা পাঁচ বোন ছিলাম, আমার ভাই ছিল, মা-বাবা ছিল। কতো সুন্দর আমাদের ঘরবাড়ি ছিল। আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আজ আমি এতিম। বলুন না, আমি কোথায় যাবো? আমার কি হবে? আমি তাকে বললাম, আর তো কোনও ভয় নেই। তুমি এখানে চলে এসেছো, এখন তোমার ভয়ের কিছু নেই। কপট এক নির্বোধের মতো আমি তাকে সান্ত্বনার কথাগুলো বললাম— কিন্তু ইসমত আরার কি হবে? কি হবে আরও হাজার হাজার ইসমত আরার?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার নিউজার্সির কংগ্রেস সদস্য মি. কর্নোলিয়াস গ্যালাঘার আমায় বলেছেন যে, পাক বাহিনীর বর্বরতার খবর অতিরিক্ত বলে আমি প্রথমে মনে করেছিলাম এবং প্রকৃত সত্য যাচাইয়ের জন্যেই আমি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়।

মি. গ্যালাঘার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর একজন বিখ্যাত সামরিক অফিসার ছিলেন। তিনি বলেছেন : দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের সময় ফ্রান্সের বিধ্বস্ত এলাকাগুলো আমি দেখেছি— মর্মান্তিক বধ্যভূমিগুলোও আমি দেখেছি, কিন্তু আমি এমনটি কখনও দেখিনি। এ বীভৎসতা, এ বর্বরতার কোনও তুলনা হয় না।

টনি ক্লিফটন বলেন, গত তিন মাসে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তাতে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র দেশ হয়ে যাচ্ছে। সেটা ঠিক কবে হচ্ছে সেটাই শুধু প্রশ্ন, হচ্ছে কিনা সেটা আজ আর কোনও প্রশ্ন নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা।

**১০ জুলাই, ১৯৭১**

বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র কয়েক দিন আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "বাংলাদেশের লাখো শহীদের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে।" প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের এই উক্তির ক'দিন পরেই লন্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক ডেলি মিরর-এ প্রকাশিত A DEATH OF A NATION শিরোনামের একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক বর্বরতার লোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে এই একই মন্তব্য করা হয়। এর আগে লেবানিজ দৈনিক 'আল সাব' পত্রিকায় প্রকাশিত ARTIFICIALLY CREATED PAKISTAN IS UNFIT TO CONTINUE শিরোনামের রিপোর্টেও এই একই মন্তব্য করা হয়। তারপর গত সপ্তায় প্রকাশিত প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী NEWSWEEK-এ প্রকাশিত THE TERRIBLE BLOOD BATH OF TIKKA KHAN শিরোনামের রিপোর্টে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বীভৎস হত্যাযজ্ঞ, ব্যাভিচার, নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে। পাকিস্তান ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ ভাঙ্গন জোড়া দেয়ার নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা। চলতি সপ্তাহে নিউজউইক লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সৈন্য পাঠিয়েছে সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি কানাডীয় পার্লামেন্টের তিনজন প্রভাবশালী সদস্য বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া সর্বহারা শরণার্থীদের অবস্থা এবং বাংলাদেশে পাক বর্বরতার নমুনা দেখার জন্যে শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেছেন : 'পূর্ব পাকিস্তান' — এই নামে কোনও রাষ্ট্র-রাষ্ট্রাংশের অস্তিত্ব আর নেই। বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব সত্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ একথা জোর দিয়ে বলেন, আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আর এই আস্থা আছে বলেই আমরা মনে করি বাংলাদেশের গণনির্বাচিত

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। কানাডীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের নেতা, কানাডার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মি. জর্জেস লাচাঁস সাংবাদিকদের বলেন : শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে অন্যায় কিছু করেন নি। তিনি বলেন, কানাডার অনেক পরিষদ সদস্যই তো কুইবেক-এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী তুলেছেন। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অতএব এই গণতান্ত্রিক অধিকার তোলার জন্যে কাউকে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত নয়।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর কানাডীয় প্রতিনিধিগণ বলেন : এটা এখন পরিষ্কার যে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাঁরা বলেন, এটা এই শতাব্দীর সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়। শুধু কানাডার জনসাধারণের নয়, বিশ্ববাসী বিশেষ করে কমনওয়েলথ দেশসমূহের মানুষের যা কিছু করণীয় আছে আমরা তা অবশ্যই তুলে ধরবো।

তাঁরা বলেন, পাকিস্তান, ভারত ও কানাডা সকলেই কমনওয়েলথের সদস্য। কমনওয়েলথের একটি সদস্যরাষ্ট্রের সমরনায়করা বাংলাদেশকে ও বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে তা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

কানাডীয় পরিষদের এই তিনজন সদস্য হলেন ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মি. জর্জেস লাচাঁস, মি. এ বিউইন ও মি. হিথ নেলসন।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার কারাকাস থেকে প্রকাশিত খ্রিষ্টীয় বিশ্বের প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্যা রিলিজিয়ন' পত্রিকায় বলা হয় : পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তা দেখলে যিশুখ্রিস্ট নিজেও ভয়ে শিউরে উঠতেন।

পাক হানাদারদের এই পৈশাচিকতার কঠোর সমালোচনা করে 'দ্যা রিলিজিয়ন' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বলা হয় : পাক সামরিক সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে ঘরোয়া ব্যাপার বলে চালাতে চেষ্টা করে বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদেরই চূড়ান্ত অপমান করেছে। বস্তুত এই সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং মানববিবেকের প্রতি এটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

### ১৪ জুলাই, ১৯৭১

...গত ১২ই জুলাইয়ে প্রকাশিত মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক-এ বলা হয় : পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে সৈন্য পাঠায় সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

'নিউজউইক' পত্রিকায় বলা হয় : ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে বাংলাদেশে যখন সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে সবদিক থেকেই রাজনৈতিক সমাধানের দাবী উঠছিল। ইয়াহিয়ার সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছিল। দাবী উঠছিল— পাকিস্তানের যে সঙ্কট তার সমাধান সমরসজ্জা বা সামরিক অভিযানে সম্ভব নয়। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। কোনও রকম শর্ত আরোপ না করে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই সমাধান নিহিত রয়েছে। বুলেট-বেয়োনেটে পাকিস্তানের

রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র ঘরে-বাইরের এই দাবী উপেক্ষা করে পাকিস্তানের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত বৈঠক বাতিল করে বাংলাদেশের ওপর সামরিক অভিযান চালালো।...

নিউজউইক উল্লেখ করেন : গত সপ্তাহে ঢাকায় কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক মন্তব্য করেছেন, আপোস আলোচনার আর কোনো পথই খোলা রইলো না। ইয়াহিয়ার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আলোচনার সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। আলোচনা এখন আর সম্ভব নয়। পাকিস্তান মরে গেছে এবং ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্রই পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে।

**১৫ জুলাই, ১৯৭১**

...পাকিস্তানকে উন্নয়ন সাহায্য দেয়ার মতো আদৌ কোনও অবস্থা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে ফিরে গিয়ে তাঁরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

এই রিপোর্টে বলা হয় : বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে এসে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদল তাঁদের রিপোর্টে এই একমাত্র সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া বন্ধ করা হোক। কারণ, এখন পাকিস্তানে যে কোনও আন্তর্জাতিক সাহায্যই দেয়া হোক না কেন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

রিপোর্টে তারা বলেছেন : বর্তমানে পাকিস্তানকে কোনও রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যাবে না। এমনকি পাকবাহিনীবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্যে যদি কোনও আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠানো হয় তাহলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার সেই সাহায্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোনও সাহায্যই গিয়ে পৌঁছুবে না। বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে কোনো রকমের আন্তর্জাতিক সাহায্য দিলে ইয়াহিয়া সরকার তা পশ্চিম পাকিস্তানেই পাচার করবে। অতএব পাকিস্তানকে কোনো রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফরকারী বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদলের নেতা Mr. i. p. m. Cargill এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। Mr. i. p. m. Cargill বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর।

Mr. Cargill তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এত বেশি হয়েছে যে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবনধারা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এখন এক ভয়াবহ আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

Mr. Cargill তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষের বিরুদ্ধে যে এখনও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে, সেখানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তারা যে এখনও চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, হত্যা, লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারে তারা যে এখনও সমান তৎপর রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে

পারে না। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই হোক অথবা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই হোক সামরিক প্রশাসকরা এখনও যেসব সামরিক তৎপরতা চালাচ্ছে তা বাংলাদেশের বৃহৎ জনসমষ্টির জীবনে এনে দিয়েছে এক গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মুক্তিসেনাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পাক সেনারা, আর তারই প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করছে সাধারণ মানুষের ওপর।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন দারুণ উদ্বেগজনক। স্বাভাবিকতার নামগন্ধ সেখানে নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে পাকিস্তানি সামরিক সরকার যে দাবী করছে Mr. Cargill তাঁর রিপোর্টে তার কঠোর সমালোচনা করে বলেন : সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা, সৈন্য প্রত্যাহার করা ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না।

## ১৮ জুলাই, ১৯৭১

কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত আজ এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি স্বার্থান্বেষী মহল ও ইয়াহিয়া চক্র সর্বাত্মক মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে যে বিভ্রান্তির কালো ধোঁয়া ছড়িয়েছিল বিশ্বমানবতা ও বিশ্ববিবেকের নবতর অভ্যুদয়ের আলোকচ্ছটায় তা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে আজ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও অমানুষিক নির্যাতনের খবর পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার পেছনে কোন দুরভিসন্ধি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে বিশ্বের মানুষের কাছে তা আজ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত ঘটনাবলী যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিশ্বের মানুষ ততই আমাদের পক্ষে মত প্রকাশ করছে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশ আজ আমাদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহ এবং আরও কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নটি জাতিসংঘে তোলার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রশ্নটি জাতিসংঘে উত্থাপনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার অপরাধ সম্পর্কে পাকিস্তানের কোনও বক্তব্য যে থাকতে পারে না তা ধরে নেয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, সমাজসেবী, কূটনীতিক, পর্যটক ও বিশ্বসংস্থাসমূহের যেসব প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তাদের রিপোর্ট ও প্রামাণ্য তথ্যাদি থেকে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পাক বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা ও বর্বরতার অপরাধে অপরাধী। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠলে পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যা অপরাধে অপরাধী হানাদার বলে চিহ্নিত হবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশও বিশ্ব সংস্থার সমর্থন এবং স্বীকৃতি লাভ করবে'।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে কোনও অবস্থাতেই তারা পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে

সহযোগিতা করবে না। অর্থাৎ, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ইয়াহিয়া সরকারকে আর কোনও সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে না।.....বিশ্ব ব্যাংকের যে প্রতিনিধিদলটি গত ৩রা জুন থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত উনিশ দিন ধরে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তারা বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক নয়। সেখানে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, পাক হানাদার সৈন্যরা এখনও বাংলাদেশের ওপর হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছাড়া এইড কনসার্টিয়ামভুক্ত সব দেশই পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের নেতা তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে একথা তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া অর্থহীন হবে এবং পাকিস্তানকে এখন যে-কোনও সাহায্যই দেয়া হোক, ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার তা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে, ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে সমরসম্ভার ও অর্থ সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করলেও আমেরিকার জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশন ও বহু জননায়ক বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী প্রকাশ করে বাংলার জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ খোলাখুলিভাবেই বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ইভিনিং স্টার' প্রভৃতি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকাগুলিতে মার্কিন সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ঋণদানকারী রাষ্ট্রগুলির উচিত পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত Mr. Chester Bowles পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য প্রেরণের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, মার্কিন সরকারের এ ভুলের কোনও তুলনা হয় না। মার্কিন সরকারের এটা শুধু ভুল নয়, এটা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ— ইতিহাস এ অপরাধ কোনও দিনই ক্ষমা করবে না।

**২০ জুলাই, ১৯৭১**

...ডাবলিন থেকে প্রকাশিত 'আইরিশ টাইমস' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়; ইয়াহিয়া তার বেতার ভাষণে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বা যে রাজনৈতিক রদবদলের প্রস্তাব করেছে তা জঘন্য। ইয়াহিয়া তার বেয়োনেট-উদ্যত সেনাবাহিনী দিয়ে আটক দেশবাসীর উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেছে তাতে তার দেশ গোল্লায় যাবে। বাংলাদেশ থেকে যে সকল নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সেনাবাহিনীর অত্যাচারে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা কেউই এ প্রস্তাবে দেশে ফিরে আসতে পারে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পদ্ধতির কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছে তা দুরভিসন্ধিমূলক। দশ লক্ষ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে গোটা বাংলাদশেটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের কিছু অংশের ওপর তথাকথিত দখল রেখেছে সত্যি, কিন্তু এই দখল রাখতে

গিয়ে তাদের যে কী পরিমাণ মাশুল দিতে হচ্ছে তা একমাত্র তারাই জানে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারের অধীনে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠছে। আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যেসব বাঙালি সৈনিক ছিলেন তারাই আজ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইয়াহিয়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। বাংলাদেশের সর্বত্রই এখন গেরিলা যুদ্ধ চলছে— শুধুমাত্র তাই নয়, ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীতেও গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

'আইরিশ টাইমস' পত্রিকায় আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে। বর্তমানের এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী ও সরকার যেখানে আজও হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন সমানে চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। ভারতে এভাবে লাখ লাখ শরণার্থী ঠেলে দিয়ে ইয়াহিয়া সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করতে চাইছে। পত্রিকায় বলা হয় : বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকেই যাবে এবং তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

স্টকহোম থেকে প্রকাশিত সুইডিশ দৈনিক, DOGENS NYHETER-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে বাংলাদেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হয়।

'ডগেনস নিহিতের' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে ইয়াহিয়ার সামরিক অভিযানের কঠোর সমালোচনা করে বলা হয় : বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা বর্তমানে চরমে পৌঁচেছে। এখনও বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ শরণার্থী সৈন্যদের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

পত্রিকায় বলা হয় : বাংলাদেশে সামরিক বর্বরতা সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে গিয়ে কিছু সময় দাঁড়ালেই ইয়াহিয়ার স্বাভাবিক পরিস্থিতির দাবীর অসারতা সহজেই ধরা পড়ে— বোঝা যায় ইয়াহিয়া সরকারের মিথ্যা প্রচারণার বহর।

**২৩ জুলাই, ১৯৭১**

...সিয়েরা লিওনের ফ্রি টাউন থেকে প্রকাশিত 'মেইল' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে এক দীর্ঘ রিপোর্ট বেরিয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ফ্রিটাউন দৈনিকের সংবাদদাতা Mr. Som Short প্রশ্ন করেছেন : বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার চেয়ে বেশি কিছু কি ঘটতে পারতো?

তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশে যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, তা বোঝার জন্যে বা তা বিশ্বাস করার জন্যে এর চেয়ে বেশি প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশের ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখে ফ্রিটাউন দৈনিক মেইল-এর সংবাদদাতা Mr. Som Short বলেন, পাকিস্তান সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের

পশ্চাতে যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র বা ভয়াবহ একটা কিছু আছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্বরতা ক্রমে বেড়েই চলেছে, যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে বাংলাদেশে ধ্বংস ও মৃত্যু তত বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই তো এখন এখানকার ঘটনাবলীর অল্পবিস্তর জানতে পেরেছে কিন্তু তবু আমরা আমাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য করতে পারছি না কেন?— এই রক্তস্নানের কি কোনও শেষ নেই?

**২৯ জুলাই, ১৯৭১**

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার যত অপচেষ্টাই পাকিস্তানি সামরিক চক্র করুক, কিন্তু যা সত্য তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে।

আমেরিকার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' ও লন্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক 'দি টাইমস'-এ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের মোকাবিলায় মুক্তি বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তথাকথিত দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল করা হয়েছে বলে যে দাবী করেছেন, সে প্রসঙ্গে 'The Bengalis Strike Back' শীর্ষক একটি নিবন্ধে 'নিউজউইক' পত্রিকা বলেন : 'ইয়াহিয়ার জন্যে দুঃখ হয়, কেননা তিনি যা দাবী করেছেন প্রকৃত ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।' পত্রিকায় বলা হয় যে, সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ অভিযান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এ অভিযান গোড়া থেকেই পরিচালিত হচ্ছে এবং উন্নত সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী চরমভাবে ঘায়েল হচ্ছে।

'নিউজউইক' বলেন : বাংলাদেশের বহু কলকারখানা ধ্বংস করা হয়েছে, ডিনামাইট দিয়ে প্রধান প্রধান ব্রিজসমূহ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, মাইন বসিয়ে বহু রেল সড়কের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

পত্রিকায় বলা হয়, সামরিক বাহিনী অধিকৃত ঢাকা শহরেও নিয়মিত গোলাগুলি চলছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত মুক্তি সংগ্রামীদের অভিযান বাংলাদেশের সর্বত্রই অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল সফরকারী নিউজউইকের সংবাদদাতা মি. লোরেন জেনকিন্স এখানে মুক্তিবাহিনীর হাতে খুলনার দু'জন দালালের 'লালরঙা চিঠি' প্রাপ্তি এবং কড়া সামরিক পাহারাধীন থেকেও শোচনীয় মৃত্যুর খবর জানান।

লন্ডন টাইমসের রিপোর্টার মাইকেল হর্নসবি জানান যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অহরহ মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা রাস্তা, রেলওয়ে ব্রিজ, রেললাইন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

লন্ডন টাইমস্ এর সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশের সকল শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরে গেরিলাদের তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায়ই গেরিলারা পাক বাহিনীর ওপর বোমা নিক্ষেপ করছে।

হর্নসবি জানান যে, গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক বাহিনী আশপাশের এলাকার বেসামরিক বাশিন্দাদের ওপর উৎপীড়ন করে থাকে।

বস্তুত বাংলাদেশের পাক বাহিনী অধিকৃত এলাকায় এমনি প্রশাসনিক অচলাবস্থাই বিরাজ করছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আক্রমণে পাক সেনারা এখানে-ওখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দিন দিনই হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে।

এই বাস্তব সত্যকে গোপন করার যত অপচেষ্টাই পাকিস্তানি জঙ্গী সরকার করুক, বিশ্বের চোখে ধরা পড়বেই। আর এভাবেই বাংলার সার্বিক মুক্তিকামী মানুষের সপক্ষে গড়ে উঠবে বিশ্বজনমত।

১ আগস্ট, ১৯৭১

...বর্তমানে ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত ইয়াহিয়ার সৈন্যদের অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার ও দাপট যতই বাড়ছে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা যতই জোরদার হচ্ছে ততই বিশ্ববাসী আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের সপক্ষে ততই গড়ে উঠছে বিশ্বজনমত।

ইতিমধ্যে জঙ্গীশাহীর অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বহু বিদেশী সাংবাদিক, সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদ যুদ্ধক্ষত বাংলাদেশ সফর করেছেন।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি কর্নেল অ্যার্লা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে তাঁর সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতন বায়াফ্রার মর্মান্তিক ঘটনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্যরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার কোনও নজির নেই। নরওয়ে রেডক্রসের একজন প্রতিনিধি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে বলেছেন, বর্তমান শরণার্থী সমস্যার সাথে বিশ্ব ইতিহাসের অন্য কোনো ঘটনার তুলনা করা যায় না।

একটি স্বাধীন দেশে দখলদার সৈন্যরা কতো বেশি নির্যাতন চালিয়ে গেলে ৮০ লাখ মানুষকে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি ফেলে দেশত্যাগ করতে হয় তা সকলেরই বোধগম্য।

এহেন অবস্থায় বাংলাদেশে যখন মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই— মানবতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা যখন বিপর্যস্ত, সে ক্ষেত্রে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি বৃহৎ শক্তি একনাগাড়ে পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করে গণহত্যার উস্কানি দিচ্ছে।

মার্কিন জনগণ ও সেখানকার পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র সাহায্যের নীতিতে অবিচল রয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বহু প্রভাবশালী সদস্য পরিষ্কার ভাষায় নিক্সনের এই অনমনীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই এ

বিষয়ে একমত যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেয়ার মানেই হচ্ছে গণহত্যায় অংশ গ্রহণ করা। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিন কোটিরও বেশি মানুষ চরম খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া সরকারকে খাদ্য ও অস্ত্র সাহায্য দেয়া রীতিমতো যুদ্ধাপরাধ।

এদিকে ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি জন্ আরউইন সিনেটের এক সাব-কমিটির বৈঠকে বলেছেন যে, বাংলাদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষের খবর তাঁরা পেয়েছেন। অথচ পাকিস্তানের দখলদার সমরকর্তারা দুর্ভিক্ষ রোধের কোনো চেষ্টা চালাচ্ছে না। এতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দেশ থেকে ৮০ লাখ মানুষকে তাড়িয়ে এবং ১০-১২ লাখ মানুষকে হত্যা করেও এদের কসাই মনোবৃত্তির এখনো খায়েস মেটেনি।

এমনি মর্মান্তিক অবস্থায় জাতিসংঘ আবার বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা করছে। অথচ গত চারমাস যাবৎ জাতিসংঘ বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারও বাংলাদেশ-সমস্যাটিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ হিসাবে দেখাবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে প্রদত্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ জঙ্গীশাহীর এ ধরনের নির্লজ্জ অপকৌশলকে পাকিস্তানের "ভ্রান্ত পদক্ষেপ" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই বলে সহানুভূতিশীল বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়ে পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী জঙ্গী কর্মকর্তারা আজকাল জাতিসংঘের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশে তাদের কৃতকর্মের কালিমা মোচনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই বাংলাদেশ সমস্যাটি হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বিরোধ। এ বিরোধ যত শীঘ্র মিটমাট হবে ততই সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে— বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের মনে ফিরে আসবে শান্তি ও আস্থার মনোভাব।

বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশন সংস্থাও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জীবনের নিরাপত্তার জন্যে বাংলাদেশ সমস্যার আশু সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বাংলাদেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরাই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং লাখ লাখ শরণার্থীকে নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবারও নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবে।

**১৫ আগস্ট, ১৯৭১**

...গত ২০শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্র বাংলাদেশে যা করেছে সমস্ত বিশ্ব তাতেই হতবাক হয়েছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বর্ণিত মানব ইতিহাসের সেই সর্বাধিক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনার পর এবং মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড

কেনেডি বর্ণিত মানব ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় সৃষ্টির পর ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী বর্তমান বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে বিচার প্রহসন শুরু করেছে। এই বিচার প্রহসনের পিছনে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক চক্রের যে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশে পাক সামরিক চক্রের বর্বরতা ও বীভৎসতার দৃষ্টান্তে এটাই মনে হয় যে, ইয়াহিয়া ও তার নয়া নাৎসী বাহিনী করতে পারে না এহেন কিছু নেই।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মি. ট্রুডো পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক তারবার্তায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনেও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারে দারুণ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

লন্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যেভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে পাক সামরিক চক্রের ওপর আদৌ ভরসা করা যায় না। লন্ডনের 'টাইমস্', 'ইয়র্কশায়ার পোস্ট' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে এই তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীগণ এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থাও শেখ মুজিবুরের বিচার প্রহসনের জন্যে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

'টাইমস্' পত্রিকায় প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী মি. ডবলু, টি, উইলিয়ামের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে মি. উইলিয়াম বলেছেন : যেভাবে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে তিনি ও বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, যেভাবে এই তথাকথিত বিচার চলছে তাতে কোনোক্রমেই শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায়বিচার আশা করা যেতে পারে না। তিনি বলেন, একমাত্র প্রাণের ঝুঁকি ও বহু ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়া কোনো বাঙালি কৌঁসুলিই শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থনে যাবেন না। মি. উইলিয়াম বলেন, আইয়ুবের আমলে সুপ্রিম কোর্টের রায় লঙ্ঘন করে সামরিক সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করেছিল। ভয়ঙ্কর ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র সেই একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিচার প্রহসন শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাক সামরিক চক্র মূঢ়তার বশে মিথ্যা অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি কোনোরকম দণ্ড দেয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : মিথ্যা অভিযোগ তুলে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা এক মারাত্মক ভুল করেছে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যদি এই তথাকথিত বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে সেটাই হবে সবচে মারাত্মক ভুল আর সেই ভুলের কোনও সংশোধনের পথ থাকবে না।

১৬ আগস্ট, ১৯৭১

...পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষ দেশবরেণ্য জননেতা, বুদ্ধিজীবী সমাজ, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র পাকিস্তানি নরঘাতী তস্করদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।...

জাতিসংঘের জনৈক মুখপাত্র গত শুক্রবারে বলেছেন যে, পাকিস্তানি সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসনের ব্যাপারে সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন স্টার' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে পাকিস্তানের মূঢ় সামরিক চক্র এক প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের একথা বোঝা উচিত যে নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদা প্রশ্নাতীত।

'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় : শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। আজও তিনি বাঙলার নয়নমণি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে আজও তিনি সদা প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম। পাকিস্তানের জঙ্গী সামরিক চক্র বিচার প্রহসনের দ্বারা যদি তাঁর কিছু করে, তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যে চিরতরে বিদায় হবে তা নয় বরং মূল পাকিস্তানটাই চূর্ণ হয়ে যাবে।

যুগোশ্লাভ দৈনিক "বেলগ্রেড বোরবা" পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন করতে গিয়ে ইয়াহিয়া তার নিজের সমস্যার সমাধানের সকল পথই রুদ্ধ করেছে। এখন অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

জেনেভায় 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস'-এর সদর দফতর থেকে ইসলামাবাদে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়েছে। এই তারবার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

'জাকার্তা টাইমস'-এ বলা হয় : শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা। তার বিচার প্রহসন চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সর্বস্ব খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছে।

১৮ আগস্ট, ১৯৭১

বিশ্বজোড়া প্রতিবাদ, ঘৃণা ও কোটি ধিক্কার উপেক্ষা করে পাক সামরিক চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে।...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঝানু আন্ডার সেক্রেটারি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মি. চেস্টার বোলস শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন: পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের যে গোপন বিচার

চালাচ্ছে তা আগাগোড়া একটি প্রহসন মাত্র। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এটা একটা চরম ধৃষ্টতা। এ বিচার সকল রীতিনীতি ও আইন-কানুনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মি. চেস্টার বোলস পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান নীতির কঠোরতম সমালোচনা করেন। মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে সামরিক সাহায্য অব্যাহতভাবে দিয়ে চলেছে, মি. চেস্টার বোলস তাকে "চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নীতিবিগর্হিত" বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্প্রতি 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে মি. চেস্টার বোলস বলেন: পাকিস্তানের ফ্যাসীবাদী সরকারকে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক চরম ভুল করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অতীতের সব ভুলত্রুটি সংশোধন করে পাকিস্তানের কাছে সামরিক অস্ত্র ও সমরসম্ভার বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা এবং পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেবার আহ্বান জানান।

পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ, কেনেডির সহোদর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী সৃষ্ট "মানব ইতিহাসের চরম বিপর্যয় ও মানব ইতিহাসের সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়" নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে গেছেন। তিনি পাক অধিকৃত বাংলাদেশেও যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাক বাহিনীর বর্বরতা পাছে পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায় সেজন্যে পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাঁকে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশে যাবার অনুমতি দেয়নি। শুধুমাত্র সীমান্তে দাঁড়িয়ে ও শরণার্থীদের শিবিরগুলি পরিদর্শন করে তিনি যা দেখেছেন এবং যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকেই তিনি বলেছেন : পাকিস্তানি সৈন্যরা যে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিটির সভাপতি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন: পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র অপরাধ হলো তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তাঁর বিচার আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে বিচারের ব্যাভিচার এবং ন্যায়বিচারের প্রহসন মাত্র।

আদ্দিস আবাবা বেতার থেকে প্রচারিত এক খবরে বলা হয় : রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্যে সারাবিশ্বে এক প্রচার অভিযান শুরু করবে।

বিশ্ব জোড়া এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই প্রহসন মেনে নেয়নি। আজ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই চলছে পাক হানাদার নিধনের দুর্বার অভিযান। মুক্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বাংলাদেশের পুণ্যভূমি থেকে হানাদারদের সমানে উৎখাত করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ হানাদার উৎখাতে বদ্ধপরিকর।

১৯ আগস্ট, ১৯৭১

...পাকিস্তানের সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের তীব্র নিন্দে করেছেন। এই বিচার প্রহসনের কঠোর সমালোচনা করে তিনি পাকিস্তানি সামরিক চক্রকে এই বলে হুশিয়ার করেছেন যে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশে যা করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে মেতে যা করতে যাচ্ছে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর ফলে পাকিস্তানটাই তাসের ঘরের মতো এক মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এ নিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে পরপর দুবার হুঁশিয়ার করে দিলেন। এয়ার মার্শাল আসগর খানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের আরও কয়েকজন নেতার চৈতন্যোদয় ঘটছে। সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সর্বনাশা তৎপরতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর খোদ মুখপত্র 'পাকিস্তান টাইমস'-এও শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের সমালোচনা করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি শান্তিকামী মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি সামরিক চক্রকে সমরাস্ত্র, সমরসম্ভার ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এলেও মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহল, রাজনীতিক ও শান্তিকামী মার্কিন জনগণ পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদমুখর। গত সপ্তাহে পাকিস্তানি জাহাজ আল-আহমাদী মার্কিন সমরাস্ত্র বহনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু সেখানে পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং বিক্ষোভকারীরা ছোট ছোট নৌযান দিয়ে পাকিস্তানি জাহাজের সম্মুখে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানি জাহাজটিকে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার সংকল্প পরিত্যাগ করে বাল্টিমোরের দিকে এগুতে হয়।

শুধু ফিলাডেলফিয়া বন্দর নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই পাকিস্তানি সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার উঠেছে। পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী সর্বত্রই লাঞ্ছিত। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মদত পেয়ে পাকিস্তানের গোঁয়ার সামরিক চক্র এখনও আস্ফালন করছে সত্যি কিন্তু এর শোচনীয় পরিসমাপ্তি অত্যাসন্ন।

২০ আগস্ট, ১৯৭১

...পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এসে তাঁর বাবা খান আবদুল গফফার খানের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কাবুলে পৌঁছে তিনি সেখানকার একটি ইংরেজি পত্রিকা 'নিউ ওয়েভ'-এর সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : পাকিস্তানের রাজনীতি এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়— পাকিস্তান ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবেই। পাকিস্তানের রাজনীতি এখন যেভাবে চলছে তাতে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার আর কোনো উপায় নেই।

তিনি বলেন : বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যা করছে তা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতাকেও হার মানায়। তবে পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষে বাংলাদেশকে দখলে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যদি মনে করে থাকে যে, চরম অত্যাচার চালিয়ে, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের বীর জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে তাহলে তারা চরম ভুল করবে। খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন : আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশও যখন ভিয়েতনামের বীর জনগণকে বশে আনতে পারেনি তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুঁচকে পাকিস্তানের পক্ষে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশকে কব্জায় রাখা কি করে সম্ভব? পাকিস্তানের আর্থিক ও সামরিক বাজেট এখনও যেখানে বাংলাদেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেখানে জয়লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না।

পশ্চিম পাকিস্তানি ন্যাপনেতা খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন : ধর্ম যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দুটি জাতির রাষ্ট্রীয় বন্ধন হতে পারে না, তা চিরকালের মতো প্রমাণিত হয়ে গেল। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় বন্ধন বলে যারা ভাবতো এবার তাদের মোহমুক্তি চিরদিনের মতো ঘটে গেল। তিনি বলেন : আমার কাছে বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্ব এখানেই।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া আর তার বর্বর সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হবার দুদিন আগে পর্যন্ত খান আবদুল ওয়ালী খান ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠনের একমাত্র অধিকারী তিনিই ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখার যে ক্ষীণতম সম্ভাবনা ছিল, পাকিস্তানি সামরিক চক্র তাকেও বেয়োনেট-বিদ্ধ করেছে। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হবেই— তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। অথচ এমনটি হয়তো এতো তাড়াতাড়ি ঘটতো না। পাকিস্তানি সামরিক চক্রের মাথায় গোবর বোঝাই না হলে খুব সহজে এমনটি ঘটতো না। তারা যদি জনগণের রায়কে মেনে নিত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে স্বীকার করে নেয়া হতো তাহলে পাকিস্তানকে আরও কয়েকটা দিন টিকিয়ে রাখা যেতো। কিন্তু তা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। গত ২৫শে মার্চের রাতেই ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী সেই সম্ভাবনাকে খুন করেছে।

পিণ্ডির বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করতে গিয়ে খান আবদুল ওয়ালী খান একটি উপমা দিয়ে বলেন : "দুধের কলসী ভেঙ্গে গেছে। দুধ চারদিকে গড়িয়ে পড়ছে। আর তার চারপাশে বসে তারা কাঁদছে।"

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন : পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ যে কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন তা নয়, বিপজ্জনক।

## ২১ আগস্ট, ১৯৭১

...বাংলাদেশের শহরে নগরে বাজারে বন্দরে প্রতিটি পল্লীতে আজ শত্রুহননের দুর্বার লড়াই চলছে। আর এই লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে খেয়ে পাকিস্তানি সামরিক চক্র নতুন এক ফন্দি আঁটলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা ভারত-পাকিস্তান সমস্যা বলে চিহ্নিত করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল আমাদের দেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে তারা যদি ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আজ যে বিশ্ব জনমত গঠিত হয়েছে তাকে বিভ্রান্ত এবং বাংলাদেশে আজ যে দুর্বার লড়াই চলছে, তাকে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে। পাকিস্তানি সামরিক চক্র এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সীমান্তে এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উষ্কানিমূলক তৎপরতা শুরু করলো। কিন্তু বিশ্বের সচেতন মানুষ পাকিস্তানি সামরিক চক্রের এই দুরভিসন্ধিটা বুঝে নিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এমন কি প্রয়োজন হলে সংঘর্ষ একটা বাধিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার যে দুরভিসন্ধি তারা করেছিল তা ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মি. আলেক্সী কোসিগিন পাকিস্তানি ফ্যাসিবাদী সামরিক চক্রের এই ঘৃণ্য দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী নির্যাতনের নায়ক পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন : সাবধান! ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো পাকিস্তানের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে।

গত ১৭ই আগস্ট ইসলামাবাদস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মি. এ. এ. রদিনভ জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিনের একটি চিঠি পৌঁছে দেন। ঐ চিঠিতেই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি সামরিক চক্রের গোপন দুরভিসন্ধি ও ঔদ্ধত্যের বিষয়ে জেনারেল ইয়াহিয়াকে হুঁশিয়ারী প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি ইয়াহিয়া ও তার বর্বর সামরিক বক্রকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে, তারা যেন গোঁয়ারের মতো ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আস্ফালন বা দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি না করে। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সামরিক চক্রকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও উৎপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে আর একপা অগ্রসর না হওয়ার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন।

## ২৭ আগস্ট, ১৯৭১

...সম্প্রতি ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিন ও ভারতবর্ষের পনেরোজন লোকমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণরক্ষার জন্যে অবিলম্বে সক্রিয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশ্বের সকল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের সকল সরকারের কাছে পাঠানো এক বার্তায় তাঁরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন : বাংলাদেশে আজ যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে, তাতে বিশ্বশান্তি আজ দারুণ এক হুমকির সম্মুখীন। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীকে কোনোরকম সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্যেও তাঁরা বিশ্বের সরকারবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

হংকং-এর একটি প্রভাবশালী দৈনিক 'হংকং স্টান্ডার্ড'-এ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় : সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের নামে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যা করতে যাচ্ছে তা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচার প্রহসনের পেছনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার যে গোপন দুরভিসন্ধি রয়েছে তা বীভৎস। পত্রিকায় বলা হয় : সম্প্রতি পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী ঘোষণা করেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একজন কৌসুলি নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে কোনও কৌসুলি থাক আর না-ই থাক এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা ও প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সরকার ইতিপূর্বেই শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছে। তারা যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগেভাগেই দোষী বলে ঘোষণা করছে সেখানে এই বিচার স্রেফ একটি প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

আইরিশ আইনজীবী সমিতির অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য ও রাজনৈতিক বন্দি মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ারম্যান মি. সিয়ান ম্যাকব্রাইড জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অসামরিক আদালতে করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে আইনগত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করার জন্যে গত মাসে মি. ম্যাকব্রাইড পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে তখন কিছুই করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার গোপনে সামরিক আদালতে না করে প্রকাশ্যে বেসামরিক আদালতে করার দাবী জানিয়ে মি. ম্যাকব্রাইড বলেন : কোনো বিদেশী আইনজীবীকে পাকিস্তানের আদালতে শেখের পক্ষ সমর্থনের অনুমতি যদি না দেয়া হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান যাতে তাঁর ইচ্ছেমতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন তার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

মি. ম্যাকব্রাইড গত মাসে তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উল্লেখ করে বলেন : শেখ মুজিবুর রহমানের লন্ডন সলিসিটরদের অনুরোধে তিনি বাংলাদেশের নেতার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার আইন উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করে শেখের বিচার যেভাবে চলছে সে সম্পর্কে দারুণ উদ্বেগ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন: রাজনৈতিক বন্দিদের মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে তিনি বিচারের কতগুলো উদ্বেগপূর্ণ দিক সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন।

তিনি অভিযোগ করেন : সামরিক আদালতে গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার চলছে তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যে শুধু একটাই বলা হয়েছে যে, অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তিনি বলেন, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি তার ইচ্ছামতো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে সে বিচার বিচার বলে গণ্য হতে পারে না।

## ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

...আজ বাংলাদেশ সমস্যা একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানি শাসক চক্র শত প্রচেষ্টাতেও বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে মৃত পাকিস্তানের পচা গলিত লাশের তলায় ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্বের সকল চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছেও এই তথ্যটি আজ অজানা নয়। আর ঠিক এই কারণেই মার্কিন সিনেটের আরও একজন প্রভাবশালী সদস্য রিপাবলিকান দলের মি. চার্লস পার্সি মন্তব্য করলেন : পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। আর কোনও অবস্থাতেই দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানে জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

রিপাবলিকান সিনেটর পার্সি সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখে গেছেন। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর তিনি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছেন এবং দেখেশুনেই তিনি বলেছেন : এখন আর যাই হোক, একথা কল্পনাও করা যায় না যে পাকিস্তান আবার বেঁচে উঠবে। আগের অবস্থা ফিরে আসবে একথা চিন্তা করাও অসম্ভব। পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বাঙালির মনোভাব একই রকম। বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানিরা বিদেশী হানাদার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেন : বাঙালি জাতি আজ যে ইস্পাতকঠিন সংকল্প নিয়ে লড়াই করবে তা একটি বিরাট ও মহৎ সংকল্প। আমি আশা করি পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর নায়করা এটা উপলব্ধি করবে। এবং এই উপলব্ধির উপরেই তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেন : আমি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের নেতাদের একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে তারা যদি আর এক পা অগ্রসর হয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা যদি তথাকথিত বিচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে পৃথিবীর কেউ-ই তাদের ক্ষমা করবে না।

## ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

...বাংলাদেশ পরিস্থিতির এই ক্রমাবনতিতে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দারুণ উদ্বিগ্ন। বিশ্বজনতার এই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরে এক বিবৃতিতে তিনি বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এক দারুণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন : বাংলাদেশের ঘটনাবলী বর্তমানে যেভাবে জটিল হয়ে পড়ছে, সেখানকার পরিস্থিতি বর্তমানে যেভাবে দ্রুত অবনতির দিকে গড়িয়ে চলেছে এবং এর ফলে প্রতিনিয়ত যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যাদির উদ্ভব ঘটেছে তাতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে দারুণ উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।...

তিনি বলেন : বাংলাদেশ পরিস্থিতি এখন এত দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এ ব্যাপারে বিলম্ব হলে যে কোনও রকমের মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং তা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সীমার মধ্যে সীমিত থাকবে না। তিনি বলেন : আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে এটা দারুণ এক উদ্বেগের ব্যাপার। বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠিকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে।

সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বলেন : গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছে। তারপর সেখানে শুরু হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান এবং তাতেও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আজও বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চল যাচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশে তাঁবেদার সরকার খাড়া করেছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে— কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে না, বরং প্রতিদিনই সেখানকার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। অতএব এ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার যতই গলাবাজী করুক না কেন তারা সেখানে তাদের গণবিরোধী নীতি এখনও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বলেন : বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের ফলেই এই দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহের মানুষ আজ দারুণ এক শোচনীয় অবস্থার মুখে পড়েছে। অবিলম্বে সেখানে বড় রকমের ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

**৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

গত ২৮শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে এবং আজও যা করে চলেছে তার এক মর্মান্তিক বিবরণ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর কঠোর সমালোচনা করেন।

অধিবেশনের শুরুতে সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুইডেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ কঠোরতম ভাষায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের সমালোচনা করে বলেন : পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে যা করছে এবং আজও যা করে চলেছে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা দাবী করেন, অবিলম্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরতার অবসান ঘটাতে হবে। তাঁরা বলেছেন : বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তানি সরকারি প্রচারযন্ত্র যতই বিভ্রান্তির জাল বুনুক সেখানকার প্রকৃত ঘটনাবলী আজ আর কারও অজানা নয়। পাকিস্তানি সামরিক সরকার বা সেখানকার সামরিক জান্তা যা-ই বলুক না কেন সেখানে যা ঘটেছিল তা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বিশেষ কোনও দাবীভিত্তিক আন্দোলন নয়। তা ছিল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবন-মরণের আন্দোলন। আর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের

মানুষ তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী নিও-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনই শুরু করেছিল। গত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেছিল পাকিস্তানি হানাদাররা তা মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের একমাত্র অপরাধ হলো নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীদের উপনিবেশিক স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যেই তারা বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সুইডেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ গভীর আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান না করা হলে তা এক মহাপ্লাবী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে এবং তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ক্রিসটার ভিকম্যান বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যা চালাচ্ছে তা কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না। দেশমাতৃকার বুক থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে দেবার জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ পাল্টা আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশের পাক অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই দুর্বার লড়াই চলছে এবং এ লড়াইয়ের পরিণতি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে দারুণ বিপজ্জনক। মি. ক্রিসটার ভিকম্যান এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে অবিলম্বে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট না হলে এ সংকট বহু দূরে গড়াবে।

ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস স্যুম্যান বলেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশ সংকটের সমাধান করতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশের সংকট আরও বিস্তার লাভ করবে।

**২ অক্টোবর, ১৯৭১**

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানি হানাদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঢাকায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মি. টাইগারম্যান পদত্যাগ করেছেন।

মি. টাইগারম্যান গত ছ'বছর ধরে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাঙ্কের একজন বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শিকাগো গিয়েছিলেন। মি. টাইগারম্যান একজন মার্কিন নাগরিক। তিনি শিকাগো থেকে গত ১৮ই সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন।

মি. টাইগারম্যান বলেন : বাংলাদেশ আমার অত্যন্ত পরিচিত দেশ। এ দেশে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পর এখানকার প্রতিটি জিলা প্রতিটি শহর-বন্দরে গ্রামে গঞ্জে আমি ঘুরেছি একবার নয়, বার বার। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় তিনি এ পর্যন্ত ঘুরেছেন ১৮ বার।

গত ৮ই সেপ্টেম্বরে আবার যখন তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বলেন : বিমান থেকে নেমেই আমি অবাক হয়ে গেলাম

আমার সেই পরিচিত ঢাকা বিমানবন্দর এ যেন নয়। এ যেন বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোনও বিমান ঘাঁটি। বিমান বন্দরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলোকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে দেখলাম। দেখলাম বিমানবন্দরের চারিদিকে অসংখ্য বিমানবিধ্বংসী কামান। টার্মিনাল ভবনের ছাদে, জানালার আর চিলতে ছাদ বা বারান্দাগুলোয় দেখলাম বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার করা হয়েছে এবং সেখানে সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্যরা বিমানবিধ্বংসী কামান, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তাক করে আছে যেন এখুনি কিছু ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে। আগে যেখানে বিমানবন্দরের পূর্বপাশে রাস্তায় প্রাচীরের ধারে এবং ডমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল উইংসের টার্মিনাল ভবনে হাজার হাজার দর্শনার্থীকে দেখতাম লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে এখন সেক্ষেত্রে একজন অসামরিক ব্যক্তিও দেখলাম না। আগে বিমানবন্দরে যেসব অসামরিক কাস্টম ও ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মচারীদের দেখতাম, তাদের কাউকেই দেখলাম না। হয় তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হয়েছে, অথবা তারা প্রাণভয়ে এ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরাই সবকিছু করছে। বিমানবন্দরে যেসব বিদেশী নাগরিক যাওয়া-আসা করছে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের নানাভাবে নাজেহাল করছে। পিআইএ বা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের যে বিমানগুলো আগে অসামরিক যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যেতো সেগুলোকে আজকাল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম, গোলাবারুদ ও সৈন্যদের পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মি. টাইগারম্যান বলেন, ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে একজন বাঙালিকেও আমি খুঁজে পেলাম না। অথচ এদেশটা একান্ত ভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দেশ।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মি. টাইগারম্যান বলেন : বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আমি দেখলাম এয়ারপোর্ট রোডের দু'পাশে বহু ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে এবং রাস্তার দুধারের বাড়িগুলি জনশূন্য। আর এইসব জনশূন্য বাড়িগুলির ছাদে, বারান্দায় ও জানালায় বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার বানানো হয়েছে। রাস্তায় দু'হাত ছাড়া চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এইসব চেকপোস্টে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে কথিত যে দু-একটা অসামরিক গাড়ি চলাচল করছে সৈন্যরা সেগুলো তন্নতন্ন করে তল্লাশী করছে। পথচারীদেরও তল্লাশী করা হচ্ছে। পথচারীদের বেশভূষা ও চেহারায় বাঙালিত্বের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেলে সৈন্যরা তাদের ধরে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী তরুণ হলে তো আর কথাই নেই। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোয় যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সারি সারি বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান সরকারি ভবনগুলোর চারপাশে ১৫ থেকে ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল তোলা হয়েছে। ঢাকা রেডিওকে বর্তমানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর ঢাকার রাস্তায় কেউ হাঁটে না। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের রাস্তায় কেবল পাকিস্তানি সৈন্য, পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও কুকুর ছাড়া আর কেউ চলাচল করে না। মানুষ সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে এতই ভীতসন্ত্রস্ত যে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা ভীষণ ভয় পায়। কারণ আজও প্রতিদিন শহরে ধরপাকড় চলছে। কখন কোনও মুহূর্তে সেখানে কার জীবনে মৃত্যু নেমে

আসবে তা কেউ জানে না। প্রায় প্রতিরাতেই বোমা বিস্ফোরণ ও খণ্ড লড়াইয়ের শব্দ শোনা যায়। গোটা শহরটা এখন বদ্ধভূমিতে পরিণত।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বলেন : এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সেখানে থেকে কাজ করা আমার পক্ষে যুক্তিগতভাবে, নীতিগতভাবে কিংবা নৈতিকতার দিক থেকে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানে আমি আর কোনোদিন ফিরে যাবো না। বাংলাদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানিরা বিতাড়িত হলে আমি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে যাবো। আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কাজ করবো। দীর্ঘ ছ'বছর থাকার পর আমি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসেছি। তাদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের বন্ধন অনেক গভীর।

**৫ অক্টোবর, ১৯৭১**

...ব্রিটিশ কমন্সসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য মি. ফ্রেড ইভান্স বলেছেন : বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। জাতিগতভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভাষা ও সামাজিকতার দিক থেকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র—সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বাঁচার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই বাঙালিরা আজ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তারা আজ যে লড়াই করছে তা হলো দেশকে মুক্ত করার লড়াই—শত্রুমুক্তির লড়াই। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যে যুদ্ধ করছে তা তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। আর এই অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনের ফলে যে দুই লক্ষাধিক শরণার্থী সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে এবং কি নারকীয় নির্যাতনের ফলে তারা তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে উদ্বাস্তু শিবিরে দিন কাটাচ্ছে তা জানার জন্যে ব্রিটিশ কমনসভার বিশিষ্ট সদস্য মি. ফ্রেড ইভান্স লন্ডন থেকে পশ্চিম বাংলায় গিয়েছিলেন। একাধিক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের অসহনীয় নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে তিনি বলেন : বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেরই এগিয়ে আসা উচিত।

মি. ফ্রেড ইভান্স বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন : অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলে এশিয়ার এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে। অবিলম্বে এর সমাধান করতেই হবে।

মি. ফ্রেড ইভান্স বলেন : বাংলাদেশের মূল সমস্যা মানসিক চেতনা ও মানবাধিকারের সমস্যা। তিনি বলেন : একজন গণতন্ত্রী হিসাবে বুলেটের বদলে ব্যালটের মাধ্যমেই যে কোনও সমস্যার সমাধানের আমি পক্ষপাতি। বাংলাদেশ সঙ্কটের শুরুতে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মতো

আমিও এটাই আশা করেছিলাম কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শক্তি সে সম্ভাবনাকে গোঁয়ারের মতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মি. ফ্রেড ইভান্স বলেন : আমরা ব্রিটেনবাসী ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিলাম, প্রয়োজন হলে নয়া ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত।...

২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

...গত বাইশে অক্টোবর থেকে পঁচিশ অক্টোবরের মধ্যে নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাতে এই উপমহাদেশের পরিস্থিতি এবং পাকিস্তান ভারতের সীমান্তে যে গুণ্ডামি ও তস্করবৃত্তির মহড়া দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে উভয় পক্ষে আরও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে চারদিনব্যাপী আলোচনার পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয় : পাকিস্তান ভারত সীমান্তে ব্যাপক সমাবেশ করে এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে এই উপমহাদেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তাতে এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবার দারুণ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ভারত আক্রমণ করে বাংলাদেশ প্রশ্নকে ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নে রূপান্তরিত করার সপক্ষে এবং পরে জাতিসংঘের সাহায্য নিয়ে ত্রাণ পাওয়ার যে স্বপ্ন তারা দেখেছে তাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ ভারত আক্রমণের অর্থ হবে পাকিস্তানের আত্মহত্যা, ভারত আক্রমণ করতে গেলে গোটা পাকিস্তানটারই কবর হয়ে যাবে।

গত ছাব্বিশে অক্টোবর মস্কো ও অটোয়ায় যুগপৎভাবে প্রকাশিত সোভিয়েট-কানাডা যুক্ত ইশতাহারে বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানানো হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কানাডার এই যুক্ত ইশতাহারে বলা হয় : বাংলাদেশ পরিস্থিতির এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান আনতে হবে যাতে বাংলাদেশের জনগণের আইনসম্মত অধিকার ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা পূর্ণ আস্থায় ও মর্যাদায় দেশে ফিরে আসতে পারবেন। কানাডায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মি. আলেক্সি কোসিগিনের আটদিনব্যাপী সরকারি সফর শেষে এই ইশতাহার প্রচারিত হয়।

১ নভেম্বর, ১৯৭১

...যুগোশ্লাভিয়া সর্বতোভাবেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ একটি শান্তিকামী দেশ বলে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী উভয় ব্লকেই এ সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছেই জোটনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়া সমানভাবে সমাদৃত।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোও আজ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট টিটো বলেছেন : বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যা করেছে এবং আজও তারা সেখানে যা করে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনও দৃষ্টান্ত নেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সেখানকার নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও বর্বরতা চালিয়েছে তার ফলেই বাংলাদেশ থেকে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের ঘরবাড়ি সহায়-সম্বল ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ গোটা সরকারি প্রচারযন্ত্র এতদিন প্রচার করে এসেছিলেন যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুষ্টিমেয় অবাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, আর তাকেই থামাতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ঘোষণা করে— জনগণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে বাংলাদেশের মানুষ আজ দেশ থেকে হানাদার নিশ্চিহ্ন করার যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছে তাকে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুচরদের কার্যকলাপ বলে ইয়াহিয়া সরকার কতদিন যাবৎ প্রচার করে এসেছে।

পাকিস্তানের মাথামোটা গোঁয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সরকারের অপপ্রচারমুখর মুখে বিরাট একটা চপেটাঘাত মারার মতো জওয়াব শোনা গেল গোষ্ঠনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভীয় প্রেসিডেন্টের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে। তিনি বললেন : বাংলাদেশ প্রশ্নটি ভারত-পাকিস্তান প্রশ্ন নয়। এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোনও বিষয় নয়। তিনি বললেন : এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও নয়।

সপ্তাহব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে গত সপ্তাহে মার্কিন টেলিভিশন সংস্থা সি.বি.এস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট টিটো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিশ্ববাসীকে এই সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন।...

**৬ নভেম্বর, ১৯৭১**

সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি তথা বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে পাক হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা নগরীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার ঢাকা থেকে পাঠানো এক রিপোর্টে বলেছেন : বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক অভিযান শুরুর পর সাত মাস কেটে গেছে কিন্তু এখনও কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। বাংলাদেশের প্রত্যেক শহর-বন্দরের জনসংখ্যা বিগত ২৫শে মার্চের আগে যা ছিল এখন তার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এই ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষের কিছু অংশ সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে, কিছু লোক নিখোঁজ হয়েছে এবং বাকী সকলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করছে।

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর এই রিপোর্টে বলা হয় : পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তি বাহিনীকে খতম করবে বলে যে দুরাশা পোষণ করেছিল তা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ফল উল্টো ফলতে শুরু করেছে— বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যরা

মুক্তিবাহিনীর হাতে দারুণ মার খাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। লড়াইয়ে তারা কোনোক্রমেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না। জলে-স্থলে সর্বত্রই তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের এখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থান হলো কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার লিখেছেন : বাংলাদেশের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর অধিকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওই রিপোর্টার লিখেছেন : বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাগুলোর ব্যাপক হত্যা, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসের দ্বারা পাকিস্তানি সৈন্যরা যে বিভীষিকা ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তা এখন হ্রাস পেয়েছে। মুক্তিসেনারা এখন দেশের শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ঘৃণা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সামরিক অভিযানের পর প্রথমদিকেও এতখানি ঘৃণা ছিল না। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অসামরিক প্রশাসনে নিযুক্ত বাঙালি এবং সাধারণ বাঙালিদের ওপর এখনও চরম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। একজন বাঙালি একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিল— শুধু এই অপরাধেই পাকিস্তানি সৈন্যরা ওই বাঙালি ভদ্রলোকের পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। কিন্তু এত করেও তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠছে না।

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদদাতা লিখেছেন : মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ প্রশ্নটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর উদ্দেশ্যে ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষের মাধ্যমে তারা বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চালাবার চেষ্টায় আছে। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ফলে বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা, সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য কমে গেছে।...

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

...সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মি. ভি. কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন— বাংলাদেশে আজ যে লড়াই চলেছে তা খাঁটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তথা বর্বর সমরনায়করা বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংস আর চরম সন্ত্রাসের নীতির দ্বারা বাঙ্গালিদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। তিনি বলেন : আমি আশা করি এই বাস্তব ঘটনা যত তিক্ত ও যত কঠোরই হোক না কেন পাকিস্তান এটা উপলব্ধি করে সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে। সম্প্রতি সোভিয়েট পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ভারত সফরে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মি. কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন।

বিশিষ্ট সোভিয়েট নেতার এই উক্তিরই আরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠেছে ফরাসি দেশে। ফ্রান্সের লোকবরেণ্য নেতৃবর্গ আজ মনে করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাবার কোনও পথ নেই, পন্থাও নেই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পঁপিদু নিজেই বলেছেন : বাংলাদেশ সংকটের মূল হচ্ছে রাজনৈতিক, অতএব বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এ সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। তা না হলে সমগ্র উপমহাদেশে বিপর্যয়ের ঝড় নেমে আসবে এবং যার পরিণতি ভাবা দারুণ কঠিন ব্যাপার। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও পৈশাচিকতার ফলেই বাংলাদেশ থেকে ৯৬ লক্ষ অসহায় নরনারী-শিশু-বৃদ্ধ তাদের বাড়িঘর সহায়-সম্পদ হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশকে একটি বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। বাংলাদেশে এই ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী তথা জঙ্গী সমরনায়করাই দায়ী। আর ঠিক এই কারণেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'য় পাকিস্তানি জঙ্গী সরকার ও সামরিক জান্তাকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে : বাংলাদেশের যে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের সহায়-সম্পদ, ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তারা যাতে পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে তারা যাতে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তেমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। 'প্রাভদা'য় বলা হয়, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীই শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এ সমস্যা আজ এক জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের মাথাগরম জঙ্গীচক্র যুক্তিতর্ক বিসর্জন দিয়ে তাদেরই সৃষ্ট সমস্যার জন্যে গোঁয়ারের মতো ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে।

**২৪ নভেম্বর, ১৯৭১**

...গত রাতে বিবিসি'র এক বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের পাঠানো রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় : মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গত ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তান তার দশটি সামরিক ঘাঁটি হারিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা পশ্চিম খণ্ডে মোট বাইশটি সীমান্ত চৌকির মধ্যে একুশটি দখল করেছে।

গত রাতে ঢাকা থেকে বিবিসি'র বিশেষ সংবাদদাতা মি. রোনাল্ড রোবসন জানাচ্ছেন: মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা এখন যশোরের চৌগাছা থেকে যশোর বিমান বন্দরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অধিকৃত যশোর বিমানবন্দরের রানওয়ে ও কন্ট্রোল টাওয়ারটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে করতে পাকিস্তানি বাহিনী এখন দ্রুত পিছু হটে যেতে শুরু করেছে।

বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অস্ট্রেলীয় বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় : বাংলাদেশের সর্বত্রই বীর মুক্তিসেনারা সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে শত্রুসেনাদের

একের পর এক ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানি হানাদারদের শিবিরে শিবিরে এখন ত্রাহি ত্রাহি হাঁক উঠেছে।

ঢাকা থেকে AFP সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাচ্ছেন : শত্রুবাহিনী অধিকৃত ঢাকার সঙ্গে গত সোমবার থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঢাকা-যশোর, ঢাকা-ঈশ্বরদি, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কুমিল্লা এক কথায় বাংলাদেশের সকল অভ্যন্তরীণ রুটে পি-আই-এ'র সকল সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। গত মার্চের পর ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার একমাত্র যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রিত পি-আই-এ সার্ভিস। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে তাও বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমানে চারদিক থেকে শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শত্রুবাহিনীকে সমূলে নিধন করে চলেছে। সর্বত্রই চলেছে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। ঢাকার মাত্র আঠারো মাইল দূরে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা মুন্সীগঞ্জ শহর আক্রমণ করে। মুক্তিসেনারা মুন্সীগঞ্জ থানার পুলিশদের ওপর আক্রমণ করলে থানার একজন পুলিশ অফিসার ও বহু পুলিশ নিহত হয়। মুক্তিসেনারা বিজয় দর্পে সারা শহরে কুচকাওয়াজ করেন। মুক্তিসেনারা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ীথানা দুটিও পুড়িয়ে দিয়ে ঢাকার এক বিশাল এলাকাকে শত্রুমুক্ত করে।

এদিকে মুক্তিসেনারা বর্তমানে উত্তরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সিলেট শহরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বলে বিবিসি'র বিশেষ সংবাদদাতা মি. ডোনাল্ড রোবসন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সিলেটের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হটে যাচ্ছে। তিনি তারবার্তায় জানিয়েছেন মুক্তিসেনারা কুমিল্লার ওপরেও এক ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে।

গতরাতে অস্ট্রেলীয় বেতারের এক সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় : বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার আক্রমণ চালিয়েছে তার সঙ্গে একমাত্র বাংলাদেশের গত ঘূর্ণিঝড়েরই তুলনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করব : গত সপ্তাহে NEWSWEEK-এর সিনিয়র এডিটর মি. রোচগ্রেভ তাঁর An Unwinable Guerilla War শীর্ষক রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এখন এমন এক দুর্জয় গেরিলা যুদ্ধের ফাঁদে পড়েছে যেখান থেকে তাদের মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নেই।

২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

...গত ২২শে নভেম্বর 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর করাচীস্থ সংবাদদাতা গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে God is not with the big battalions শিরোনামের এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কিত মাও সে-তুং-এর একটি বিখ্যাত উক্তি ভিয়েতনাম তথা সমগ্র

ইন্দোচীন, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসেনাদের দারুণ প্রেরণা দিয়ে চলেছে। উক্তিটি হলো : মাছ যেমন করে সমুদ্রের অগাধ জলের মধ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, মুক্তিসেনাকেও সেভাবে জনসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে হবে।

Mr. Malcom Browne তাঁর এই রিপোর্টে বলেন : বাংলাদেশের বীর মুক্তিসেনারাও আজ বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্রে মাছের মতোই স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা বলেন : গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অধিকৃত বিভিন্ন এলাকা এবং মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বিশাল এলাকা সফর করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি কোনোদিন তা কল্পনাও করিনি। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশের সমগ্র জনগণ মুক্তিসেনানী হয়ে উঠবে একথা ভাবাও যায় না। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা নয়— বাংলাদেশে গিয়ে আমাকে তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আজ বাংলাদেশে যে কোনও পর্যটক যে কোনও সাংবাদিক যান না কেন তিনিও আমার মতোই বিস্ময়ে মুগ্ধ হবেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বত্র শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে আমার শুধু বার বার একটা কথাই মনে হয়েছে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে এইসব হতভাগ্য পাকিস্তানি সৈন্য ও সমরনায়করা কিছুই শেখেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকায় আমি যেসব পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তাদের সবাইকেই মনে হয়েছে এক-একটি আস্তো উজবুক।

পাকিস্তানের মাথামোটা সমরনায়করা বাংলাদেশে বড়ো বড়ো রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ন নিযুক্ত করেছে বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে— কিন্তু God is not with big battalions— অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের সহায় নন। বাংলাদেশের গণগেরিলাদের হাতে তারা চূড়ান্তভাবে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানের ব্যাটেলিয়নগুলো এখন কেবল প্রাণরক্ষার জন্যেই লড়াই করছে। বাংলাদেশের নদী-মাঠ-প্রান্তরে আর জলাভূমিগুলোয় পাকিস্তানি যুদ্ধজয়ের স্বপ্নের কবর দিয়েছে বাঙালি গেরিলারা। যে কোনও বিদেশীর পক্ষে বাংলাদেশের এই বাস্তব পরিস্থিতিটুকু উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ শুধু গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে নয়— বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহের প্রতিটি শহর-বন্দরের সর্বত্রই মুক্তিবাহিনীর দেখা পাওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, দোকান, বিদেশী ফার্ম, কনসুলেট অফিস থেকে শুরু করে সরকারি অফিস-আদালতের প্রত্যেকটি দফতরে তারা সক্রিয়। বাংলাদেশের আমি যেখানে গেছি, যার সঙ্গে কথা বলেছি সবখানে সবার মুখে একই কথা শুনেছি— পাকিস্তানি হানাদারগুলোকে আমরা নিশ্চিহ্ন করবোই। আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চলবেই।

পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এখন এমন অবিশ্বাস্যরূপে কমতে শুরু করেছে যা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ এটাই কঠোর বাস্তব।

# দৃষ্টিপাত

১৪ জুন, ১৯৭১

আমাদের চোখের সামনেই যেন একটি মর্মান্তিক ইতিহাস তার পৃষ্ঠাগুলো দিনের পর দিন উন্মোচন করে দিল। আর আমরা সবাই হয়ে থাকলাম ইতিহাসের এক-একজন উজ্জ্বল সাক্ষী। সর্বযুগের, সর্বকালের এবং সর্বদেশের একটি নিষ্ঠুরতম ঘটনা, একটি অমানুষিক পৈশাচিকতা, একটি হৃদয়বিদারক বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের চোখের সামনেই ঘটে গেল। আমরা চোখ দিয়ে দেখলাম, আমাদের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে অনুভব করলাম এবং আমরা সবাই বহু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে আবার নতুন সূর্যের অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। নতুন দিনের আশায় আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজ উজ্জীবিত— নতুন সংগ্রামে আমরা সমগ্র বাঙালি আজ শপথ গ্রহণ করেছি। এ সংগ্রাম আমাদের সুনিশ্চিত মুক্তি নিয়ে আসবে, এ সংগ্রাম আমাদের বিজয়ের তোরণদ্বারে উপস্থাপন করবেই।...

বন্ধু, আমরা তো কোনও অন্যায় করি নাই। ব্রিটিশ বেনিয়াদের উৎখাত করে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করতে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির অবদান সবচেয়ে বেশি। মহামতি গোখলে তাই একদিন বাঙালিকে লক্ষ করে এ যুগের একটি পরম সত্যবাণী উচ্চারণ করেছিলেন What Bengal thinks today, India thinks tomorrow—অর্থাৎ, বাঙালি আজ যা ভাবে, সারা ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল। রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নেতাজী সুভাষ বসু, নজরুল ইসলাম এবং এই জাতীয় আরো বহু নাম উচ্চারণ করা যায় যাঁরা সারা ভারতীয় উপমহাদেশকে মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিও ছিল বাংলাদেশ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকায়। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব যিনি সারা বিশ্বের কাছে পেশ করেছিলেন তিনিও ছিলেন একজন বাঙালি—বাংলার নয়নমণি, বাংলার বাঘ ফজলুল হক। পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুতে মুসলিম লীগের বিরোধী মন্ত্রিসভা ছিল—সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান চায় কিনা তা নির্ধারণ করতে হয় গণভোট নিয়ে। সারা পাকিস্তানে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ সরকার কায়েম ছিল। সুতরাং পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি বহুলাংশে নিস্পৃহ ছিল—এ-আন্দোলনে বলিষ্ঠ এবং অগ্রণী নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। বাঙালির আন্দোলনেই পাকিস্তান এসেছে—পাঞ্জাবি, সিন্ধী, বেলুচি বা পাঠানদের আন্দোলনে নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই মাতব্বর হয়ে এল পাঞ্জাবি, কি চাই? না লুটের মাল চাই—এল সিন্ধী, এল পাঠান। কোথায় লুট করা যায়। আর কোথায়! সোনার বাংলায় সোনা ফলে। সুতরাং সবাই মিলে লুটের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু লুট করতে গিয়ে দেখা গেল বাঙালির সাধনা, বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালির সংস্কৃতি সবকিছু অত্যন্ত প্রদীপ্ত। সুতরাং শুরু হলো ষড়যন্ত্র। ধ্বংস করতে হবে বাঙালির আসল চেহারাকে। ইসলামকে সামনে রেখে, পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে সামনে রেখে তাদের এই লুণ্ঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর দিনের পর দিন ষড়যন্ত্রের

জাল বিস্তারিত হতে থাকলো। প্রথম আঘাত এল ভাষার ওপরে—তারপর অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শুরু হলো শোষণের এক সুপরিকল্পিত আয়োজন, আরম্ভ হলো শাসনের এক নিদারুণ প্রয়াস। আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছিলাম এবং প্রত্যেকটি বাঙালি পাকিস্তানের নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের আদর্শকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে একান্ত সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের দেউলিয়া অর্থনীতিতে পুষ্ট মানুষ নিজেদের স্বার্থপরতাকে ভিত্তি করে বাঙালির সমস্ত কিছু লুন্ঠন করে বড় হবার জন্য মেতে উঠেছিল, আর তাই তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করলো। কথায় কথায় আমরা যে পাকিস্তানের সত্যিকার নাগরিক সে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো—আমাদের আন্তরিকতা, আমাদের বিশ্বস্ত চেতনা সবকিছুকে পদদলিত করে আমাদের সবাইকে পর্দার সামনে থেকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে যাবার সুপরিকল্পিত কাজ শুরু হলো। আর এই হলো পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ইতিহাস। বর্তমান শতাব্দীর নির্মম একটি ইতিকথা।

('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ড. মযহারুল ইসলাম রচিত)

**১৬ জুন, ১৯৭১**

বাংলার প্রাণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হককে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদীচক্রের মুখপাত্ররা একদিন বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল Mr. Fazlul Hoq is self-confessed traitor. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কুচক্রী মুসলিম লীগ সরকারের অনুসারিগণ বাংলার মাটিতে সাংঘাতিক পরাজয়বরণ করে আবার পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাচনের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার সপক্ষে সমগ্র বাঙালি অকুন্ঠ রায় দিয়েছিলেন। বাঙালির এই একতা ও নবজাগ্রত চেতনা পশ্চিমাদের ভয়ের ও ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাকে যেমন নির্বিচারে শোষণ করা চলছিল এবার সে পথে এক বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই জাগ্রত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকেন যে বাংলাকে আর শোষণ কতে দেয়া হবে না তখন পশ্চিমা আমলাগণ এবং স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদরা বিপদ গুণতে শুরু করে। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হতে থাকে—আর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ফজলুল হককে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক। এই ষড়যন্ত্রের নেতা সেদিন ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ প্রভৃতি। এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল চুয়ান্নের নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগের কতিপয় বাঙালি মীরজাফর। ১৯৫৫ সালের ২৯শে মে বাংলার দরদী নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক যখন করাচী থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে ফিরে এলেন তখন বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস—নিজের দেশে ফিরে এসে, যে বাংলার মাটিকে ফজলুল হক প্রাণের মত ভালোবাসতেন সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলবার অধিকার তাঁর রইল না। সামরিক বাহিনীর কড়া পাহাড়ায় তাঁকে বিমানবন্দর থেকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হলো এবং নিজের ঘরে তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হলো। ছয় মাস তাঁকে বাইরের কোনও লোকের সাথে মিশতে দেয়া হতো না—এমনকি পবিত্র ঈদের দিনে মুসলিম জামাতের সাথে একত্রে বসে নামাজ পড়তে পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হতো না।

বাংলাকে ভালোবাসার এই হলো শাস্তি—বাংলার দুঃস্থ, নিঃস্ব, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের জন্য কথা বলার এই হলো সত্যিকার পুরস্কার। ঋণসালিসী বোর্ড স্থাপন করে একদিন যে ফজলুল হক বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন, বাঙালির সামান্য বিপদে যিনি বাঘের মত গর্জে উঠতেন, দুঃখী মানুষের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতেন, বাংলার গ্রামে, বন্দরে, শহরে অসংখ্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার পথ যিনি সুগম করেন এবং সর্বোপরি লাহোর বৈঠকে যিনি সারাবিশ্বের সামনে পাকিস্তান প্রস্তাব তুলে ধরেন সেই ফজলুল হক, সেই শেরে বাংলা ফজলুল হক সেদিন প্রবীণ ও বৃদ্ধ বয়সে নিজের ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন। যেদিন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস ও আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফজলুল হক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন কোথায় ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ? ব্রিটিশের তাঁবেদার ও গোলাম সেজে তারা তখন চাকরি করতো ও নিজেদের সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করতো এই দুই পরাশ্রিত বশংবদ জানোয়ার। আর পাকিস্তান প্রস্তাবের যিনি উদ্যোক্তা, যাঁর হাতে পাকিস্তান প্রস্তাবের জন্ম, সেই মনীষী ফজলুল হককে 'বিশ্বাসঘাতক' বলতে এদের এতটুকু বাঁধলো না।...

উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনের পর এসেছে অভিশপ্ত একাত্তর সাল। এবারেও সেই একই খেলার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। চুয়ান্নোর নির্বাচনের পর শিকার ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, প্রবীণ গণনেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও অসংখ্য দেশপ্রেমিক। শিকার ছিলেন শহীদ সুহরাবর্দী এবং সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আজকের নির্বাচনের পর শিকার হয়েছেন বাংলার অবিসংবাদিত প্রাণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। যে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং এম, এম, আহমেদ একদিন ছিল ব্রিটিশের পদলেহী চাকর, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল এক-একটি অখ্যাত-কুখ্যাত সাধারণ গোলাম, আজ তারাই হয়েছে দেশের হর্তাকর্তাবিধাতা। আর ফজলুল হকের ভাগ্যে যেমন জুটেছিল বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি, তেমনি বাংলার প্রাণের নেতা, সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একমাত্র গণনেতা আজ হলেন দেশদ্রোহী। ভাগ্যের এ এক নির্মম পরিহাস বটে— রবীন্দ্রনাথের উপেনের ভাষায় "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আর আমি চোর বটে।"

কিন্তু দিন আর বেশি দূরে নয় যখন এই ষড়যন্ত্রের জাল আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবোই এবং বাংলাদেশকে এই দানবদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবোই। আসুন আপনি কৃষক-মজুর, আসুন আপনি চাকরিজীবী-বুদ্ধিজীবী, সবার ওপরে এসো তোমরা ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-তরুণের দল— এবার আমরা দানব হত্যায় ও দানব বিতাড়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ্ আমদের সহায় হবেন। জয় বাংলা।

('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ড. মযহারুল ইসলাম রচিত)

২৩ জুলাই, ১৯৭১

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকবর্গ তাদের বেতার ও অন্যান্য প্রচারকেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের নিকট দিন-রাত প্রচার করে চলেছে যে তাদের দখলীকৃত বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিগত তিন মাসে জঙ্গী শাসকদের অমানুষিক কার্যকলাপ এবং সমগ্র প্রচারণা যে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে আমরা তা জানি এবং বিশ্বের নিকটও তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের চীৎকার এবং ক্রন্দন এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রচারণারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মাসক্যারেনহাস্ নামক 'সানডে টাইমস্'-এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এই মাসের ১৩ তারিখে করাচী থেকে সপরিবারে লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবার সুপরিকল্পিত কার্যকলাপের একটি লোমহর্ষক এবং প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন। সানডে টাইমস্-এর জেনোসাইড বা একটি জাতিকে নির্মূল করা সম্পর্কে এই প্রামাণ্য তথ্য আজ ইউরোপ, আমেরিকা এবং প্রাচ্যজগতে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে শক্তসমর্থ যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে শরীর থেকে রক্ত নিয়ে মৃতদেহগুলোকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি দেখেছেন সৈন্যরা কিভাবে যাকে খুশি তাকে ধরছে এবং খেয়ালখুশিমতো গুলি করে মারছে। তিনি দেখেছেন এই বর্বর পশুগুলো কিভাবে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করছে। এবং এই জাতীয় আরো বহু চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আর এই ঘটনাগুলো সবই বেশি দিন আগের নয়। মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটেছে। সুতরাং একদিকে মৃত্যুর নিষ্ঠুর লীলা চালিয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানের বর্বর হানাদার সেনাবাহিনী, অন্যদিকে জঙ্গী সরকার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পি-টি-আই পরিবেশিত আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ করবো। কোনও একটি শহরে শতাধিক নিরীহ লোককে বলা হয় যে, রেশনের দোকানে এলে তাদেরকে সাপ্তাহিক রেশন দেয়া হবে। লোকজন সরল বিশ্বাসে রেশনের দোকানে উপস্থিত হয়। তখন সেনাবাহিনী রেশনের দোকান খুলে দিয়ে সেই শতাধিক লোককে বলে যে তারা যত খুশি নিয়ে যেতে পারে এবং তাদের কোনও অন্যায় করা হবে না। লোকজন যখন রেশন দ্রব্য নিয়ে দোকান থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তখন সৈন্যরা পেছন থেকে গুলি করে এবং শতাধিক লোককে সেখানেই হত্যা করে।

এগুলো সবই বর্বরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার এক-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই দৃষ্টান্তগুলো এখন সবই ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশী পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে মিথ্যা প্রচারণার তো অন্ত নেই। দেশবাসী সবাই জানেন যে এখনো ট্রেন পুরো চালু করা সম্ভব হয় নি— যেসব জায়গায় দিনে একটি কি দুটো মাত্র ট্রেন চালু হয়েছে সেখানেও বাঙালিদের উঠবার বিশেষ সুযোগ নেই। সড়কপথেও অনুরূপ অবস্থা। মফস্বল শহরগুলোতে লোকজন ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছে না, কেননা বহু ঘটনায় দেখা গেছে যে লোকজন ফিরে এলেই তাদের ব্যাপকভাবে

হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সড়কপথে গাড়ি দু'এক স্থানে চালু হলেও লোকজন নেই। জলপথের অবস্থাও একই রকম। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে কিন্তু দু'একজন শিক্ষক কাজে যোগ দিলেও ছাত্র নেই— এবং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হানাদার সৈন্যদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত কোনও ছাত্র পড়াশুনো করতে যাবে না। অফিস-আদালতের অবস্থাও অন্যরূপ নয়। ঢাকার বেশ কিছু পরিমাণ অফিস খোলা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার অফিসগুলো মফস্বল শহরগুলোর ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু মফস্বল শহরে শতকরা আট-দশটির বেশি অফিস চালু হয়নি, সেহেতু ঢাকায় লোকজন অফিসে গিয়ে বসে বসে সময় কাটানো ছাড়া করবার কিছু পাচ্ছেন না।

সুতরাং পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক চীৎকার করে যতটা বলুক যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে কিন্তু আসলে যে তা সত্য নয় একথা আমরা সবাই জানি। আর আমরা বাঙালি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশকে যতদিন পর্যন্ত না হানাদার পশ্চিম পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে, ততদিন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না। সত্যিকারভাবে বাংলায় বিগত তিনমাসে যা ঘটেছে তারপর আর কোনও অবস্থায়ই এই হানাদার পশুশক্তির সাথে সহযোগিতা করতে একটি বাঙালিও অগ্রসর হতে পারেন না। জোর করে কিছুসংখ্যক লোককে অফিসে, আদালতে, ট্রেনে, বাসে বা শহরে-নগরে নিয়ে এলেও বাংলার মানুষের মন জয় করবার সাধ্য এই পশুশক্তি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের বর্বরতা, তাদের ইতিহাসে নজীরবিহীন হত্যালীলা, পাশবিকতা ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক দেশটি মৃত্যুবরণ করেছে— আর সেখানে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। জয় বাংলা।

('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ড. মযহারুল ইসলাম রচিত)

**২৬ জুন, ১৯৭১**

বাংলাদেশ! ও নাম কানের ভিতর দিয়া পশে। এ নামের লাবণী অবনি বহিয়া যায়। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শেখ মুজিবের বড় প্রিয় গান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণের গান। এ গানে বাংলাদেশের মর্মকথাটি আছে। আমার কাছে এ-গানের কিন্তু একটা ভিন্ন অর্থ আছে। মনে পড়ছে গাঁ থেকে ফিরছি। অদূরে রাজশাহী শহর দেখতে পাচ্ছি। তেসরা এপ্রিল। সকাল দশটা। মাথার ওপরে উড়ে এল ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বিমান স্যাবর জেট। তারপর শুরু হলো নির্মম বোমাবর্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি একটা খালে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু খালটার দশহাত দূরেই একটি ছেলে হাল চাষ করছে। তাকেও শুয়ে পড়তে বললাম। কিন্তু সে নির্বিকার হাল চাষ করতে লাগলো। কোনও কিছুই হয় নি। বিমানগুলি চলে গেলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঝাড়তে লাগলাম। কিন্তু ছেলেটি তখন গাইছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। আমাকে দেখে ও বলদ দুটি থামালো— বললো, আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছিলেন? তার কথায় একটু বিদ্রূপের সুরও ছিল। বললাম, হ্যাঁ ভয় একটু পেয়েছিলাম বৈ কি। বললাম, তোমার বুঝি ভয় করে নি। বললো, না। বললো, মরতে তো হবেই স্যার। জিজ্ঞেস

করেছিলাম, তোমার নামটি কি ভাই? উত্তর এল, অমল। ঘটনাটা ছোট্ট, কিন্তু অসামান্য। অমল, বিমল, রহিম, করিম হাল-চাষ করছে আর গান গাইছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি। আমবাগানের নিচে নিচে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বীর সেনানী ভাইরা বন্দুক নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রাজশাহী শহরের চারদিকে অতন্দ্র প্রহরী এই ই-পি-আর বাহিনীর জোয়ানেরা। ওদের কাছে বসলাম। পাশেই বাজছে রেডিও। আবার গান : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। ই-পি-আর'এর কয়েকজন জোয়ান গানের সঙ্গে পায়ের তাল ঠুকছে। ওরই মধ্যে একজন, নাম রশিদ। ঢাকায় বাড়ি, বললো, কি জানেন সাহেব, এ গানটা শুনলেই পরানটা এক্কেবারে ফাইট্যা যাবার চায়। বললো— ঐ যে ছেলেটাকে দেখছেন, ঐ যে হাল চাষ করছে। ওর নাম অমল। কাল সারা রাত ট্রেঞ্চ কেটেছে আমাদের জন্য। আর এই যে, দেখছেন বুড়ো মিয়াকে, ইনি মসজিদের ইমাম। সারাদিন আমাদের জন্য খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। পানি আনছেন। বিড়ি-সিগারেট যোগাড় করছেন। বুকটা আমার গর্বে ফুলে উঠলো। বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এমন প্রমাণ আর কখনও দেখিনি।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

**২৭ জুন, ১৯৭১**

একজন মায়ের কথা বলছি। হ্যাঁ, একজন বাঙালি মায়ের কথাই বলতে চাইছি। মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার সরকার বন্দুক-রাইফেল জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ জমাও দিয়েছিল। কিন্তু যে-মায়ের কথা বলছি, তিনি রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর ছেলেদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন— খবরদার, বন্দুক জমা দিবি না। জল্লাদের হাতে বন্দুক দেয়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করবি না তোরা? বললেন তিনি। আমার মনে আছে, তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই বললেন— মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করো। হয় ইয়াহিয়ার সেনাদেরকে খতম করবে আর না হয় মরবে। ছেলেরা মায়ের কথা রেখেছে। তাঁর এক ছেলে শহীদ হয়েছে। আর বাকী দুজন এখনও লড়ছে। গেরিলা আক্রমণে তারা দুজনেই সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছে। এই কিছুদিন আগে এদের দু'ভায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। বললাম—তোমার মায়ের কথা বলো। বললে— মা আছেন গাঁয়ে। তিনি তাঁর কাজ করছেন। সবাইকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন, প্রেরণা যোগাচ্ছেন। বললে— মা কি বলেন জানেন আপনি? বলেন, মাকে আর দেশকে এক করে দেখবি। তোমরা আমার ছেলে নও, তোমরা বাংলাদেশের সন্তান— এই কথাটা মনে রেখো। মনে রেখো, ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু সেনারা আমার মতো বহু রত্নপ্রসবিনী মাতাকে হত্যা করেছে। আর এখন রত্নগর্ভা বাংলাদেশকে হত্যা করছে। কিন্তু ওরা জানে না, একজন মাকে হত্যা করা যায় কিন্তু দেশকে হত্যা করা যায় না। বাংলাদেশকে হত্যা করা যায় না। যাবেও না। মাতা আর পুত্রের রক্ত থেকে জন্ম নেবে রক্তবীজের ঝাড়।

এমনি মা আমরা পেয়েছি লক্ষ লক্ষ, আর এমনি পুত্রও পেয়েছি লক্ষ লক্ষ। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আজ মরণ-পণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। সমস্ত শোষিত নিপীড়িত জনগণ আজ জেগে উঠেছে, হাতে তুলে নিয়েছে তারা তরবারি— আজ ভয় নেই। মুক্তিফৌজের বীর ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত কঠিন আঘাত হানছে ইয়াহিয়ার সেনাদলের ওপর। আর ভয় নেই। মুক্তিফৌজের সামনে তিনটি প্রধান কর্তব্য :

(এক) শত্রুকে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে হবে

(দুই) শত্রুর দালালদের খতম করতে হবে

(তিন) কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনতে হবে।

...আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করছি, আমরা জানি, পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। কারণগুলো কি? প্রথম কারণ : পৃথিবীর কোনওও মুক্তিযুদ্ধ এমন অভূতপূর্ব গণঐক্য দেখে নি। দ্বিতীয় কারণ : পৃথিবীর কোনও মুক্তিযুদ্ধই যুদ্ধের শুরুতেই সশস্ত্র বাহিনীর এমন সমর্থন লাভ করেনি। স্মরণ করুন কিভাবে আমরা ই-পি-আর, ই-বি আর, পুলিশ, আনসার এবং মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং এ মুহূর্তেও তারা কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। এমন কি ভিয়েতনামের যুদ্ধেও প্রথম দিকে এ-ধরনের সশস্ত্র সমর্থন পাওয়া যায় নি, কাজেই সবদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে বলা যায়, আমরা সবাই একটি গৌরবময় মহান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছি। মনে রাখতে হবে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কারণসমূহ যথার্থ। আমরা লড়াই করছি ন্যায়ের জন্য এবং আমাদের লড়াইও যথার্থ পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই বিশ্বের সকল দেশ থেকে আমরা সমর্থন, সাহায্য ও সহানুভূতি পাবোই এবং পাচ্ছিও।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

**৯ জুলাই, ১৯৭১**

মাঠে মারা গিয়েছে ইয়াহিয়া খানের লম্বা-চওড়া রেডিও গলাবাজি। শাহী কায়দায় ফরমান জারির ভঙ্গিতে কাকাতুয়া ইংরেজিতে আওড়ানো প্রায় একঘন্টার নরম গরম চরম বিলাপ আর প্রলাপ কি করে দাগ রাখবে দুনিয়ার মানুষের মনে? তবু, যাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি ভর করেছে, যাদের মধ্যমণি হিসেবে ইয়াহিয়া খান ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, তারা এই রেডিও গলাবাজির আগে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বাজনা তো কম বাজায়নি, কাঠখড় তো কম পোড়ায়নি, গৌরীসেনের টাকা তো কম খরচ করেনি, বেঈমানি ঢাকবার জন্যে দেশদেশান্তরে মিষ্টি কথা তো কম পরিবেশন করেনি। পাকিস্তানি শাসকচক্রের ঝানু উপদেষ্টারা ইতিমধ্যে তদ্বির-তদারকের বাকি কিছু রাখেনি। কিন্তু কোনও ফল হলো না। ইয়াহিয়া খানের ২৮শে জুনের রেডিও ভাষণ একটা জঘন্য অপভাষণ হিসেবেই বরং চিহ্নিত হয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে গেল রাওয়ালপিন্ডি সামরিকচক্রের সেই মুনাফালোভী দুর্বুদ্ধিতা, যা এই চক্রকে বাংলাদেশ দমনে প্রবৃত্ত করেছে। ইয়াহিয়া খান তার প্রলাপে বলেছে যে, রাওয়ালপিন্ডির সামরিক চক্র নিজেরাই

শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও শাসনতন্ত্র রচনার এখতিয়ার নাকচ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে তো তারা ধ্বংস করতেই চেয়েছে। এটা ইয়াহিয়ার কারণে দুনিয়ার কাছে জাহির হয়ে গিয়েছে।

২৮শে জুনের আগে দুনিয়ার যেসব রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চিন্তা করছিলেন যে, দানবীয় অপকর্ম করে ফেলে হাতেনাতে ধরা পড়ে ইয়াহিয়া খানেরা হয়তো তওবা করে পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল থাকার জন্যেও দুনিয়ার কাছে একটা সম্মানজনক মীমাংসাসূত্র রাখতে পারবে, তারাও খুঁজে-পেতে কিছু পায়নি ইয়াহিয়া খানের বাচনে।

বস্তুতপক্ষে ২৮শে জুনের পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বলেছেন, তাদের প্রত্যেকটি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায় যে, এইসব মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানের বাচনকে আমলেই আনেননি। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম জার্মানির পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসাসূত্রের জন্যেই তাগিদ দিয়েছেন। এটা ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা কূটনৈতিক সূত্রে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক সমাধান-সূত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কানাডা আর আয়ারল্যান্ডের আইন পরিষদের যেসব সদস্য বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন, তাঁদেরও একই কথা। তাঁরা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের রাওয়ালপিণ্ডি চক্রের জল্লাদেরা একটা গোটা জাতিকে— সাড়ে সাত কোটি নরনারী শিশুকে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কি ধরনের হত্যাকাণ্ড করেছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের যে তাগিদ তাঁরা দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারা যায়, ইয়াহিয়ার বাচনকে তাঁরা ঝাড়া অগ্রাহ্য করেছেন। গোটা বাঙালি জাতিকে নিধন করার জন্যে পাকিস্তানি শাসকচক্র যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে এতদিন, ইয়াহিয়ার বক্তব্য তারই একটা বেতালা পদক্ষেপের মহড়া ছাড়া যে আর কিছু নয় সেকথা আজ বিশ্বের মানুষ বুঝে নিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে আসছে। সবিশেষ সংবাদে দেখা গেল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্মকর্তারা সরকারিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশের ব্যাপারে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। এর সোজা অর্থ এই যে, ইয়াহিয়া খানের রেডিও বাচনকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব, এটাই বর্তমান, এটাই ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ নিজের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করবে। দুনিয়ার দেশ-দেশান্তরের কাছে এই ঘটনা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ঘটনা হিসেবে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ইয়াহিয়া খানেরা মিথ্যা। স্বাধীন বাংলাদেশ সত্য। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নরনারী-শিশু বুকের রক্ত ঢেলে এই সত্যের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের মুক্তির দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

('জামিল শারাফি' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

১০ জুলাই, ১৯৭১

রাওয়ালপিন্ডি থেকে দুটো পত্র পৌঁছেছে লন্ডনে। সরকারিভাবে সরকারি চিঠি। এগুলো নাকি প্রতিবাদলিপি। কিন্তু কিসের প্রতিবাদ? দুনিয়া তাজ্জব হয়ে গিয়েছে খবরটা শুনে। পাকিস্তানি জল্লাদ সরকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখে জানিয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ব্রিটেনের সংবাদপত্রে পাকিস্তানবিরোধী প্রচার চলছে— এ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থা হোক।

বিশ্ববাসীর মনে স্বভাবতই দুটো প্রশ্ন জেগেছে। বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার পরেও যে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকচক্র অতীতের রেশ ধরে বাংলাদেশের ঘটনাকে এখনও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বোঝাতে চেষ্টা করছে। আর শুধুমাত্র অস্ত্রপাতির জোরে বলে বেড়াচ্ছে যে বাংলাদেশ তাদের দখলে রয়েছে— তারা ব্রিটেনের খবরের কাগজগুলি কি লিখছে না লিখছে তার ওপর খবরদারি করতে চাইছে কোন লজ্জায়? এটা হতে পারে প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা ভিন্ন ব্যাপার থেকে এসেছে। পাকিস্তানি জল্লাদেরা নিজেদের হাতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম নগরীতে রাজমিস্ত্রী দিয়ে দুটো-চারটে দালানকোঠা মেরামত করিয়ে আর রং ফিরিয়ে, নিজেদের হাতে খুন করা হাজার হাজার নরনারী-শিশুর গলিত লাশ গুম করে সাফাই-সাক্ষীর মারফত প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিল যে, পাকিস্তানি ফৌজের লোকেরা বেকসুর, মাসুম, তারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে জান কোরবান করে দিয়েছে আর ফৌজী কর্তাব্যক্তিরা করুণার বড় বড় থলে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বসে আছে জনসংযোগ দফতর হাট করে খুলে। ফল এতে উল্টোই হয়েছে। সাংবাদিকরা অবরুদ্ধ নগরীগুলিতে ঢুকবার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন এবং ফাঁস করে দিয়েছেন পাকিস্তানি জল্লাদদের সমস্ত গোমর। শেষরক্ষা করার জন্যে, সত্যের বিশ্বপরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখাগুলিকে ঢাকা দেবার জন্যে পাকিস্তানি জল্লাদেরা এখন চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেশের সরকারকে দিয়ে কিছু একটা করাতে। কিন্তু এদের মাথায় কি এ কথাটা ঢুকছে না যে, যে হাত দিয়ে এরা সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র লিখছে, তা বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী-শিশুর রক্তে রঞ্জিত, সে রক্তের দাগ লেগে যাচ্ছে এদের চিঠিপত্রেও? তবে দুনিয়ার সামনে উপরোক্ত দুটো প্রশ্নের একটাই জবাব রয়েছে। দু'কান কাটা রাস্তার মাঝ দিয়েই চলে। আসামি কাঠগড়ায় উঠে আবোল-তাবোল বকে পাগলের ভান করে। সত্যকে চাপা দেবার জন্যে পাকিস্তানি জল্লাদেরা কম চেষ্টা করেনি। এরা ২৫শে মার্চে নৈশ হামলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা নগরীতে সমাগত সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে হোটেলের কামরায় আটকে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সেই অবরোধ ভেদ করে সাংবাদিকরা পাকিস্তানি জল্লাদদের নারকীয় কাণ্ডের যে তথ্য আর ছবি নিয়েছিল, সেই সব তথ্য আর ছবি কেড়ে নেয়া হয়েছিল করাচী বিমানবন্দরে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে এরা ঢুকতে দেয়নি, পাছে পাপ প্রকাশ পেয়ে যায় এই চিন্তায়। এরা বাংলাদেশের যেসব খবরের কাগজের অফিসকে দালান সমেত পুড়িয়ে ছাই করেনি, তাদের উপর জঙ্গী আইনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কোনও ফাঁকে যাতে বাংলাদেশ থেকে খবর বাইরে না যেতে পারে সেজন্যে এরা বিদেশীদের

জন্যে নির্ধারিত কূটনৈতিক শিষ্টাচারকে বুটের তলায় মাড়াতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া যায়নি। পাকিস্তানি জল্লাদেরা ভেবেছিল, দিন চলে যাবে একরকম করে এবং দুনিয়ার মানুষ আস্তে আস্তে ভুলে যাবে।

('জামিল শারাফী' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

## ১৬ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের মতো এমন শান্তির দেশ, এমন সুখের দেশ আর কোথায় আছে! এমন জন্মভূমি ক'জনে ভাগ্যে পায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল ঘরকুনো। বুঝিবা একটু আড্ডাবাজ। কিন্তু বাংলার ছেলে-মেয়েরা কোনওদিন গোলমালে নিজেদেরকে জড়াতে চায় নি। মায়ের স্নেহ, দাদা-দাদী আর নানা-নানীর আদর কেড়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় অথচ আজ! ভাবলে অবাক লাগে। এই তো সেদিন! ঘুরছি আর ঘুরছি। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম মুক্তিবাহিনীর শিবিরে। শান্ত নিরীহ বাঙালির ছেলেরা দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে। এক-একটি ছেলে যেন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে নিয়েছে। মায়ের আঁচল ছেড়ে, ঘরের নিশ্চিন্ত কোণ ছেড়ে, সামান্য সুখ আর আনন্দের পথ ত্যাগ করে বাংলাদেশের ছেলেরা এই প্রথম অস্ত্রের ভাষায় কথা বলছে। পার্থক্যটা অনুভব না করে উপায় নেই। আমিও না করে পারিনি। বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ নেই মুক্তিবাহিনীর স্কুল-কলেজ। তা সব সময়ই খোলা।

এমনি একটি মুক্তিবাহিনীর শিবিরে গেলাম সেদিন। সোনার টুকরো হীরের টুকরো সব ছেলেরা লড়াইয়ে যাবে তাই তৈরি হচ্ছে। বললাম, কেমন আছো ভাইরা আমার? কেমন আছ? সবাই বললে ভালো আছি। বললে : আমাদের বিপ্লবী সেলাম নিন। নিলাম। ওদের সঙ্গে কথা বললাম। পেয়ালা পেয়ালা চা খেলাম। একজন বললে : আমরা এখন লড়াই করতে যাচ্ছি। বললাম— সে কি? এক্ষুণি? বললে— হ্যাঁ এক্ষুণি। প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। অস্ত্রে ওরা দীক্ষিত হচ্ছে— অস্ত্রে ওরা শান দিচ্ছে। ওদের সমস্ত মাংসপেশীগুলো ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, ওরা পায়ের তালে তালে মার্চ করছে— ওরা তৈরি হচ্ছে, লড়াই করতে যাচ্ছে। বাংলার সন্তান মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে, শত্রু নিকেশ করছে। পার্থক্যটা সত্যিই ভুলবার মতো নয়। মায়ের আদুরে খোকা নয় আর। ঘাড়ে বন্দুক, বুকে অসীম সাহস, চোখে-মুখে উজ্জ্বল বিশ্বাস, পায়ে পায়ে বলীয়ান অশ্বের বেগ। ওদের একজন বললে— দেখবেন লড়াইটা। বলার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল মুক্তিবাহিনী আর একদল পাক-সেনা। শুরু হলো লড়াই। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী হেরে গেল। আমি হাততালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানালাম। এরপর ওরা গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল দেখালো। আর একবার হাততালি দিয়ে ওদেরকে অভিনন্দন জানালাম। ওদের অবসর ওরা এমনি করে কাটায়। আনন্দের মধ্যে শিক্ষা আর শিক্ষার মধ্যে আনন্দ। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এভাবে তৈরি হচ্ছে। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনীর কবর রচিত হবে অচিরে।

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

১৯ জুলাই, ১৯৭১

কবি শহীদ সাবের আজ আর নেই— কিন্তু তার কবিতা আছে। সেই কবিতাটিই পড়ছিলাম। গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী যেভাবে গেরিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল— সেসব কথা মনে পড়েছিল শহীদ সাবেরের। সাবেরের মনে তৈরি হচ্ছিল বিদ্যুতের— জন্ম হচ্ছিল একটি কবিতার— আর সে কবিতা মুহূর্তে মনকে আক্রান্ত করে।

কবিতাটি পড়ছিলাম। শহীদ সাবের আজ আর নেই। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী হত্যা করেছে শহীদ সাবেরকে। হত্যা বলবো, না অন্য কিছু? শহীদ থাকতেন ঢাকার দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ'-এর কার্যালয়ে। আগুনে-বোমা ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হলো সংবাদ কার্যালয়। তাঁরই সঙ্গে পুড়ে গেলেন শহীদ সাবের— যে শহীদ সাবের ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী, যে শহীদ ছিলেন মুক্ত মানবতার প্রতীক। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনী শুধু অধ্যাপক হত্যাই করেনি। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী কেউ বাদ যায় নি।

শহীদ সাবের নেই—কিন্তু আছে তাঁর কবিতা। কবিতাটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন সরদার ফজলুল করিম। লিখেছিলেন :

"কিশোর শহীদ সাবের আমারই ন্যায় জেল থেকে জেলান্তরিত হতে হতে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এসে আমার সঙ্গে দৈবক্রমে মিলিত হয়েছিলেন। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব-বাংলার আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল। আর সে আন্দোলনের সঙ্গে ইলা মিত্রের নামও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।"... সরদার ফজলুল করিম আরও লিখেছেন : "ইলা মিত্রের গ্রেপ্তার এবং তার উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন তখনকার সংগ্রামের উপকথায় পরিণত হয়েছিল। সে কাহিনীর ভিত্তিতে শহীদ সাবের তাঁর 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন।"

সংক্ষেপে এই হলো শহীদ সাবেরের সেই বিখ্যাত কবিতার পটভূমি। তাঁর মনে পড়েছিল হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অত্যাচারের কথা। কিন্তু যে-কারণে আমি বিস্ময় বোধ করি, তা হলো শহীদ সাবেরের সেই কবিতায় ইয়াহিয়ার খুনী জল্লাদ সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন সবই প্রতিফলিত হয়েছে বিস্ময়কর ভাষায়। কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। দেখতে পেয়েছিলেন শহীদ সাবেরও। সবচাইতে বড় কথা সেই ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের শিকার হলেন কবি নিজেই। এমন করে নিজের ভবিষ্যৎ আর কোনও কবি দেখেছেন কি? আছে কি বিশ্বে কোনও উদাহরণ? না নেই— শুধু আছে এই বাংলাদেশে। শহীদের সেই কবিতার ভাষা তাই কান্নায় সিক্ত, ঘৃণায় ঘৃণায় উচ্চকিত, ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত, পাশব শক্তির ঘৃণ্যতম অত্যাচারের কথা এমন করে কেউ কখনও প্রকাশ করেনি।...

কবিতাটির প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে একজন জার্মান ফ্যাসিস্ট ক্যাপ্টেন ভের্নের গর্ভবতী একজন রুশ মহিলাকে উলঙ্গ করছে। কারণ, সেই রুশ মা ছিলেন গেরিলাদলের সদস্যা। তাই এই নির্মম অত্যাচার। শহীদ সাবের লিখছেন :

মাগো, মা আমার কাঁদছো তুমি?
আমাকে একবার দেখো,

দেখো, আমি স্থির, অটল, চোখের পাতাটি নড়ছে না।
চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই,
কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, লুকিয়ে আনা বইটি।
এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে
সেতো তোমারি ছবি মাগো।

কি সেই ছবি? ছবিটা দেখুন।

চারদিকে রক্ত-জমানো হিমেল মৃত্যু
আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমান্ডারের সামনে
মাগো ক্যাপ্টেন ভের্নের কি বুঝবে বলো?
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে?
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে
পররাষ্ট্র লোভী নাৎসিরা কি বুঝবে তা।

না, শুধু হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী নয়। বোঝেনি ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ট জল্লাদ সেনারাও। শহীদ সাবের তারপর লিখেছেন দ্বিতীয় দৃশ্য। ফ্যাসিস্টরা ধরে নিয়ে গেছে গর্ভবতী মাতাকে। পথেই তার সন্তান হলো। মায়ের কোল থেকে দস্যুরা কেড়ে নিলে নবজাতককে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার
সেই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে, সেই দুঃসহ শীতে
তুমি উলঙ্গ, মাগো তুমি উলঙ্গ
সেই বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তুমি
হেঁটে চলেছ মাগো, পেছনে বেয়োনেটের ডগা
ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার,
দস্যুরা হাসছে মাগো, মাতৃমূর্তির নগ্নতায়,
তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মাগো
খোঁচায় খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত তোমার শরীর

*  *  *  *

তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারুণ যন্ত্রণা বলো :
একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ড : আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে।
তারপর ভের্নের ডেকেছে তোমায়
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে

*  *  *  *

শয়তান তোমার ছেলের জান কবজের দিক হুমকি
মাগো, তুমি, মা —তোমার একটি কথার পরে
করছে নির্ভর অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী, বলবে না একটি কথাও।

না জননী একটি কথাও বলেননি। তাঁর চোখের সামনে তার সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করা হলো। পরে তিনি নিজেও প্রাণ দিলেন। বাংলাদেশের মা-বোনদের ওপরে এমনি নির্যাতন চালিয়েছে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনারা।...

শহীদ সাবের লিখেছিলেন :

আর দেখ আমি কারাগারে
মাগো তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
আমার জন্যে কেঁদো না, দেখ দেখ
আমি স্থির, অটল...

না, শহীদ সাবেরের জন্য আমরা কাঁদবো না। বাংলাদেশের তিনিই প্রথম কবি যিনি ইয়াহিয়ার বর্বর ফ্যাসিস্ট সেনাদের হাতে প্রাণ দিলেন।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

## ২০ জুলাই, ১৯৭১

...পাকিস্তান সরকার শিক্ষিত সেনাবাহিনীর নিয়মিত মৃত্যু রোধ করতে আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন— রাজাকার বাহিনী তৈরি করেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। আকাশ থেকে নিক্ষেপ করেছে রাশি রাশি প্রচারপত্র। তাতে বলা হয়েছে : যে দেশপ্রেমিক জনগণ, দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা বড্ড খারাপ কাজ করছে। আপনারা তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেবদের জন্য এখনও দেশ-প্রেমিক আছে, এ কথা ভাবলে হাসি পায়। তবে একটা কথা বলতেই হয়, বাংলাদেশের মানুষ দেশপ্রেমের বাস্তব পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন হাতে হাতে।

একজন কৃষক ভাইয়ের সাথে আলাপ করছি। তিনি জমিতে রোয়া লাগাচ্ছিলেন। বললাম— কেমন আছেন? বললেন— ভালো আছি, খুব ভালো আছি। বলেই মাথার টোপরের ভেতর থেকে একখানা কাগজ বের করে দিলেন। বললেন, এই এক্ষুণি ফেলেছে বিমান থেকে। ওখানেই বসে বসে পড়লাম। সেই প্রচারপত্র—যাতে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। কৃষক ভাইটি আমাকে জানালেন— লোক পাঠান, বুঝলেন লোক পাঠান। ঐ ব্যাটা রাজাকারদের সাবাড় করা দরকার। আরও জানালেন— মুক্তিবাহিনীকে বলবেন— তাদের জন্য আমরা ধান-চাল-আটা-গম সব মজুদ করে রেখেছি। এমন জায়গায় রেখেছি, খান সেনাদের চৌদ্দপুরুষও খুঁজে পাবে না।

অবাক লাগলো। একজন সাধারণ চাষি মুক্তিবাহিনীর জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী যা করছে, তা সমস্ত অত্যাচারের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিদিন অনুভব করছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী ধনিকদের দালাল পাকিস্তানি হানাদার সেনার হাত থেকে মুক্ত করতেই হবে স্বদেশকে। তাই দেশের সমস্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছেন দেশের সাধারণ মানুষ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতাই মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের কারণ। রাজাকার বাহিনী কিংবা শান্তি

কমিটি করেও কূল পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণের ব্যাপক অংশে বিরাজ করছে অসন্তোষের তীব্র দাবদাহ।...

আজ 'পাকিস্তান' বলতে যা বোঝায়— তা হলো পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনও অভিযোগ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমাদের মতোই শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে মিথ্যে ভাঁওতায় ভুলিয়ে, কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাঙালিকে হত্যা করবার কাজে লাগাতে চেয়েছে। সিন্ধু থেকে কৌশলে এভাবে স্বল্প-মেয়াদী ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক আনা হয়েছে সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্যে। মুক্তিবাহিনীর হাতে এরাও প্রচণ্ড মার খাচ্ছে।

গোড়াতে সেই যে চাষি ভাইয়ের কথা বলেছিলাম। তিনিই বলছিলেন— একটা মজার ব্যাপার দেখেছেন? মজার ব্যাপার? আমি অবাক হলাম— চারিদিকে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ এবং অত্যাচারের মধ্যে মজার ব্যাপারটা কি? তিনি বলছিলেন— সিন্ধু থেকে আনা একদল সেনা রাস্তার ধারে বসে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করছে। তারা এ হত্যাকাণ্ডে নিজেদের হাত রক্তাক্ত করতে চায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে যেতে চায়। আর কেউ বা বসে বসে কাঁদে। এরা যুদ্ধ করতে চায় না, মরতে চায় না। পাকিস্তানি শাসকচক্র সিন্ধুর শোষিত জনগণকে লেলিয়ে দিয়েছে শোষিত বাঙালিদের বিরুদ্ধে। মানুষ যন্ত্র নয়— মানুষ ভাবে, মানুষ চিন্তা করে, মানুষেরই শুধু বিবেক রয়েছে। তাই সিন্ধি বেলুচি এবং সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা লড়তে চায় না। একজন কমান্ডিং অফিসার তার অধীনস্থ সেনাদেরকে বাঙালিদের বাড়ি-ঘর লুট করতে বললে তারা রাজী হয়নি। উল্টো তারা কমান্ডিং অফিসারকেই হত্যা করে।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ শত্রুমুক্ত। এইসব জায়গায় মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় গ্রামবাসী প্রতিটি গ্রামকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে গড়ে তুলেছে। যে হাত কেবল লাঙল ধরতো, কিংবা কলম ধরতো, কিংবা যে হাতে একতারা শোভা পেতো— সেই হাত, সেই একই হাত আজ তুলে নিয়েছে রাইফেল।

এইসব এলাকা কয়েকদিন আগে ঘোরার সময় খান-সেনাদের অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি, শুনেছি তাদের বর্বরতার কথা, জেনেছি, মুক্তিবাহিনী ও গ্রামবাসীর সম্মিলিত ক্রমাগত যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা। তরুণ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেছি এবং বার বার অনুভব করেছি কি গভীর আমাদের দেশের মানুষের দেশপ্রেম; কি প্রচণ্ড সংগ্রামের, যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের। এবং কি কঠিন পণ নিয়েছে তারা সবকিছু উৎসর্গ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার।

এসব জায়গায় যে কদিন খান সেনারা ছিল, সে কদিন তারা গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বহু মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়েছে, ফসলের ক্ষতি করেছে, বাজার-দোকানপাট জ্বালিয়েছে, লুট করেছে, অনেকের পাকা বাড়ি ভেঙ্গে ইট

নিয়ে বাঙ্কার বানিয়েছে। খেয়াল-খুশিমতো হত্যা করেছে মানুষকে, অত্যাচার করেছে মেয়েদের ওপর।

এইসব অন্যায়-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ—পদদলিত, শোষিত মানুষ জেগে উঠেছে। তাদের চোখে এখন শত্রুহননের আকাঙ্ক্ষা। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ এখন যুদ্ধ করে যেতে চায়। একজন গ্রামবাসী আমায় বললেন : যুদ্ধ তো সবে শুরু, এখনই কি জয়ের কথা বলেন। খান সেনাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে না দেয়া পর্যন্ত জয় কিসের। আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না তাই খান সেনারা ফাঁকা মাঠে কারদানি দেখিয়েছে, এখন তো আমরা সবে অস্ত্র ধরেছি, তার শোধ তুলবো না?

গ্রামের একজন যুবক বললেন, 'অস্ত্র যখন ধরেছি তখন বেঁচে থাকতে খান সেনারা এই গ্রামে আর ঢুকতে পারবে না। চেষ্টাও তারা কম করেনি, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন মজাটা টের পেয়েছে তারা। এখন তারা মাইল সাতেক দূরে থানা গেড়েছে।'

সবখানেই এক মানসিকতা। খরচাপাতি কমিয়ে দিয়েছে সবাই। খাদ্যসামগ্রী জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্য। গ্রামের এখানে-ওখানে জঙ্গল হয়ে গেছে— আমাদের যোদ্ধাদের জন্য খুবই অনুকূল। গ্রামবাংলা, যুদ্ধ ও জীবন সব এখন একাকার হয়ে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা এমন চতুরতার সঙ্গে খানসেনাদের ঘায়েল করে চলেছে যে আমাদের কোনও প্রাণহানি হয় না বললেই চলে। তার কারণ নিজেদের পরিচিত দেশে যুদ্ধ করে চলেছে মুক্তিসেনারা। সহজে তারা দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মানুষের শত্রু খানসেনারা তা পারে না। কাউকেই তারা বিশ্বাস করতে পারে না, দেশের মাটি ও পরিবেশ তাদের অনুকূলে নয়। কারণ এদেশ তাদের নয়, এদেশকে তারা জানে না, এদেশের মানুষকে চেনে না, জানে না। তারা কেউ এদেশের নয়। তারা যে জোর করে এদেশে থাকতে চাইছে সেটি নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই তারা এদেশে থাকতে পারবে না, এদেশ থেকে তাদের চলে যেতে হবে, এদেশের মানুষই তাদের তাড়িয়ে দেবে। মাটির সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে যারা শত্রুতা করে তাদের এরকমই পরিণতি হয়ে থাকে।

যুদ্ধ কিভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা দু-পাঁচজন মুক্তিসেনার সঙ্গে আলাপ করলেই জানা যায়। যারা আহত হয় তাদের কারুর হাতে বা পায়ে, কিংবা কাঁধে বা শরীরের অন্য কোথাও হয়তো গুলি লাগে। এগুলো যেন কাউকে বলার মতো কোনও ব্যাপার নয়। নিতান্ত জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায় : গুলি? তা লেগেছিল গোটা দুই— হাতে কিংবা পায়ে বা অন্য কোথাও। বেশ কিছু ছেলে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছে তা বিশেষ কোনও ব্যাপার নয়, জীবনে আর পাঁচটা ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটে, ঘটেছে; এও তেমনি। সেজন্যে এসব ব্যাপারে কোনও মুক্তিসেনার ভ্রূক্ষেপও নেই। তাদের সবার সামনে একটি মাত্র লক্ষ্য— শত্রু ধ্বংস করা।

দুটি তরুণের কথা শুনলাম। কয়েকবার যুদ্ধ করেছে এমন একটি ছেলের নাম খোকন। স্কুলের ছাত্র। হালকা গড়ন। লাজুক লাজুক ভাব। সবার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতো। যুদ্ধ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোনও সুযোগ এলেই সে

লাফিয়ে উঠতো তার সঙ্গে শেষবারের মতো যখন আমার দেখা হয় তখন সে বারবার আমাকে বলেছিল, 'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শত্রু খতম করে এদেশের শোষিত মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দেয়া। কেউ যেন আর কোনও দিন আমাদের বঞ্চিত পদদলিত করতে না পারে সে জন্যই আমরা জীবন দিচ্ছি।' পাক-সেনাদের দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল খোকন। একটি সজিনা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গুলি চালাচ্ছিল সে। তার শেষ চেষ্টা ছিল সঙ্গীদের বাঁচানো। কয়েকজন খান-সেনাকে খতম করার পর একটি গুলি সজিনা গাছ ভেদ করে তার শরীর বিদ্ধ করে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার উত্তর ছিল একজন খান-সেনার উদ্দেশ্যে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয়া। তাতেই খানরা তাদের বহু সঙ্গীকে হারিয়ে পালিয়ে যায়।

কাছাকাছি এক শিবিরে দেখা হয় হাবলুর সঙ্গে। তার বুকে পাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে। বাঁ হাতেও লাগে কয়েকটি গুলি, বাঁ পা-ও রেহাই পায়নি। ডান হাত ছাড়া হাবলুর কোনও অঙ্গই আর চালু ছিল না। বুক ও পেটের সামনের চামড়া মাংস সমেত উড়ে চলে যায়, হাত-পা অচল। তবু হাবলু যুদ্ধ চালিয়ে গেছে এক হাতে, ছুঁড়েছে গ্রেনেড। যে খানসেনাটি তাকে গুলি করেছিল তাকে হাবলু শেষ করেছে এক গ্রেনেডেই। সামনে যে কয়টি পড়েছিল তাদের কাউকেই ছাড়েনি সে। তারপর বুকে হেঁটে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে নিরাপদ জায়গায় চলে আসে। হাবলুর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো অচল হয়ে গেছে।

হাবলু বললো, 'আমরা এখন খানদের একেবারে কাছে না পেলে আর গুলি ছুঁড়ি না। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে, আমরা হিসেব করে গুলি খরচ করি। ওরা বেহিসাবীর মতো মরে, মরে অন্যায়ের ধ্বজাধারী হয়ে। আমরা মরি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রতিটি প্রাণ আমাদের অমূল্য, একটি একটি মৃত্যু একটি একটি অবদান।'

এরকম বহু খোকন ও বাবলুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা সবাই প্রাণ দিচ্ছে, দেবে। তারা বারবার বলেছে, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা শোষণের শেষ ঘাঁটিটি পর্যন্ত ধ্বংস করতে চাই। কড়াই থেকে আগুনে পড়তে চাই না আমরা। দশ লক্ষ নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। মরছে প্রতিদিন হাজার হাজার। রক্ত দিচ্ছে মুক্তিসেনারা, দেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর বিরাম নেই। কিন্তু তার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ যেন মুছে যায়, শোষক যেন ধ্বংস হয়। শোষক যেন না গজায়, গরম কড়াই থেকে আমরা যেন আগুনে না পড়ি। তাহলেই, কেবল তাহলেই আমাদের জীবন বিসর্জন, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের যুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সার্থক হবে।

('জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

**৩ নভেম্বর, ১৯৭১**

...'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' প্রবাদটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য পিন্ডি অধিকর্তাদের বেলায়। কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, ৯০ লক্ষ লোককে দেশত্যাগী, আরো অসংখ্য গৃহ ভস্মীভূত এবং লুণ্ঠন করে হঠাৎ টনক নড়েছে। আজ ইয়াহিয়ার বাদশাহী সিংহাসন টলোমলো, জল্লাদবাহিনীর আর্তনাদে মুখর সমস্ত পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস। যারা

এসেছিল এদেশকে পদানত করতে, শৃংখল পরাতে, ধনসম্পদ লুট করতে আজ মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে হত্যাকারী হয়ে উঠেছে হতোদ্যম, গতপ্রাণ। জল্লাদবাহিনীর মনেও আজ ভয়, সন্ত্রাস দানা বেঁধে উঠেছে। মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে তিনবার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে।

এখন উপায়? উপায় খুঁজে বের করেছে বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণিত নায়ক, বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো বিবৃতি, সব অসত্যের ভাণ্ডার রেডিও পাকিস্তান থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচারিত হলো সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন, যারা ঘর ছেড়েছে অত্যাচারের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে, গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য, একটু আশ্রয়, একটু নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে। দরবিগলিত কণ্ঠে পরম বন্ধুর মতো আহ্বান এল— 'আয়, ওরে আয়, ঘর ছেড়ে যারা গেছিস তারা আয়। তোদের সব আছে, তোদের সব দেবো।' কিন্তু বাংলার মানুষ দুর্জনের আশ্বাসে ভুলল না। কেননা তারা জানে, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। একবার তারা আঘাত পেয়েছে, বহু কষ্টে বুকের পাথর চাপা দিয়ে ভুলে আছে মা-বোন-ভাই-আত্মীয়স্বজনের হত্যার কাহিনী। তারা চায় না আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

ইয়াহিয়ার তাঁবেদাররা বলল, 'সংবর্ধনা শিবিরগুলি ফেরত-উদ্বাস্তুদের দ্বারা ভরে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, 'সংবর্ধনা সভায় একটি লোকও দেখলাম না।' দুর্জনদের মিথ্যা উক্তির প্রমাণটি লক্ষ করুন।

যারা মানুষকে ঘরছাড়া করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, বাঙালিকে হত্যা করে সংখ্যাসমতা আনতে চাইছে— তাদের কোনও আশ্বাস কি সংগ্রামী মানুষ সুস্থ মানুষের উক্তি বলে গ্রহণ করতে পারে?......শুধু এই নয়, আরো আছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের দিন ও তারিখ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই, 'নিজের মুরগি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে কাটব'। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার, ভাগ্য, ধ্যান-ধারণা অতো সস্তা বা মূল্যহীন নয়। ইয়াহিয়া খান অনুভব করেছে এতদিনে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সদস্যদের দেশদ্রোহী বলে ফরমান জারি করা হলো। আবার সেই ব্যক্তি যে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, সে দলেরই নির্বাচিত কতিপয় সদস্যকে আবার বৈধ বলে মেনে নিলো। প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিলো। বাতিলকৃত সদস্যপদে আবার নির্বাচন হবে। এ যেন ছেলের হাতে মোয়া। সামরিক শক্তির বলে গণমানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা যেন ছেলেখেলা ব্যাপার।

শুধু তাই না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিনিধি নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাদেরই অনেকে আজ নির্বাচিত হলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, খেলা আর বলে কাকে? মনগড়া হিসেবে বিশ্বকে ভাঁওতা দেয়ার যে পথ বেছে নিয়েছিল ইয়াহিয়া খান, আজ তা নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বাংলার মানুষ আজ তার জবাব দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বারবার।...

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

এসেছিল এদেশকে পদানত করতে, শৃংখল পরাতে, ধনসম্পদ লুট করতে আজ মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে হত্যাকারী হয়ে উঠেছে হতোদ্যম, গতপ্রাণ। জল্লাদবাহিনীর মনেও আজ ভয়, সন্ত্রাস দানা বেঁধে উঠেছে। মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে তিনবার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে।

এখন উপায়? উপায় খুঁজে বের করেছে বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণিত নায়ক, বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো বিবৃতি, সব অসত্যের ভাণ্ডার রেডিও পাকিস্তান থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচারিত হলো সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন, যারা ঘর ছেড়েছে অত্যাচারের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে, গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য, একটু আশ্রয়, একটু নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে। দরবিগলিত কণ্ঠে পরম বন্ধুর মতো আহ্বান এল— 'আয়, ওরে আয়, ঘর ছেড়ে যারা গেছিস তারা আয়। তোদের সব আছে, তোদের সব দেবো।' কিন্তু বাংলার মানুষ দুর্জনের আশ্বাসে ভুলল না। কেননা তারা জানে, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। একবার তারা আঘাত পেয়েছে, বহু কষ্টে বুকের পাথর চাপা দিয়ে ভুলে আছে মা-বোন-ভাই-আত্মীয়স্বজনের হত্যার কাহিনী। তারা চায় না আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

ইয়াহিয়ার তাঁবেদাররা বলল, 'সংবর্ধনা শিবিরগুলি ফেরত-উদ্বাস্তুদের দ্বারা ভরে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, 'সংবর্ধনা সভায় একটি লোকও দেখলাম না।' দুর্জনদের মিথ্যা উক্তির প্রমাণটি লক্ষ করুন।

যারা মানুষকে ঘরছাড়া করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, বাঙালিকে হত্যা করে সংখ্যাসমতা আনতে চাইছে— তাদের কোনও আশ্বাস কি সংগ্রামী মানুষ সুস্থ মানুষের উক্তি বলে গ্রহণ করতে পারে?......শুধু এই নয়, আরো আছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের দিন ও তারিখ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই, 'নিজের মুরগি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে কাটব'। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার, ভাগ্য, ধ্যান-ধারণা অতো সস্তা বা মূল্যহীন নয়। ইয়াহিয়া খান অনুভব করেছে এতদিনে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সদস্যদের দেশদ্রোহী বলে ফরমান জারি করা হলো। আবার সেই ব্যক্তি যে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, সে দলেরই নির্বাচিত কতিপয় সদস্যকে আবার বৈধ বলে মেনে নিলো। প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিলো। বাতিলকৃত সদস্যপদে আবার নির্বাচন হবে। এ যেন ছেলের হাতে মোয়া। সামরিক শক্তির বলে গণমানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা যেন ছেলেখেলা ব্যাপার।

শুধু তাই না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিনিধি নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাদেরই অনেকে আজ নির্বাচিত হলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, খেলা আর বলে কাকে? মনগড়া হিসেবে বিশ্বকে ভাঁওতা দেয়ার যে পথ বেছে নিয়েছিল ইয়াহিয়া খান, আজ তা নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বাংলার মানুষ আজ তার জবাব দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বারবার।...

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

৭ নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ বাহিনীর মৃত অফিসারদের জন্য কাঠের বাক্স তৈরি করা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে ব্যাপক হারে। বেচারা কাঠমিস্ত্রীর শান্তি বা স্বস্তি নেই। দিন-রাত তার কাজ—বাক্স বানাও। মরা লাশগুলোকে জলদি পাঠাও নিজের দেশের মাটিতে। কারণ? কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, বাংলার মানুষ যেন বুঝতে না পারে যে বর্বরবাহিনীর অফিসারগুলো একে একে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বাংলার মাটিতে ওদের ঠাঁই নেই। কেন না ওরা বাংলার নয়। বাংলার মাটির এতটুকু দরদ নেই ওদের জন্য। বাংলা শুধু বাংলাদেশের জনগণের। এখানের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি সব এদেশেরই। এ সবই বেড়ে উঠেছে সবুজ কোমল লতার মতো বাংলার মাটি থেকে। তাই এ মাটিতে কি ঠাঁই পেতে পারে যারা বাঙালি বিদ্বেষী, যারা বাংলার পয়লা নম্বরের দুশমন? কখনোই না।

হিংস্র পশুদের খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বাংলার শ্যামল প্রান্তর আর জনপদে। লোভী, বিবেকহীন পশুর দল দিকদিশাহীনভাবে চালিয়েছে অত্যাচার, হনন আর সন্ত্রাসের রাজত্ব।

কিন্তু তারপর? কূল আর রক্ষা হয় না। চারিদিক থেকে আঘাত হানছে বাংলার মানুষ। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে জলে-স্থলে, যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের খতম করছে। এখন শয়তানদের পথ চলতে ভয়, ঘরের মধ্যেও নেই স্বস্তির আশ্রয়।

এ জন্যেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রাইফেল দেখিয়ে টেনে নিয়ে আসছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে। তাদের আড়ালে এগিয়ে আসছে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখে। কিন্তু এতেও কূল রক্ষা হচ্ছে না। তীক্ষ্ণধী, সদাজাগ্রত বাংলার প্রহরী মুক্তিবাহিনী তাদের কৌশল ধরে ফেলেছে। পাল্টা এমন আঘাত হানছে যে দস্যুর দল 'পড়ি কি মরি' করে পালাতে দিশা পাচ্ছে না।

ভীতসন্ত্রস্ত জল্লাদবাহিনী শহরের চারপাশে নদীর ধারে গড়েছে বাঙ্কার, বসিয়েছে মেশিনগান। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গা মিশিয়ে এসে মুক্তিবাহিনী আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর, তাই কোনও কিছুতেই বিশ্বাস নেই। নদী দিয়ে পানা ভেসে যাবে ওদের সামনে দিয়ে? যদি মুক্তিবাহিনী হয়? মেশিনগানের একটানা গুলি চলে পানার উপর।

রাতের অন্ধকারে শিয়াল-কুকুরেরও ওদের সীমানা দিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। হত্যাকারীদের ধারণা, মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে—অতএব দৃশ্যগোচর কোনও কিছুকেই ক্ষমা নেই।

রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর গুলির শব্দ পেলে সে পথে তারা হাঁটে না। প্রথমে তাদের পরম ভৃত্য রাজাকারদের পাঠিয়ে খোঁজখবর নেয়, পরে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে সেখানে যায়।

একবার রাতের বেলায় গেরিলারা একজন পাক দালালের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করে। দালালের এক শুভানুধ্যায়ী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় পার্শ্ববর্তী জল্লাদবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে। খবর দেয়, 'হুজুর, অমুককে মুক্তিবাহিনী এসে মেরে ফেলল। এখনো ওরা

আছে, রাজাকারদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।' কাপুরুষ পশুপ্রবর, খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'হাম কিয়া করেগা। মুক্তিফৌজ আয়া হ্যায়, তুম লোগ যা কর হঠা দো। আভি হাম নেহি যায়েগা, সুবাহ মে যায়েগা।' নিরাশ হয়ে ফিরে এল দালালের সাগরেদ।

এখন ফল হয়েছে অন্য রকম। এখন বরং পশুগুলো এলে এইসব ঘা খাওয়া মানুষগুলোই এসে খবর দেয়, 'ওরা এসেছে'। তাদের সংখ্যা এবং শক্তি সমস্তই পুংখানুপুংখরূপে জানিয়ে দেয় মুক্তিবাহিনীকে।

যারা নেহাৎই প্রাণের দায়ে শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছিল বা রাজাকারে নাম লিখিয়েছিল, আজ তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, মুক্তবাহিনীর প্রচণ্ড মারের সামনে টিকতে না পেরে দলে দলে রাজাকার আত্মসমর্পণ করছে। জঙ্গীশাহীর জঘন্যতার রূপটাও ফাঁস করে দিচ্ছে।

আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে ভাড়াটে সৈন্যের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৈনিক। আমাদের গেরিলারা আজ তাই হয়ে উঠেছে অজেয়, দুর্বার।

আর পক্ষান্তরে জল্লাদ বাহিনীর সাম্রাজ্য-বাসনা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দুঃসাহসী গেরিলাদের এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে খতমকৃত জালেম বাহিনীর অফিসারদের জন্য আর কতো কাঠের বাক্স লাগবে, তার খতিয়ান কি করেছে ইয়াহিয়া খান?

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যাদের চক্ষু আছে এবং চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন, আজ তাঁদেরকে একবার বাংলাদেশের রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করবো। একবার চোখ খুলে দেখুন আমাদের সংগ্রামী বীর যোদ্ধা বাঙালি যুবকগণ কিভাবে পশ্চিম পাকের হানাদার পশুদের খতম করে ক্রমাগত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছেন। বাংলাদেশের চূড়ান্ত দুর্দিনে পশু পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকগণ আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বিক্রম, ধৈর্য এবং দেশপ্রেমিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কচ্ছেন, বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নিদর্শন একান্ত বিরল। একবার চেয়ে দেখুন যশোর রণাঙ্গনের দিকে— আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাত সামলাতে অপারগ হয়ে কিভাবে খানসেনারা পশ্চাদপসরণ করছে। খুলনায় একটি জাহাজ ডুবিয়ে আমাদের সেনারা চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সিলেট, চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া সর্বত্রই আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতি এবং পাকসেনাদের পরাজয় অব্যাহত রয়েছে। ঢাকায় বেসামাল হয়ে সামরিক চক্র বারবার সান্ধ্য আইন জারি করে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করছে। কিন্তু তাই বলে বাঙালির মনোবল হ্রাস পায়নি। আমাদের বীর সেনাদের অগ্রগতি দেখুন এবং জেনে রাখুন, ইন্শাআল্লাহ্ সময় আর খুব দূরে নেই যখন ঢাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা গৌরবের সঙ্গেই উত্তোলিত হবে।

সে কারণেই বলছিলাম, যাঁদের চক্ষু আছে এবং চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন আজ তাঁরা চোখ খুলে একবার দেখুন— শ্রবণশক্তি যদি বধির না হয়ে থাকে তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই বিজয়বার্তাগুলো শুনুন। কথাগুলো এই জন্য বলছি যে বাংলাদেশে এখনো কিছুসংখ্যক বাঙালি আছেন যারা চোখ থেকেও অন্ধ এবং শ্রবণশক্তি থেকেও বধির। ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে এই জাতীয় কিছু অন্ধ ও বধির বাঙালি এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য দেদার চীৎকার করে যাচ্ছেন। এসব বাতুলদের তখনই জ্ঞানোদয় হবে যখন মুক্তিবাহিনীর সঙ্গীন তাদের গর্দানকে স্পর্শ করবে। যে প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য এখনো কিছুসংখ্যক জন্মদালাল বাঙালি গলদঘর্ম হচ্ছেন তাদের বোঝা উচিত যে আজ ঐসব প্রভুদের কি অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। বেলুচিস্তানে বেলুচরা এবং সীমান্ত প্রদেশে পাঠানরা এবার অস্ত্রধারণ করেছে। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রে বালকোচিত চাপল্যই যাঁর বৈশিষ্ট্য সেই জুলফিকার আলী ভুট্টোর খোদ জন্মভূমি সিন্ধুও আজ বিক্ষুব্ধ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া চক্রের পালাবার স্থানটি পর্যন্ত থাকবে না। এই দুই জানোয়ারের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথাই আমরা এখন ভাবছি।

জানি, বহু দুঃখ এবং বেদনা, বহু নির্যাতন এবং নিপীড়ন, বহু রক্তক্ষয় এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের দিন কেটেছে এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। জানি, আমরা যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে দুদিন পর বিজয়ীর বেশে নতুন করে যাত্রা শুরু করবো, তাদের অনেকেই প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। যে জীবন আমরা হারিয়েছি, যে সম্মান এবং ইজ্জত আমরা পশুদের হাতে বিসর্জন দিয়েছি, যে সম্পদ আমাদের লুণ্ঠিত হয়েছে, জানি, সেসব আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবক্ষয়, এই অপরিসীম ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা একটি জাতিকে, একটি দেশকে বিশ্বের ইতিহাসে নবজন্ম দান করতে চলেছি— এই মহান গৌরব একান্তভাবেই আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান বংশধরদের। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য হয়নি। সেদিক থেকে আমরা অনেক ভাগ্যবান। দুঃখ আমাদের অনেক হয়েছে, রক্ত এবং জীবন আমাদের প্রচুর দিতে হয়েছে সত্য কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এই মৃত্যু, এই রক্তদান, এই আত্মত্যাগ সবকিছুর মধ্যেই একটি বিরাট মাহাত্ম্য আছে। সেই মাহাত্ম্যই আমাদের মহীয়ান করে তুলেছে। তার জোরেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে বলতে পারবে যে আমরা আজ দেশের কারণে মরতে শিখেছিলাম বলেই তারা মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। আমাদের আত্মত্যাগ ও মৃত্যুর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সত্যিকার মানুষের মতো বাঁচবার একটি স্থান, একটি পথ আমরা আজ তৈরি করে যাচ্ছি। যে মহৎ কারণের জন্য জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে, অনেক অভাব ও দীনতাকে হাসিমুখে বরণ করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের সকল ছোবলকে দুপায়ে দলিত মথিত করে আজ বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তার মূল্য মানুষের ভাষায় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই মহান কারণ ও সংগ্রামের উজ্জ্বলতম আদর্শ শুধু বাংলাদেশের নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বের সমাজ গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা যে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এই একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়েছি, তা কম গৌরবের কথা নয়।...

এটা অত্যন্ত আশার কথা যে বিশ্ববিবেকের ক্ষেত্রে আজ আশানুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ আজ উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে। অবশ্য বাংলাদেশে মানবতার যে অপমান সংঘটিত হয়েছে, মানবতার ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। আর এই লাঞ্ছিত মানবতাকে রক্ষার জন্য সভ্যতাগর্বী উন্নত দেশগুলো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন, আমরা গোড়া থেকেই এমন আশা করেছিলাম। সে আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়েছে একথা আমরা বলতে পারবো না। গণতন্ত্রের আদর্শকে সমগ্র বিশ্বে যাঁরা সমুন্নত রেখেছেন বলে গর্ব করেন, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ভূমিকা আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে।

বিশ্বের জনগণ আমাদের সাথে আছেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন। এ ছাড়া বিশ্বের সর্বত্রই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম মোটামুটি একটি সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে। আমরা আশা করবো, আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বিশ্ববিবেক আমাদের সপক্ষে আরো জাগ্রত হবে। আমরা একথা জানি, স্বাধীনতা কোনোদিন শুধুমাত্র অপরের সাহায্যে আসে না— সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হয়। আমরা তাই আজ দিকে দিকে সংগ্রামের এমন দুষ্কর যাত্রাপথকে বেছে নিয়েছি। আর এই সংগ্রামই আমাদেরকে বিজয়ের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর জয়পতাকার ছায়া আজ বাংলার সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চলে সবুজ ঘাসের ওপর বিপুল এক শুভাবহ মায়ার প্রলেপের মতো বিস্তারিত হচ্ছে। সেদিন আর অধিক দূরে নয়, যখন এই বিজয়কেতনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা জাগ্রত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কবি নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গভীর প্রত্যয়ে জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকে প্রণতি জানাবো :

নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম
চির মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর।

(ড. মযহারুল ইসলাম রচিত)

# সংবাদ পর্যালোচনা[*]

**২১ জুলাই, ১৯৭১**

একটি ছোট্ট খবর। পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী শীগ্‌গীরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করবে। কখন, কোথায়, কিভাবে এ বিচার প্রহসন জমে উঠবে, খবরে তার বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশিত খবরে এটুকু স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকার স্বাধীন বাংলার জনক শেখ মুজিবের বিচারের আয়োজন করছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

ভ্রান্তি বিলাসের কি বিচিত্র পুনরাবৃত্তি! সত্যকে, ন্যায়কে, বিবেককে টুঁটি টিপে হত্যা করে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকবার কি দুঃসাহসিক প্রয়াস।! কি সীমাহীন স্পর্ধা! এ তো নতুন কিছু নয়। বিচারের নামে প্রহসনের জালিয়াতি মঞ্চ সাজিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার এমনি এক স্পর্ধিত অপচেষ্টা ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। উনিশ শ' ছেষট্টি সালে বীরপ্রসবিনী বাংলার অগ্নিসন্তান শেখ মুজিব যেদিন ছয়দফা দাবী পেশ করেন, সেদিনই ত্রাসে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল পশ্চিমা শাসককূলের তখতে তাউস। আর তাই সেদিনের গণবিরোধী শাসক সামরিক জান্তার মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি। উদ্ধত রাজরোষ জেল-জুলুম আর বক্ষভেদী বুলেট হয়ে নেমে এসেছিল আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের উপর— স্বাধীনচেতা বাঙালি জাতির উপর। কিন্তু তাতেও যখন ফল হয়নি, যখন বাংলার গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে আইয়ুবের রণহুঙ্কার বিধবার অসহায় আর্তনাদের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আইয়ুবশাহী শেষ রক্ষার জন্য সাজিয়েছিল মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। উদ্দেশ্য ছিল, ভাড়াটিয়া জজ, উকিল আর সাক্ষীসাবুদের সযত্নসৃষ্ট ষড়যন্ত্রের জালে বেঁধে শেখ মুজিবকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। কুর্মিটোলার সেনানিবাসে দিনের পর দিন সেই সাজানো-গুছানো মামলার বিচার প্রহসন চলেছে। ভাড়াটিয়া সাক্ষীদের মিথ্যা জবানীর রেকর্ডপত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে— গোটা সরকার তার সর্বশক্তি দিয়ে শেখ সাহেবকে আটকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সকলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাংলার মানুষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মনে করেছে তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে, সমগ্র বাংলার বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। আর তাই সর্বশক্তি নিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। শেখ মুজিবের পিছনে কাতারবন্দি বাংলার মানুষের সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের স্রোতের মুখে খুলে গেছে জেলের তালা, খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে ক্ষমতাদর্পী শাসকের মসনদ আর আইয়ুব-মোনেম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

---

* 'সংবাদ পর্যালোচনা' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি আমির হোসেন রচিত।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। বাঙালির আশা-আকাংক্ষার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি, বঞ্চিত বাংলার বিবেকের কণ্ঠস্বর শেখ মুজিবুর রহমান জেল-জুলুম আর ত্যাগ-তিতিক্ষার দুঃসহ আগুনে পুড়ে হয়েছেন আরও খাঁটি সোনা। হয়েছেন বঙ্গবন্ধু— বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। বিগত সাধারণ নির্বাচনে নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবে বাংলার মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে— শেখ মুজিব বাংলার, বাংলা শেখ মুজিবের। তারা আরও দেখিয়ে দিয়েছে— শেখ মুজিব শুধু বাংলার নন, সারা পাকিস্তানেরই সংখ্যাগুরু দলের নেতা। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত হতবাক করে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে এক নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সবচাইতে বড় কথা, শেখ মুজিবেরই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তারই নির্দেশে বাংলার মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। এই নরপশুর দল ছারখার করে দিয়েছে অগণিত সোনার সংসার— চিরতরে নিভিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ ঘরের প্রদীপ। কিন্তু বুলেট শুধু রক্তই ঝরাতে পারে— মানুষের হৃদয়ে অমোঘ বাণীকে, তার আত্মার আন্তরিক আকাঙক্ষাকে পিষে মারতে পারে না। ওরাও পারেনি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের যে অনির্বাণ প্রদীপশিখা শেখ মুজিব জ্বেলেছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তরে, হানাদার সেনা-দস্যুদের হিংস্র থাবা তা নিভিয়ে দিতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তো আজ বাংলার দশদিগন্তে চলেছে শত্রুহননের মহোৎসব। দিন যায়, রাত যায়, আর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে জল্লাদ বাহিনীর মৃত্যুঘণ্টার শব্দ। ওরা দেখতে পাচ্ছে ওদের পরাজয় আসন্ন। ওরা বুঝতে পারছে সোনার বাংলার বুকটিকে চিরে চিরে খাবার দিন শেষ— এবার বিদায়ের পালা। তাই মুমূর্ষু শয়তানের মরণার্তির মতোই ইয়াহিয়ার মুখে অশ্রাব্য প্রলাপধ্বনি। তাইতো আইয়ুবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শোচনীয় পরিণতির স্মৃতি মিলিয়ে যাবার আগেই তার জারজ সন্তান আজ ব্যতিব্যস্ত শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নতুন মামলা সাজাবার আয়োজনে।

কিন্তু কিসের মামলা? কিসের বিচার? কে করবে কার বিচার? নরঘাতক ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ক্ষমতাদর্পী সেই উন্মাদ জেনারেল রঙীন পানীয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আজ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে যে, শেখ মুজিব আজ আর ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের নাগরিক নন। পাঁচ কোটি নাগরিকের দেশ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শক্তির উৎস বন্দুকের নল। আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের শক্তির উৎস তার দেশবাসীর শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সংগ্রামী চেতনা।...

**২৮ জুলাই, ১৯৭১**

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় অফিস-আদালত ও দোকান-পাটের নামফলক বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ও

উর্দুতে লেখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে অমুসলিম গন্ধ রয়েছে সেগুলোও পাল্টিয়ে নয়া নামকরণের অভিযান শুরু হয়েছে।

খবরটিতে নতুনত্ব না থাকলেও কৌতুকের খোরাক আছে। কারণ, ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটা পেছনদিকে ঘোরে না জেনেও কসাই ইয়াহিয়া ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটাকে পশ্চাদমুখী করার হাস্যকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলার পরিবর্তে উর্দু এবং ইংরেজিতে নামফলক লেখা আর বিশেষ বিশেষ স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নয়া মুসলমানী নামকরণের নির্দেশে ওদের দুরভিসন্ধিটাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমরা এতে বিস্মিত হইনি। বিক্ষুব্ধ হলেও আমরা এতে মোটেই বিচলিত হইনি। কারণ, ওদের এই অপচেষ্টা নতুন কিছু নয়। চব্বিশ বছর আগে যেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশ ছেড়ে যায়— সেদিনই পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী চক্র মেতে ওঠে বাংলার বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ ছিল বাঙালি জাতিকে চিরদিন পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখা। আর এই ঔপনিবেশিক লক্ষ্য হাছিলের স্বার্থে পশ্চিমা শাসককূল বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক হিস্যা, তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আর স্বকীয় সত্তার ওপর হামলা করেছে বার বার। বাঙ্গালিদের নিজস্ব পরিচয়, তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে মুছে ফেলবার জন্য চক্রান্ত চলেছে সুপরিকল্পিতভাবে। চেষ্ট চলেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখবার।...

বাংলার মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতিকে পঙ্গু করার যে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলে এসেছে চব্বিশ বছর ধরে, পরাধীন বাংলার শেষ সুবেদার মোনেম খানের আমলের একটি ঘটনায় তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। দুরন্ত প্রতাপশালী গভর্নর মোনেম খান একদিন লাটভবনের দরবার কক্ষে ডেকে পাঠালেন ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের। এ এত্তেলা পেয়ে হাজির হলেন সকলে। তাদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল হাশিম, কবি জসীমুদ্দীন এবং অন্যান্য। হুকুম করলেন গভর্নর : 'কি লেখাপড়া করেছেন আপনারা? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?' জবাব দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। বললেন : 'না, পারি না। আমরা কি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখবো? আমরা লিখলে তো তা হবে হাই সঙ্গীত, জসীম সঙ্গীত... ।' লজ্জায় অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন গভর্নর। জারি করলেন দ্বিতীয় নির্দেশ— বাংলা ভাষাকে ইসলামী রূপ দিতে হবে। এবার জবাব দিলেন অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা রাজনীতিক— মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিল বাংলার ছাত্র-তরুণের দল— 'না। তোমার কথা মানি না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।" বিদ্রোহী বাঙালির সেই কণ্ঠস্বর নূরুল আমিনের বুলেটও স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের দল বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃতি আদায় করে এনেছেন। রক্তের অক্ষরে লিখিত হয়েছে বাংলাভাষা আর বাঙালির বিজয় গাথা।

কিন্তু পশ্চিমা শাসকের দল কোনোদিন এই সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংলা আর বাঙালি কথা দুটি ওদের অনুভূতিতে প্রতিনিয়ত ছড়িয়েছে বৃশ্চিক

দংশনের জ্বালা। তাই অবিরাম হামলা চলেছে বাঙালি জাতির উপর— বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতির ওপর। ওরা আরবি হরফে বাংলা ভাষা লিখতে চেয়েছে, হাওয়াই হামলা করেছে, ভাষাটাকে মুসলমানী চেহারা দেবার জন্য তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিয়েছে। 'কৃষ্টি-সংস্কৃতি'কে করা হয়েছে 'তাহজিব-তমদ্দুন' (তাহজিব তামাকদুন)। নজরুলের কবিতায় 'শ্মশান' কেটে করা হয়েছে 'গোরস্থান'। কায়কোবাদের লেখা 'মহাশ্মশান' বইখানির নাম পালটিয়ে রাখা হয়েছে 'মহা-গোরস্থান'।

কিন্তু কি লাভ? মি. জিন্নাহ থেকে মোনেম খাঁ যা পারেনি— ইয়াহিয়া-টিক্কাও তা পারবে না। ইতিহাসের গতি পশ্চাদমুখী নয়, ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখের ভাষা আর তাদের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও কেউ জোর করে হত্যা করতে পারবে না।

### ৩০ জুলাই, ১৯৭১

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে জানা যায় যে, এবার পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। অপরাধ? সেখানকার মানুষ শত্রুকবলিত ঢাকা বেতারের কোনও অনুষ্ঠান শোনে না— তারা শোনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী ও ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান।

খবরটি ছোট্ট হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, অধিকৃত এলাকার জনগণকে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশ্বজনমত সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার জন্যই জঙ্গীশাহী রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। আর এই প্রচেষ্টা থেকে বাংলাদেশে হানাদারদের নাজেহাল অবস্থারই স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

যুদ্ধের সবচাইতে বড় বলি হচ্ছে সত্য। মারণাস্ত্র মানুষের জানমালের মতো সত্যকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জঙ্গীশাহীও তাই করেছে। প্রকৃত ঘটনা যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাতে প্রকৃত ঘটনার কোনও বিবরণ থাকে না, নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ মতামত প্রকাশের কোনও সুযোগ সেখানে নেই। প্রতিটি শব্দ ছাপা হবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। সব কাগজে একই খবর ও মন্তব্যের কার্বন কপি ছাপা হয়। ফলে সংবাদপত্র নামে যে কাগজগুলি অধিকৃত এলাকায় প্রকাশিত হয়, তা বস্তুত সংবাদপত্র নয়— জঙ্গীশাহীর প্রচার বুলেটিন মাত্র। তাই সেগুলো কেউ কেনে না, পড়ে না। জালেমশাহীর দফতর ওগুলো বিনামূল্যে বিলি করে।

এইতো গেল সংবাদপত্রের কথা। এরপর থাকে রেডিও। এবং সেটাই আজকের দিনের সবচাইতে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। ঢাকা বেতারকেন্দ্র এখন শত্রুবাহিনীর দখলে। শত্রুকবলিত এই বেতারযন্ত্রটি থেকে যা প্রচারিত হয়, তা জঘন্য জালিয়াতি আর মিথ্যার বেসাতি ছাড়া কিছুই নয়। জল্লাদ বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে রক্তের গঙ্গা বয়ে

চলেছে বাংলার দিকে দিকে। ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসস্তূপ সাক্ষী হয়ে আছে ওদের পাশবিক নির্যাতনের। হানাদার-দস্যুরা নারীর ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে, দুধের শিশুকে খুন করেছে, দলে দলে মানুষকে করছে ঘরছাড়া, দেশছাড়া। অধিকৃত এলাকার মানুষ নিজের চোখে দেখেছে, দেখছে এ দৃশ্য। কিন্তু ঢাকা বেতারে শুনছে ঠিক এর উল্টো কথা। ঢাকা বেতার সুকৌশলে প্রচারণার মারপ্যাচে সত্যটাকে হত্যা করে মিথ্যার পুতুল সাজিয়ে খাড়া করছে মানুষের কাছে। তাই তারা আস্থা হারিয়েছে— বীতশ্রদ্ধ, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঢাকা বেতারের উপর। আর সেই কারণেই কেউ আজ আর ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছে না। তারা সত্য খবরের জন্য, নির্ভুল তথ্যের জন্য, বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমতের ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য শুনছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান। জঙ্গীশাহী এখবর জানে। তারা জানে যে, এসব বেতার কেন্দ্রের মারফত জনগণ হানাদারদের নির্যাতন-নিপীড়ন-গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী জেনে নিচ্ছে। জেনে নিচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় সাফল্য এবং হানাদারদের ক্রমাগত বিপর্যয়ের বৃত্তান্ত। ফলে ওদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ে যাচ্ছে ওদের মিথ্যাবাজি আর জালিয়াতির বেসাতি। তাই শংকিত, বিব্রত হয়ে উঠেছে জঙ্গীশাহী ওরা জানে, লোকের হাতে যদি রেডিও থাকে, ঢাকা বেতারের জাল-জুয়াচুরি অনুষ্ঠান তারা শুনবে না— শুনবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও বিদেশী বেতারের অনুষ্ঠান। তাই আক্রোশে ক্রোধে দিশেহারা হয়ে জল্লাদরা এখন কেড়ে নিতে শুরু করেছে সকল রেডিও। উদ্দেশ্য— মিথ্যে যদি না শুনতে চাও, সত্য কথাও শুনতে দেবো না।...

**১ আগস্ট, ১৯৭১**

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার জন্য চাষিদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে যে, ফসলের এক-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে জরিমানা হিসাবে এবং বাকী দুই-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ।

বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার চাষিদের শায়েস্তা করা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য আছে এই নির্দেশের পিছনে। বাংলাদেশের যুদ্ধ পশ্চিমা শাসকদের রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছে। আর সেই শূন্য রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া জারি করেছে এই তোগলকি নির্দেশ।

একথা আজ সকলেরই জানা যে, বাংলাদেশে যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভারের চাপে পাকিস্তানি অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে পাট, চা, চামড়া সহ সমস্ত রকম রফতানী বাণিজ্য বন্ধ। কলকারখানায় উৎপাদন নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে থাকার দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে এসেছে চূড়ান্ত অচলাবস্থা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংরক্ষিত বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য বিক্রয়ের নামে হরিলুটের বাতাসার মতো দুহাতে অর্থ লুটে নেয়ার দিন শেষ। রাজস্ব আদায় বন্ধ—বাংলার মানুষ খাজনা দিচ্ছে না, ট্যাক্স দিচ্ছে না। আয়ের কোটা শূন্য কিন্তু খরচ বেড়েছে বহুগুণ।

প্রশাসনিক ব্যয় ছাড়াও জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে গণহত্যা খাতে প্রতিদিন খরচ করছে দেড় কোটি টাকা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ। পৃথিবীর দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরেছে ইয়াহিয়ার অনুচরেরা, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। তাই রাজকোষ শূন্য— নিদারুণ অর্থসংকট, পরের ধনে পোদ্দারিতে ঘটেছে মারাত্মক বিঘ্ন। বেসামরিক কর্মচারীদের তো বেতন দেয়ার প্রশ্নই নেই, কসাই বাহিনীর জোয়ানদেরও বেতন বাকী পড়েছে দীর্ঘদিনের। ফলে দিকে দিকে উঠেছে অসন্তোষের ঝড়। বেগার খাটতে রাজী নয় তারা— কাজ করছি, পয়সা চাই। বেতন বাকী রেখে যুদ্ধ করা যায় না। আর এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই টাকা চাই— প্রচুর টাকার দরকার ইয়াহিয়া খানের। টাকার দরকার বাঙালি হত্যার হাতিয়ার কিনতে, জল্লাদ ভাড়া করতে। আর সে টাকা ওরা আদায় করতে চায় বাংলাদেশেরই চাষিদের কাছ থেকে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্যই জারি হয়েছে নরঘাতক ইয়াহিয়ার নয়া নির্দেশ।...

১৭ আগস্ট, ১৯৭১

তিনটি খবর। তিনটি খবরের উৎসস্থল দূর-দূরান্তের তিনটি জায়গা— করাচী, নয়াদিল্লী, ওয়াশিংটন। অথচ খবর তিনটি একই সূত্রে গাঁথা— একই লোককে কেন্দ্র করে। আর তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

করাচী থেকে ফরাসি বার্তা প্রতিষ্ঠান এ-এফ-পি জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আদালতে তার বিচার স্থগিত হয়ে গেছে। লায়ালপুরের কাছে শেখ সাহেবের বিচার প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমি কোনও অপরাধই করিনি। তাই বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্নই উঠে না।

নয়াদিল্লীতে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তিদানের শর্তে বাংলাদেশের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতি। বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা করে সিনেটর কেনেডি বলেন, শেখ মুজিব যদি কোনও অপরাধ করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। যেভাবে গোপনে তার বিচার হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে জাতিসংঘে জঙ্গীশাহীদের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে যে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দেয়া হবে না।

আগা হিলালী আরও বলেছে যে, বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী মিলিটারি কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে না। রায়ের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাস করতে পারবে।

খবরগুলো পাশাপাশি রেখে এগুলোর তাৎপর্য লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবকে জল্লাদ বাহিনী এখনও হত্যা করেনি— করতে পারবেও না। কারণ সে শক্তি ওদের নেই। তাই বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন-মঞ্চ সাজিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে নরঘাতক ইয়াহিয়া চেষ্টা করছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে। বঙ্গবন্ধুর অমূল্য

জীবনকে বাজি রেখে সে নেমেছে বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধ বানচালের জুয়াখেলায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আবার ভুল করেছে— আবার ভ্রান্তির বালুচরে পা আটকে গেছে তার। ইয়াহিয়া স্বীকার না করলেও বিশ্ববাসী জানেন, প্রায় সাড়ে চারমাস ধরে ভয়-ভীতি, প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা চলেছে শেখ মুজিবকে বশে আনবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মাথা সে কিনতে পারেনি। আর পারেনি বলেই শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের মতো হুঙ্কার ছেড়েছে— আমি শেখ মুজিবের বিচার করবো, তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। এর পিছনে এক সুচতুর লক্ষ ছিল ইয়াহিয়া খাঁর। সে ভেবেছিল, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাকে বশে আনা যাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যাবে, আর যাবে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়েছে জল্লাদী প্রচেষ্টা। ভয় পাবার পরিবর্তে আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছেন : আমি কোনও অপরাধ করিনি। সুতরাং বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তাই বাধ্য হয়ে তাকে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবি রাখতে হয়েছে। এই বিচার আর হত্যার হুমকি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এতটুকু দমাতে পারেনি। বরং শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে দ্বিগুণতর শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুশমনের ওপর। আরও ত্রিশঙ্কু অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে হানাদার বাহিনী। আর বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে ইয়াহিয়া খানের। এইতো গতকাল সিনেটর কেনেডি বলেছেন শেখ মুজিবের একটিমাত্র অপরাধ যে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তার গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ মাত্র। বস্তুত এ কথা কেনেডির একার কথা নয়। কেনেডির কণ্ঠে বিশ্altবিবেকের দ্ব্যর্থহীন রায়ই ধ্বনিত হয়েছে। আর সে রায় ক্ষমাহীন নিয়তির মতো জানিয়ে দিয়েছে যে, অপরাধী শেখ মুজিব নয়—ইয়াহিয়া খান। যুদ্ধ শেখ মুজিব শুরু করেননি— ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা অভিযানের জবাবেই সৃষ্টি হয়েছে রক্তাক্ত সংঘর্ষের। আর তাই সমস্যার সমাধানের সর্বপ্রধান শর্ত হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি। কেনেডির এই বক্তব্যের আরেকটি তাৎপর্য আছে। কেনেডিদের বলা হয়ে থাকে মার্কিন বিবেকের কণ্ঠস্বর। আর সে কারণেই বলা যায়, কেনেডির বক্তব্য পৃথিবীর আর দশটি দেশের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরই বক্তব্য। সুতরাং দেখা যায়, যে দেশের অস্ত্র দিয়ে ইয়াহিয়া বাঙালিদের হত্যা করছে, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সেই আমেরিকার জনগণের দৃষ্টিতেও ইয়াহিয়া দোষী, শেখ মুজিব নির্দোষ। জল্লাদ ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে, বিচারের রায় যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে না। তার দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাসের ক্ষমতা থাকবে ইয়াহিয়ার। চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু এর গোপন তাৎপর্যটুকু বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইয়াহিয়া চেয়েছিল ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু ভারত-রাশিয়া শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি জল্লাদের সে খায়েশ চিরতরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন একটি মাত্র তুরুপের তাস আছে ইয়াহিয়ার হাতে। আর সে হচ্ছে শেখ মুজিবের জীবন। তাই সে চাইছে বিচার প্রহসনে বঙ্গবন্ধুর চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করে তার জীবনরক্ষার ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে নিয়ে তাই দিয়ে রাজনীতি করতে। আর ইয়াহিয়ার এই গোপন উদ্দেশ্যটি

সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে : "এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শেখ মুজিবকে দণ্ড দেওয়া হবে। তবু মনে হয় ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে না। কারণ, সে জানে বাংলাদেশের যুদ্ধে এক পাকিস্তানের আশা চিরতরে সমাধিস্থ হয়েছে। শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখলে অন্তত একটা শেষ সুযোগ পাওয়া যাবে। সে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগাভাগিটা সম্পন্ন করা।" অতঃপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

### ২২ আগস্ট, ১৯৭১

লন্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পন্থা স্থির করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ও তেহরানে গোপনে গোপনে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলেছে। এই তৎপরতার নায়ক ইরান। আর এর পেছনে নাকি সমর্থন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার। খবরটিতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারি ইতিমধ্যেই তেহরান গিয়ে পৌঁছেছেন। সেখানে ইরানের উদ্যোগে তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের গোপন সাক্ষাৎকারের আয়োজন হবে।

সুদূর ইরানে বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে পর্দার অন্তরালে কি ঘটছে স্পষ্ট করে জানবার উপায় নেই। আর সে নেপথ্য নাটকে তেহরান-চীন-রাশিয়ার ভূমিকাটাও সহজবোধ্য নয়। ডেলি টেলিগ্রাফের এই খবরটি ছাড়া এব্যাপারে আর কোনও সূত্র থেকে কোনও তথ্যও আমাদের হাতে আসেনি। তাই এক কথায় খবরটি উড়িয়ে দেয়া বা একে সত্য বলে মেনে  নেয়া কোনোটাই সহজ নয়। তবু কথা আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া বাহিনী আজ দিশাহারা। প্রতিদিন ওরা মরছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে মাত্র কয়দিন আগে নতুন করে এক ডিভিশন সৈন্য আমদানি করা হয়েছে বাংলাদেশে। আমেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র আসছে, চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম আসছে, মার্কিন বিশেষজ্ঞ এসেছে। এমন কি জর্দান থেকেও লোক ভাড়া করে আনা হয়েছে বাংলাদেশের বীর যোদ্ধাদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু তবু অবস্থার উন্নতি হয়নি— পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে ইয়াহিয়ার। প্রতিদিন নয়া নয়া এলাকা মুক্ত হচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাতে। ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি তার দূরভিসন্ধি যে বানচাল করে দিয়েছে— ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের খায়েস মিটে গেছে ইয়াহিয়ার। ক্ষমতার মদমত্ত সেই নরঘাতক চেষ্টা করেছে জাতিসংঘকে টেনে এনে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে। কিন্তু সে চেষ্টাও তার নিদারুণ ব্যর্থতা বরণ করেছে। আরেকটা চাল খেলেছে খুনী ইয়াহিয়া। সে ভেবেছিল বিচারের নামে প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে ভাড়াটিয়া মিলিটারির জজ-ব্যারিস্টারের পুতুল নৃত্যের ব্যবসা করে শেখ মুজিবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে— আর তার ফলে মনোবল ভেঙ্গে যাবে বাংলাদেশের

মুক্তিযোদ্ধাদের। তার ভাড়াটিয়া ডালকুত্তা বাহিনীর দুরু দুরু বক্ষে আসবে নতুন শক্তি—দাবিয়ে দেওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। কিন্তু এখানেও হতাশ হয়েছে জেনারেল ইয়াহিয়া। এ খবরে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী—তীব্রতর হয়েছে তাদের আক্রমণধারা। তারই পাশাপাশি বিশ্বজনমতের প্রচণ্ড চাপে শাণিত ছুরিকা খসে পড়েছে জল্লাদের হাত থেকে। তার প্রমাণ—বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবকে গুলি করা হবে না বলে জাতিসংঘে পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর ঘোষণা। ইয়াহিয়ার সামনে এখন পাকিস্তান নামক মৃত ঘোড়াটিকে জীবিত করে তোলার আর কোনও পথই খোলা নেই। তবু শেষ চেষ্টা করছে সে। শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে দিয়ে হলেও যদি বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাখা যায়, সেটাই তার শেষ চেষ্টা। হতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই চলেছে তেহরানে গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা। আবার এমনও হতে পারে যে, এই তৎপরতা নতুন কোনও চালিয়াতি, কোনও দুরভিসন্ধি হাসিলের জঘন্য ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।...

### ২৬ আগস্ট, ১৯৭১

একটা খবরের মতো খবর! করাচি থেকে এ-এফ-পি জানিয়েছে যে, পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রতি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছে। যেসব সদস্য জল্লাদশাহীর দৃষ্টিতে নিরপরাধ সুবোধ বালক, তাদের প্রতিই এই আবেদন জানানো হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের মারফত সরকারি মহল গণপ্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

খবর শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাই না। মনে হয়, পৃথিবীর সব কিছুরই সীমা আছে—সীমা নাই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর নির্লজ্জ বেহায়াপনা, নিষ্ঠুরতা, ন্যাকামি আর ধোঁকাবাজির। আর সীমা নাই বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ওদের নির্মম পেশাদারী রসিকতার। সম্ভবত সে কারণেই, এতদিন পরে জঙ্গীশাহী গণপ্রতিনিধিদের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালনের আবেদন জানাতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। কে না জানে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যই তারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এজন্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার মানুষ নিঃশব্দে ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শিরদেশে পরিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের নজিরবিহীন নির্বাচনী বিজয়ের গৌরবময় শিরোপা। বাংলার মানুষ বিগত নির্বাচনে শেখ মুজিব এবং তার অনুসারীদের শুধু ভোটই দেয় নাই—দিয়েছিল হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবিচল বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আস্থা। এই বিশ্বাস ও আস্থার যাতে এতটুকু অমর্যাদা না হয়, স্বীয় দায়িত্ব পালনে যাতে বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়, সেই সচেতন সতর্কতাই গণপ্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে। দিনটা ছিল ৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১ সাল। বাংলার উদার আকাশের নিচে শীতার্ত দিনের শেষপ্রহরে স্নিগ্ধ সূর্যালোক-স্নাত সুবিশাল রেসকোর্সের জনারণ্য আর উপরে জাগ্রত বিধাতাকে সাক্ষী রেখে সেদিন বাংলাদেশের

গণপ্রতিনিধিরা শপথ নিয়েছিলেন। এক হাত বুকের উপর রেখে আরেক হাত উর্ধ্বে তুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গণপ্রতিনিধিরা বিবেকের নামেই ওয়াদা করেছিলেন : 'জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা আমাদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করবো—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করবো আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব। এই শপথ যে ধোঁকাবাজির ভড়ং ছিল না, ছিল তাদের ঈমানেরই অঙ্গ—সেই সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণেও তার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। শেখ মুজিব সেদিন বাংলার মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলেন : যদি কেউ এই শপথ ভঙ্গ করে, যদি কোনও গণপ্রতিনিধি তোমাদের বিশ্বাস ও আস্থার অমর্যাদা করে, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়—তাকে জ্যান্ত কবর দিও। এমনকি এই গাদ্দারি যদি আমি করি—আমাকেও তোমরা রেহাই দিও না।

গণপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের এমন দুর্বার আগ্রহ তাদের ছিল বলেই নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বার বার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এজন্য তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখটিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়াই টালবাহানা করেছে। শেষ পর্যন্ত তারই খুশিমতো ১লা মার্চ নির্ধারিত হয়েছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ। কিন্তু সেদিনও পরিষদের অধিবেশন বসতে দেয়নি ইয়াহিয়া খানই—গণপ্রতিনিধিরা নয়। আর এভাবেই শাসনতন্ত্র রচনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পথ গণপ্রতিনিধিদের সামনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে—অথচ আজ হঠাৎ করে সেই জঙ্গীশাহীর মুখেই শোনা যাচ্ছে গণপ্রতিনিধিদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন। শুনে চমকে উঠতে হয় ভূতের মুখে রাম রাম শোনার মতো।

কিন্তু আর যাই হোক হঠাৎ করে জঙ্গীশাহীর এই সুমতির পেছনে যে কোনও সাধু উদ্দেশ্য নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিনও আজকের অবস্থাটার দিকে তাকালেই জল্লাদী আবেদনের গোমরটা ফাঁস হয়ে যাবে।

৩১০ সদস্যের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা ১৬৭। ৩০০ সদস্যের বাংলাদেশ পরিষদেও আওয়ামী লীগের সংখ্যা ২৮৮। যদি মার্চের এক তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারতো, ক্ষমতাসীন হতে পারতো। ফলে সমাধি রচিত হতো জঙ্গীশাহীর। কিন্তু তা হতে দিতে চায়নি জল্লাদ ইয়াহিয়া। আর চায়নি বলেই ষড়যন্ত্র আর শঠতার আশ্রয় নিয়ে সে সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষের ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশান্তরি করেও ইয়াহিয়া বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের বিবেককে কিনে নিতে পারেনি। তাই সেই বিবেকহীন জল্লাদ কলমের এক খোঁচায় জবাই করেছে আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ এবং ১৯০ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকে। ইয়াহিয়ার দৃষ্টিতে তার পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পরিষদে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা

এখন সংখ্যালঘু। শেখ মুজিব কারাগারে। পাকিস্তানের সাবেক জঙ্গীশাসক আইয়ুবের জারজ সন্তান এবং বর্তমান শাসক ইয়াহিয়ার লেজুড় ভুট্টোর দল এখন জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু। সুতরাং আর ভয় নেই। তাইতো আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া মেহেরবানী করে পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। এ আবেদন আজ শুধু মানুষের মনে বিদ্রূপ, ঘৃণা আর ধিক্কারই সৃষ্টি করবে।...

২৭ আগস্ট, ১৯৭১

বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার তথাকথিত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত গণপ্রতিনিধিদের শূন্য আসনগুলির উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে চায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ৭৯ জন অনুসারীকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছে, তাদের জায়গায় আগামী নভেম্বর মাসে উপনির্বাচন হবে বলে ইয়াহিয়া খানই ঘোষণা প্রচার করেছিল। লন্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা জানিয়েছে যে, নির্বাচনে দাঁড়াবার মতো দালাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ইয়াহিয়া খান উপনির্বাচন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে গেরিলাদের অপ্রতিহত তৎপরতা। তারা যেকোনোভাবে হোক উপনির্বাচনের প্রহসন ঠেকিয়ে রাখবেই। ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছে, ইয়াহিয়া খান খুব শিগগিরই উপনির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যা ঘটতে যাচ্ছে তা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক কিছু নয়।

গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তেইশ বছরের প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়েছে শোষক-ষড়যন্ত্রী শাসকের কব্জা থেকে নিজেদের ভাগ্য ছিনিয়ে আনার দুর্বার আকাংক্ষায়। বিজয়ী করেছে তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালোবাসা এবং তার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আস্থাই নেতা ও জনতাকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছে। এই নৈকট্যবোধ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই প্রতিফলিত হয়েছে নির্বাচনী রায়ে। এই নির্বাচনের লক্ষ ছিল একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু নির্বাচনী রায় যখন শেখ মুজিবের পক্ষে গেল, যখন শোষক-ষড়যন্ত্রকারী-গণদুশমন শাসকরা বুঝতে পারলো যে শেখ মুজিবুর হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মানে হলো নিজেদের কবরের উপর জনতার বিজয়-কেতন উড্ডীন করা, ওরা প্রমাদ গুণলো। লিপ্ত হলো নির্বাচনী রায় বানচালের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। ন্যায়নীতি-বিবেকের মাথা খেয়ে জঙ্গীশাহী জনতা, গণ-প্রতিনিধিবর্গ আর তাদের নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে শুরু করলো নতুন চক্রান্ত। উদ্দেশ্য—যেকোনোভাবে হউক পরিষদের অধিবেশন বাতিল এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখতেই হবে। আর এই দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য কি না করেছে জঙ্গীশাহী! রক্তগঙ্গা সৃষ্টি করেছে ওরা বাংলাদেশে—খুন, জখম লুঠ, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা ওরা করেনি। এমন কি শেখ মুজিবকে বন্দি করে, বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করতেও ওরা পিছপা

হয়নি। তাতেও যখন কাজ হয়নি—মাথা নত করেনি বাংলার নেতা ও জনতা—জল্লাদ ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় খারিজ করেছে পৌনে তিনশত গণপ্রতিনিধির সদস্যপদ। কারণ, ইয়াহিয়া ভেবেছিল আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের এসব শূন্যপদে উপনির্বাচন করে দালালদের পার করিয়ে নেওয়া যাবে, গঠন করা যাবে একটি পুতুল সরকার—যে সরকারের একমাত্র দায়িত্ব হবে জল্লাদের পা চাটা।

কিন্তু বিধি বাম, বাংলার মাইর দুনিয়ার বাইর। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আর বীর জনতার মিলিত প্রতিরোধের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ইয়াহিয়ার তোগলকি খোয়াব।

...সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রয়টার পরিবেশিত এক খবরে জানা যায়, পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর নায়ক ইয়াহিয়া খান গত মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরান গিয়ে পৌঁচেছে। ওয়াকেবহাল মহল জানিয়েছেন, ইয়াহিয়া খান ইরানের শাহের সঙ্গে পাক-ভারত সম্পর্কে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবে।

তেহরানের ইংরেজী দৈনিক ' তেহরান জার্নাল'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান ও ভারতের বর্তমান সংঘাতে ইরানের মধ্যস্থতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে ইরানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান থাকায় ইরান দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে তৃতীয় যেকোনও দেশের চাইতে অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পত্রিকাটিতে এমনও বলা হয়েছে, অক্টোবরে পারস্য সাম্রাজ্যের আড়াই হাজারতম বার্ষিকী অনুষ্ঠান ইয়াহিয়া খান ও ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের একটা চমৎকার সুযোগ করে দেবে।

ঠিকই দিন ঢাকা থেকে এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার লাটবাহাদুর গাদ্দার মালিক বলেছে যে, সে ভারতীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দুটি খবরের উৎসস্থল তেহরান ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব অনেক—হাজার হাজার মাইল। কিন্তু আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে খবর দুইটির সারসংক্ষেপে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে অনেকের কাছেই। তবু একথা সত্য যে, সমস্যার কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া ধর্না দিয়েছে ইরানের দরবারে, উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের। আর এদিকে, ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া গভর্নর মালিক বাস্তুচ্যুত বাঙালি শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য আলোচনা করতে চাইছে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে।

কিন্তু কেন? পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর এই আচরণের, ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এত খায়েশ কেন?

বিশ্ববাসী জানেন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ কোনও বিরোধ নেই। আসলে সংঘাত চলেছে, যুদ্ধ চলেছে শেখ মুজিবরে স্বাধীন বাংলাদেশ এবং উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর মধ্যে। রক্তপাত, বর্বরতা, লুঠতরাজ, নির্যাতন চলেছে বাংলার

মাটিতে—এসব করছে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া ডালকুত্তার দল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে অমিতবিক্রমে লড়ে চলেছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদস্যুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী নাপাম বোমা ফেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে বাংলাদেশের জনপদ। স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে জল্লাদ ইয়াহিয়া খান। লিপ্ত হয়েছে তার বিচার প্রহসনে। তাই সমগ্র বিরোধটা, মূল সংঘর্ষটা চলেছে বাংলাদেশের জনগণ আর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এর মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? ভারতের কথা আসে কিসে?

কিন্তু তবু গোড়া থেকেই জঙ্গীশাহী চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বেমালুম চাপা দিয়ে বিশ্ববাসীকে এই মর্মে বিভ্রান্ত করতে যে সংঘর্ষটা আসলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। এর উদ্দেশ্যও পরিষ্কার। জঙ্গীশাহী চাইছে, পাক-ভারত সংঘর্ষের ডামাডোলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে। ইয়াহিয়া চাইছে বাংলাদেশ ইস্যু থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কল্পিত পাক-ভারত বিরোধের দিকে সরিয়ে নিতে। আর সে কারণেই তেহরানের দুয়ারে ধর্না।

**২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

খবরের পর খবর। নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী ২৫টি দেশ একবাক্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করেছেন। গত সোমবার সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দানের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ভারতের সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করা এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত সমুদয় সাহায্য সামগ্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করারও দাবী জানানো হয়।

এদিকে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে বলা হয়েছে, তার মতো কালজয়ী নেতাকে আটক রাখা গর্হিত অন্যায়। আফগানের বাদশাহ জহির শাহের মস্কো সফরশেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-আফগান যুক্ত ইশতেহারেও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি, বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদস্যুদের বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের নীরব দর্শক জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মানবিক মূল্যবোধে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। তিনি একথাও বলেছেন যে, বাঙালি জাতিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব।

এদিকে, ফ্রান্সের বিশিষ্ট লেখক, রাজনীতিক ও প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মঁসিয়ে আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে দেশ-বিদেশের বহু তরুণ তার কাছে চিঠি লিখেছে। এই খবর পরিবেশনকারী একটি পত্রিকার ভাষায় "আজ বাংলার মুক্তিসংগ্রামে কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি" পড়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত সবক'টি খবরই বাঙালি জাতির জন্য শুভ সংবাদ। কারণ, এতে একদিকে যেমন বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে দুনিয়ার মানুষ জল্লাদ ইয়াহিয়ার কথা বিশ্বাস করেনি। বরং পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে অন্তহীন ঘৃণা আর ধিক্কার ছাড়া তার আশা করবার আর কিছুই নেই। ...

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

একটি বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, লন্ডনে এই মর্মে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি আসন্ন। কোনও কোনও পর্যবেক্ষকের মতে, বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার আগেই শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। লন্ডনে পাকিস্তানি অনুচররা এই মর্মে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবের কোনও দোষ নেই। শুধুমাত্র চরমপন্থীরা দেশদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য দায়ী। আর এরই দরুন ২৫শে মার্চ পাক ফৌজকে অস্ত্র হাতে রাস্তায় নামতে হয়েছিল।

এদিকে করাচী থেকে ফরাসি বার্তা সংস্থা এ-এফ-পি জানিয়েছে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেগম মুজিবকে লায়ালপুরের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারে। রাওয়ালপিন্ডির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় চিকিৎসাধীন তার বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে পারে। বলা হয়েছে যে, গত সপ্তাহে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গভর্নর ডা. মালিকের সঙ্গে দেখা করে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধু যাতে তাঁর অসুস্থ পিতা-মাতাকে দেখতে পারেন সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। পিন্ডির পত্র-পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবের বিচারের রায় আগামী সপ্তাহেই দেওয়া হবে বলে মনে হয়।

জল্লাদ ইয়াহিয়া খেলাটা ভালোই জমিয়ে তুলেছে। উপরের খবরগুলো একটু তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায় যে এর পেছনে রয়েছে ইয়াহিয়ার এক সুচতুর চাল। এই ক'দিন আগেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান 'লা ফিগারো' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে সদম্ভে বলেছে যে, শেখ মুজিব কোথায় আছে তা তার জানা নেই। কারণ, কারারুদ্ধ 'ক্রিমিনালদের' কে কোথায় আছে তা একটা দেশের প্রেসিডেন্টের জানা থাকবার কথা নয়। আজ সেই ইয়াহিয়া খানের সরকারই দয়ায় বিগলিত হয়ে শেখ মুজিবের পত্নীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবে, বঙ্গবন্ধুকে তার রোগশয্যাশায়ী পিতামাতাকে দেখতে ঢাকা নিয়ে আসবে, এমনকি জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিতর্ক

শুরু হবার আগেই বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবে—এতসব খবরে এখন বাজার মাৎ। শুধু কি তাই, একদিকে ইয়াহিয়া খান নিজেই বলছে শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিমিনাল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে তার হচ্ছে বিচারের নামে প্রহসন—আবার অপরদিকে জেনারেল ইয়াহিয়াই বঙ্গবন্ধুর জাতীয় পরিষদ সদস্য-পদটি খারিজ করে। তার অনুচরেরা সার্টিফিকেট দিচ্ছে ' শেখ মুজিব আসলে ভালো মানুষ। তার কোনও দোষ নেই।' ইয়াহিয়া খান 'লা-ফিগারো'কে বলেছে, 'শেখ মুজিবকে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবী করিয়েছে।' ইয়াহিয়ার অনুচরেরা বলছে, 'চরমপন্থীরাই দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডের গুরুঠাকুর।'

কিন্তু ঘটনাটা কি? আমরা বরাবরই বলেছি, শেখ মুজিবের জীবন এবং তাঁর নিরাপত্তাকে ইয়াহিয়া খান ব্যবহার করতে চাইছে শেষরক্ষার তুরুপের তাস হিসাবে তাই সে একদিকে শেখ মুজিবের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে, অপরদিকে গোপনে দূত পাঠিয়ে তারই কাছে দিচ্ছে আপোষের ধর্না। ... তারই অনুসারীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে জঙ্গীশাহী আর তার চেলা-চামুণ্ডারা জনমনে বিভ্রান্তি এবং বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ইয়াহিয়া খান জানে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথেরই অভিযাত্রিক মাত্র। তবু এই বিভেদ-প্রচার নীতি অনুসরণ করছে তারা নিজেদের দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্যই। ...

**১ অক্টোবর, ১৯৭১**

জাতিসংঘ সদর দফতর প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য পাকিস্তান জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মি. উ থান্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়, জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি প্রতিনিধি আগা শাহী উ থান্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে এ আবেদন জানিয়েছে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে গুরুতর 'ক্রিমিনাল' অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে জনাব সিদ্দিকী এবং প্রতিনিধিদেলর অন্যান্য সদস্যদের নিউইয়র্কে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও আবেদন করা হয়েছে।

ব্যাপারটাকে কি বলা যায়! পাকিস্তান যে ফরিয়াদ জানিয়েছে তাকে মামা-বাড়ির আবদার বললেও খাটো করে বলা হয়। একটি স্বাধীন দেশের জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের বিশ্বসংস্থায় মাতৃভূমির বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টিকল্পে উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীর এই নির্লজ্জ অপচেষ্টাকে কলঙ্কজনক তস্করবৃত্তি আখ্যা দিলেও যথেষ্ট বলা হয় না, কিন্তু তবু ঘটনা সত্য যে পাকিস্তানি জঙ্গীশাহী জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এমনকি জাতিসংঘ লবিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা যাতে স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে না পারেন, সে জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা মঞ্জুর বন্ধ করার চেষ্টাও পাকিস্তান করেছে। পাকিস্তানের এই অপচেষ্টার দরুনই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা লাভে বিলম্ব হয়েছে এবং তার ফলে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক পৌছতে

বিলম্ব হয়েছে পুরো চারটি দিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গীশাহীর প্রথম অপচেষ্টাটি ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে পৌচেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেছেন।

সকলেই জানেন, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নিউইয়র্ক গিয়েছেন বিশ্ব সংস্থার সদস্যদের কাছে জননী বাংলার বুকে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও নজিরবিহীন গণহত্যা যজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করতে। তাঁরা গিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিদান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্ব রাষ্ট্রবর্গকে অগ্রণী করতে। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যারা জাতিসংঘে গিয়েছেন তারা জনগণের আস্থাভাজন—সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং কূটনীতিক। সততা ও দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি সোনা তারা। তাদের কণ্ঠস্বর বাঙালি জাতির কণ্ঠস্বর বলেই বিবেচিত হবে। তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন হানাদার বর্বর উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত একটি দুর্বিনীত জাগ্রত জাতির।

অপরদিকে পাকিস্তানি প্রতিনিধিলটি গঠিত হয়েছে গণধিকৃত রাজনৈতিক মৃত সৈনিকদের নিয়ে। সকলের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। শুধুমাত্র দুই দলের নেতা—বাংলাদেশ প্রতিনিধিলের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী এবং পাকিস্তানি প্রতিনিধিদেলর নেতা পেশাদার দালাল মাহমুদ আলির দিকে তাকালেই দুই প্রতিনিধি-দলের মধ্যকার পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বিশ্ববাসী জানেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের হয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের—পাঞ্জাবি কুচক্রের জারজ সন্তান মাহমুদ আলিদের নয়। তাই একথাও পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্যকেই বিশ্বাসী চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার জল্লাদী খায়েশ নির্ঘাত মাঠে মারা যাবে। আর সেই ভয়েই জঙ্গীশাহী প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিশ্বসংস্থার আঙ্গিনায় ঢুকতে না পারেন—তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে না পারেন।...

**৮ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় জঙ্গীশাহীর উপনির্বাচনের প্রহসন সম্পর্কে আরও জবর খবর এসেছে। শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার মারফত জানা গেছে যে, অধিকৃত এলাকার যে ৭৮টি জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের খারিজ করে উপনির্বাচন হচ্ছে তার ৫৫টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাকিস্তান-দরদী ইসলামী-দরদীরা নির্বাচিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৩টি আসনের ৮৫টিতে জনাবরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে— ভোটাভুটির দরকার হয়নি। এদিকে রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে লাহোরে ইয়াহিয়া খাঁ'র সঙ্গে তার বৃদ্ধ ঘেটু নূরুল আমিন সুদীর্ঘ আলোচনা-বৈঠক চালিয়েছে। বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, ইয়াহিয়া খান নূরুল

আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় নিয়েই নাকি জল্লাদ আর দালালের সলাপরামর্শ চলেছে।

অপরদিকে ভুট্টোর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী-গিরির চাকরিটা পাকা হবার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে তার চীন সফরের দরুন। কিছুদিন আগেও ভুট্টো ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম কথা বলেছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই ইয়াহিয়ারই ট্যান্ডেল হিসাবে সে পিকিং সফর করছে সমরাস্ত্রের ভিক্ষাপাত্র হাতে। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, ক্ষমতার কাঁচকলার গন্ধ পেয়েই ভুট্টো এতটা তকলিফ স্বীকার এবং নিচে নামতে রাজী হয়েছে।...

এবার আসা যাক উপনির্বাচনের তেলেসমাতি খেলার কথায়। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলি, ৭০'-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাই বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি। তাদেরই নিয়ে গঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। তাই বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় পর্যন্ত এই তথাকথিত জল্লাদী উপনির্বাচন শুধু অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপই নয়—ইয়াহিয়ার এক হাস্যকর পাগলামিও বটে। আর এই উপনির্বাচন সম্পর্কে ইয়াহিয়ার খাস তালুক পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকার মতামতই কি তার প্রতি খুব অনুকূল? মোটেই নয়। সেকথাই এখন বলছি।

করাচীর 'ডন' পত্রিকা বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার উপনির্বাচনে ভুট্টোর পিপলস পার্টির ৫ জন সদস্যের বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াকে 'রহস্যজনক' বলে মন্তব্য করেছে। পত্রিকা বলেছে, এটা সত্যই রহস্যাবৃত— কেন এই ৬টি আসনের সব কয়টিতেই পিপলস পার্টির বিরোধী নূরুল আমিন নেতৃত্বাধীন ৬-দলের এক্যজোটের সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর কেন নিয়েছে, তার জবাব নূরুল আমিনও দিতে পারেনি—সে জানে না। লাহোরের উর্দু দৈনিক ' কোহিস্তান' জানিয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ৬টি আসন দখল করার জন্য পিপলস পার্টি বিরোধী প্রার্থীদের ২২ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছে। আরেকটি লাহোরী উর্দু দৈনিক 'আজাদ' এ ব্যাপারে তদন্ত দাবী করেছে। পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, এই উপনির্বাচনের ফলাফল জনগণকে এবং বিশ্ববাসীকে নির্বাচনের বৈধতা, নিরপেক্ষতা ও সততা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত করতে পারবে না। পত্রিকাটি বলেছে, 'এই ৫৫টি আসনে তারাই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে, ডিসেম্বরের নির্বাচনে যাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' তার পর আমাদের আর কি বলার আছে?

**১৬ নভেম্বর, ১৯৭১**

... নিউজ উইকের সিনিয়র এডিটর আর্নড বোর্চগ্রেভ গত সপ্তাহের ঢাকা থেকে প্রেরিত এক তারবার্তায় অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন : ইস্টার্ন সেক্টরের কমান্ডার নিয়াজীকে মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে বললো, 'বিদ্রোহীরা কোনও সমস্যা নয়। তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমাদের রাজাকাররাই যথেষ্ট। অথচ বোর্ডগ্রেভের মতে রাজাকাররাই সামরিক জান্তার উপকারের তুলনায় ক্ষতিই করছে

বেশি। যেহেতু তাদের হাতে বন্দুক আছে, তাই তারা মনে করে তাদের এক-একজন বিধাতাপুরুষ। খাদ্য বা মেয়েমানুষ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানালে এই রাজাকাররা যেকোনও লোকের জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।

বোর্চগ্রেভ আরও লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সত্যটিকে সযত্নে ডা. মালিক থেকে শুরু করে জেনারেল ইয়াহিয়া পর্যন্ত সবার কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে। তাদের ধারণা, সেনাবাহিনী সঠিকভাবেই মুক্তিবাহিনীর মোকাবেলা করছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে এখনও কত ভয়াবহ হিংস্র বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তারই দুটি নজির পাওয়া গেছে সম্প্রতি। নিউজউইকের প্রতিনিধি বলছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের পশ্চাদ্ধাবনের নামে কয়েকদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ডেমরা গ্রামে ঢুকে পড়ে। হানাদার নরপশুরা সেখানে ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক সমস্ত মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের বেশি বয়স্ক সকল পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরই দু-একদিন পরে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা চালনার কাছে নদীতে দ্রুত গানবোট চালিয়ে ঢেউ তুলে কতকগুলি জেলে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। জেলেরা সাঁতরে তীরে উঠবার চেষ্টা করলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়।

আমাদের কথা নয়—বিদেশী সাংবাদিক আর্নড বোর্চগ্রেভের এই বিবরণীই নিরপেক্ষ নিয়তির কঠিন রায়ের মতো বিশ্ববাসীকে আরেকবার জানিয়ে দিল বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী জঙ্গীচক্র মার্চ মাসে যে নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, যে হিংস্র বর্বরতা শুরু করেছিল আজো তা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই বর্বরতা? কেন এই নৃশংসতা? কেন মানবেতিহাসে নজিরবিহীন এই পাশবিক গণহত্যাযজ্ঞ? কি অপরাধ করেছিল বাংলার মানুষ?...

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন উপনিবেশবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে—আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া ভোট দিয়ে বাঙালি জাতি শেখ মুজিবকে প্রদান করেছে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্বভার। আর বিধাতার ছায়া সন্দর্শনে ভীতসন্ত্রস্ত শয়তানের মতোই থর থর করে কেঁপে উঠেছে গণবিরোধী শাসক-শোষককুলের অন্তরাত্মা। কারণ, তারা জানতো, শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থই হবে দুঃখী জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি—আর চক্রান্তকারী শাসক-শোষক ও জঙ্গীবাজদের চূড়ান্ত সর্বনাশ। আর তাই তাদের স্বার্থের জিম্মাদার, ভাড়াটিয়া এজেন্ট ইয়াহিয়াকে তারা প্ররোচিত করেছে হিংস্র বর্বর পন্থায় বাঙালি জাতিকে নির্মূল করে দেবার অভিযান চালাতে। ...

**২৩ নভেম্বর, ১৯৭১**

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি ম্যালকম ডব্লু ব্রাউন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফরশেষে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। ইয়াহিয়া খান শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা তাদের এ ইচ্ছাকে দাবিয়ে দিতে পারবে না। বরং তার বর্বরতা এবং শক্তি-প্রয়োগের মাত্রা যত বাড়বে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাও ততই ত্বরান্বিত হবে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের এই রিপোর্টে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জঙ্গীশাহী তার সব রকমের প্রচার মাধ্যমে সাহায্যে যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, নিউইয়র্ক টাইমসসহ বিভিন্ন নিরপেক্ষ বিদেশি সংবাপত্রের রিপোর্ট এবং মন্তব্যই বিশ্ববাসীর সামনে তার অসারতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি আজ বাংলাদেশের দিকে। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ যাতে সঠিক তথ্য জানতে না পারে জল্লাদ ইয়াহিয়ার প্রচারবিশারদরা সেজন্য চেষ্টার এতটুকু কসুর করেনি।

পশ্চিম পাঞ্জাবি শিল্পপতি, কায়েমী স্বার্থবাদী এবং শোষককুল পৃষ্ঠপোষিত উপনিবেশবাদী জঙ্গী শাসককুলের গণবিরোধী শাসন ও শোষণের চাকা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকায় তাদেরই ভাড়াটিয়া গোলাম জল্লাদ ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। ইতিহাসে নজিরবিহীন গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, হিংস্র বর্বরতার সঙ্গে নারীধর্ষণ, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের আশ্রয় নিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা দেশান্তরী করে ইয়াহিয়া খান চেয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তাদের স্বাধীনতার দাবীকে নির্মূল করে দিতে। আর এ বর্বরতার লোমহর্ষক কাহিনী চাপা দিয়ে রাখবার জন্য কুচক্রী ইয়াহিয়া বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছিল বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর প্রথম মুহূর্তেই। কিন্তু তার অসুদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইয়াহিয়া একদিকে যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করতে পারেনি, তেমনি পারেনি বাংলাদেশে তার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর পৈশাচিকতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রাখতে।

বহুদিন কড়া সেন্সরশিপ আরোপ রেখে, কিছু অসৎ সাংবাদিক ভাড়া করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে জল্লাদশাহী নিজেদের পাপকীর্তি চাপা রাখার, বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়াব্যাপী সংবাদপত্র জগৎ এবং জনমতের প্রচণ্ড চাপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশে ঢুকতে দিয়েছে। প্রথম সুযোগেই দুনিয়ার দশদিগন্ত থেকে খ্যাতনামা পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন সাংবাদিক ও ক্যামেরা-ম্যানরা ছুটে এসেছেন যুদ্ধবিক্ষত বাংলাদেশে। তারা দেখেশুনে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছেন। ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কিউবার বিপ্লব আর জনযুদ্ধ সারা পৃথিবীর মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৮ মাস সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে বীর প্রসবিনী বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা যে অভূতপূর্ব বীরত্ব আর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তার আর কোনও নজির নেই। ইয়াহিয়া খান ৭২ ঘণ্টার 'ক্রাশ বেঙ্গলি' প্রোগ্রামের হিংস্র নখরাঘাতে শুরুতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দাবিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের তীব্রতায় জল্লাদী খোয়াব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আজ জল্লাদী সাম্রাজ্যের মোহই চূড়ান্তভাবে ক্রাশ হবার দ্বারপ্রান্তে। বিদেশী সাংবাদিকরা২ নিজের চোখে দেখছেন প্রতিদিন প্রতিটি রণাঙ্গনে হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটছে।

প্রতিদিন মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা—নতুন নতুন অঞ্চলে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। আর তাই হানাদার জঙ্গীবাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা সত্যভাষণের স্বার্থেই বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই— কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

## ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ ইয়াহিয়া খান গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে এমন এক জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আর ফিরবার উপায় নেই। রেডিও পাকিস্তানের খবর অনুসারে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছে, পাকিস্তানের সম্মান ও অখণ্ডতাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবে। ইয়াহিয়া খান আবার অভিযোগ করেছে যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ পরিচালনার ফলেই উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে।

একই দিনের আরেকটি খবরে জানা যায়, যে সমস্ত ব্রিটিশ, মার্কিন ও জার্মান নাগরিক বাংলাদেশে আছেন অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা এই মুহূর্তেই স্বদেশে ফিরতে পারছেন না তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। গতকালকের খবরে বলা হয়েছে, মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা থেকে হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে যশোর সেক্টরে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। সাতক্ষীরা মহকুমাও গতকাল শত্রুমুক্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একটি দল খুলনা শহর অভিমুক্তে এগিয়ে চলেছে। আর যশোর ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে আকাশবাণীর খবরে জানা যায়, পাকিস্তানি সৈন্যরা বুধবার মধ্যরাত্রি থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাটের ওপর একটানা ১২ ঘণ্টা ধরে গোলাবর্ষণ করায় ১২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আগরতলা সীমান্তেও পাকিস্তানি বাহিনীর অশুভ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইতিপূর্বেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে আশংকা করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, পাকিস্তানি কাণ্ডজ্ঞানহীন জঙ্গীচক্রের ভারত আক্রমণের সম্ভবত বেশি দেরী নেই। ভারতও প্রস্তুত হয়ে আছে হামলার পাল্টা জবাব দেবার জন্য। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে একথা নিশ্চিত যে, পাকিস্তান যদি আক্রমণ চালায় ভারত তার দাঁতভাঙ্গা জবাবই দেবে। আর সে জবাব যে পাকিস্তানি জঙ্গীচক্রের জন্য কত ভয়াবহ হবে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের আকাশসীমা লংঘনকারী ৪টি পাকিস্তানি বিমানের তিনখানির ভূ-পতন।

কিন্তু, কেন এই রণপাঁয়তারা? কেন এই যুদ্ধের আগুন? ভারত যুদ্ধ চায় নাই। ভারত চেয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন জাতি হিসাবে বাঁচুক, সেখান থেকে জঙ্গী বর্বরতায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণভয়ে যারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তারা সসম্মানে দেশে ফিরে যাক। তবু, শুধুমাত্র এই মৌলিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দায়েই পাকিস্তান ভারতের

ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছে। আগাগোড়াই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতের কারসাজি বলে চালিয়ে দিয়ে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে। আজ যখন ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটিয়া বাহিনী শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখনও ইয়াহিয়া খান সেই পুরাতন সুরেই কথা বলছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিজের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হওয়াতেই হয়তো সে বলে চলেছে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেছে। আর এই কল্পিত অভিযোগ তুলেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। ...

**২৯ নভেম্বর, ১৯৭১**

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছার জন্য পাকিস্তানি জঙ্গীশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইয়াহিয়া খানের ঈদের শুভেচ্ছা বাণীর জবাবে শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে তার এই আহ্বান জানিয়ে দেন।

ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, ইয়াহিয়া খান শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ কোনও আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারবে না। শ্রীমতী গান্ধীর মতে, তিনি বাংলাদেশের জনগণকে কোনও সমাধান মেনে নিতে বলতে পারেন না। কারণ সে অধিকার তার নেই।

এই উপমহাদেশে বর্তমান উত্তেজনাকর পরিবেশের পটভূমিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর এই আহ্বানের তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মধ্যে একটা ভয়াল রক্তক্ষয়ী এ্যাডভেঞ্চার পরিহার করে বাস্তবতার আলোকে বিরাজমান গুরুতর সমস্যা থেকে শান্তিপূর্ণ পরিত্রাণের এটাই সম্ভবত বিশেষ মানবিক আহ্বান। ইয়াহিয়া খান যদি শ্রীমতী গান্ধীর এই ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, এই উপমহাদেশে উত্তেজনার বারুদস্তূপে জল্লাদী হামলার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগে, সর্বাত্মক যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ইয়াহিয়া খান শুধু মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদই নয়—কূটচক্রান্তের এক ঘৃণিত নায়ক। যে পশ্চিম পাঞ্জাবি শোষক-পুঁজিপতি-উপনিবেশবাদী চক্রের সে ভাড়াটিয়া গোলাম, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইয়াহিয়া না করতে পারে এমন কোনও কাজ নেই। বাঙালিদের বুকের ওপর দিয়ে ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের রথচক্র চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশে বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ আর নারী-ধর্ষণের পাশবিক উন্মত্ততায় লিপ্ত হয়েছে। এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই সে দশ লক্ষ বাঙালির নরকঙ্কালের ওপর বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে মেতে

উঠেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলায়। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশ ইস্যুকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের চেহারা দিতে। এই উদ্দেশ্যেই সে বার বার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রত্যাখ্যাত হয়েও আবার প্রস্তাব দিয়েছে। এই একই উদ্দেশ্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সর্বশেষে সুইজারল্যান্ডের কাছে তথাকথিত ভারত-পাকিস্তান বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করার জন্য ধর্না দিয়েছে। ঈদবাণীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার জল্লাদী খায়েশেরও আসল উদ্দেশ্য ভারত-পাকিস্তান বিরোধের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা দিয়ে জননী বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সংগ্রামকে পিষে মারা। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তারও পিছনে সক্রিয় এই একই দুরভিসন্ধি।...

## ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার অপকর্মের দোসর স্বঘোষিত ডেনমার্কের যুবরাজ জুলফিকার আলী ভুট্টো ৮-সদস্যের এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে জাতিসংঘে গিয়েছে। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর চাকরি পাওয়ার পর পরই ইয়াহিয়া তাকে জাতিসংঘে পাঠিয়েছে তার পক্ষ হয়ে বক্তব্য পেশের জন্য।

ভুট্টো ভাগ্যবান লোক। ইয়াহিয়া জল্লাদ হলেও বেঈমান নয়। সম্ভবত সেকারণেই অনেক ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মান-অভিমানের পর আবার জল্লাদে-যুবরাজে মিলন ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত হয়নি বঞ্চিত ভুট্টো। দীর্ঘদিন পরে ক্ষমতার কাঁচকলাটার টুকরা একটা অংশ হলেও ইয়াহিয়া ভুট্টোর হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে পাঠিয়েছে জাতিসংঘে।...

বিগত সাড়ে আট মাসে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বানচাল করার জন্য যে হিংস্র বর্বরতা, যে পাশবিক গণহত্যা, শাঠ্য ষড়যন্ত্র আর ছল-চাতুরির তস্করসুলভ অভিযান চালিয়েছে, মানব জাতির ইতিহাসে তার কোনও নজির নেই। কিন্তু তবু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করে, এক কোটিকে দেশান্তরী করে, অগণিত জনপদ নিশ্চিহ্ন করে, কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার হুমকি দিয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে পারেনি ইয়াহিয়া খান। বরং যতই দিন গেছে, ততই তীব্রতর দুর্জয় দুর্বার হয়ে উঠেছে দুর্দম বাঙালি জাতির আক্রমণ ধারা। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত করতে চলেছেন। দুশমন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তারা দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছেন শত্রুকবলিত ঢাকার দিকে। বাঙালি জাতি আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের। তাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছে শেষরক্ষার জন্য—ধর্না দিয়েছে আমেরিকার দুয়ারে। আমেরিকা এগিয়ে এসেছে খুনী নিক্সনের দোসর জল্লাদ ইয়াহিয়ার পরিত্রাণে। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালিয়ে আমেরিকা চাইছে ইয়াহিয়াকে সর্বনাশের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা

করতে। ইয়াহিয়ার সরকার মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞের নায়ক—এক কলঙ্কিত সরকার। এই সরকারের চেহারাটা বিশ্ববাসীর কাছে এত বেশি ঘৃণাদায়ক যে খোলস বদল ছাড়া ওকালতিরও সাহস পাচ্ছে না নিক্সন। সম্ভবত সে কারণেই—ওয়াশিংটনের অদৃশ্য সুতার টানে ইয়াহিয়া নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী আর ভুট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। উদ্দেশ্য : বাঙালি নূরুল আমিন আর সিন্ধি ভুট্টোকে মঞ্চে খাড়া করে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়া যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। জনগণ পাকিস্তানই চায়—ভারতই পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য পূর্ব বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে ভুট্টোকে অস্ত্র ভিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল চীনে। এবার তাকেই মৃত পাকিস্তানের সঞ্জীবনী সঙ্গীত গাইবার জন্য পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘে। ইয়াহিয়ার বড় আশা, ভুট্টো ব্যারিস্টার, তুখোড় বক্তা—নিশ্চয়ই সে সবকিছু গুছিয়ে বলে সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে।

হায়রে দুরাশা! ইয়াহিয়া হয়তো জানেই না যে, কথার মারপ্যাচে ধোঁকাবাজির দিন বাসি হয়ে গেছে। আসল সত্য, উপমহাদেশের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। তার প্রমাণ বিদেশী পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও নিবন্ধ।

লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখেছে, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হোক আর না হোক, ধ্বংস আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি এরপর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অতি নাটকীয় কিছু ঘটে তবু বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোনোমতেই সম্ভব হবে না। গার্ডিয়ান আরও বলেছে, ইয়াহিয়া যদি এখন আলোচনায় বসতে চায়, সে আলোচনার মূল বিষয় হবে কি উপায়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া যায়। আমেরিকার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনেক দেরীতে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গতিরোধের সময় পার হয়ে গেছে। 'নিউজউইক' লিখেছে, পাকিস্তানের মৃত্যুচীৎকারের মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে নবজাত বাংলাদেশের প্রথম জন্মধ্বনি। আমাদের আর কিছু বলবার দরকার আছে কি?

**১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

অনিবার্য পতনের মুখে জঙ্গীশাহীর সাম্রাজ্য। বড্ডো প্রাণে লাগছে, সাধের উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে! গালে চড় খেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। বীরবর জওয়ানরা লড়াই করা তো দূরের কথা, প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করছে মিত্রবাহিনীর কাছে। তবু অবশ্য আশানুরূপ সাড়া এখনো মেলেনি। আজ পর্যন্ত অফিসার এবং জওয়ান মিলিয়ে ৮ হাজার অস্ত্র ফেলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

---

* 'সংবাদ পর্যালোচনা'র এই কথিকাটি মুস্তাফিজুর রহমান রচিত।

বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করার স্বপ্ন যারা দেখেছিল, বাংলাদেশে জুলুমের এবং ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যারা বাংলাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, তারা প্রত্যক্ষ-ভাবে কেউই বাংলার অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর শক্তির সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি, অথবা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও মনকে চোখ ঠেরে সবকিছু ধামাচাপা দিতে চাইছিল। পিন্ডির সদর দফতরে যুদ্ধের ঢেউয়ের আঘাত লেগেছে কিন্তু বাংলার মাটিতে মৃত্যুভয়ে ভীত খানসেনাদের আর্ত হাহাকারের কোনও শব্দ হয়তো পৌঁছায়নি।

কিন্তু সত্যকে গোপন করে বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। সেটা বোধগম্য হয়েছে জল্লাদশাহীর অনেক দেরীতে। যুদ্ধরত সৈনিকের আকুল আবেদন পৌঁছেছে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে, কিন্তু সে আবেদনে সাড়া দেবার এখতিয়ার নেই রাষ্ট্রসংঘের। বাংলাদেশে জল্লাদবাহিনীর প্রধান লে. জে. নিয়াজী সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ নাকচ করে মৃত্যুর দিনটি গোনার জন্য তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন। মেজর জে রাও ফরমান আলীর সব আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ' বারবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসংবরণ করে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আর তা না হলে চরম বিপর্যয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। ঢাকা নগরীর ওপর গত রাত থেকে চরম আঘাত হানা শুরু হয়েছে।

জেনারেল নিয়াজী সত্যকে গোপন করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ বা উদ্ধারের পক্ষে সমর্থন জানায়নি। কারণ, উদ্ধারপ্রাপ্ত জীবিত এই সেনাবাহিনী দেশের মাটিতে অর্থাৎ পাকিস্তানে ফিরে গেলে সেটা হবে জঙ্গীশাহীর পক্ষে আত্মহত্যার শামিল। বাংলাদেশের সংগ্রামের সামগ্রিক রূপটি উদঘাটিত হয়ে যাবে। আপামর জনসাধারণের কাছে এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, তাদেরই বাপ-ভাই-ছেলে বাংলাদেশের জঙ্গীশাহীর পরিচালিত অন্যায় যুদ্ধের জন্যই মারা গেছে। তাদের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে গ্লানিকর মৃত্যু। তার ফল হবে মারাত্মক। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাকিস্তানে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ, আকাশবাণী এবং বি-বি-সি শোনা নিষিদ্ধ।

আর এদিকে যাদের ভরসা দিয়ে, শক্তির অহমিকা দেখিয়ে একটি অবাস্তব পুতুল সরকার গড়ে তুলল, তাদেরও স্বস্তি নেই। চিরকালের মিথ্যাবাদী, উগ্রমস্তিষ্ক ভুট্টোকে তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাঠানো হলো জাতিসংঘে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! সেই উগ্রমস্তিষ্কের মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিথ্যাবাদীর মুখ দিয়ে সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। এতদিনে ভুট্টো স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছে এবং ভুট্টোর স্বভাবসিদ্ধ নীতিমাফিক সামরিক জান্তাকে দোষারোপ শুরু করেছে—অন্যায়ের সমস্ত ঝক্কি এখন ঠেলে দিচ্ছে সামরিক জান্তার উপর।

পুতুল সরকারের লোভী, ক্ষমতালিপ্সু পালের গোদাটির যখন এই অবস্থা তখন বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। জঙ্গীশাহীর ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করে একটি বালির প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল চিরদিনের বাংলার জাতশত্রু, পাক দালাল ডা. মালিক। পাকিস্তানি সুবেদারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাঁতের মাকুর মতো নিয়াজী এবং

ফরমান আলী যাতায়াত করছিলেন ঠিক তখনই কলজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী। চৈতন্যোদয় হলো বাংলার কলংক, জঙ্গীশাহীর পদলেহী তথাকথিত পাকিস্তানি সুবেদার ডা. মালিকের। চোখ থেকে এতদিনে গ্যালন গ্যালন জল ঝরতে শুরু করেছে।

ঢাকার গভর্নর হাউসের উপর বোমা এবং কামানের গোলা নিক্ষেপের সংগে সংগে সন্দেহাতীতভাবে পাক প্রতিরোধের পতন অনুধাবন করেছেন ডা. মালিক।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির একটি খবরে প্রকাশ, ডা. মালিক কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদের পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে ডা. মালিক নিজের জীবনের চুলচেরা হিসেব করে দেখছেন।

গভর্নর হাউসের বাংকারও আর নিরাপদ নয়। তাই অতিমূল্যবান নিজের প্রাণটি বাঁচানোর জন্য স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে ঢাকা নগরীর নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। গতকাল অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশের প্রধান এম, এম, চৌধুরী উচ্চপদস্থ আরো ১৬ জন সরকারি কর্মচারীকে নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ডা, মালিক সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছেন অবশ্য। অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত।

ঢাকা নগরী মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর পদানত না হওয়া পর্যন্ত ডা. মালিক সপারিষদ আইউব খানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কাজের পর্যালোচনা করুন হিসেবের খতিয়ান কষে দেখুন।

পাকিস্তানি বাহিনীর সর্বশেষ এবং সুদৃঢ় প্রতিরোধ যে বিপর্যয় এবং পতনের মুখে, এটা আজ দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট।

এখন পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মুখে দুটি পথ—একটি জেনারেল মানেকশ'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করা, আর তা না হলে মৃত্যুকে শ্রেয় জেনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা।




এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম :
লক্ষ জনতার মুহুর্মুহু শ্লোগান এবং করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত ঘোষণা (৭ মার্চ, '৭১, ঢাকার রেসকোর্স ময়দান)।



মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় পতাকা। দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান পতাকা থেকে শুধুমাত্র মানচিত্রটি বাদ দেয়া হয়েছে।

### জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস–
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনের
ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায়রে–
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়া গো
কি স্নেহ কি মায়াগো–
কি আঁচল বিছায়েছ
বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায়রে–
মা তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

### রণ সঙ্গীত

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চলরে চলরে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাঁধার বিন্দ্যাচল ॥

নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল ॥

চলরে নও-জোয়ান,
শোনরে পাতিয়া কান–
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙরে ভাঙ আগল,
চলরে চলরে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥

## মানচিত্রে রণাঙ্গন
## (বাংলাদেশ)





"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ।

ছবি : রশীদ তালুকদার



স্বাধীনতার প্রস্তুতি : মার্চ ১৯৭১। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করছেন।
ছবি : রশীদ তালুকদার



জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।
ছবি : রশীদ তালুকদার



২৫ মার্চের কালরাত্রি। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করেছিল ধ্বংসযজ্ঞ ও নিধন পর্ব।



ধ্বংসস্তূপ ও লাশের মাঝখানে (নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা) বিমূঢ় শিশু ও মা।
ছবি : আনোয়ার হোসেন





ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল,
বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল : নির্বিচারে ছাত্র-জনতা হত্যা।



বুড়িগঙ্গায় বাঙালির ভাসমান লাশ।
ছবি : আনোয়ার হোসেন



চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে জড়িত বেদনাময় এক স্মৃতি। জানা গেল, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধিজীবীদের খুন করেছে আলবদর বাহিনী।
ছবি : রশীদ তালুকদার



জয় বাংলার জয়



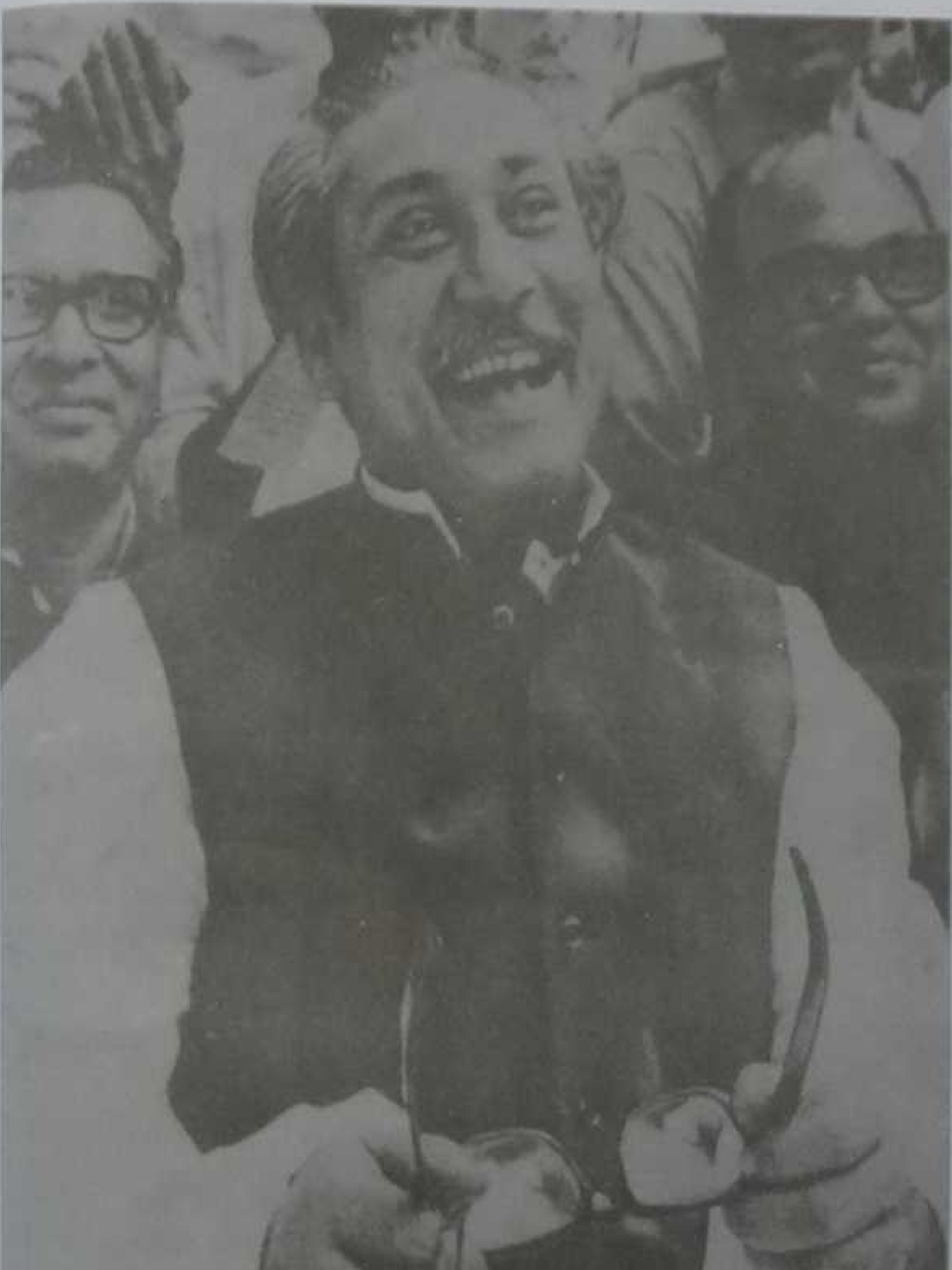
মীরপুর বধ্যভূমি



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি।
ছবি : রশীদ তালুকদার



স্বাধীনতার প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।
ছবি : আনোয়ার হোসেন



২০ মার্চ। ধানমণ্ডীর বাড়িতে কি কথায় বঙ্গবন্ধুর মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে,
চোখের চশমা খুলে হাতে নিয়েছেন তিনি।
ডানদিকে অন্যতম সহকর্মী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ–বাঁদিকে জনাব নজরুল ইসলাম।



পাক ফৌজ তখন ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ। যশোর দুর্গ কয়েক হাজার মানুষ দা, কুড়োল হাতে ঘিরে রেখেছে। এপ্রিলের গোড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চক্করে ইয়াহিয়ার বোমারু বিমান নির্বিচারে ছোঁ মেরে ইসলামের নামে, অখণ্ডতার নামে মন্দির গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, মসজিদের ছাদে বোমা নামিয়ে দিচ্ছিল। মিনারে অশ্বত্থের শেকড় বাতাসে নিরালম্ব দোলে। ধর্ম, মানবতা ধ্বসানো — তাকিয়ে মৌলবি সাহেব কোনো তল খুঁজে পাচ্ছেন না।



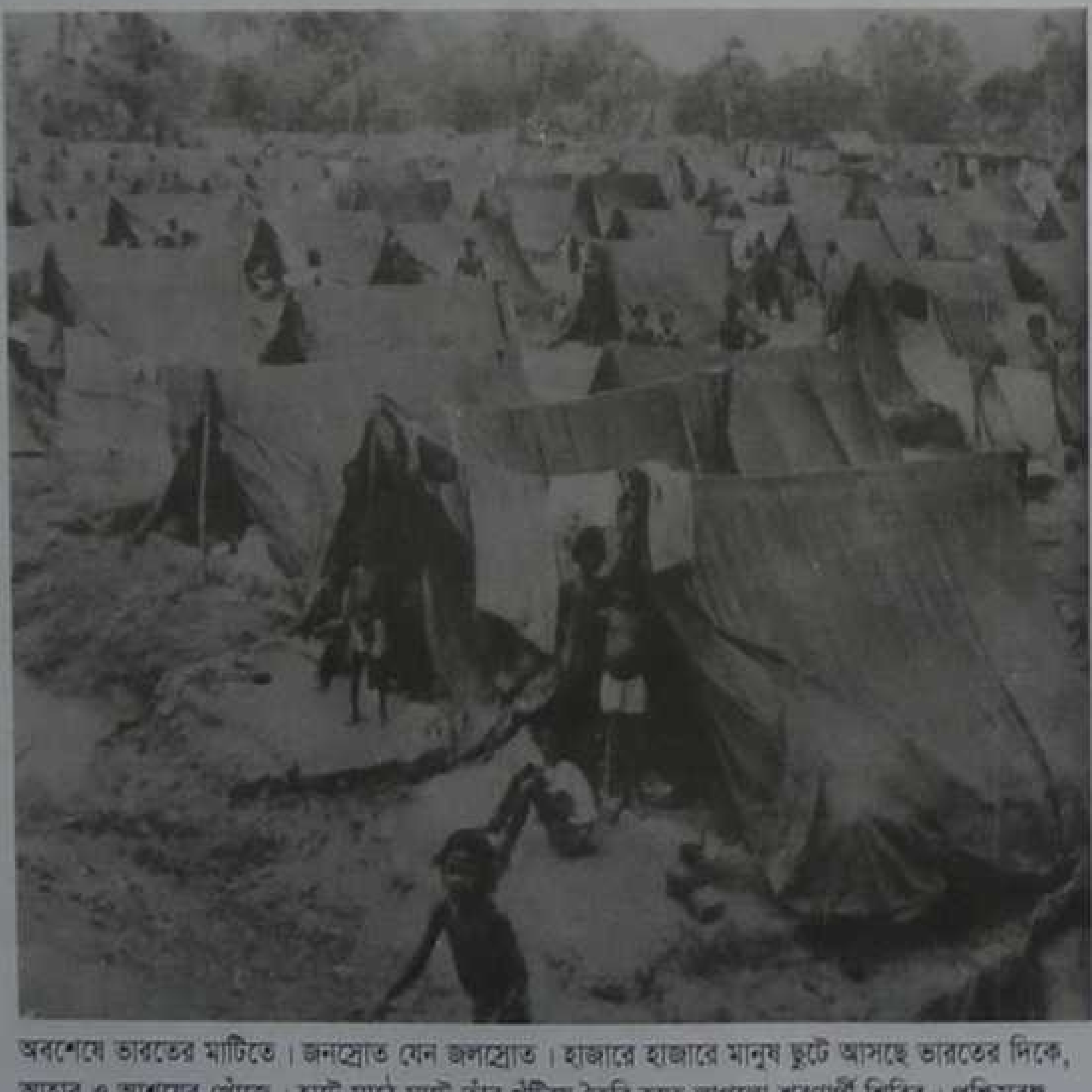
পিছনে শত্রুর কামানের হুঙ্কার। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।



তবু ওরা নিজের দেশের মায়া কাটিয়ে দলে দলে চলেছেন আশ্রয়ের সন্ধানে।



রোদ বৃষ্টি ঝড় কিছুই আর প্রতিবন্ধক নয়। পাট ক্ষেতের কোল ঘেঁষে কেউ চলেছে ভিজে কাপড় শুকোতে শুকোতে।



অবশেষে ভারতের মাটিতে। জনস্রোত যেন জলস্রোত। হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে আসছে ভারতের দিকে, আহার ও আশ্রয়ের খোঁজে। হাটে মাঠে ঘাটে তাঁবু খাটিয়ে তৈরি হতে লাগলো শরণার্থী শিবির। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে ভরে গেল শিবিরে শিবিরে।

# মানুষের মুখ*

১৬ জুন, ১৯৭১

এক টুকরো রুটি ॥

সময় : উনিশ শ' একাত্তর সনের ২৭শে মার্চ। স্থান : চট্টগ্রামের কোনও উপকণ্ঠ। পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে শহরে, বন্দরে, গ্রামে। 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে' আমাদের মুক্তিবাহিনী। সীমান্ত থেকে ছুটে এসেছে ই-পি-আর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা। দলে দলে ওরা এসেছে রামগড় রাঙামাটি আসলং কিংবা হরিণা থেকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত অথচ উদ্দীপ্ত ঐ জওয়ানদের অন্তত একরাত্রির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাল ভোর থেকে ওরা অবরোধ শুরু করবে ক্যান্টনমেন্টে। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দেড়শ জওয়ানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

না, অসুবিধা মোটেই হলো না। থাকার ব্যবস্থার জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালা খুলে দেয়া হলো। খাবারের কথা গ্রামে পৌঁছাতেই বাড়ি বাড়ি থেকে গরম ভাত-তরকারি চলে এল। মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই নবাগত মেহমানদের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত খাবার এল অঢেল পরিমাণে।

যুদ্ধের সময়ে খাদ্য সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। স্থানীয় যুবকবৃন্দ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একটি কমিটি করে ফেললেন। খবর এল, রাতেই আরও নতুন জওয়ান পৌঁছে যাবে ওখানে। মোট আড়াই শ' লোকের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা থাকলেও নিয়মিত কার্যসূচি চালিয়ে যাওয়া নিতান্ত সাধারণ কথা নয়।

ভোর বেলাতেই বস্তা বস্তা চাল এসে পৌঁছলো মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় দফতরে। গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক দু'টো দশাসই ছাগল নিয়ে এলেন। ওগুলো যুদ্ধকর্মীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, আগামী ঈদে কোরবানী দেব ভেবেছিলাম। সে সুযোগ আর জীবনে আসবে কিনা জানি না। ছাগল দুটো দিয়েই খালাস পেলাম ভাববেন না। প্রয়োজন হলে নিজকেও কোরবানী দিতে কসুর করব না।

শুধু চাল আর ছাগল নয়। আরও এল তরিতরকারি, লাউ-কুমড়ো, গুঁড়ো মশলা ইত্যাদি। অনেকে পাক করে আনলেন ভাজা কিংবা সেদ্ধ ডিম। সেসব যথাযথভাবে রাখতে হিমশিম খেয়ে উঠলেন তিরিশজন কর্মী।

একাশি বছরের বৃদ্ধ সাদেক আলী লাঠিতে ভর দিয়ে যখন এসে পৌঁছালেন তখন সকাল আটটা। গভীর মমত্ববোধে তাকিয়ে রইলেন জওয়ানদের মুখের দিকে। শীর্ণ হাতে ধরে একটা কলাপাতার ঠোঙা। ওটার মোড়ক খুলে বেরুল এক টুকরো রুটি।

---

* 'মানুষের মুখ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'কামাল মাহবুব' ছদ্মনামে মাহবুব তালুকদার রচিত।

বৃদ্ধ একজন জওয়ানের দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন ঠোঙাটি। দেখতে পেয়ে জনৈক কর্মী ছুটে এলেন। বললেন, কিছু দিতে হলে আমাকে দিন। ভদ্রলোক রুটির টুকরোটি এগিয়ে দিলেন কর্মীটির দিকে। বললেন, আমি গরিব মানুষ। এক টুকরো রুটি দেয়া ছাড়া আমার আর সাধ্য নেই বাবা। বয়স কম হলে যুদ্ধে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ্ সে সৌভাগ্যও কপালে রাখেননি।

আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কর্মীটি সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। গ্রামের নাম বললেন বৃদ্ধ। আত্মপরিচয়ও দিলেন, 'আমি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছি। এখন আর কিছু করে খাবার সাধ্য আর আমার নেই।' কিন্তু আপনি দেড় মাইল পথ হেঁটে রুটি বয়ে আনলেন, কষ্ট তো আর—' বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার এতগুলো ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর আমার হবে কষ্ট?' একটু যেন উষ্মতা তাঁর কণ্ঠে। ভদ্রলোক বিশেষ অপেক্ষা না করে চলে গেলেন।

এক টুকরো রুটি নিয়ে যুদ্ধকর্মীটিকে যথেষ্ট অসুবিধেয় পড়তে হলো। সকালের টিফিন সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। রুটিটা তাহলে কি করা যায়? এমনিতর রুটি তখন পর্যন্ত আর আসেনি, সুতরাং ওটাকে আলাদা রাখতে হবে এবং এক টুকরো রুটির জন্যে একটি আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন। কর্মীটি মনে মনে বিড়ম্বনা বোধ করলেন।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক সুবেদার সাহেব তাঁর প্লাটুন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অপারেশনের জন্যে। কর্মীটি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, এটা খেয়ে নিন তো!

আমার নাস্তা সারা হয়েছে। সুবেদার বললেন, এখন এটা দিয়ে কি করব?

কর্মীটি ম্লান মুখে বললেন, আমার রাখার অসুবিধা হচ্ছে। একজন অনেক কষ্ট করে রুটিটা নিয়ে এসেছেন। সুতরাং কোনোদিকে ফেলে রাখতেও মন চাইছে না।

দিন তাহলে আমাকে, সুবেদার সাহেব হাত বাড়িয়ে রুটির টুকরোটি নিলেন। তারপর ওটা কাগজে মুড়িয়ে প্যান্টের পেছন-পকেটে ভরে রেখে দিলেন।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হলো না। দুদিন পর্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না সুবেদার সাহেবের। শোনা গেল, যুদ্ধ করতে করতে সুবেদার সাহেব ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি চলে গিয়েছেন, বিস্তর পাক সৈন্যকে খতম করেছে ওঁদের দলটি। গড়পড়তায় এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনজন পাকিস্তানির প্রাণ নিয়েছে। কিন্তু সুবেদার সাহেব বেঁচে আছেন কিনা কে জানে!

হ্যাঁ, বেঁচেছিলেন সুবেদার সাহেব। তিনদিন পরে যখন ফিরলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হলো, কয়লার খনি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন যেন, দুচোখ ভরে কালি পড়েছে। শ্রান্তি আর ক্লান্তির প্রলেপ পড়েছে মুখে।

কিন্তু সুবেদার সাহেব কাকে যেন খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন এক সময় সেই যুদ্ধকর্মীটিকে সামনে দেখে হাত চেপে ধরলেন তার। বললেন, আপনি আমার খুব উপকার করেছেন।

আঁ—আমি! অপ্রস্তুত হলেন কর্মীটি।

আপনি সেদিন রুটিখানা না দিলে কি যে হতো! উপোস করার অভ্যেস অবশ্য আছে। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যে তাকদ দরকার, ঐ রুটিখানাই তা আমাকে দিয়েছিল। আপনি ওটা না দিলে—

কর্মীটি বাধা দিয়ে বললেন— সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্মরণ করুন। ঐ এক টুকরো রুটি যে সময়বিশেষে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাতো আমি জানতাম না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধ করি জানতেন।

দুজনেই মাটির দিকে তাকালেন। দুজনের অভিভূত মনে একজন বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। একজনের মনে বাস্তব, আর একজনা তাঁকে দেখেননি বলে ছবিটা কাল্পনিক।

কিন্তু আর একটা ছবি ওদের সামনে স্পষ্ট। দুজনের চোখের সামনেই অতি সাধারণ এক টুকরো রুটি।

২৭ জুন, ১৯৭১

**স্বাতীর যুদ্ধ ॥**

স্বাতী। বয়েস সাড়ে পাঁচ! পেশা—ঘরকন্নার কাজে মাকে টুকিটাকি সাহায্য করা, আব্বু বাড়ি ফিরলে দরজা খুলে দেয়া, ছোট বোনটিকে যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে উপদেশ দান। ইস্কুলের পড়াশুনা এখনও ওর শুরু হয়নি, বাসায় প্রথম পাঠের অনেক দূর এগিয়ে গ্যাছে। বাংলাদেশের হাজার মেয়ের মতো সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট্ট স্বাতী এখন যুদ্ধ করছে।

ওর বাবা ছিলেন অধ্যাপক। আর অধ্যাপক মানেই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর পয়লা নম্বরের শত্রু। ওদের চোখে শিক্ষা ও শিক্ষকতা মারাত্মক অপরাধ। মানুষের বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতি আণবিক বিস্ফোরকের চাইতেও মারাত্মক' ফলে কুচক্রী পাশব শক্তির ষড়যন্ত্রে ওদের ছোট্ট সংসারেও নাড়া পড়ল। সংসারের সাজানো বাগান পেছনে ফেলে ওদের এগিয়ে যেতে হলো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল একটি স্কুলের ছাত্রাবাসে। দিন দশেকের মধ্যে ওখান থেকে সরে যেতে হলো গ্রামের আরো অভ্যন্তরে, তারপর আরও ভেতরে যেখানে আদি অকৃত্রিম পা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর কোনও যানবাহন চলে না। চিরকালের পরিবেশ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে এসে দাঁড়াল ক্ষুদে পরিবারটি। হাতের সম্বল বলতে সামান্য কিছু টাকা—স্বাভাবিক অবস্থায় যাতে পনেরো থেকে বিশ দিন অব্দি চলে। এখন ঐ টাকায় অনিদিষ্টকাল চালাতে হবে। প্রথম দিকে আলুভর্তা, ডাল আর দুবেলা ভাত বরাদ্দ রইল, কিন্তু ওতে মুখ ঘুরিয়ে রইল স্বাতী। বল্লো, আমি নাশতা খাবো। আমার বড়ো খিদে লাগে।

ওর মা এসে মাথায় হাত বুলালেন, নাশতা এখন কোথায় পাব মা-মণি? এখন তো যুদ্ধ চলছে। সবাইকে তাই কষ্ট করতে হচ্ছে। আমরা যুদ্ধ করছি? স্বাতীর মুখের রেখা পালটে গ্যালো সহসা। ওর চোখে-মুখে উজ্জ্বলতার ছোঁওয়া লাগল। কণ্ঠ নামিয়ে বল্লো, ভুট্টো খুব পাঁজী, খুব শয়তান। আর শেখ মুজিব কতো ভালো, না আম্মু?

আম্মু মাথা নাড়লেন।

এরপর স্বাতীই সংসারের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলল। ওর আব্বুর পরনের একমাত্র লুঙ্গিটা ছিঁড়ে এসেছিল কিন্তু কেনা হচ্ছিল না। স্বাতীর মাও কবার বলেছেন আর

একটা কিনে ফেলতে। কিন্তু পয়সার অভাব তখনকার জন্যে নিদারুণ সত্য। স্বাতী বল্লো, যুদ্ধ থামলে তোমাকে একটা ভালো লুঙ্গি কিনে দেব আব্বু।

এ কথার পর যথাশীঘ্র লুঙ্গি কেনার ব্যাপারে ওর মায়ের চাপ কার্যকরী হলো না। ওর বাবা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্বাতীর ছোট বোনটির অনেকগুলো হবি। তার মধ্যে অন্যতম কান্না। কিছু একটা হাতের মুঠোয় পায়নি বলে হঠাৎ সেদিন কান্নার প্লাবন বইয়ে দিল। বোনের রকম-সকম দেখে স্বাতী ভারি খাপ্পা। বোনকে রীতিমতো শাসাল সে, কতবার বলছি এখন যুদ্ধ হচ্ছে! খবরদার তুমি কান্নাকাটি করবে না। কাঁদলে মিলিটারি বুঝে ফেলবে আমরা এখানে আছি। আব্বুকে তখন ধরে নিয়ে যাবে।

তারপর আব্বুর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বল্লো, আব্বু! তুমি যে প্রফেসর তা কিন্তু কাউকে বলো না। তুমি যদি কিছু না বল, তাহলে তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না, আবার যুদ্ধ করে আমাদের জয় হলে তখন তুমি প্রফেসর বলবে।

ওদের বাসস্থানের তিন-চার মাইলের মধ্যেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেত। ততদিনে স্বাতী চিনে ফেলেছে কোনটা মেশিনগানের শব্দ আর কোনটা শেল। বেশি আর অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হলে বুঝত পাকিস্তানিদের আওয়াজ, অন্যদিকে পাশাপাশি কম শব্দ হলেই বুঝতে পারতো বাঙালিদের গোলাগুলির শব্দ। সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী যুদ্ধের অনেক কথাই শিখে ফেলেছিল।

এইটা মেশিনগানের শব্দ, না আব্বু? দূরের শব্দ শুনে স্বাতী বলতো। কখনো ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলতো, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। খালি বিস্কুট খেতে চাও। যুদ্ধের সময় কি বিস্কুট পাওয়া যায়?

কান্নাকাটি থামিয়ে ছোট বোনটি তখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতো ওর দিকে। আম্মু ও আব্বু দুজনেই তাকাতেন। তখন ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনায় মুখর হতো স্বাতী; আমাকে আর ছোট বোনকে দুটো শাড়ি কিনে দিয়ো যুদ্ধ থামলে। আমরা না একদিন পোলাও খাব তখন! তখন তো তুমি আবার মাইনে পাবে। আমাদের সাইকেলে চড়ে আবার বিকেলে বেড়াতে যাব। আচ্ছা আব্বু, আমাদের অত সুন্দর বাড়িটা মিলিটারিরা নিয়ে গ্যাছে? তোমার বইগুলো ওরা নষ্ট করেছে? এসব কথা শুনে ওর আব্বুকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হতো, ছল ছল করতো ওর মায়ের চোখ। আশ্চর্য, এসব মোটেই বিষাদ-বেদনা জড়াতো না ওর কণ্ঠে। স্বাভাবিক সহজভাবে বলতো সব কথা। যুদ্ধক্ষেত্রের একজন সৈনিক যেমন জীবনের সকল অস্বাভাবিকতা দূর করে পৃথিবীর নির্মমতম সত্যটিকে হাতের মুঠোয় রাইফেল তুলে দাঁড়ায়, তেমনি ওদের ছোট্ট সংসারে বাস্তবের কঠিন সত্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য প্রেরণা যোগাত সে।

একদিন বিকেলে দিঘীর পাড়ে আব্বুর সাথে বসে ছিল স্বাতী। চুপচাপ বসে মেশিনগানের শব্দ শুনছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে, আব্বু! যুদ্ধ কেন হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর ওর আব্বুর অজানা—কি উত্তর হতে পারে এই অবোধ সরল শিশুর ক্ষুদ্র প্রশ্নটির? মানুষ মারার কারিগর ইয়াহিয়া খান! আপনি কি পারবেন এ প্রশ্নের জবাব দিতে? বাংলাদেশের মানুষের উপর কেন যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন আপনি? কি স্বার্থ রক্ষা

করলেন নিরীহ লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নির্বিচারে হত্যা করে? আপনি তো পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়েছিলেন; সেনাবাহিনীর পশুত্ব লেলিয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে নিহত করল কে? ইতিহাসের পাতায় একদিন পাকিস্তানের প্রথম শত্রু ইয়াহিয়ার কলঙ্কিত নামে সিন্ধু-বেলুচিস্তানের মানুষও থুতু ছিটাবে। আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রবাদে রূপ লাভ করবে এই কথাটি : বিশ্বাসঘাতকতার অন্য নাম ইয়াহিয়া খান।

কিন্তু স্বাতীর কথায় আসি। দিঘীর কালো জলের দর্পণে মুখ রেখে স্বাতী বলেছিল : আমাদের পেলেন্ থাকলে বেশ হতো।

পেলেন্ দিয়ে কি হবে? অন্যমনস্ক আব্বু প্রশ্ন করেছিলেন।

শান্ত ধীর কণ্ঠে স্বাতী বলেছিল, তাহলে পেলেনে বসে আমরা মেশিনগান দিয়ে ওদের মারতাম। আমাদের অনেক বন্দুক থাকলে মিলিটারিরা আমাদের সাথে পারত না।

হ্যাঁ মা—ওর আব্বু বলেছিলেন, আমাদের হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি হয়ে গ্যালো। অস্ত্র হাতে থাকলে তা হতো না।

স্বাতী কি বুঝেছিল কে জানে! আব্বুর হাত ধরে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিল, ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারবে না।

ওর আব্বুকে উত্তর দিতে হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে এর উত্তর লিখেছে রাঙ্গামাটির প্রান্তরে। সত্যি, ওরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। জল্লাদ বাহিনীর কয়েক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য ছাড়া আর কি আছে? হৃদয়হীন পাশব শক্তির উল্লাস ছাড়া ওদের অস্ত্রের আর কোনও ভাষা নেই।

আর বাংলার মাটির দুর্বার ঘাটিতে 'প্রত্যেকে সৈনিক আজ, প্রত্যেকে সৈনিক।' ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে? আমাদের মুক্তিফৌজের পাশপাশি দাঁড়িয়ে সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে। ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে?

স্বাতী কেবল একটি মেয়ের নাম নয়, এদেশের অগণিত শিশু মেয়েদের নাম— যে স্বাতী জাতির অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারার মতো সংগ্রামী জনতাকে পথ দেখায়, যে স্বাতী রাতের অন্তিমে আসন্ন সূর্যোদয়ের আবাহন জানাতে ঘন অন্ধকারেও প্রাণের আলো জ্বেলে রাখে।

"কলিজার রক্তে ভেজা মুহূর্তের সে মুক্তি মহিমা
আকাশ, তোমারে ভাঙ্গে সীমা!"

### ৩ জুলাই, ১৯৭১

দেশের শত্রু ॥

ছেলেটির বয়স ষোল কিংবা সতেরো। মুখের আদলটি কিন্তু আরও কচি। দেখতে চৌকোস। এস-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল দুটো লেটার নিয়ে। কলেজের ছাত্র ছিল ঢাকায়। মুক্তিফৌজের দফতরে এসে বলল, আমি গেরিলা যুদ্ধে নাম লেখাব।

তুমি এতো দেরী করে এলে কেন? প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

কি করব? আব্বা দিচ্ছিলেন না—কিছুটা উষ্মা ও ক্ষোভ ছেলেটির কণ্ঠে।

তোমার বয়সী ছেলেরা অনেকেই বাবার মতামতের অপেক্ষা করেনি। তদন্তকারী অফিসার বল্লেন।

জানি, একটু বিরক্তি স্বর ছেলেটির কণ্ঠে। বলল, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রাখলে আপনি কি করবেন?

তাহলে কি করে এলে? এবারে কৌতূহলের সুর অফিসারের কণ্ঠে।

অনশন করে। তিনদিন যখন না খেয়ে রইলাম, তখন মা-কে দরজার তালা খুলে দিতে হলো। মা অবশ্যি আব্বার ভয়ে কিছু বলতে পারেন নি, নইলে আটকে রাখার মতো মহিলা নন।

তোমার বাবাই বা আটকালেন কেন?

বাবার কথা বলবেন না, সে পরে বলব, আমি আবার একটু ভদ্র ছেলে ছিলাম কিনা, মুক্তিফৌজে যোগদান করব ভেবে বিদায় চাইতে গিয়েছিলাম।

অফিসার ভদ্রলোক অন্য প্রসঙ্গ তুল্লেন, বল্লেন—ঢাকার কি খবর বলো।

সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছে, ঐ যে "চরমপত্র" বলে অনুষ্ঠানটা—দারুণ পপুলার। আচ্ছা বলুন না ভদ্রলোক কি এই ক্যাম্পে থাকেন? আমি দেখব।

পাকিস্তানি বেতার লোকে শোনে না তাহলে?

শোনে মাঝে-মধ্যে, তবে স্বাধীন বাংলা না থাকলে ভারতীয় বেতারই শোনে বেশি। বিশেষ করে রাত সাড়ে দশটার সংবাদ পরিক্রমা।

ব্যাস! এবার বলো ঢাকার মুক্তিসেনার গেরিলারা কেমন কাজ করছে?

করছে বেশ ভালো, কয়েকটি তো ঘুঘু লোককে সাবাড় করে দিয়েছে। তবে টপ লিডার ফিগারগুলোর মাথায় মিলিটারি ছাতা ধরা কিনা, ঝড়-বৃষ্টি এখনও এদের গায়ে লাগেনি, দুচারটে বাজ ফেলতে পারলে কাজ হবে।

এরপর ছেলেটাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করা হলো। ওর নাম মোরশেদ। ঢাকার এক অভিজাত এলাকায় ওদের বাড়ি। ওদের এলাকায় একটি লিস্ট তৈরি করে মিলিটারিরা লোকজন ধরছে। বিশেষ করে কম বয়সী ছেলেদের। ওর জন্য অবশ্য বিশেষ ভয় ছিল না। ও বরাবরই একজন গুড বয়। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে ওর সচেতনতা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২৫শে মার্চের পরের ঘটনা ওকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করে। তারপরই মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাবে বলে ঠিক করেছে।

তদন্ত ও অন্যান্য কাজ শেষ হলে মোরশেদকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠান হলো। এতদিনে ওর সকল স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছে। সেই সফলতার ছাপ লাগল ওর চোখে-মুখে।

ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পের এক অফিসারের উপর ভার পড়েছিল একটি লিস্ট তৈরি করবার, তাতে পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর সাহায্যকারী দালালদের নাম সংকলিত করে ওদের খতম করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দান ছিল অফিসারটি কাজ। দুজন বন্ধুকে নিয়ে মোরশেদ ঢাকা থেকে নবাগত বলে উনি ওর সাথে আলাপ করছিলেন।

আপনি কি শত্রুদের লিস্ট করেন? মোরশেদ এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করল।

কেন? অফিসারটি এহেন প্রশ্নের জন্য বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না।

আমি আপনাকে একটা নাম দেব। মোরশেদ বলল।

সবার কাছ থেকে সব সময়ে অবশ্য নাম নেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে যদি শক্রতার উপযুক্ত প্রমাণাদি পাওয়া যায়, তবেই তার নাম তালিকায় রাখা হয়।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যি একজন শক্রর নাম আপনাকে বলতে পারি, মোরশেদ জানালো।

কিন্তু, সে তো সত্যিকার শক্র না-ও হতে পারে। আসলে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি না বললে ঠিক বোঝা যায় না কে কোন ধরনের শক্র। অনেকে ব্যক্তিগত শক্রতার জন্যেও আমাদের কাছে একজনের নাম দিয়ে বসতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয়।

ব্যক্তিগত শক্র হলেই দেশের শক্র হবে এমন কি কথা আছে? দেশের শক্র মানে দেশের শক্রই।

কিন্তু সেটা তুমি কিভাবে বিচার করবে। এমন তো হতে পারে যে, তুমি যাকে শক্র ভাবছ, চরম মূল্য দেবার মতো শক্র সে নয়।

আমি তাকে ভালো করেই চিনি। তিনি যে দেশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করেছেন, সে সম্পর্কেও কোনোরকম সন্দেহ নেই। মোরশেদ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লো কথাগুলো। সব অভিযোগ খুলে বল্লো।

কি নাম তার বলো। অফিসারটি কাগজ-কলম নিলেন। বল্লেন, যাচাই করে অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিতে হবে।

এবারে অকস্মাৎ ম্লান হয়ে উঠল মোরশেদের মুখ। চোখের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য যেন নিভে গেল, শীতল কণ্ঠস্বরে বল্লো—আমি একটা কথা বলতে চাই এ সম্পর্কে।

কি কথা?

ধরুন তাকে না মেরে বন্দি করে নিয়ে আসা যায় না?

সেসব আমরা দেখব। তোমার ভাবনার কারণ নেই, তাকে, যদি বন্দি করে রাখা যায় তো সবচেয়ে ভালো। বল্লাম তো! সে আমরা দেখব, অফিসারটি ওর চোখ-মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেই হঠাৎ থমকে গেলেন, বল্লেন, লোকটির প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে মনে হয়; কিন্তু ওর কাজের বর্ণনা শুনে কিন্তু তার প্রতি কোনও দুর্বলতা থাকার কথা নয়।

মোরশেদ চুপ করে রইল, কিছু বল্লো না।

কথা বলছো না কেন? অফিসার ভদ্রলোক সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

উনি আমার আব্বা, মোরশেদ বল্লো। ওর দুচোখের পাতা ভিজে উঠছে।

না। মোরশেদের আব্বার নামটি শেষ পর্যন্ত শক্রর তালিকায় উঠাতে পারেন নি অফিসার। ঐ তালিকায় নাম থাকার একটিমাত্র অর্থ, তা হচ্ছে মৃত্যু।

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে মোরশেদ এখন দিগ্বিজয়ের মতো একটির পর একটি দেশের শক্রকে খতম করছে। ওর মতো একটি ছেলের শুধুমাত্র জনক হয়ে মোরশেদের বাবা তার জীবনের মূল্য পরিশোধ করেছেন। জনাব আফতাব আলী সাহেব—ঐ হীরের টুকরো সন্তানের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করে নিজেকে আপনি সংশোধন করবেন না কি?

# প্রতিনিধির কণ্ঠ*

**১৯ জুলাই, ১৯৭১**

...টিক্কা-হামিদ, ভুট্টো-মওদুদী চক্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাপতি ইয়াহিয়াকে বলিলেন, "আলোচনার প্রয়োজন নাই, আলোচনা দ্বারা বাঙালিকে ঠাণ্ডা করা যাইবে না। সেনাবাহিনী প্রস্তুত হুকুম পাইলেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালি জাতিটাকে চিরদিনের জন্য হুকুমের গোলাম বানাইয়া দিতে পারি।" হুকুম মিলিয়া গেল। রাতের অন্ধকারে পরিকল্পনা মোতাবেক আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী নারী শিশু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ১০ লক্ষ বাঙালিকে খুন করিল। নগর, বন্দর গ্রাম, জনপদ, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, কারখানা, পত্রিকা অফিস সবই এই কসাইরা অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধ্বংস করিতে লাগিল। ইহারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করিল। বাঙালি জাতি এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জল্লাদদের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কসাইদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কারণে ৬০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইয়াহিয়ার নিয়মিত জল্লাদ বাহিনীতে যখন টান্ পড়িল, তখন পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনিয়মিত বাহিনী আমদানী করা হইল। বঙ্গশার্দুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি বলা হয় ইয়াহিয়া-টিক্কার হানাদার বাহিনী খতম হইয়াছে, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা যাহারা অসীম সাহসী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছি তাহারা দেখিয়াছি বাংলার সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনীর নাম শুনিলে কিভাবে এই হানাদার বাহিনীপ্রাণ লইয়া দৌড়ায়। মার খাইতে খাইতে ইহারা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে আসিতে নারাজ। অপরপক্ষে এই পশুবাহিনী নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চালাইয়া প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছে। এই প্রসঙ্গে দুই-একটি জেলার যুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে চাই। তাহা হইতে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত অবস্থা কি। একমাত্র নোয়াখালী জেলার শুভপুর, ছাগলনাইয়া, বান্ধুয়া, মুন্সিরহাট, পরশুরাম, রথি ইত্যাদি স্থানের সম্মুখযুদ্ধ হানাদার বাহিনীর তিন হাজারের উপর সৈন্য নিহত হইয়াছে। গেরিলাদের আক্রমণে এই জেলার পেনাঘাটা, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মাদাসব্রিজের নিকট, বগাদিয়া, আলোকপাড়া, কাঠালিয়া, পারপাড়া, পাঠাননগর ইত্যাদি স্থানে কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন, জে-সি-ও ইত্যাদি অফিসারসহ এক হাজারের উপর হানাদার বাহিনী নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যা নিহতের সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে। পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার শত্রুর অবস্থা আরও শোচনীয়। কুমিল্লা হইতে ফেনী পর্যন্ত হাইওয়ে রাস্তার দুই পার্শ্বে মিয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথ দিঘী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শালদা নদী, কসবা, আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি রণাঙ্গন হানাদার বাহিনীর গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে।

---

* জাতীয় সংসদ সদস্যদের বক্তৃতামালা থেকে সংকলিত।

মুক্তিবাহিনীর সাথে গ্রামবাসী একত্র হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিয়াছে। গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নোয়াখালীর এক গ্রামবাসীর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করিতে চাই। তাহারা পিতা-পুত্র দুইজনে শত্রু যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বের জমিতে ইরি ধান কাটিতেছিল। এমন সময় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়া শত্রুর সৈন্যসহ দুইখানা ট্রাক ধ্বংস হইয়া যায়। পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা তাহাদের নিকট ঘটনার বিষয় জানিতে জড়ো হয়। তখন বৃদ্ধ বলিতে থাকেন, "যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি, এইবার আল্লাহ তাহা দেখাইয়াছে। কামান-বন্দুকের কথা শুনিয়াছি কিন্তু গতকল্য যাহা দেখিয়াছি তাহা আল্লার গজব ছাড়া আর কিছু নহে। এই পাঞ্জাবি পশুরা নিরীহ গ্রামবাসী মা-বোনের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, শরিয়ত-বিরোধী কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। তাই আল্লাহতায়ালা এই গজবিয়াগো উরফে এক্কারে নারাজ অই গ্যাছে। নইলে কওচেন, হিগুন যাওন লাগছিল রাস্তার হরদি গাড়ি চালাইয়া, আচমবিৎ মাটির তলেত্তুন আওয়াজ করে কি একটা বারঅই হিগুনের কিল্লাই ধ্বংস কল্লো! ইয়াত্তুন আঁর মনে ইইচে ইগুনের উরফে আল্লার গজব নাজিল অইচে। আল্লা মজিবের উরফে রাজী অই গ্যাছে। মজিব এই যুদ্ধে জিতবো। নইলে আল্লার কিতাব মিইছা।"...

(নূরুল হক, এম-এন-এ)

**৫ আগস্ট, ১৯৭১**

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ বর্তমানে পঞ্চম মাসে পদার্পণ করল। প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম এবং প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ২২ বৎসর যাবৎ টিকে আছে। যুদ্ধ আমরা চাইনি, যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ চাইনি। বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করেছিলাম। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পশ্চিম পাক সামরিক জান্তা ভেবেছিল আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে কিন্তু অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ওরা ভেবেছিল বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল আছে তাদের কিছু কিছু বাঘা বাঘা নেতা নির্বাচনে জয়লাভ করবেই এবং সেই সমস্ত 'কুইস্লিং'দেরকে নিয়ে যে পরিষদ গঠিত হবে তাতে আওয়ামী লীগ খুব জোর হলে প্রধান বিরোধীদল হিসাবে পরিষদে আসন গ্রহণ করবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত নির্বাচনে সারা বাংলার সংগ্রামী মানুষ যেন এক হয়ে গেল এবং শতকরা ৯৮১/২টি আসনে জয়লাভ করে অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। তার পরেই শুরু হলো নতুন খেল। সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করে ফেরার পথে মন্তব্য করল যে "আমি পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে এসেছি।" এদিকে পূর্বেই আয়োজিত লারকানায় শিকারের বাহানায় ভুট্টোর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলল যে,

চিরাচরিত প্রথায় অর্থাৎ মন্ত্রীত্বের টোপ ফেলে যেভাবে বাংলাদেশ থেকে নেতা সংগ্রহ করে বাংলাদেশকে শোষণ করা হয়েছে সেভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীত্বের টোপ আমি দিয়ে এসেছি। ভুট্টো তুমি শক্ত হয়ে যাও। ভুট্টো তার চিরাচরিত প্রথায় আবোল-তাবোল বকা আরম্ভ করে দিল এবং তার ঔদ্ধত্য এতখানি বেড়ে গেল যে, সে বলল—"পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।" অথচ সবাই জানেন যে, সিন্ধু প্রদেশ '৪৭ সালের পরে কোনও সময়ই শাসনযন্ত্রের চাবিকাঠি হাতে পায়নি। পশ্চিম পাঞ্জাবের সামন্ত প্রভু এবং আমলাতন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে সিন্ধু প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার যোগান দিত। আমাদের তরফ থেকে আমরা জবাব দিলাম যে, স্মরণকালের ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাব কোনও সময়ই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ছিল না, বরং বৈদেশিক আক্রমণে বিদেশীদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, আলেকজান্ডার হতে আরম্ভ করে যত বিদেশী আক্রমণকারী ভারতবর্ষে স্বল্পকাল অবস্থান করেছেন বা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন তাদের অনেকেই নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আসেননি।

যাইহোক ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধুর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে বঙ্গবন্ধু পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি জনগণের কাছে আমার দলের ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচি দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি। এ থেকে একচুল নড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভুট্টো বলেছিল সে তার দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুট্টোর ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আপনাদের সকলেরই জানা আছে। যাই হোক সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনাপতি ইয়াহিয়াকে তারযোগে জানিয়ে দিলেন যে, যদি ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হয় তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তার পরে ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। এদিকে ভুট্টোর একগুঁয়েমির কারণে পহেলা মার্চ বেআইনী এবং অগণতান্ত্রিকভাবে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই মুলতবি ঘোষণা করে দিল। সারা বাংলাদেশ আন্দোলনে ফেটে পড়লো। শত শত ছাত্র-জনতা ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন। সংগ্রামী ছাত্রলীগ ২রা মার্চ ঢাকা এবং ৩রা মার্চ প্রদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করল এবং আওয়ামী লীগ ৫ই মার্চ প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রমনার ঘোড়দৌড় ময়দানে আয়োজিত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশে ঘোষণা করলেন, "শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ দিয়ে আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।" তিনি ঘোষণা করলেন যে, অবিলম্বে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সৈন্যদেরকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ২রা মার্চ হতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে তাদের হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে—অন্যথায় আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।

পরবর্তীকালে ১৫ই মার্চ থেকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ তার উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সকল শর্ত মেনে নিল এবং ২৪ কি ২৫শে মার্চের মধ্যে উহা ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু আসলে এই দীর্ঘসূত্রিতা অতি সংগোপনে সামরিক প্রস্তুতির বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিওর ঘোষণা দূরে থাকুক আসলে ২৫শে মার্চ রাতে ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান নিয়ে হানাদার বাহিনী বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা এবং বিভিন্ন রেজিমেন্টে যে সমস্ত বাঙালি অফিসার ও নিয়মিত বাঙালি আছে তাদেরকে নিরস্ত্র করে হত্যা করা এবং ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেয়া। তাই তারা যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে নিয়মিত বাহিনীর বাঙালিদেরকে হত্যা করেছে, এবং ই-পি-আর পুলিশ বাহিনীর উপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আমাদের বাঙালি ছেলেরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে এবং দেশমাতৃকাকে হানাদারের কবলমুক্ত করার অগ্নিশপথে সারা বাংলার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-জনতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আজকে বাংলার প্রতিটি ঘর এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য মরীয়া হয়ে হানাদার বাহিনী নারী ও শিশু সমেত হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে চলেছে। ইয়াহিয়া বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের জন্য আমাদের মন ও প্রাণ শোকাপ্লুত এবং অভিভূত। ...

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আজকে আপনারা সকলেই বিক্ষুব্ধ। বাঙলার ঘরে ঘরে এমন কোনও পরিবার নেই যাদের কেউ না কেউ কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বঙ্গবন্ধুব নামে আজকে আপনাদেরকে ডাক দিয়ে যাই—বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার আপনার সকলের। মুক্তি বাহিনী আজ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দিন দিন এর শক্তি বেড়েই যাবে, কমবে না। আপনারা ধৈর্য ধরুন। বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে আমরা উদ্বুদ্ধ। একটি বাঙালি বেঁচে থাকা পর্যন্ত হানাদারদের রেহাই নাই। বাঙলা মায়ের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব কায়েম আমরা করবোই। বাঙালি হিসাবে জন্মেছি, বাঙালি হিসাবে বাঁচবো, বাঙালি হিসাবে আমাদের জীবনতরী বেয়ে যাবো আর বাঙালি হিসাবেই মরবো—এই মন্ত্রই হোক আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই।

"আমাদের যাত্রা হলো শুরু
এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এবার বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক
ফিরবো নাকো আর
ওগো কর্ণধার।"

আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। জয় বাংলা ॥

(মিজানুর রহমান, এম-এন-এ)

২১ আগস্ট, ১৯৭১

শেখ মুজিব আজ আর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়— শেখ মুজিব আজ বাংলার ইতিহাস। বাংলার ২৩ বছরের রাজনীতি তথা সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে তিনি এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। শোষণ ও পীড়নের রাজনীতিতে শেখ মুজিব এক আশ্চর্য প্রতিবাদ। প্রতিবাদ তিনি করেছেন সমস্ত জীবন ধরে সমস্ত সত্তা দিয়ে। তিনি তাঁর পর্বতপ্রমাণ অটল সাহস ও মনোবল নিয়ে সবকিছু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে এককভাবে বাংলার ইতিহাসে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ সেই শেখ মুজিব, যাঁকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধু নামে আখ্যায়িত করেছিল এবং যিনি শুধু মুজিব ভাই বলে সবারই কাছে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং বিচারের নামে প্রহসন চলছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার সন্তান। বাংলাদেশে জন্মেছেন, বাংলাদেশে লালিত-পালিত, বাংলাদেশকে ভালোবেসেছেন এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাঙালির স্বার্থে বাঙালির মুক্তি কামনায় নিজের জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়ে ছিলেন। সেই শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে না রেখে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোষক গোষ্ঠী সমস্ত রকমের আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়েও নিরীহ বাঙালির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে ১২০০ মাইল দূরে বন্দি করে রেখেছে। শুধু তাতেই তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করেনি। বাঙালির কণ্ঠকে ও দাবীকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করার জন্য তাঁকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ...

এবারের এই বন্দিদশা তিনি অনায়াসে এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে, বিশ্বাস করতেন অহিংস আন্দোলনে। তিনি কোনোদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি যে, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। তিনি কোনোদিন চাননি নিরস্ত্র, নিরীহ জনসাধারণের রক্তে বাংলাদেশ রাঙা হোক। আগরতলা কেস থেকে মুক্তি পেয়েই রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, "আমি জনগণের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করব না, দেশের স্বাধীনতার জন্য দরকার হলে সবার আগে আমি রক্ত দেব।" তিনি নিজের ঘোষণার সম্মান দিয়েছেন। আজ তিনি ধৃত। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে তিনি সবার আগে তাদের হাতে ধরা পড়েছেন।

আর আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া বিচারের আসনে বসেছেন। কিন্তু কার বিচার কে করে? তাঁকে বিচারের অধিকার খুনী ইয়াহিয়ার নাই। শেখ মুজিব সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-ভরসার স্থল, তাদের একচ্ছত্র নেতা। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া তাঁকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিনন্দিত করতেও কসুর করেনি। আজ শেখ মুজিবুর রহমান যদি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে ইয়াহিয়াকে তাঁরই হুকুমের তাঁবেদার হতে হতো। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শেখ মুজিবের বিচার তিনি করতে বসেছেন। যদি বিচার করতেই হয় তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? কেন আজ স্থানের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে? কেন বিচারকদের নাম জনগণকে

জানান হচ্ছে না? কেন বাইরের কৌসুলি আসবার অনুমতি দেয়া হয়নি? শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী বা দেশের শত্রু হন তাহলে সাধারণ কোর্টে এবং সবার সামনে বিচার করার মতো সৎসাহস থাকা উচিত ছিল। ...

আজ পৃথিবীর শান্তিকামী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের দাবী ও আবেদন তাঁরা যেন শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ করতে জল্লাদ ইয়াহিয়াকে বাধ্য করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কোনও একটি বিশেষ দেশের মানুষ নন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতীক, তিনি নিপীড়িত জনগণের ত্রাণের প্রতীক। তাঁর জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশের লোকের নয়, তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের। শেখ মুজিবকে হত্যা মানেই গণতন্ত্রকে হত্যা করা—সত্য ও ন্যায়কে আবর্জনার আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া।

বাংলাদেশের মা-বোনের তরফ থেকে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তাঁর মতো মহান নেতার কোনও ক্ষতি আমরা সহ্য করবো না। এবং তাদের এই বলেই সাবধান করে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও লোককেই ক্ষমা করবে না। ...

(বদরুন্নেসা আহমেদ, এম-এন-এ কর্তৃক
'শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে' শিরোনামে লিখিত ভাষণ)

**১৫ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মানুষের উপর যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন বাংলার শ্যামল প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে চললো, যখন বাংলার আকাশ নির্যাতিত মানুষ ও ধর্ষিতা মা-বোনদের আর্তনাদে বেদনাকরুণ, তখন পৃথিবীর মানুষের চোখে এক নিদারুণ বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। পরম বিস্ময়ে মানুষ দেখেছিল বিশ্ববিবেক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সরকার, যারা গণতন্ত্র এবং মানবতার নামে চীৎকারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের এই রক্তপ্লাবী ঘটনাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে একটা ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টারও অন্ত ছিল না। এদের মনোভাব দেখে এই সময়ে মনে হয়েছিল ব্যবসার মুনাফার বেদীমূলে তারা মানবতাকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত নন। বাংলাদেশের ঘটনা যে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয় সেই সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "লাখো লাখো আদম সন্তানের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। পাকিস্তান আজ মৃত। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জাতির জন্ম হয়েছে।" কিন্তু তার এই পরিষ্কার ঘোষণাটিও যেন তখন পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মনে কোনও সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল মানবতাকে রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মুক্ত মানুষের মন সোচ্চার হয়ে উঠলো বাংলার মানুষের সপক্ষে। ধিক্কার দিল তারা ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসক ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্রকে। ব্যবসার মুনাফার গোলকধাঁধায় বাধা সরকার ছাড়া প্রতিটি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ইংল্যান্ডের লিবারেল দলের M. P. মি. রাসেল জনস্টোন ৩১শে মার্চে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বললেন :

"আমি বিশ্বাস করি না ইহাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া ব্রিটেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে। আমাদের চোখের সম্মুখে যে ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা চূড়ান্ত বর্বরতার নামান্তর মাত্র। শান্তি ফিরাইয়া আনা এবং মীমাংসার জন্য কমনওয়েলথের প্রধান সদস্য হিসাবে ব্রিটেনকে তাহার সমস্ত কিছুই করিতে হইবে।"

"Coflict in East Pakistan : Background & Propsect" শিরোনামে হাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক—মি. এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান এবং স্টিফেন এ, মার্গলিন ১লা এপ্রিল তারিখে লিখলেন :

"স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম, বাংলাদেশ হবে একটি সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই স্বাধীনতার জন্য তাকে কত রক্ত ঢালতে হবে।"

History of Economics & Political Domination of East Pakistan পত্রিকায় Herbert বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপন সোসাইটি লিখলেন, "বাঙালিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ লড়ছে। এই যুদ্ধে তাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের কত প্রাণ দিতে হবে এবং তাদের কত সম্পদ ধ্বংস হবে।"

৯ই এপ্রিল নেপালের 'অর্পন' পত্রিকা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলো, "ইহা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আজ শুধুমাত্র কল্পনা নয়, একটি বাস্তব সত্য।"

১৩ই এপ্রিল তুরস্কের পত্রিকা 'আকসাস' লিখলো, "পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ছে।"

ইন্দোনেশিয়ার 'জাকার্তা" পত্রিকা ১৫ই এপ্রিল লিখলো, "পূর্ব পাকিস্তানিরা আর পাকিস্তানি নামে পরিচিতি হইতে ইচ্ছুক নয়। তারা বাঙালি—এই পরিচয়ই গ্রহণ করেছে। কারণ আজ 'পাকিস্তানি' শব্দ দ্বারা তারা মনে করে একদল সৈন্য, যারা তাদের লোকজনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।"

৩০শে মার্চ চিকাগো ট্রিবিউন লিখলো, "পৃথিবীর যে অংশটি একদিন ভিয়েতনামের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখর ছিল, সেই অংশে আজ শত-সহস্র লোককে মেশিনগানের গুলিতে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ভিয়েতনামে গত ৪ বছরে যত লোককে হত্যা করা হয়নি তার চেয়েও অধিক লোককে মাত্র ৪ দিনে হত্যা করা হয়েছে।"

৭ই এপ্রিল 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখলো, "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা করছে, চাক্ষুষ দর্শীর এই বিবরণ সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং নীরবতা মানুষের কাছে নিশ্চয় পীড়াদায়ক। বাংলাদেশের এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয় একটি মানবিক দায়িত্ব রয়েছে।

শুধুমাত্র এই কয়েকটি পত্রপত্রিকাই নয়, লন্ডনের ডেইলি মেইল, ডেইলি টেলিগ্রাফ, New Stateman, Sanday Times, London-এর Time পত্রিকা, গার্ডিয়ান,

Sunday Telegraph, Newsweek, Christian Monitor, Washington Post, Ockland Tribune, Bultimore Sun, Otowa Citizen, চিলির আলমারকিউরিও, ব্রুসেলসের লা লিব্রা, জাপানের Time পত্রিকা, আরব রাষ্ট্র কুয়েতের আখবর-আল-কুয়েত, সিরিয়ার আল-তাউরা, রাশিয়ার প্রাভদা, ইত্যাদি সমস্ত পত্রিকায় পৃথিবীর মানবতাকামী মানুষ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেন, স্বাধীনতাকামী বাংলা মানুষকে জানালেন আন্তরিক সমর্থন।

হিমালয়ের ঘুম ভাঙলো। পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেবার বিরুদ্ধে আমেরিকার সিনেটে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন সিনেটর কেনেডি। শ্রমিকরা পাকিস্তানি জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে অস্বীকার করলেন। আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য কমিটি পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন।

ব্রিটেন, ফ্রান্স পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলো। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন গণহত্যার নিন্দা করে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য দাবী জানালেন।

এবার বাংলাদেশের সপক্ষে এগিয়ে এল উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম। সংগ্রামী উত্তর ভিয়েতনাম ঘোষণা করলো : "বাংলাদেশের যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।" বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে তারা পূর্ণ সমর্থন জানালেন—কিন্তু বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল চীনের প্রতি। ইয়াহিয়া বারবার হ্রেষা ধ্বনি করছিল, "চীন আমাদের সাথে।" চীনের কণ্ঠ নীরব। অবশেষে চীন মুখ খুললো,ভুট্টোর চীন গমন উপলক্ষে ভোজসভায়। বিভ্রান্ত ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসাবে মানবতার ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য অপরাধী ভুট্টো গিয়েছিল চীনের সমর্থন আদায়ের জন্য।

ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো চক্র মনে করেছিল চীন তাদের কুকর্মকে সমর্থন জানাবে, কিন্তু চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মুখে চপেটাঘাত করলেন। ভোজসভায় চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোকে পরামর্শ দিলেন পূর্ব বাংলা সম্বন্ধে একটি যুক্তিসম্পন্ন মীমাংসা করতে। শুধু তাই নয়, চীন ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের সমস্ত প্রচারণার মুখে পদাঘাত করলেন।

১১ই নভেম্বর B.B.C. র খবরে প্রকাশ, চীন পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। চীন বলেছে, "কোনও অবস্থাতেই ভারত আক্রমণ করা পাকিস্তানের উচিত হবে না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার আকারে নিরাপত্তা পরিষদে তোলার আবেদন জানিয়েছিল।.চীন তার সেই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছে।

চীনের এই কথার অর্থ এই দাঁড়ায়, চীন পাকিস্তান সরকারের কার্যাবলী সমর্থন করতে প্রস্তুত নয় এবং ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কারকেও চীন অসার ও অযৌক্তিক মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যাকে চীন পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে দেখতে রাজী নয়।

এইদিকে মার্কিন সরকারও পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে আজ ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার সারা বিশ্বে অসহায় এতিমের পর্যায়ে নেমে এসেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলার মানুষের

সপক্ষে। বাংলার দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছেন। তাদের ক্ষিপ্রতায় এবং প্রচণ্ডতায় হানাদার বর্বর পাক বাহিনী দিশেহারা।

সেদিনের স্বল্প অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিবাহিনী আজ বিশ্বের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং দুর্ধর্ষ অজেয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তারা প্রস্তুত হচ্ছে চরম আঘাত হানার জন্য, বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটিকেও নিশ্চিহ্ন করার জন্য। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

(জিল্লুর রহমান, এম-এন-এ)

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিগত প্রায় আট মাসাধিককাল যাবৎ আমরা সবাই মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত আছি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মুক্তিসংগ্রামে শরীক হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোরবানী দিয়েছে কোনও না কোনও ভাবে। মুক্তিযুদ্ধ ও সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের পার্থক্য এই যে, সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে জোর করে যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়; বেতনভোগী (Mercenary) সৈন্যরা দায়ে পড়ে অথবা পদের লোভে বা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়—সুশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুসেনাকে খতম করার জন্য মাতৃভূমিকে শত্রুকবল হতে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে। আমাদের বাংলাদেশের বাহাদুর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার ও মোজাহেদ বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার সংগ্রাম পরিষদের বাহাদুরেরা প্রথমে এরূপ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমরনায়ক ইয়াহিয়া টিক্কা খানের হানাদার দস্যুবাহিনীর বর্বর আক্রমণ রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের সর্বস্তরে নরনারী, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মজদুর তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে পরবর্তীকালে এই চরম সংগ্রামে শরীক হয়েছে— কেহ সক্রিয়ভাবে, কেহ পরোক্ষভাবে, সক্ষম যুবকেরা অস্ত্রের মাধ্যমে এবং শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও কূটনীতিবিদ সাধ্যমতো তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার মাধ্যমে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মুক্তিযুদ্ধ কারও একার কর্তব্য। অবশ্য যুগে যুগে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বেঈমান, সুবিধাবাদী, 'কুইস্‌লিং' বা 'মীরজাফরদের' যেমন ভূমিকা ছিল, আমাদের এই সংগ্রামেও মীরজাফরেরা তেমন নিষ্ক্রিয় নয়। দেশবন্ধু তাই একসময়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় বেশী।" সোনার বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরীহ 'মাসুম' নরনারী, শিশু, যুবক-যুবতীকে নির্বিচারে হত্যার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ নারীর শ্লীলতাহানি ও সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে, বাংলার কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা, লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির অপরাধে, প্রায় ৯৫ লক্ষ

নরনারী-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার অপরাধে এবং অপর প্রায় ২ কোটি লোককে গৃহহারা-বাস্তুহারা এবং ছিন্নমূল করার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা তথা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করার অপরাধে ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টো-হামিদ যেমন অপরাধী—তেমনি এই জল্লাদচক্রের ক্রীড়নক সহযোগী মাহমুদ আলী, ডা. মালিক নূরুল আমীন গং এবং তাদের প্রত্যেকটি সক্রিয় সমর্থক ও তাঁবেদারগণও সমভাবে অপরাধী এবং সমভাবে শাস্তির যোগ্য। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের বিধান অনুসারে হত্যাকারী এবং তার সহযোগীকে একই আইনে ফাঁসি দেয়ার বিধান চালু আছে। সহযোগী বা নরহত্যাকারীর সহকারী সম্পর্কে আইনে বলা আছে, As if he himself committed murder—অর্থাৎ, সহযোগী যেন নিজেই খুন করেছে। কাজেই ইয়াহিয়া চক্রের দালালদের সম্পর্কে এই চালু ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বন্ধুগণ, "Truth shall prevail"—এটা universal truth বা সার্বজনীন সত্য—অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই, আমাদের পবিত্র কোরানেও আছে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

অর্থাৎ "সত্য সমাগত—মিথ্যা অপসৃয়মাণ, এবং মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

আমাদের এই আজাদীর সংগ্রাম মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জালেমের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মজলুমের সংগ্রাম। আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষায়—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই যুদ্ধে ইন্‌শাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই। আমাদের মনজিলে মকসুদে আমরা পৌছবই।

দুনিয়ার সমস্ত আজাদীর ইতিহাসে দেখা যায় স্বাধীনতা "অর্জন করা হয়েছে"। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক কোরবান হয়েছে, নানাভাবে আজাদীপাগল মানুষ নির্যাতন ভোগ করেছে, শোষিত হয়েছে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে, সঙ্গীনের আঘাত খেয়েছে, ফায়ারিং স্কোয়াডে আত্মাহুতি দিয়েছে—কিন্তু শির দিয়েছে তবু আমামা দেয়নি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে ফাঁসির রজ্জু বরমাল্যের মতো কণ্ঠে বরণ করে আজাদীর জয়গান গেয়েছে, তবুও জাতির স্বাধীন সত্তাকে বিলিয়ে দেয়নি—স্বাধীন পতাকাকে অপমানিত হতে দেয়নি। ইতিহাসে মহাচীন, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে স্বীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কেহই স্বাধীনতা দান হিসাবে বিনা রক্তপাতে পায়নি। অবশ্য ওদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা পেয়েছে সভ্য জাতির নিকট হতে, সক্রিয় বা পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছে। আমরাও আশা রাখি, দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশ হতে সাহায্য-সমর্থন পাবো। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে অনেকের হয়ত ভ্রান্ত ধারণা যে, মেহেরবানী করে ব্রিটিশ সরকার আমাদিগকে স্বাধীনতা দান করে গিয়েছেন। বাস্তবপক্ষে কি তাই? ১৮৫৭ ইং সনের সিপাহী বিদ্রোহ, ক্ষুদিরাম, ভগৎসিং এবং হাজার হাজার সিপাহীর ফাঁসির কি কোনও দাম নেই? নেতাজী সুভাষ

বসুর পরিচালনায় বার্লিন, সিঙ্গাপুর, মালয় বর্মা ও বিভিন্ন স্থানে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করা হয়েছিল, তা কি কম চাঞ্চল্যকর? মনিপুর ও ইম্ফল অপারেশনে যে প্রায় ছয় হাজার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (INDIAN NATIONAL ARMY) অনাহারে-অর্ধাহারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষ তথা ব্রিটিশ আর্মির হাতে যে বিভিন্নভাবে প্রায় ২০ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দি হয়েছিল, নির্যাতন ভোগ করেছিল বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তা কি এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি? বর্মা, রেঙ্গুন, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, জার্মান, জাপান ও অন্যান্য স্থানের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় (তদানীন্তন) নাগরিকগণ কেহ কেহ তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও কোটি কোটি টাকা এবং কেহ কেহ মোট সম্পদের একটা অংশ INA ফৌজকে দান করেছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির King's Commission প্রাপ্ত Major G.S. Dillon, শাহনাওয়াজের মতো শত শত কমিশন্ড অফিসার এবং হাজার হাজার জোয়ান ব্রিটিশ সরকারের চাকরি ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্রোতে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল। ICS পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেও নেতাজী সুভাষ বসু যে চাকরি ত্যাগ করেছিলেন, তা কি বৃথা গিয়েছে? বস্তুত এইসব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ উপমহাদেশের আজাদী লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আমার প্রিয় ধর্মভীরু দেশবাসীকে বলা প্রয়োজন যে, মি. জিন্নার পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। এবং এটাকে অপমৃত্যু চলা চলে না। অবশ্য পাকিস্তানের জন্মটাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলা চলে। কাজেই এর প্রতি আর কারও কোনও মোহ থাকা উচিত নহে। পাকিস্তানরূপী যে শিশুকে তিওয়ানা-নসরুল্লা কোম্পানির আকবার-আহরার পার্টি তথা পশ্চিমা সামন্তবাদ চক্র জন্ম দিতেই চায়নি, তারাই পরবর্তীকালের স্বীয় বুর্জোয়া স্বার্থে সে শিশুর দাবীদার সেজে প্রকৃত জন্মদাতা তথা নিরীহ ধর্মভীরু বাঙালিকে বিগত ২৪ বৎসর ধরে নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন করেছে। ইসলাম, সংহতি ও মুসলমানের নামে বহু অনৈসলামিক কারবার বেঈমানী ও ধোঁকাবাজি করেছে। ব্যবসায়ী স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা ভাই বলে মুখে প্রচার করেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষকে কোনওদিন তারা হৃদয়ে স্থান দেয়নি। লক্ষ লক্ষ বাঙালি বন্যায়-জলোচ্ছ্বাসে-ঘূর্ণিঝড়ে শিয়াল-কুকুরের মতো প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা শোষকচক্র, কখনও শোষণের যাঁতাকল বন্ধ করেনি। ১৯৬৪ সনে যখন পূর্ববাংলার এক মহকুমায়ই ১৮ হাজার লোক একরাতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারিয়েছিল তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সফর করতে পূর্ববঙ্গে না এসে লন্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। লন্ডনের পত্রপত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল : "18 thousand people died, who cares?" অর্থাৎ, বিগত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালীতেই যখন প্রায় ১০ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারা নরনারীর অগণিত মৃতদেহ পদ্মা-মেঘনা-যমুনাতে এমনকি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে পর্যন্ত ভেসে ভেসে যাচ্ছিল—তখন আমাদের গরিবের ট্যাক্সের টাকায় কোনও Gunboat, Helicopter কোথায় ছিল? তদানীন্তন গভর্নর এডমিরাল আহসান

বলেছিলেন, "আমি Islambad-এর কাছে Helicpter চেয়েছিলাম—কিন্তু পাইনি।" সেই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ। লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। ভারত সহ দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্র হতে সাহায্য-সম্ভার এসেছিল, হেলিকপ্টার এসেছিল। তখনও পিণ্ডি-ইসলামাবাদশাহীর হৃদয় বিগলিত হয়নি। শত শত নরনারীকে, স্ত্রী ও পুরুষকে একসাথে কবরস্থ করা হয়েছিল। এমনকি হিন্দু-মুসলমানকে একসাথে এক গোরে দাফন করা হয়েছিল—কারণ দাফনের কাপড়েরও অনটন হয়েছিল। Gunboat ছিল না, অর্থ ছিল না। এক ফোঁটা পানি, এক মুঠো অন্ন ও লজ্জা নিবারণের এক টুকরো কাপড়ের জন্য লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে সারা দুনিয়া বিগলিত হয়েছিল, সাহায্য-সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু বিগলিত হয়নি আদমজী, ভালিকা, আমীর আলী, ফেন্সী, দাউদ ও গান্ধারা গোষ্ঠীর তথা পশ্চিমা ২২-পরিবারের হৃদয় এর পরও আপনারা এদের ইসলামী দরদের ধোঁকামিতে বিশ্বাস করেন? এদের ইসলাম শোষণের যন্ত্রবিশেষ। আসলে এরা ইসলাম মানে না। ১৪ শত বৎসর পর্যন্ত প্রতি জুম্মাতে, ঈদে আপনারা খোতবায় শোনেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

—আল্লাহ 'আদল' ও এহছানের কথা তথা ন্যায়বিচার ও ইনছাফের কথা, মঙ্গলের কথা বলেছেন; আর এই লুটেরা দস্যুদল পাক কোরানের এই নির্দেশ অমান্য করে যুগ যুগ ধরে বেইনসাফ ও বেঈমানী করেছে। ভাইসব, দুনিয়ার কোনও রাষ্ট্রই শুধু ধর্মীয় বন্ধনের নামে বা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জোর করে অবাস্তব ও অসম্ভবকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। তাই বহুদিন জোড়াতালি দেয়ার পর নকল পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আর যদি কেহ মনে করেন পাকিস্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তজ্জন্যও বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ বা পূর্ববঙ্গবাসী দায়ী নহে।

বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত Artificial Heart Tenasplantation করে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে পাকিস্তানকে জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ২৫শে মার্চের গভীর রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া-টিক্কাখান-ভুট্টোচক্র বেয়নেটের খোঁচায় পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এর জন্য এককভাবে তারাই দায়ী। তারপর ১০ লক্ষাধিক বাঙালি নরনারী-শিশু-যুবক-যুবতী-মা-ভাই-ভগ্নির তাজা রক্তস্রোতের অতল তলে পাকিস্তান নিমজ্জিত হয়েছে—ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রাণরক্ষা আর সম্ভব নহে। ইসলাম Universal—আল্লাহ সবার। আমরা 'আলহামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামীন'—অর্থাৎ 'সব প্রশংসা তাহার জন্য যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন' ..... মোট কথা, ইসলাম Co-existence, Co-havitation ও Compromise-এর ধর্ম। এক কথায় ইসলামের মর্মকথা Secularism-এর মর্মকথা। কাজেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে তুলবো এমন এক সমাজব্যবস্থা যা হবে সার্বজনীন—Universal and

Secular—যাতে থাকবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার। থাকবে না মানুষে মানুষে কোনও বিবাদ-বিচ্ছেদ, কোনও ভেদাভেদ। আর আমাদের এই মহান মূলমন্ত্রের হোতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তথা দুনিয়ার সমস্ত মজলুম বঞ্চিত মানবতার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাগ্যের পরিহাস, তিনি আজ জেনারেল ইয়াহিয়ার কারাগারে আটক, আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সাবধান করে দিতে চাই—বঙ্গবন্ধুর কোনও ক্ষতি সাধিত হলে সমগ্র বিশ্ব দাবানলের অগ্নির মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এখনও সময় আছে জেনারেল ইয়াহিয়া, তাকে এখনও মুক্তি দাও—নচেৎ শুধু তোমার পাকিস্তান নয় অচিরেই তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে। জয় বাংলা॥

(আবদুল মালেক উকিল, এম-এন-এ)

# অভিজ্ঞতার আলোকে

**২৪ জুলাই, ১৯৭১**

বাংলার মুক্তি আন্দোলনে যারা রক্ত দিয়েছেন, যারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রায়কে উপেক্ষা করে, গণতন্ত্রের সমস্ত নীতি পদদলিত করে এবং মানবতার সমস্ত শিক্ষাকে মথিত করে স্বৈরাচারী বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরপরাধ নিরস্ত্র বাঙালি জনতার উপর ২৫শে মার্চের রাতে। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করার পূর্বেই প্রচারিত হয়ে গেল এখবর, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপের ঘটনা। কিন্তু বাংলার মানুষ এবার মরণজয়ী। সামরিক বাহিনীর কামান, ট্যাংক, মর্টার, বিমান ও আরও হাজার ধরনের উন্নত মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো তারা। বিপুল বিক্রমে বিশ্বাসঘাতক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো EPR, পুলিশ বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর। এ খবরও প্রচারিত হলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিশাবসানের পূর্বেই। সচেতন জনতা বুঝতে পারলো মুক্তি তাদের সোজা পথে আসবে না। স্বাধীনতা তো ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হয়। এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় রক্তের। জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো বঙ্গবন্ধুর বাণী "রক্ত যখন দিতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।" বাংলার বীর জনগণ রুদ্ররোষে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কৃষক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও জনতা অস্ত্র হাতে তুলে নিল। কোটি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো রক্তের বিনিময়ে বাংলার মুক্তি আদায় করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, পরাধীনতার গ্লানির অবসান করার দীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

এ ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে আঘাত করলো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর সে ঢেউ এসে সাড়া জাগালো হজরত শাহ মখদুম শাহ্‌দৌলার পদস্পর্শে পবিত্র শাহ্‌জাদপুর সহ পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, ফরিদপুরসহ আরও অসংখ্য গ্রামে। প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলো সবাই। মুক্তিবাহিনী গঠিত হলো মহল্লায় মহল্লায়। মা-বোনেরা এবং অশীতিপর বৃদ্ধও এসে দাঁড়ালো মুক্তি বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সবার মুখেই একই মন্ত্র "জয় স্বাধীন বাংলা"। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলো শত্রু বাহিনীর আগমনের— মোকাবেলা করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে দা এবং কারও হাতে মজবুত লাঠি। বাইরে থেকেও মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা এল। বিভিন্ন জায়গায় ছাউনি ফেলা হলো। শেরপুর থেকে নগরবাড়িঘাট পর্যন্ত ঐ রকম ছাউনি পড়লো পাঁচ-ছয়টা। এ সমস্ত ছাউনিতে বাংলার মুক্তিসেনাদের হাতে সাধারণত বন্দুক, রাইফেল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে নেওয়া কিছু উন্নত ধরনের অস্ত্র থাকতো। সোনার বাংলার সোনা মুক্তিযোদ্ধাদের জনতা আপন করে নিল। নিষ্পেষিত, অধিকারবঞ্চিত জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখতে পেল স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি। একটি ঘটনা বলি। একদিন দুপুরের দিকে খেয়া নৌকায় পার হচ্ছি। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন যুবক। নৌকারোহীরা মুক্তিসংগ্রামে মোমেনের ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ উঠে এলেন আমাদের কাছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোমরাই তো বাবা অবহেলিত, লাঞ্ছিত বাংলার চোখের মণি। তোমাদের রক্তের বিনিময়ে আমার মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হবে। আমি মুক্ত বাংলায় মরতে পারবো। আমাদের পরবর্তী পুরুষকে আর পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হবে না। কি গৌরব এ ত্যাগের! জয় তোমাদের হবেই বাবা, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হবেই। এ যুদ্ধ তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। দুর্ভাগ্য, অনেক বয়েস হয়েছে আমার। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা এখন আর নেই। কিন্তু তবুও যদি আমাদের মতো নিরস্ত্র হয়ে সামনে আসতো শত্রু, তবে এ বয়সেও একবার দেখিয়ে দিতাম বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি।" ভাবছিলাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এই আশীর্বাদের উপর শ্রদ্ধা রেখে, মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো অসংখ্য রণাঙ্গনে বাংলার রত্নরা সদাসচেতন প্রহরী হয়ে রয়েছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য। চিন্তা করার আর সময় হয়নি। বৃদ্ধকে মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনও করা হয়নি। হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলাম মারণাস্ত্রের বিকট আওয়াজ। খুব কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে খেয়াল হলো অদূরে পাইকারহাটির ডাববাগানে মুক্তিবাহিনীর ছাউনির কথা—আমাদের বাহিনীর ৬০ জন মুক্তিসেনার কথা। তখন বেলা প্রায় দু'টো। পাকিস্তান বাহিনীর সৈন্যরা ১৪খানা ট্রাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে কাশিনাথপুর থেকে আসছিল বাঘাবাড়িঘাট অভিমুখে। মাঝপথে ডাববাগান। ট্রিগারে হাত রেখে মুক্তি বাহিনীর জোয়ানরা প্রস্তুত। শত্রুসেনাদের ট্রাকগুলো ওদের আওতায় এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মুক্তিসেনাদের রাইফেল আর ব্রেনগানগুলি। শত্রুবাহিনীর পাঁচখানা সৈন্যবাহী ট্রাক অকেজো হয়ে গেল গুলির আঘাতে। প্রাণ দিল ১৫০/৬০ জন পাকিস্তানি সৈন্য। এ যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল—EPR-এর লোক। অদ্ভুত শরীর। তার গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল ৫/৬টা বুলেট। অচেতন অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হলো ফ্রন্ট থেকে। ডাক্তারগণ তাকে ঔষধ-দিচ্ছেন—অপারেশন করে তার শরীর থেকে শত্রুবাহিনীর বুলেট বের করছেন। বাঁচার আশা খুবই কম। আমরা সেবা করছি কায়মনোবাক্যে। ও চোখ মেলে চাইলো। জিজ্ঞেস করলো মুক্তিসেনাদের কুশল, অগ্রগামী অবস্থানের পরিস্থিতি। মুমূর্ষু অবস্থায়ও ওর চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। করুণাময় আল্লাহতায়ালার অসীম কৃপায় ও বেঁচে গেছে। মনে হয় বাংলার কোনও প্রান্তে আবার সে অস্ত্র তুলে নিয়েছে শত্রুসেনাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। খোদার অসীম রহমত আছে ওর উপর, কারণ ও তো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। পরে পাকিস্তান বাহিনীর কামান আর মর্টারের আঘাতে ডাববাগান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল! ধ্বংস হয়েছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো। মুক্তিযোদ্ধারা তবুও নির্ভয় । তারা আবার ঘাঁটি গাড়লো ঘ্যাটনা ব্রিজের তলায়। পণ করলো, পাকিস্তানি বাহিনীকে কিছুতেই সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। কয়েকদিন পর শত্রুসেনারা ট্রেনে সৈন্য বোঝাই করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে সিরাজগঞ্জের দিকে। কিন্তু মুক্তিসেনারা ঘ্যাটনা ব্রিজের কাছে রেলের ফিস-প্লেট তুলে রেখেছে। ট্রেন থেমে গিয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেন থেকে নেমেছে লাইন মেরামত করার জন্য। এ সময়ের জন্যই ওৎ পেতে বসে ছিল মুক্তিসেনারা—সংখ্যায় মাত্র

১০ জন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো তাদের রাইফেল। ভূলুণ্ঠিত হলো আক্রমণকারী পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর ১৫/১৬ জন সৈন্য। শত্রুসেনারা মেশিনগান, মর্টার আর রকেট ব্যবহার করেও মাত্র ১০ জন মুক্তিকামী বাঙালির সামনে দিয়ে সেদিন ঘ্যাটনা ব্রিজ অতিক্রম করতে পারেনি। নরপিশাচ পাকিস্তানি সৈন্যরা তখন ফিরে উল্লাপাড়া গ্রামে চলে যায়। নিরপরাধ জনগণের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে নিরস্ত্র লোকজনকে। আশ্চর্য পৌরুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের। মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে নিরস্ত্র মানুষ মারার অদ্ভুত মনোবল! আরও আশ্চর্য ইসলামপ্রীতি এহিয়া খানের! ইসলাম কি কোথায়ও নিরস্ত্র, নিরপরাধ লোককে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে? অনুমতি দিয়েছে কি অসংখ্য নিরপরাধ লোকের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার, খাদ্যশস্য নষ্ট করার? মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার?

জানি, এহিয়া খান এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু যত অত্যাচারই করুক না কেন বাংলার জনগণ এবার এদের উৎখাত করবেই। একজন বাঙালি জীবিত থাকলেও সে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। বাঙলাকে মুক্ত করবে। আমরা পশুর মতো বাঁচতে পারি না। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদের আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাইতো সেদিন বাংলার সোনা ফলানো মাঠের মধ্য দিয়ে আসবার সময় কয়েকজন কৃষক আমার কাছে এসেছিল। ওরা বলছিল, "তিন গাঁয়ের লোক সভা করে ঠিক করেছি—যদি গায়ে মিলিটারি আসে তবে লাঠি, দা আর বর্শা নিয়েই তাদের খতম করব। গায়ের একটা পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে একটা মিলিটারি ঢুকতে পারবে না। পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে গায়ের মেয়েদের উপর মিলিটারি এত অত্যাচার করবে তা হতে দেওয়া হবে না।" ওরা জানে ওদের লাঠি আর বর্শা মিলিটারির মারণাস্ত্রের তুলনায় কত নগণ্য। কিন্তু কি অদ্ভুত প্রত্যয়! এহিয়া খান, তুমি এদের পরাভূত করতে পারবে কি?

শিমুলতলার সাদিক এসেছে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য—বাড়িতে না বলে। আসবার সময় ওর বাবাকে চিঠিতে লিখেছে, "আব্বা, মাতৃভূমির এ দুর্দিনে বাড়িতে বসে থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। আমি চল্লাম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। নিজের জীবনের বিনিময়েও যদি মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে পারি তাহলে গৌরবান্বিত বোধ করবো।" সাদিকের আব্বার স্তব্ধ মৌনমুখে অপূর্ব প্রশান্তির ছবি এহিয়া খান তুমি দেখেছ কি? এক সাদিক নয়, আরও লক্ষ লক্ষ সাদিক তাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। আর বেশিদিন দেরী নেই যেদিন মুক্তিসেনাদের চরম আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে শত্রুবাহিনী, নিশ্চিহ্ন হবে বিশ্বাসঘাতকরা। আর আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি "বাংলাদেশ" হবে মুক্ত। জয় বাংলা।

(এই কথিকাটির লেখকের নাম জানা যায়নি)

২৭ জুলাই, ১৯৭১

অসম সাহসীর অধিকারী মুক্তিবাহিনীর হাতে নরপশুরা মার খেয়ে খেয়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, আর অনেকে হাসপাতালে পা-হাত হারিয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের বন্ধুরা সেসব দেখেশুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে যেসব সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় 'ছেড়ে দে মা পালিয়ে বাঁচি' এই পুরাতন কথাটি ওরা জেনে ফেলেছে। কারণ পশ্চিম পাঞ্জাবি কুকুরদের সঙ্গে বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের তীব্র মতদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পশ্চিম পাঞ্জাবি অধিনায়ক অনেক জায়গায় বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের নিরীহ নিষ্পাপ গ্রামবাসীদের উপর গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিলে এই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে সৈন্যদের মধ্য হতে একটা বিরাট সংখ্যক অংশ বাঙালিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী নয়। এ দৃষ্টান্ত কয়েকটা ঘটনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিছু সংখ্যক পাঠান সৈন্য মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিফৌজে যোগদানেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অনেকে নিজের পায়ে নিজেরা গুলি করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তারা জানে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে এ পৃথিবী হতে চিরবিদায় না নিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে থাকা অনেক ভাল। তবুও আশা থাকবে ভালো হয়ে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র পরিজনের সঙ্গে দেখা করার।

স্পষ্টতই পাকবাহিনী ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এমনকি সেদিন পাক পশুদের একটা চলন্ত গাড়ির সামনে একটি বোমা ফুটলে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার সমেত অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে সকলেই নেমে পালাতে আরম্ভ করে। তখনই মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ও জনগণ গিয়ে গুলি না করে ছুরি দিয়ে পাক পশুদের কতল করে ফেলে। এই চারমাসের যুদ্ধে পাক পশুরা সেখানে যেভাবে নতুন নতুন কলাকৌশল করে প্রস্তুতি নিয়েছে, পরক্ষণেই মুক্তিবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ করলে আস্তানাতেই চিরতরে মৃত্যুর কালো অন্ধকারে লুটিয়ে পড়েছে। এসব দেখেশুনে পাক পশুরা বাঙালিদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে রাজী নয়। তাছাড়া বেশ কিছুদিন হতে পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত লোক বাংলাদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও এক নম্বর লাইসেন্স নিয়ে কন্ট্রাক্টরি করত এবং বড় বড় চাকরিজীবী হয়ে বাংলার মাটিতে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করত, তাদের অনেকেই এদেশ থেকে চলে গেছে। খুলনা পোর্ট হতে জাহাজে ভর্তি হয়েছে, তাদের মালপত্র—জিপ, ট্যাক্সি, খাট, আলমিরা, আসবাবপত্র ও এমনকি যাত্রীবাহী বড় বড় বাস পর্যন্ত। এইসব মালপত্র নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। বাংলাদেশে কার্যরত সব লোকই খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে এদেশে তাদের থাকা চলবে না। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। বেশ কিছুদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানি পশুদের মেজর খান আলতাফ হোসেনের ভাই, যিনি একজন সি এ্যাণ্ড বি'র প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর, তিনি বক্তব্যগুলি তার আর এক বাঙালি প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে পেশ করে বলেন, "রহমান সাহেব, এদেশে আমরা থাকতে পারব না। ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু শুনলাম। যে কটা টাকা-পয়সা আছে তা নিয়ে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। আর আমার যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে, তা আপনাকে দিয়ে চলে যাব। আপনাদের দেশ মুক্ত হবার পর বেঁচে

থাকলে পরে দেখা হবে।" এমনকি খুব গোপনভাবে তিনি বলে গেলেন, 'তার ভাই যশোর ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন কিন্তু খুলনায় থাকা বেশি নিরাপদ নয় মনে করে চলে আসতে চান—কখন কোন্ সময় কি হয় তার ভয়ে।' এখন বুঝতেই পারা যাচ্ছে তাদের মনোবলের মিটার কত নিচুতে নেমে গেছে। অথচ টিক্কা এত ধাক্কা খাওয়ার পরও চিন্তা করতে পারে না কি গতি হবে তার। আর জঙ্গী এহিয়া ইসলামাবাদের স্বপ্নপুরীতে থেকে মুক্তিবাহিনীর মার কি রকম কি করে বুঝতে পারবে? যে স্বপ্নপুরী একদিন ওর বাপ বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্ত চুষে অর্থ নিয়ে গড়ে তুলেছিল, সেখানে শুধু লালপানির শ্রাদ্ধ করা হয়। আর এদিকে তার দালাল ভাইস অ্যাডমিরাল মোজাফ্ফর হাসান ঐ বর্বর কুকুরদের আস্তানায় আস্তানায় সাহস যোগাতে বেরিয়ে পড়েছে। হলে কি হবে ফল যে হচ্ছে তার উল্টো। মুক্তিবাহিনীর হাতে ওরা দিনের পর দিন মার খেয়ে হয়েছে দিশেহারা।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে একটা কথা বলতো ; মুক্তিবাহিনীর হাতে এত মার খাওয়ার পরেও ইয়াহিয়া আজও ভারতকে দোষারোপ করছে। লজ্জাহীনকে শিক্ষা দিতে হলে কিছুটা নির্লজ্জ না হয়ে পারা যায় না। এখন পর্যন্ত তো বাংলার মুক্তিবাহিনীকে স্বীকার করা হলো না, অথচ মুক্তিবাহিনী বাংলার মাটিতে থেকে আজ হতে প্রায় চার মাস ধরে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে তবুও তারা ভারতের দুষ্কৃতিকারী। যদি তাই-ই হয় তাহলে ইয়াহিয়ার প্রিয় দালাল পাক সেনাদের জিজ্ঞাসা করলেই তো সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে। কারা তারা, যাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে? দালালেরা কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ পাবার আশায় তো রাজাকার বাহিনী করেছে। আর এই রাজাকার বাহিনীতে যতসব চোর, বাটপাড়, বদমাইশ ও ডাকাতদের নেয়া হয়েছে—যারা সমাজের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং যাদের সমাজে কোন ঠাঁই নেই। এদের মধ্যে অবশ্য অনেকে জেল-হাজতে ছিল। এই সমস্ত লোকেরাই পাক পশুদের লুঠতরাজ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তাদের নাম ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর কাছে ধরা পড়েছে। আসলে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে জীবন রক্ষার্থে রাজাকারের খাতায় নাম লিখেছে। অথচ দেখা গেছে পাক বাহিনী এদেরকে ভালোভাবে বিশ্বাসও করে না। ঐ রাজাকাররা এখন শুধুমাত্র মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের কতগুলি দালালের দেহরক্ষী হিসেবে রাইফেল ঘাড়ে করে চলে, কোন সময় মুক্তিবাহিনীর সম্মুখীন হলেই অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে আবার ইয়াহিয়া ডিফেন্স সার্টিফিকেট, সেভিংস সার্টিফিকেট ও প্রাইজ বন্ড কেনার কতই না আহ্বান জানাচ্ছে—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক এহিয়া জানে না যে অন্ধ তার লাঠি একবারই হারায়। যে ভুল বাঙালি একবার করেছে, তার পুনরাবৃত্তি আর করতে চায় না। কারণ তারা জানে এসব টাকা-পয়সা কোনো দিনই আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বাঙালিদের জানতে বাকি নাই যে এগুলোর হেড অফিস ঐ দালালদের দেশে। সেজন্যই ব্যাঙ্ক-বীমার টাকা জমা দেয়া ও প্রিমিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে গেলে কোনও দিনও আর সে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। অবশ্য বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ

সরকার এর একটা ব্যবস্থা করবে। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি দালালদের কোনও মালপত্র খরিদ করবো না। কোনও কাপড়-চোপড় আমরা না কিনলে ওদের গুদামে সব জমা হয়ে পচবে। এজন্যই ওদের কল-কারখানা বন্ধ হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে অনেক মিল ও কারখানা হতে শ্রমিক ছাঁটাই আরম্ভ হয়েছে। আমরা ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিরতরে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো। বাংলার মানুষকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করবার দিন ঐ ২৫শে মার্চের রাত ১০টায় ফুরিয়ে গেছে। যারা আজ পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য দেখেশুনে খরিদ করছে তারা নরঘাতক এহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করতে সহায়তা ছাড়াও বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়ে, বাংলার সম্পদ ভোগ করে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যে কত বড় অপরাধ তার কৈফিয়ৎ ওদের দিতে হবে জীবন দিয়ে। বাঙালিরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করবেই করবে–যার জন্য দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার প্রতিটি ছাত্র, শ্রমিক ও যুবকেরা এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করছে। এরা সকলেই স্বাধীনতা রক্ষার বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে ঐ কুকুরদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছে। তারা জানে, অমাবস্যার কালো অন্ধকার ভেদ করে অচিরেই লাল সূর্য আলোয় ভরা আভা নিয়ে পূর্বদিগন্তে উদিত হবে।

(অধ্যাপক এম. এ. সুফিয়ান রচিত)

# শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন

২৭ জুলাই, ১৯৭১

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বাংলাদেশ রত্নগর্ভা। বাংলাদেশে শুধু সম্পদ নয়, আছে মানুষের মতো মানুষ। বাংলাদেশের জননেতারা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর নিজ দেশের জনগণকে ভালোবেসে যে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তার তুলনা সমকালীন ইতিহাসে নেই। বঙ্গজননী তার কোলে শুধু তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বাঘা যতীনদের মতো বিপ্লবীদের ধারণ করেনি। ধারণ করেছে চিত্তরঞ্জন, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির মতো বিখ্যাত নিয়মতান্ত্রিক নেতাদেরও। নিয়মতান্ত্রিক নেতা হয়েও এরা দেশের জন্য কম নির্যাতন ভোগ করেন নি। শেরে বাংলা ফজলুল হককে পাকিস্তানের তৃতীয় বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে নজরবন্দি করেছিলেন। এই বৃদ্ধ সর্বজনমান্য নেতাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শয়তান শাসকচক্র ঈদের নামাজের জামাতেও যোগ দিতে দেয়নি। এর চাইতেও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির সঙ্গে। হৃদরোগে আক্রান্ত এই নেতাকে বৃদ্ধ বয়সে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের' কাল্পনিক অভিযোগে দীর্ঘ ছয় মাস জেলে আটকে রাখা হয়েছে। জেলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। মুক্তিলাভের পর দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে প্রিয়-পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশের আরেক জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনের পর গিয়েছিলেন লন্ডনে। তিনি দেশে ফেরার আগেই হয়ে গেল সব ওলট-পালট। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করে দিলেন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ। ফজলুল হক হলেন নজরবন্দি। গোলাম মোহাম্মদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসকান্দার মীর্জা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'মওলানা ভাসানী যদি দেশে ফেরেন, তাকে আমি গুলি করার নির্দেশ দেব।'

বিবরণ দিতে গেলে এক মস্তবড় পুঁথি তৈরি করা যায়। বাংলাদেশের এমন একজন নেতা, এমন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী নেই যাকে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শাসকচক্র হয়রানি করেনি, নির্যাতন করেনি, অমর্যাদা করেনি। তাই এবারেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের কাছে পাকিস্তানের বর্তমান ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের নায়ক ইয়াহিয়া খাঁ যখন বলেন ' শেখ মুজিব একজন ক্রিমিনাল' তখন আমরা বিস্মিত হই না। ইয়াহিয়ার মতো একজন অর্ধশিক্ষিত বর্বরের কাছ থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা সম্পর্কে এর চাইতে শোভন ও ভদ্র ভাষা আমরা আশা করি না। যে ব্যক্তি নিজে ক্রিমিনাল, যার হাতে এখনো নিরীহ-নিরপরাধ বাঙালির বুকের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে, ইতিহাসের সেই জঘন্যতম খুনী দস্যু বাংলার ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান জননায়ক সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে কথা বলবেন, এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশে অনেক মহান নেতা জন্মেছেন। দেশের জন্য তারা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা সকলেই আমাদের

শ্রদ্ধেয়। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, নির্যাতন বরণ ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুগ সৃষ্টিকারী নেতা। তার ত্যাগ, সাহস ও ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তিনি এখন শুধু বাঙালির নয়নমণি নন, কিংবদন্তীর রাজা। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রায় বারটি বৎসর। তিনি কাটিয়েছেন জেলে। ইয়াহিয়ার আগে আইয়ুব একবার তাঁর গলায় ফাঁসির রজ্জু পরাতে চেয়েছিল। পারেনি। এখন আবার সেই ফাঁসির রজ্জু হাতে নিয়ে খুনী ইয়াহিয়া নতুন খুনের নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবের অপরাধ তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন। বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভালোবাসে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের ইতিহাসে যে অধ্যায় যোজনা করেছেন, তার কোনও দ্বিতীয় নজির নেই। একটি নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলনকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের প্রভাবে তিনি রূপান্তরিত করেছেন বিপ্লবে। বিপ্লবকে রূপান্তরিত করছেন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড রুখে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সুদক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে বলতে গেলে প্রায় খালি হাতে লড়ছে। এ কি ইতিহাসের কম বড় বিস্ময়? এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র মানুষের সবল ও প্রেরণাদানকারী নেতৃত্বের জন্য। একটি নামই আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সৃষ্টি করেছে। আর বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের নতুন সংগ্রামী ইতিহাস। তাই বাংলাদেশের ঘৃণ্য শত্রু ইয়াহিয়া, হামিদ ও টিক্কা খাঁর দল এই ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের নায়ক শেখ মুজিবকে ধ্বংস করার জন্য পাগলা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবকে জেলে বন্দি রেখে কাপুরুষ ইয়াহিয়া সাহস ও স্বস্তি পাচ্ছে না। সুতরাং বিচারের নামে তাকে হত্যা করার এই শয়তানি চক্রান্ত। ...

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

## ২০ আগস্ট, ১৯৭১

(এই পর্যায়ের শেষ আলোচনা)

সত্তরের নির্বাচনবিজয়ী বাংলাদেশের একচ্ছেত্র জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত চলছে পাকিস্তানি নাৎসীদের জেলে। এটা যে বিচার নয়, বিচার প্রহসন এবং হত্যা করার নারকীয় চক্রান্ত, সে সম্পর্কে বিশ্বের কোনও দেশের কোনও মানুষের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সম্পর্কে ইউরোপের প্রভাবশালী দৈনিক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা গত ২ই আগস্ট তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন : "এই বিচারে বিদেশী সাংবাদিকদের পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে দেয়া হচ্ছে না। বিদেশের সংবাদপত্রগুলোর প্রতি ইসলামাবাদের অবিশ্বাস পাকিস্তানের কল্যাণ সাধন করবে না।"

'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা ঠিকই বলেছেন। তবে যাকে তিনি বলছেন বিদেশী সাংবাদিকদের প্রতি ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রের অবিশ্বাস, আসলে সেটা ভয়। ইয়াহিয়া জানে, গত ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকেরা ছিলেন বলেই, তার

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে। আজো শেখ মুজিবের তথাকথিত প্রহসনে যদি বিদেশী সাংবাদিকেরা উপস্থিত থাকেন, তাহলে আসল কথা ফাঁস হয়ে যাবে। ধরা পড়বে আসল অপরাধী ইয়াহিয়া এবং তার বেঈমান খুনী চক্র। তাই বিচারের নামে খুনী ইয়াহিয়ার এই কঠোর গোপনীয়তা। প্রতি যুগে বিচারের নামে ইয়াহিয়ার মতো খুনীচক্রের যে হত্যালীলা, তারই প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রে আজ এই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। তবে কবিগুরু, তোমাকে আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে পারে, বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। শয়তান ইয়াহিয়া চক্র আজ বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তি নয়। এই জানোয়ারদের, এই বর্বর পশুশক্তির পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য বাংলাদেশের তরুণেরা আজ অস্ত্রধারণ করেছে। বাঙালি মুক্তিবাহিনী আজ অজেয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এই অপরাজেয় মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কাপুরুষ ইয়াহিয়া ঢাকা আগমনের সাহস পাচ্ছে না। টিক্কা এবং তার সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছে ছাউনিতে।

এখন প্রশ্ন, এত শীঘ্র শেখ মুজিবকে বিচারের নামে হত্যা করার জন্য পাগলা কুকুরের মতো কেন হন্যে হয়ে উঠেছে ইয়াহিয়া? এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সোজা। মূর্খ ইয়াহিয়া ভেবেছে—এক, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর উৎসাহ নষ্ট হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হবে; দুই, বাংলাদেশ নেতাহীন হবে এবং তার প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস হবে; তিন, শেখ মুজিব বেঁচে না থাকলে বাংলাদেশের সারা এলাকা স্বাধীন হলেও তাকে সংগঠিত ও স্থিতিশীল করার মতো কোনও নেতা ও সংগঠন থাকবে না।

আগেই বলেছি, অতীতের ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেনি এই মূর্খ ইয়াহিয়া। নইলে সে জানতো, আইয়ুবের আমলে এই পরীক্ষা একবার নয়, বহুবার হয়ে গেছে। ১৯৬৬ সালে যখন বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয়দফার আন্দোলন শুরু করেন, তখন আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে রেখে ভেবেছিল আন্দোলন ব্যর্থ হবে। শেখ মুজিবকে ছাড়া তার হাতে গড়া আওয়ামী লীগ এই আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। আইয়ুবের এই দুরাশা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭ সালে কুচক্রী নওয়াবজাদা নসরুল্লাকে হাত করে পশ্চিম পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী চক্র ভেবেছিল, শেখ মুজিব জেলে রয়েছেন এই সুযোগে আওয়ামী লীগকে ভেঙে তাদের পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। কিছু লোককে হাত করে এজন্য তারা চেষ্টাও চালিয়েছিলেন, কিন্তু নসরুল্লার এই চক্রান্তও সফল হয়নি।

১৯৬৮ সালে যখন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়, তখনও আইয়ুব চক্র ভেবেছিল শেখ মুজিবকে জেলে রেখে এই মামলার বিচার চালানো হলে দেশে নেতৃত্বের অভাবে কোনও আন্দোলন হবে না। আইয়ুবকে এই ভুলের খেসারত

দিতে হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে যে গণবিপ্লব হয়, তখনো শেখ মুজিব কারাগারে। তাঁর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নবীন অথচ সংগ্রামী নেতারা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রনেতারা এই বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নির্ভুলভাবে পরিচালনা করেন।

ইয়াহিয়া বাংলাদেশের এই বিপ্লবী ইতিহাস জানে না তা নয়। কিন্তু মানবতাবোধ ও ইতিহাসজ্ঞান বর্জিত এক মূর্খ সেনাপতির কাছ থেকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আশা করা বাতুলতা। ইয়াহিয়া এবং তার চারপাশে জমায়েত জঙ্গী নায়কেরা জানে না, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় কিন্তু একটি আইডিয়া বা আদর্শকে হত্যা করা যায় না। শেখ মুজিব আজ শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি সংগ্রামী আইডিয়া বা আদর্শ। বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামী জাতীয়তা এবং তার সংগ্রামী সংগঠন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি শেখ মুজিবরূপী এই আদর্শ। এই আদর্শেই আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা আজ বলীয়ান। শেখ মুজিব যদি সশরীরে এই আদর্শ রূপায়ণে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারেন, তাহলে সারা বাংলাদেশের ও বাঙালি জাতির পরম গৌরব। আর তিনি যদি কোনও চক্রান্তের শিকার হয়ে নাও থাকেন, তাহলেও তার প্রদর্শিত পথেই আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিব আজ দেশের বাইরে বহুদূরে কারান্তরালে রয়েছেন; তবু তার প্রদর্শিত পথে অবিচল থেকে আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি সুসংগঠিত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের শক্তি ও স্থিতিশীলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দিন দিন সংগঠিত ও শক্তিশালী হচ্ছেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঙালি জাতির এই নবঅভ্যুত্থান ব্যর্থ করার আশা মূর্খ ইয়াহিয়ার দুরাশা মাত্র।

তবে বাঙালির নয়নমণি, জাতির প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে ইয়াহিয়া চক্র নিস্তার পাবে তারা এমন আশা যেন স্বপ্নেও না করে। এই কথা এখন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার সময় এসেছে। বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র পরিণতি হবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। আমরা বলি, একজন বাঙালির দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে এই পৈশাচিক হত্যার পরিশোধ না নিয়ে তারা ছাড়বে না। ইয়াহিয়া চক্র পালিয়েও প্রাণে বাঁচবে না। তোজো ও হিটলারের পরিণতি বরণই তাদের ভাগ্যে অবধারিত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি, কোটি কোটি বিশ্ববাসী এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার জোরে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সমস্ত শয়তানি চক্র ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবেন এবং তার প্রিয় জনগণের মধ্যে ফিরে আসবেন। আজ এই সংকট সন্ধিক্ষণে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুণছি।

শেখ মুজিব দীর্ঘজীবী হোন ॥ জয় বাঙলা ॥

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

# পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

২৫ আগস্ট, ১৯৭১

॥ রোগগ্রস্ত ভদ্রলোকের অপচেষ্টা ॥

বিদ্রোহের অগ্নিতে ভস্মীভূত ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের বিশ্বের বৃহত্তম উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। পৃথিবীতে এতো ব্যাপক উপ-নির্বাচন বোধ হয় আর কোনও দেশে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মূক ও শঙ্কিত নাগরিকদের অস্ত্রের হুঙ্কারে একটি তথাকথিত সাধারণ নির্বাচনের স্বাদ পেতে হয়তো চলেছেন। বন্দি নাগরিকদের অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ইয়াহিয়া যে উপ-নির্বাচনের ফাঁদ পেতেছেন, গণহত্যার মতোই সেটা হবে তার আর একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক রেকর্ড—প্রবঞ্চকের ডাইরিতে নতুন অধ্যায়ের সংযোজনা।

ভদ্রলোক রোগগ্রস্ত। মনস্তত্ত্ববিদগণ যেমন কোনও কোনও রোগীর মধ্যে বিশেষ জৈবিক প্রবণতার সন্ধান পান, মনোবিজ্ঞানীদের চেম্বারে উপস্থিত করলে ইয়াহিয়ার মধ্যেও রক্তপানের প্রবল উন্মাদনা পরীক্ষাযন্ত্রে ধরা পড়বে।

জীবনে অন্তত একটা বিজয় তার আছে—তা হচ্ছে অস্ত্রের ঝঙ্কারে বলপূর্বক পাকিস্তান দখল, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত। অঙ্গুলি হেলনে তিনি নির্বাচন করেছেন, অঙ্গুলি আস্ফালনে তিনি গণহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবে সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। আবার খেয়াল-খুশি মতো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আসনচ্যুত করার নির্দেশ দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। এই তোগলকী হটকারিতার উত্তরাধিকারী শৈলনিবাসী ভদ্রলোক ইয়াহিয়া জানেন না যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ তিনি দিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সদস্যপদ খারিজের অধিকার তার নেই। কারণ, পরিষদ সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের ভোটে, তার ভোটে নয়। এক্ষেত্রে ধনুক থেকে তীর তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। তার এই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রটি একটি মাত্র অভিপ্রায় বা মনোবাসনা দ্বারা পরিচালিত, তা হচ্ছে অস্ত্রবলে বেআইনীভাবে ক্ষমতার মসনদ আইনানুগ ও চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়। পাগলাগারদের চিকিৎসকগণ এ রোগের একটা নাম দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ-সবল দেখতে, এমন কি মাত্রাধিক অমৃত রসধারা পান করেও লোকটি স্বাভাবিক মাতালের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—তখন যে-কোনও ব্যক্তিকে সে হত্যা করতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ এ রোগকে "প্যারানাইয়া" বলেন। উন্মাদদের শ্রেণীবিন্যাস।

নরহত্যার জেনারেল এই ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় আওয়ামী লীগের ৭৯জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের নির্বাচন বাতিল করেছেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৫ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের পদ খারিজ করে আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই আবার আওয়ামী লীগ প্রধানরূপে অবশিষ্ট পরিষদ সদস্যদের উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে স্বপ্নরাজের ভবিষ্যৎ পরিষদে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ 'প্যারানাইয়া' রোগে আক্রান্ত এই ভদ্রলোকের এক অস্বাভাবিক খেয়ালে দু'টি পরিষদে আওয়ামী লীগের মোট ৪৫৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৭৪ জন

রাতারাতি সদস্যপদ হারিয়েছেন এবং মোট যে ১৮১ জন সদস্যপদ হারাননি, তাদের ইয়াহিয়া খান নিজেই শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেছেন! এ যেন টোগোল্যান্ডের কোনও এক ক্লান অধিনায়ক কর্তৃক ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার নির্দেশের মতো। ইয়াহিয়ার এই স্বেচ্ছাচারমূলক অধিকারটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে উন্মাদের কার্যকলাপ বলেই পরিগণিত হচ্ছে, একথা আজ সত্যের মতো উজ্জ্বল।

যে ২৭৪ জনকে অপরাধী বলে উল্লেখ করে সদস্যপদ খারিজ করেছেন, তাদেরই আবার বিচারের জন্যে কোর্টে উপস্থিত হতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শাস্তি আগে দিয়েছেন, বিচার পরে হতে চলেছে। শরীরের রক্তপ্রবাহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; কিন্তু মানুষ যদি রক্ত পান করে, তবে তার কার্যক্রমে অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ও অসঙ্গতি দেখা যায়—এ তারই দৃষ্টান্ত।

এতো সামঞ্জস্যহীন কার্যপদ্ধতির মধ্যেও ইয়াহিয়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করতে চাচ্ছেন—এক ঢিলে দুই পাখি। অন্তত কাল্পনিক পরিষদে আওয়ামী লীগকে এভাবে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে এবং গণহত্যার সহচর ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী চক্রান্তকারী ভুট্টোকে সংখ্যালঘু দলের নেতারূপে পঙ্গু করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিষদে মাত্র ৮৮ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৯৩ জন আওয়ামী লীগ নেতার সদস্যপদ বাতিল হয়নি বলে পিন্ডি সরকার ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশ নাগরিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, উক্ত মোট ১৮১ জন আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্য ইয়াহিয়া ও তার উন্মাদ জেনারেলদের পাশে রয়েছেন। এমন কি বাংলাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও নারীনির্যাতন তারা সমর্থন করেন। পরিষদ সদস্যদের একটা বিরাট অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। অপরদিকে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, উক্ত ১৮১ জন সদস্য ইয়াহিয়ার কোটের পকেটে রয়েছেন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি এই বিভ্রান্তিকর চিত্র সাময়িককালের জন্যে তুলে ধরেছেন। কারণ মিথ্যাশ্রয়ী এই জেনারেল জানেন যে, ১৮১ জন সদস্য তার মুঠোর মধ্যে নেই। এদের প্রায় সব ক'জনই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করতে যাননি। তিনি সদস্যপদ বাতিল না করে শুধুমাত্র প্রলোভন দেখিয়েছেন।

এতো ব্যাপকসংখ্যক আওয়ামী লীগ সদস্যকে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা বিশ্বাস করতে পারে না। অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিষদের মধ্যেও তারা বিদ্রোহীর ভূমিকা নিতে পারেন। যারা বিশ্বাসঘাতক, 'বিশ্বাস' শব্দটি তাদের অভিধানে থাকে না। চক্রান্তের প্রথম পর্বেই হচ্ছে সন্দেহ। রক্তপিপাসুদের হাতে নিহত হবার জন্যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন ছাড়া কেহই যখন ইয়াহিয়ার বন্দিশালায় পা বাড়াবেন না, তখন তিনি পর্যায়ক্রমে বাতিলকৃত সদস্যদের তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করবেন। এবং সে সংখ্যা চার শতাধিক হয়ে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। আর সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের নির্বাচনের রূপ নেবে ইয়াহিয়ার সর্বব্যাপী উপ-নির্বাচন।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'কমপিউটারকে'ও জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ হত্যাভিযানে যিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার নিয়েছেন,

সেই ইয়াহিয়া জানেন যে, যত প্রলোভনই থাকুক না কেন লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের মৃতদেহ মাড়িয়ে ইতিপূর্বে নির্বাচিত কোনো সদস্য পরিষদ কক্ষে প্রবেশ করবেন না। তিনি জানেন যে, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যারা হত্যা করেছে নির্বিচারে, তাদের সাথে সহযোগিতা করে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে কেউ এগিয়ে যাবেন না। তিনি জানেন যে, দেশপ্রেমিকদের রক্তে কলম চুবিয়ে কেউ ইয়াহিয়ার পরিষদের হাজিরা খাতায় দস্তখত করবেন না। সেই দানব শক্তিটি জানেন যে, দস্যু-হানাদারদের কবল থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে উদ্ধার করার জন্যে এরা সবাই স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

এই রোগগ্রস্ত ভদ্রলোক এ-ও জানেন যে, বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার তার এই অপচেষ্টা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হবে।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

## ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

### ॥ ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়েছে ॥

সামরিক ডিক্টেটর আইয়ুব খানকে তাড়িয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তারই প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে যখন পিন্ডির সিংহাসনের বসলেন সেসময় এই মিথ্যাশ্রয়ী জেনারেল বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যে সভ্য জগতের শাসকদের অনুকরণে কোমল ভাষায় দর্শনসম্মত বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন, জনগণের আশা-আকাংক্ষা প্রতিফলিত শাসনতন্ত্র ও ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি অহরহ প্রচার করতেন। এমন কি, "আমি জনগণের প্রতিনিধি নই—সৈনিক; জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবো এবং সামরিক সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন"—এ সমস্ত বক্তব্য ফলাও প্রচার করে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

দেশীবিদেশী নেতৃবর্গ, অফিসার ও সাংবাদিকদের কাছে সবচাইতে প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ, বন্দুকধারী মানুষটির মধ্যে গণতন্ত্রের এক সুকুমার মূর্তি বিরাজ করছে এটাই ছিল সমগ্র কিছুর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক কথায় তিনি দানবের কাছ থেকে মানবীয় গুণাগুণ লাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশপের গল্পের সত্য তার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ বিশেষ পশু বা পক্ষী ছদ্মবেশ ধারণ করে দীর্ঘ সময় যেমন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না, কণ্ঠস্বরই তার জন্যে অভিশাপ হয়ে ওঠে, তার পরিচয়কে ঘোষণা করে—ইয়াহিয়ার ব্যাপারেও তাই ঘটল। তার ক্রমবিকাশমান পাশবিক রূপটি সকলের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তবে তিনি সুচতুরের ন্যায় বাক্যব্যয়ে শিক্ষিত।

তখন পিন্ডিতে ট্যাঙ্কগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়েছিল, রাস্তার মোড়ের কামানগুলোর নল মাথা নত করে স্তব্ধ। অসামরিক ও সামরিক স্টারধারী আমলাদের রাজনৈতিক শাসনগত কাঠামো তখন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় ইয়াহিয়া সিভিলিয়ান পোশাকে ঢাকা সফরে আসলেন। হাতের ব্যাটন আর মুখনিঃসৃত সৌরভ বাদ দিলে তাকে সেদিন অন্তত একজন মোনাফেক রাজনীতিকের মতো মনে হয়েছিল। সাংবাদিকরা বিমানবন্দরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে— দেশব্যাপী এক রেফারেন্ডামে দ্য গল পরাজিত হয়ে সেদিনকার পত্রিকাতেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

প্রশ্ন ছিল : দ্য গলের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান হাতের ব্যাটন বাঁ হাতের তালুতে দু'বার ঠুকে বিজ্ঞের ন্যায় মন্তব্য করেন : যে কোনও সম্মানীয় নেতার পক্ষে এটাই হচ্ছে গৌরবজনক পথ।

আবার প্রশ্ন : পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও কি একথা প্রযোজ্য?

এ প্রশ্ন যে তির্যকভাবে তাকেই আঘাত করছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ক্রোধ সংবরণ করে প্রশ্নকারী রিপোর্টারের কাঁধে হাত রেখে দ্রুত উত্তর দেন 'ইয়েস্'—মানে 'হ্যাঁ'।

এটা যে তার দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে কথা এই সিপাহীর মস্তিষ্কে আসেনি। কিন্তু রিপোর্টারগণ বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় তার আঘাত লাগে।

ক্রমান্বয়ে ক্ষণিকের এই ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্যসম্ভারের ছিদ্রপথে তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালানোর তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন—রিপোর্টারের কাঁধে হাত রেখে "গৌরবজনক পথ অবলম্বনের" প্রতিশ্রুতি তখন থেকেই তার কানে ব্যঙ্গ'র মতো শোনাতো।

পিন্ডির এক সংবর্ধনা সভায় ঘনিষ্ঠ মহলের আলোচনায় ইয়াহিয়া অস্ত্রে শান দেওয়ার তথ্য সগৌরবে ফাঁস করেন। তিনি বাঁ হাতের অমৃত্যাধার উর্ধ্বে তুলে ডান হাতের অঙ্গুলি নির্দেশে বলেন : আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন মুষ্টিবদ্ধ হাতে—বিদায়ের সময় মুষ্টি খুলে তাকে চলে যেতে হয়েছে। আর আমি এসেছি মুষ্টি খুলে, কালক্রমে আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে। কথাটা শুনে জী-হুজুর পারিষদ নিষ্প্রয়োজনে হেসে উঠেছিলেন, সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা বিচলিত হয়ে পড়লেন—কিন্তু জনসাধারণ তার এই বক্তব্যে মোটেই বিস্মিত হননি। তারা জানতেন ডিক্টেটর সেনাপতি কোন্ পথ নেবেন, তার শাসনের পথ কোনটি, ক্ষমতায় স্থির থাকার জন্যে তার হাতের অস্ত্রের নাম কি। আর এক দস্যু জেনারেলের "অস্ত্রের ভাষা" সম্পর্কে তারা সচেতন।

নির্বাচনের আয়োজন ও বিলম্বিত ব্যবস্থার পরও জনগণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ইয়াহিয়াকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তবুও সামরিক আইনের মধ্যেই জনগণ ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে চুরমার করে এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠীর গুপ্ত বাহিনীর রিপোর্ট ছিল আওয়ামী লীগ শতকরা ৬০ বা ৬৫টির অধিক আসন লাভ করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল শত্রুর শাণিত অস্ত্রের ন্যায় ইয়াহিয়ার বক্ষে প্রোথিত হলো। এই পরিস্থিতিটা ছিল সামরিক শাসকদের বিদায়ের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু সামরিক শাসক কোনোদিন সম্মানের

সাথে বিদায় নেন না—বিতাড়িত পশুদের ন্যায় পরাজিত হয়ে পলায়নই তার চরিত্র। ডিক্টেটরের চরিত্রের নির্দেশে ইয়াহিয়া চণ্ড রূপ নিয়ে হত্যার অভিযানে বের হলেন বাংলাদেশে নগরে-বন্দরে-গঞ্জে-গ্রামে। বিদ্রোহের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখমণ্ডল। বিপ্লবী প্রত্যেকটি মানুষের লৌহ-পেশী বাহু দৃঢ়তর হয়ে উঠলো ঘৃণ্য আক্রমণকারী ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের তাড়নায়। এতো হত্যা, এতো ধ্বংস আর নির্যাতনের বিভীষিকার মধ্যে তারা আজ দৃঢ়তর ক্রন্দনরত নয়, নয় স্থবির। তারা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্বুদ্ধ, নবচেতনায় উদ্ভাসিত মুক্তির দিশারী।

তাই আজ পরিস্থিতিটা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে চলছে। বিশ্বের সচেতন রাষ্ট্র ও নাগরিকগণ সোচ্চার কণ্ঠে বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। কিন্তু এর পরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া নানান অপকৌশল অবলম্বনের পথ বেছে নিয়েছেন। চক্ষু চিকিৎসককে করেছেন ক্রীড়নক গভর্নর, আর মন্ত্রী করেছেন দশজন ধিকৃত ও জনগণের আঘাত থেকে পলাতক পশুকে। তদুপরি নির্বাচিত ১৮৪জন সদস্যের পদ খারিজ করে উপ-নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উপনির্বাচন হবে। আর এরই মধ্যে তিনি সামরিক নির্দেশে রচিত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করবেন। তার মতের বাইরে উক্ত খসড়ার কোনও ধারাই প্রস্তাবিত তথাকথিত পার্লামেন্টের বাতিল বা সংশোধন কথার ক্ষমতা থাকবে না। সম্ভবত ১৯৭২ সালের জানুয়ারির পূর্বে তিনি পার্লামেন্ট আহ্বান করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তার এই স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র রচনা ও অধিবেশন সবকিছুই একটা বিরাট "যদি"র উপর ঝুলছে।

কার রাজত্বে তিনি শাসন-নির্যাতন-হত্যা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এইসব বিভ্রান্তিকর আয়োজন করার ঘোষণা করছেন, সে কথা পিন্ডির "ব্রাসহ্যাট" গোষ্ঠী হয়তো জানেন। কিন্তু তার চাইতেও সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর চক্রান্তের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন বাংলাদেশের সংগ্রামরত নাগরিকগণ। ইয়াহিয়ার প্রতিশ্রুতি আর দেশদ্রোহীদের সমাবেশ দ্বারা অস্ত্রধারী সংগ্রামীদের স্তব্ধ করা যাবে না—সমগ্র নব-চক্রান্ত আজ সূর্যের মতো প্রখর।

যার জীবনেতিহাস প্রবঞ্চনার বিষধারায় আচ্ছন্ন, মুক্তিকামী মানুষের ক্রুদ্ধ অস্ত্রের বর্ষণেই কেবল তার চক্রান্তের ফলপ্রসূ উত্তর।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

# দর্পণ

**১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

সম্প্রতি প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক ও কূটনীতিক মঁসিয়ে আঁদ্রে মার্লো বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সংগ্রামী ভিয়েতনামী জনগণের মতো জবাব দিতে বলেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তিনি আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আবেদন করেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করছেন না—তাঁরা আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছেন।

মঁসিয়ে মার্লো দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানি জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাতে জয় তাদের অনিবার্য।

দ্য গল মন্ত্রীপরিষদের সংস্কৃতি দফতরের বিদগ্ধ মন্ত্রী এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সময় নাৎসী বর্বরতা নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি জানেন যুদ্ধ কী। তিনি জানেন অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কিভাবে গড়ে ওঠে। এবং তিনি জানেন মুক্তিযুদ্ধ কী। এই কূটনীতিক ও সংবেদনশীল মানুষটির অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ফ্রান্সকে নাৎসি জার্মানির কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে একদিন জেনারেল দ্য গলকেও ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জেনারেল দ্য গল তখন মুক্তিযোদ্ধা—স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন।

আলজেরিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরাসি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের জন্যে অনেক প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক কারাবরণ করেন। এসম্পর্কে একালের বিবেকের অন্যতম মুখপাত্র জাঁ পল সার্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সার্ত্র নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শুধু সার্ত্র নন, ফরাসি দেশের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলবেয়র কামুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও বহু প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছেন কিংবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন Anglo-Spanish যুদ্ধে নিহত হন। স্পেনের কবি গার্সিয়া লোরকাও স্পেনের গৃহযুদ্ধে শহীদ হন। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিক ছিলেন মহান সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ঋষি টলস্টয়।

এ যুগের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল তারকা গ্রিসের মিকিস থিওডোরাকিস। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লবী শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ মিকিস থিওডোরাকিস গ্রিক সামরিক জান্তার উৎপীড়নকে না মেনে নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। গ্রিক সামরিক জান্তা তাকে বন্ধ করে রেখেছে কারাগারে।...

মুক্তিযুদ্ধে শত্রু কবলিত দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা। সকলেই হয়ত রণাঙ্গনে শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করেন না—কিন্তু সকলেই যুদ্ধ

করছেন। কেউ নিষ্ক্রিয় নয়, সকলেই সক্রিয়। চাষি, শ্রমিক, মজুর, চাকুরে, ব্যবসায়ী সকলেই যুদ্ধ করছেন।

এই মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পীদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে—তাঁরা সংগ্রামীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখেন তাঁদের গান, কবিতা ও রচনার মাধ্যমে।

রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করার দরকার নেই কবির। কবি তখন যুদ্ধক্লান্ত যোদ্ধাদের গেয়ে শোনান দেশপ্রেমের উদাত্ত সঙ্গীত, বিজয়গাথা। রণক্লান্ত সৈন্যরা আবার নতুন বলে বলীয়ান হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যান। কবি তখন চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মসি ও অসির প্রাধান্য নিয়ে পুরোনো বিতর্ক সৃষ্টি করার সময় নয় এটা। মসি এখন ঝলসে উঠুক অসির শত প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতিতে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী আজ গৃহহারা। ঘাতক ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ রাতেই তাদেরকে খতম করতে চেয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নরপশু ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের কোয়ার্টারগুলোতে আক্রমণ চালায়। বেশিরভাগই নিহত হয়েছেন। কেউ কেউ হয়ত পালিয়ে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখনও যাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি কিংবা অসুবিধার জন্য যারা দেশের শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে রয়ে গেছেন, তারা কি করছেন—এটাই জানতে ইচ্ছে হয়। বলাবাহুল্য তারাও চুপ করে নেই। কি করে চুপ করে থাকা যায়? চোখের সামনে মা, বোন, ভাই, বাপ, বন্ধুবান্ধব সকলকে ঘাতকেরা হত্যা করছে। এই জল্লাদদের অকথ্য অত্যাচারে সোনার বাংলা আজ শ্মশান।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্ধন হচ্ছে ভাষার বন্ধন। বাংলা—বাংলা ভাষাভাষীর দেশ। কি করে সহ্য করা যায় বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে হানাদারদের আনাগোনা? তবু সহ্য করতে হয়। সারা দিন-রাত কাটে এক ত্রাসের মধ্যে, এক দুঃস্বপ্নের জগতে। বেয়নেটের মুখে বিপন্ন অস্তিত্ব!

শামসুর রাহমান এখন পত্রিকা অফিসের তেতলায় বসে কবিতা লিখছেন কি? তাঁর বিষণ্ণ চোখ দুটোতে নিশ্চয় দশ লক্ষ মৃত মানুষের পুঞ্জীভূত নিষ্পলক দৃষ্টি লেগে রয়েছে। দুঃখ, মহা দুঃখ! আর এই দুঃখ অহরহই নাম লিখছে—বাংলার প্রতিটি পর্ণ কুটিরে—ভাবনার আদিগন্ত জুড়ে। ...

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নিশ্চয় বেয়নেটের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সৃষ্টির উন্মাদনায় একের পর এক এঁকে চলেছেন ধর্ষিতা বাংলার ছবি। আরব গেরিলা শিবিরে থাকাকালে তাঁর তুলিতে জ্বলে উঠেছিল আগুন—আর সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল আরব মুক্তিযোদ্ধারা। আমরাও সেই মন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছি।

জিন্না এভেন্যুর রেস্তোরাঁতে নববিবাহিত শহীদ কাদরী কি এখনও সন্ধ্যা কাটান? রক্ত, রক্ত—চায়ের কাপে, ফ্রিজের জলে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টির শব্দকেও কি তার দশ লক্ষ মানুষের আত্মার হাহাকার মনে হয়? ...

আবুল হাসান কি এখনও হাসপাতালে পড়ে আছে? অসুখে নয়, জল্লাদের গুলিতে আহত হয়ে। নাকি সে পড়ে পড়ে ধুঁকছে কোনও মেসের আলোহীন কক্ষে—আলোর প্রতীক্ষায়। ... সে কি এক মিলিয়ন শবের দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যে ঘেমে ওঠে?

রফিক আজাদের অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয়ই এখন বারুদের আগুন হয়ে শত্রুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে?

... তোমাদের মৃত্যু নেই। তোমাদের স্থান সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনের মণিকোঠায়।

বিশ্ববিবেক তোমাদের দিকে। তোমাদের ভয় কি?

জয় আমাদের হবেই। তোমাদের মসিকে করে তোল জিঘাংসু ধারালো হাতিয়ার। পড়ে পড়ে মার খাবার দিন চলে গেছে। তোমার প্রাণের ভাষা, তোমার পবিত্র জন্মভূমি জননী বাংলাকে ওরা ধর্ষণ করছে। তোমরা দেখিয়ে দাও রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমরা তোমাদের পাশেই রয়েছি। পশ্চিম বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে চাই—

'মরো কিন্তু মেরে মরো এবং উদ্ধার করো ঘর—
নিশ্চিত রয়েছি পাশে আমি তোর জন্ম সহোদর।'...

(রণজিৎ পাল চৌধুরী রচিত)

# কাঠগড়ায় আসামী

**১৪ নভেম্বর, ১৯৭১**

পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংস হত্যাকারীর তালিকায় সংযোজিত হয়েছে দুটি নাম। একটি ইয়াহিয়া খান, অপরটি টিক্কা খান। জঘন্য জালেম হিসেবে সারা বিশ্ব তাদের ধিক্কার দিচ্ছে। টিক্কা খান শুনেছ সেসব কথা? তোমার বক্তব্য আছে কিছু? বিচারের কাঠগড়ায় হলফ করে বলো, কেন এই গণহত্যা অনুষ্ঠিত করলে? বাংলার মাটি মানুষের রক্তে কেন লালে লাল হয়ে গেল? এ গণহত্যার অন্যতম আসামী টিক্কা খান জবাব দাও।

অদ্ভুত এবং মস্তিষ্কবিকৃত নাদির শাহের যোগ্য প্রতিনিধি, হত্যার নেশায় ভুলে গেছিলে, মরিয়া মানুষের কি প্রচণ্ড শক্তি! বিশাল অতল সমুদ্রও সে শক্তির কাছে হার মানে। তুমি তো আজাজিলের পাণ্ডা, তুমি তো কোন ছার! ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লায় তথা সারা বাংলাদেশে তোমারই নির্দেশে নিতান্ত বর্বরের মতো গুলি করে মারা হয়েছে অগণিত মানুষ। বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছ সারা বাংলাদেশে। বলো কুখ্যাত গণহত্যাকারী—কি অধিকার তোমার ছিল এ গণহত্যায়?

জল্লাদ প্রভুর আর জনগণের দুশমন দালালদের মনোরঞ্জনের জন্য, অমিতশালী তুমি—৭২ ঘন্টায় স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিলে সারা বাংলার সংগ্রামের আগুন। কত শক্তি ধরে তোমার ওই শূকরছানার দল? সাম্রাজ্যবাদী, গণতন্ত্রের শত্রু, এ যুগের কলংক টিক্কা খান, তোমার সেই বীর পুংগবের দল নেড়ীকুত্তার মতো আজ লেজ গুটিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে গর্তে। দেখেছ? প্রত্যক্ষ করেছ বাংলার মানুষের শক্তি? তোমার শক্তির দম্ভ এক নিমিষেই মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অবশ্যই একথা তোমার জানা। তবু, তবু হত্যাকারী, তোমার হত্যার নেশা মেটেনি। গ্রামে-জনপদে-শহরে-নগরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অত্যাচারের বান ডাকিয়েছ। বাংলার মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে হয়ে গেছে লালে লাল। রক্তের সমুদ্রে আজ কার সর্বনাশ দেখছো শয়তান? তোমার? না তোমার মহাপ্রভুর? বলো কুৎসিৎ হত্যাকারী, এ বীভৎস হত্যার জবাব কি? জবাব দাও।

গ্রামে-গ্রামান্তরে-শহরে-নগরে কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়েছ তোমার সেনাবাহিনী। ধর্ষণে, লুণ্ঠনে, হত্যায় তারা সারা বাংলাকে করে তুলেছিল মৃত্যুর পুরী! এ অত্যাচারে কতটুকু পেলে শয়তান? এক-একটি রক্তবিন্দুতে জন্ম নিয়েছে লাখো লাখো মুক্তিযোদ্ধা। তোমার সেই কুকুরের দল মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তবু আজো সাধ মেটেনি, হত্যার নেশায় এখানো খুঁজে ফিরছে অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষদের। কিন্তু তারই বদলে কুকুরগুলো নিঃশেষ হচ্ছে একের পর এক। বলো নরকের কীট, গ্রামবাংলাকে তুমি পুড়িয়েছ, লুট করেছ শ্রীহীন করেছ কেন? জবাব দাও।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে পদলাভে উন্মুখ হয়েছিলে, যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলে— চেয়ে দেখো আজ সেই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মৃত মানুষের লাশের তলায় চাপা পড়ে গেছে তোমার সাধের পাকিস্তান। হাত-পা কামড়াচ্ছ কেন? সঙ্গীদের মতোই লাঙ্গুল দিয়ে গায়ের মাছি তাড়াও। বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিহিত আত্মাকে খুঁজে পাচ্ছো না? নির্লজ্জ বিবেকহীন, জবাব দাও, কোন্‌ বিভীষিকা তোমার চোখে ভাসছে?

কতো মজার শাসন ব্যবস্থা তোমার দেশের! বেহায়ার পৃষ্ঠপোষক বেহায়াই হয়। তার প্রমাণ তুমি আর তোমার বন্ধু—বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কিত নায়ক ইয়াহিয়া খান। এত অত্যাচার, এত লুণ্ঠন, এতো হত্যা করার পরেও তোমার পদোন্নতি হলো—পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ' কোর-কমান্ডার'! কিন্তু অর্বাচীন টিক্কা খান, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ তার জের চলছে, চলবে। বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমাদের শয়তানের মতো কালো মুখে নিক্ষেপ করবে রাশি রাশি কলঙ্কের কালি। তুমি যেখানেই যাও, যতো পদোন্নতিই তোমার হোক না কেন, শান্তিহীন, স্বস্তিহীন হবে তোমার দিবারাত্রি। বলো হত্যাকারী শয়তান, তোমার জবাব কি?

কালো কলংকের বোঝা মাথায় দিয়ে, নৃশংস জালেম প্রস্তুত হও। বলো, তোমার জবাব কি? জবাব দাও শয়তান ইয়াহিয়ার চেলা টিক্কা খান।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

# জনতার সংগ্রাম

**৫ নভেম্বর, ১৯৭১**

আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা রচনা করেছে নয়া ইতিহাস। হরতাল, মিছিল আর বিক্ষোভের স্তর পার হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে মুহূর্তে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, সে মুহূর্তে জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, আপনাআপনি। ফুল ফুটলে যেমন সুগন্ধ বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে।

দুনিয়ার ইতিহাসে দেশে দেশে এমন ঘটনা অবশ্য ঘটেছে এর আগেও। ফ্রান্সে ঘটেছে ফরাসি বিপ্লবের সময়। রাশিয়াতে ঘটেছে সোভিয়েট বিপ্লবে, চীনে গণচীনের প্রতিষ্ঠায়। কিউবাতে ঘটেছে চে গুয়েভারার গেরিলা সংগ্রামের ধারায়। আর ঘটেছে হো চি মিনের ভিয়েতনামে—সারা দুনিয়াকে আজও যা করছে বিস্মিত।

কিন্তু বাংলাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ আর মিছিলের স্তর পার হয়ে জনতার মুক্তিসংগ্রাম যত তাড়াতাড়ি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, এমনটি আর কোথাও হয়নি।

চলতি ৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে অহিংস গণঅসহযোগের কর্মসূচি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, তা যে দেখতে দেখতে অস্ত্রধাবণের কর্মসূচিতে পরিণত হবে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল পাকিস্তানি হানাদার সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার দুর্দম অভিযানে পৌঁছতে পারবে, এ ধারণা হয়তো আগে করা যায়নি।

কিন্তু এ ঘটনাই ঘটিয়েছে আমাদের বাংলাদেশ—আমাদের বাংলাদেশের জনতা—বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দা। পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশের নিরন্ন বুভুক্ষু সর্বস্তরের মানুষ, নরনারী-শিশু অবতীর্ণ হয়েছে আপোসহীন মুক্তিযুদ্ধে। মাত্র সাত মাসের মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখেছে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের সমস্ত রকমের যোগাড়যন্ত্র করা আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়া বাহিনী 'ব্লিৎসক্রিগ' বা বজ্রগতির যুদ্ধপদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেনি। ফিউজ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানি 'ব্লিৎসক্রিগ'। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের একটিমাত্র অংশের কাছে মামুলি ধরনের অস্ত্র ছিল ২৫শে মার্চ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাঙালি ই-পি-আর আর বাঙালি পুলিশ বাহিনী এবং আনসার বাহিনীকে সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আধুনিক অস্ত্র পাবার আশায় বাংলাদেশের জনতা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই হানাদার পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনীর সামরিক সময়সূচিকে পণ্ড করে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে উদ্যোগ।

নরঘাতক ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, হামিদ খান গং-এর নির্দেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে ঠাণ্ডা করার মতলবে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে গত সাত মাস ধরে, পৃথিবীর

ইতিহাসে তার নজীর নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এতে ঠাণ্ডা না হয়ে বরং আরও বেশি একরোখা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি মানুষ উৎখাত হলেও দেখা যাচ্ছে জনতা শুধু সামলে নেয়নি নিজেদের, পাল্টা আঘাত শুরু করেছে হানাদার বাহিনীর ওপর—প্রথমত গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা করে, দ্বিতীয়ত নিয়মিত সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে নিয়োজিত করে। সময়সূচির দিক দিয়ে এইভাবে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার তুলনা নেই ইতিহাসে।

সেই জন্যই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা মুক্তিসংগ্রামের নতুন নজীর স্থাপন করলো।

তুলনা করার জন্যে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ফরাসি বিপ্লবের আমলের ফরাসি জনতার। ফ্রান্সের জনগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে শাসন-শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলের কৃষকসমাজ আর শহরের মেহনতি মানুষ আর ব্যবসায়ীরা খাজনা-ট্যাক্সের কড়ি গুণতে গুণতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন ফ্রান্সের শহর আর গ্রামাঞ্চলের কোটি জনতা তাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতাকা নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ণ গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ফরাসি জাতির নবজীবন আর মুক্তি আর মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম চলে আসছিল বিভিন্ন-ভাবে, তা-ই দানা বেঁধেছিল সশস্ত্র বিপ্লবে।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্যারিসের জনতা শুধুমাত্র সড়কি সম্বল করে দুর্ভেদ্য ব্যাস্টিল কারাগার ভেঙ্গে ফেলেছিল। মুক্ত করে এনেছিল রাজবন্দিদের। তার পরে বিপ্লবী ফরাসি গণসেনাবাহিনী গড়ে তুলতে তাদের চার বছর লেগেছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ফরাসি জনতা চার বছর সময় পেয়েছিল গণসেনাবাহিনী গড়ে তোলার। পরে অবশ্য তৎকালীন ইউরোপের সমস্ত দেশের রাজতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল এই ফরাসি জনতার গণ-সেনাবাহিনী। রাজকীয় অস্ত্রভাণ্ডারগুলি দখল করে জনতার এই সেনাবাহিনী রাজতন্ত্রীদের সাঁজোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে অসজ্জিত অবস্থাতেই তীব্র যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। রাজতন্ত্রী সাঁজোয়া বাহিনী তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল ফরাসি গণবাহিনীর ঝটিকা অভিযানে। এই গণসেনাবাহিনীর লোকদের নিয়মিত সামরিক পোশাক-আশাক ছিল না বলে এদের স্যানস্‌কুলেট নাম হয়েছিল। জনতার মুক্তিসংগ্রাম জনতার মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হবার পরে জনতার সুখে, দুঃখে, ভাবনায়, চিন্তায় জড়িত যে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়, তার সফল সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে।

এদিক দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা আর মুক্তিবাহিনী ফরাসি বিপ্লবকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে ফরাসি বিপ্লবের নেতা ড্যান্টনের অগ্নিবাণী—আমাদের চাই সাহস, আরও সাহস এবং আরও সাহস।

শ্রদ্ধা জানাবে একথা মনে রেখেই যে, বাংলাদেশও এমন লড়াই করছে যা আজ এবং আগামী যুগে-যুগান্তরে মুক্তিপ্রেমিক দেশদেশান্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।...

(রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

# পুতুল নাচের খেল

**৫ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মানুষ দখলীকৃত ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে না। গত পঁচিশে মার্চের পর থেকেই ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে তারা বর্জন করতে শুরু করে। এখন এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের নারী, পুরুষ, শিশু কেউ শোনে না। কেন শুনবে? যারা নিজেদের চোখে দেখেছে মেঘনা নদীকে কারবালার রক্তরাঙা ফোরাত নদী হয়ে যেতে, যাদের চোখের সামনে হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, তারা কি করে বিশ্বাস করবে দখলীকৃত ঢাকা বেতারের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার? গল্পের পাগলা মেহের আলীর মতো অবস্থা হয়েছে ঢাকা বেতারের। মেহের আলী থেকে থেকে কেবল বলতো, সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্। ঢাকা বেতারও সেই মার্চ মাসের সাতাশ তারিখ থেকে কেবল চেচাচ্ছে, সব নর্মাল হ্যায়-সব নর্মাল।

এবার রমজান মাসের শুরুতে যশোরের এক মুক্তাঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেখি মগরেবের নামাজ ও ইফতার সেরে গ্রামের মসজিদের এক ইমাম সাহেব তার ট্রানজিস্টর রেডিও নিয়ে বসেছেন। নিবিষ্ট মনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। পরিবেশটি বড় চমৎকার। আকাশে চাঁদ নেই। মিটি মিটি জ্বলছে তারার প্রদীপ। কার্তিকের হিমেল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। যে পুকুরের পাড়ে ইমাম সাহেব বসেছেন, তার পানিতে ঝিকিমিকি তারার প্রতিভাস। ক'দিন আগেই এই গ্রামটিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে—তার চিহ্ন এখন নেই। হানাদারের পালাবার সময় কোনও কোনও বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ধানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষ আবার নতুন উৎসাহে ঘর বাঁধার কাজে হাত দিয়েছে। তাদের কেউ হারিয়েছে তার প্রিয়তম ভাইকে। কেউ হয়েছে পিতৃহারা, কারো যুবতী বোন লাঞ্ছিতা হয়েছে বর্বর হানাদার দস্যুদের হাতে। কিন্তু তাতে কারো চোখে অশ্রুকণা নেই। সব অশ্রুকণা পুড়ে যেন ক্রোধের বারুদ হয়ে গেছে। সকলের মুখে, সকলের বুকে এক প্রতিজ্ঞা—মরতে হয় আরো মরবো, তবু হানাদারদের দেশছাড়া করবো।

ইমাম সাহেবের পাশে বসে আমি দেখছিলাম সোনার বাংলার সংগ্রামী রূপ। এইতো কার্তিকের হিমে ভেজা বাংলার সবুজ ঘাস। মাথার উপরে সাদা মেঘের কারুকাজ করা নীল আকাশ। ইমাম সাহেব নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, এই গ্রামে আপনি কি একাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন, না সবাই শোনেন? ইমাম সাহেব হেসে বললেন, কি যে বলেন, সবাই শোনে। এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য আমরা সারাদিন পাগল হয়ে থাকি।

প্রশ্ন করলাম, এই অনুষ্ঠান শুনে কি লাভ হয় আপনাদের?

ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের আশা বাড়ে, সাহস বাড়ে, বুকের হিম্মত বাড়ে।

এর পরই আমার কাছে সরে এসে বললেন, একটা সত্য ঘটনা বলি শুনুন। তখনো আমাদের এই গ্রাম মুক্ত এলাকা হয়নি। পাকিস্তানি সৈন্যরা চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে, দিনে-দুপুরে লুটপাট চালাচ্ছে, ঘরের মেয়েকে বেআব্রু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা

বুড়ো মানুষেরা তখন কেবল চোখের পানিতে ভাসি, আল্লাহকে ডাকি আর ভাবি, মুক্তিবাহিনীর নওজোয়ানেরা কবে আমাদের গ্রামে আসবে? আমার ছোট নাতিটির বয়স বছর দশ। সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। আমি তাকে একদিন সাবধান করে দিলাম, বললাম—নানু, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনিস্ না। মিলিটারিরা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। নাতি বলল, কতজনকে মারবে! এই গ্রামের সকলেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। কেউ ঢাকা বেতারের হুক্কামে মারশাল ল'এর অনুষ্ঠান শোনে না।

এই পরই নাতি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো—আচ্ছা নানা, হুক্কামে মারশাল ল'র অর্থ কি?

নাতির প্রশ্ন শুনে এই বুড়ো বয়সও ঠাট্টার লোভ সামলাতে পালাম না। বললাম, নানু, হুক্কামে মারশাল ল'র অর্থ—মার শালাদের। এই শালা কারা জানো? ওই বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যেরা। বৃদ্ধ ইমাম তার নাতির গল্প শেষ করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, আপনার নাতির কথা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনি এবং আপনার মতো এই মসজিদের অন্যান্য মুসুল্লিরাও কি ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনেন না?

ইমাম সাহেব বললেন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। মুসলমানদের কাছে তো কবিরা গুনাহ। এটা পবিত্র রমজান মাস বাবা। আমাদের কাছে বড়ই পবিত্র মাস। এই মাসে মিথ্যা কথা বলার মতো শোনাও মস্ত বড় পাপ। ঢাকা বেতার থেকে এই রমজান মাসেও রাত-দিন যে মিথ্যা কথা বলা হয়, আল্লার বান্দা, নবীর উম্মত হয়ে তা কেমন করে বরদাস্ত করি বাবা?... তবু মনকে চোখ ঠেরে না হয় ঢাকা বেতারের প্রচারই বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এর পরই একদিন শুনলাম নতুন প্রচার। শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানের মিলিটারি সরকার বর্ডারে অভ্যর্থনা শিবির খুলেছেন। শুনে আমরা সবাই বেকুব! ঢাকা বেতারই এতদিন বলে এসেছে, যারা দেশ ছেড়ে গেছে তারা দুষ্কৃতকারী, তারা ভারতের চর। এখন সেই দুষ্কৃতকারী ও ভারতের চরদেরই আবার ফিরিয়ে আনার জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা কেন?

এটা গেল জুলাই মাস পর্যন্ত প্রচার। আগষ্ট মাস ও সেপ্টেম্বর মাসে শোনা গেল নতুন কথা। দলে দলে শরণার্থী ভারত থেকে দখলীকৃত বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। ঢাকা বেতার থেকে বলা হলো, রোজ হাজারে হাজারে মানুষ ফিরে আসছে। আগে যারা বলেছিলেন মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারী দেশ ছেড়েছে—তারা পরে কি করে বললেন হাজারে হাজারে দেশত্যাগী ফিরে আসছে? এটা যে বাবা আমাদের সেই পুঁথির বয়ানের মতো—

লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার
শুমার করিয়া দেখি চল্লিশ হাজার।

মাঝখানে ঢাকা বেতারের মুরুব্বিরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের মিথ্যা প্রচার বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই ফাঁক বুঝে এক সময় বলা হয়, ভারতে কিছু শরণার্থী গেছে বটে কিন্তু তাদের ভয় দেখিয়ে ও লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোন বাবা কথা। বিদেশের রেডিওতেও শুনেছি, বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে নব্বুই লাখ শরণার্থী গেছে। কেউ লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে এতগুলো লোককে

রাতারাতি দেশছাড়া করতে পারে? আর যদি তা পারাই যায়, তাহলে তোরা কেন বাপু ভারতের অন্তত এক হাজার লোককেও ভয় দেখিয়ে, কি লোভ দেখিয়ে তোদের দিকে নিয়ে আসতে পারিস না? দেখা না তোদের কথার সত্যতা!

ইমাম সাহেব থামলেন, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, কত আর বলবো বাবা, বললে কিস্সা ফুরায় না। সারা আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে শুনেছি, ভারত থেকে হাজারে হাজারে শরণার্থী ইয়াহিয়া খানদের অভ্যর্থনা শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। যে হারে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে এতদিনে নব্বুই লাখ লোকেরই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন ওই ঢাকা বেতারেই তাঁবেদার গভর্নর মল্লিক মিয়ার একটা ভাষণ শুনলাম। মল্লিক মিয়া বলেছেন, ভারত রাজী হলে তারা বিমান পাঠিয়ে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবেন। শোন বাবা কথা! এতদিন তোরা বল্লি সব শরণার্থী ফিরে গেছে। তাহলে বিমানে করে কাদের আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছিস্? এজন্যেই কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি কম। আগে জেনেশুনেও ওরা কত মিথ্যা বলতে পারে তা যাচাই করার জন্য ঢাকা বেতার ধরতাম। এখন আর ধরি না। এই রমজান মাসে মিথ্যা শোনাও পাপ। বাবা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই কথাটা কেন তোমরা ঢাকা বেতারকে জিজ্ঞাসা কর না—প্রত্যেকদিন এত মিথ্যা কথা বলতে ওদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায় না? ঈমান কমজোর হয়ে যায় না? আমি বাবা এখন ঢাকা বেতার ধরি না। কেউ ধরে না। খামোকা কেন মিথ্যা কথা শুনে গুণাহগার হই বলো। তার উপর এখন তো আবার রমজান মাস।

ইমাম সাহেবকে বললাম, এ নিয়ে দুঃখ করবেন না। দখলীকৃত ঢাকা বেতারে এখন চলছে পুতুল নাচের খেল। পুতুলকে দিয়ে যা বলানো হচ্ছে তাই তারা বলছে। যে খেল খেলানো হচ্ছে তা-ই বলছে। মেফিস্টোফিলিস আর ফাউস্টের কাহিনী আপনি জানেন না—শয়তানের কাছে আত্মা বন্ধক রেখে এক সাধুর কি পরিণতি হয়েছিল। ঢাকা বেতারেও এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী তাদের আত্মা, বিবেক, সততা ও মনুষ্যত্ববোধ কয়েকটা টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখেছে খুনী দস্যু ইয়াহিয়া চক্রের কাছে।

ইমাম সাহেব কি বুঝলেন জানি না। দুঃখিত স্বরে বললেন, বাবা, এর কি কোনও প্রতিকার নেই? তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আছে সেই প্রতিকারের দিনও খুব দূরে নয়। শীগ্গীরই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ঢাকা বেতার কেন্দ্রসহ সারা দখলীকৃত এলাকা মুক্ত করবে। আবার ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আপনারা শুনতে পাবেন মুক্ত বাংলার মুক্ত কণ্ঠ, সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা।

ইমাম সাহেব ভাবাবেগে অশ্রুপূর্ণ চোখ মুছে বললেন, আমিন, আমিন। ইয়া আল্লা, রাব্বুল আলামিন, বাংলাদেশের সেই সুদিন যেন দেখে যেতে পারি।

কার্তিকের সেই স্বপ্নসন্ধ্যায় ইমাম সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

(আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত)

# বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ

**১২ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের মানুষের কাছে এখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলের মানুষের চোখ বাংলাদেশের ওপর— সেখানে কি ঘটছে, কি চলছে সেখানে। কিন্তু জল্লাদ ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচারণার কুয়াশা ভেদ করে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঠিক চিত্র কি সব সময় তাদের চোখে ধরা পড়ছে? তাঁরা কি দেখতে পাচ্ছেন বাংলদেশের বর্তমান রূপ, তার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত চেহারা? বাংলাদেশ এখন আক্রান্ত। হানাদার বর্বর দস্যুরা তার বুকের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সেখানে সত্য নেই, ন্যায় নেই—মানুষের মূল্যবোধ মৃত, সেখানে এখন প্রচলিত মিথ্যা, উন্মাদ লালসা মাথাচাড়া। দিয়ে উঠছে। সেখানে কেবল—

জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া
নিবিচারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সম্ভাব;

বর্তমান আক্রান্ত বাংলাদেশকে যদি আপনারা জানতে চান, যদি তার পূর্ণাঙ্গ ছবি মানসচক্ষে অবলোকন করতে চান, তাহলে পিশাচের উপজীব্য জীবনকেই সেখানে খুঁজতে হবে। কারণ পাশবিকতাই এখন সেখানকার মৌলনীতি। কিন্তু এইসব নয়। এই রক্তাক্ত, নিপীড়িত বাংলাদেশের মাটি থেকেই, লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের কংকাল থেকেই বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের জাগ্রত তারুণ্য। তারা যুদ্ধ করছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে, পাশবিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করছে—আর তার নামই বাংলাদেশ। তাই আমরা হতাশ হইনে, হতাশ হবো না।

বিশ্বের বিবেকবান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে আমাদের এই সংগ্রামে, অস্তিত্ব রক্ষার এই যুদ্ধে। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশের একটি মানব হৃদয়ও ব্যথিত হয়নি বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলীতে। সব অঞ্চলের সব দেশের বিবেকবান মানুষের মন এই ঘৃণ্য বর্বরতায় বিষয়িত হয়েছে, প্রতিবাদ করেছেন তারা। আর সেই হলো আমাদের পুরস্কার, আমাদের স্বীকৃতি। পশুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল মানুষের কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তারই অন্তর্ভুক্ত। ...

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত বিজয়ের পথে। যতই দিন যাচ্ছে, নৈতিকতাহীন, বর্বর হানাদার সেনাবাহিনীর মনোবল ও শক্তি ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেশবিদেশের সংবাদপত্রে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিজয় ও সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। বিশ্বের সব প্রভাবশালী পত্রপত্রিকা মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কথা স্বীকার করেছেন। 'নিউজউইক' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি ও পাকিস্তানি হানাদার খান সেনাদের চরম নাজেহাল হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিক ও সংবাদ ভাষ্যকারদের মতে, হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর দীর্ঘদিন এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারবে না, তাদের মৃত্যু আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী।

এর পরেও মধ্যযুগীয় বর্বরতার নায়ক জল্লাদ ইয়াহিয়া তার মিথ্যা অপপ্রচারের দ্বারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কারণ তার খোয়াব ভাঙতে এখনো কিছু বিলম্ব। কিন্তু ইয়াহিয়া, তোমার খোয়াব যেদিন ভাঙবে, সেদিন দেখবে কি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর বাস্তব তোমার সম্মুখে।

দস্যু ইয়াহিয়া বাংলাদেশে পুতুল সরকার খাড়া করে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। সম্প্রতি একজন বিদেশী সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে তার বাংলাদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসংগে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পুতুল মন্ত্রিসভার যে ঠাঁট ইয়াহিয়া দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। মন্ত্রী সাহেবরা থাকেন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের সাক্ষাৎ মেলেনি। আর বাংলাদেশে মালেক মন্ত্রিসভার কোনো অস্তিত্ব আছে বলেও মনে হয় না। এইসব মন্ত্রীদের জনসাধারণ কেউ চেনে না। বরং সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। মৃত্যু, নির্যাতন সবকিছু উপেক্ষা করে ঢাকার অধিবাসীরা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন। ফলে হানাদার বাহিনীর দিশেহারা হওয়ার যোগাড়।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের প্রবল চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে সামরিক সাজসরঞ্জাম রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঘোষণায় এই তথ্য জানা গেছে। এদিকে চীনে গিয়ে মি. ভুট্টো বড়ো বেশি কল্কে পাননি। বরং চীনা অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফেই বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধানের প্রতিই পাকিস্তানকে সচেষ্ট হতে বলেছেন। ফরাসি সরকার বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন এবং এর গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক ফ্রান্স সফরকালে ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে এই মতামত প্রকাশ করা হয়। পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর ইউলি ব্রান্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিম জার্মান সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে পশ্চিম জার্মান সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

কিন্তু এখনো বাংলাদেশে মানুষ মরছে, গৃহ অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। এখনো দলে দলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এখনো অন্ধকার রাত্রির শেষ হয়নি। তারা সজল চোখে অসহায় দুটি হাত তুলে তাকিয়ে আছে সত্য ও ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড কবে নেমে আসবে, কবে, কবে। কবে শেষ হবে এই কালরাত্রির কুটিল অন্ধকার? শেষ এর হবেই। এতো রক্ত, এতো মায়ের চোখের জল, বুকফাটা কান্না, সকরুণ প্রার্থনার বাণী ব্যর্থ হতে পারে না :

বীরের এ রক্তস্রোত
    মাতার এ অশ্রুধারা
এর যতো মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?
    স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
    এত ঋণ?

রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দেবে না দেখা
দেবতার অমর মহিমা?

(মহাদেব সাহা রচিত)

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চরম বিজয়ের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে অমিতবিক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশই তাঁরা সংগঠিত হচ্ছেন, শক্তিশালী হচ্ছেন, দুর্বার দুর্জয় হচ্ছেন। আর অন্যদিকে সেই সংগে যতই দিন যাচ্ছে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ততই দুর্বল হচ্ছে, মনোবল ও নৈতিক সাহস হারাচ্ছে। এর কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তারুণ্য ও নৈতিক মনোবল হানাদার দস্যুদের নেই। তারা পাশবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটি নবজাগ্রত জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে পদদলিত করে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখতে। আর সেই শাসন কায়েম রাখতে গিয়ে তারা নির্বিচার নরহত্যা, লুন্ঠন ও নারীধর্ষণের পাশবিকতার পথ অনুসরণ করেছে। নীতিবোধ, মনুষত্ব, মানবিক ন্যায়বিচার সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তারা দস্যু ও তস্করের নির্লজ্জ বর্বরতার ভূমিকায় নেমেছে— যেখানে তারা বন্য পশুর মতোই আদিম, হিংস্র ও নৃশংস। তাদের কাছে ন্যায়নীতি, সুবিচার, যুক্তি কিংবা মনুষত্বের কোনো মূল্য নেই। নিষ্ঠুরতায় তারা বন্যজন্তুর মতোই অন্ধ, বর্বরতায় তারা মধ্যযুগীয় হার্মাদ দস্যুদের মতোই হিংস্র, ভয়ংকর।

বিপরীত দিকে বাংলাদেশের তরুণ যারা যুদ্ধ করছেন তাদের সংগ্রাম নিজের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম, মায়ের লজ্জা, বোনের অপমান, পিতার অমর্যাদার প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রাম। তাদের রক্তে মায়ের বোনের ভায়ের রক্তের প্রতিজ্ঞা জড়িত। তাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঐ হানাদার বর্বর দস্যুরা বন্দি পশুর। মতোই অসহায়, দুর্বল। তাই বাংলাদেশের এক-একটি অঞ্চল আজ ক্রমাগত শত্রুমুক্ত হচ্ছে, সেখানে উড়ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা। বাংলাদেশে উড়ছে স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা, সেই সংগে বিশ্বমানবতার মনের ভূগোলে অর্জিত হচ্ছে তাদের জন্যে সমর্থন ও শুভেচ্ছার রক্তকুসুম। পৃথিবীর দিকে দিকে উড়ছে। তারই উজ্জ্বল মানবিক পতাকা। তাই ওদের যেখানে শেষ; আমাদের সেখানে শুরু।

বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' লিখেছেন, সামরিক ও রাজাকার বাহিনীর ক্রমাগত অত্যাচার বাংলাদেশের মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারেনি। বরং অত্যাচার যতই বাড়ছে, বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার মনে প্রতিশোধের স্পৃহা ততই প্রবল হচ্ছে। ঐ সাপ্তাহিকের বিশেষ প্রতিনিধি সিনিয়র সম্পাদক আর নো দ্য বোরচাগ্রাফ বলেছেন, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর এখন মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সারা

বাংলাদেশের মানুষ আজ প্রতিশোধ চায়। 'শিকাগো নান টাইমসের' সহযোগী সম্পাদক মি. রবার্ট ই. কেনেডি বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে মাকিন নীতি তাঁর কাছে হতবুদ্ধিকর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমস্যাটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নন বলেও তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মি. কেনেডি স্বীকার করেছেন যে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য আসন্ন এবং তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধেও বাংলাদেশ সম্পর্কে মাকিন নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। মাকিন সাপ্তাহিক 'টাইম'-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের একটি দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ প্রসংগে বলা হয়েছে—পাকিস্তান একটি ডুবন্ত কুকুর। তার মাথা জলের নিচে ঠেসে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই ভারতের।

মস্কোর প্রভাবশালী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস'-এ বিশিষ্ট সোভিয়েট লেখক মি. উলানুকি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে পাকিস্তানের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণই স্বাধীন বাংলাদেশের দাবীর জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে মি. উলানুকি বলেছেন, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতেই বাঙালিরা অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রিটেনের উদারনৈতিক দৈনিক 'গার্ডিয়ান' বলেছেন, পাকিস্তান এখন নিঃসংগ ও বন্ধুবিহীন। যুদ্ধ বাধলে তাকে একাই তার ফল ভোগ করতে হবে। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও পাকিস্তানের এই নিঃসংগ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছেন, যতক্ষণ না ইয়াহিয়া বাংলাদেশ সমস্যার একটি যথার্থ রাজনৈতিক সমাধান না চাচ্ছেন, ততক্ষণ তার বন্ধুহীনতা কেবল বাড়তেই থাকবে।

এদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রী মি. রিচার্ড উড বাংলাদেশ সমস্যার যথার্থ রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান ছাড়া শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। আর এই যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানের অর্থই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মার্কিন সিনেটর উইলিয়াম স্যাকসবি বলেছেন, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার কোনও সমাধান হতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হলে প্রথমেই শেখ মুজিবের মুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাকে তিনি ইতিহাসের অন্যতম শোচনীয় ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে মার্কিন সরকারকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে—আর সেই সংগে বিশ্বমানুষের সমর্থনপুষ্ট মানবতার পতাকাও উড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। কেননা ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না।

(মহাদেব সাহা রচিত)

# পিন্ডির প্রলাপ

**১২ নভেম্বর, ১৯৭১**

জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁ আর তার জল্লাদ বাহিনীর তোতাপাখিগুলো সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একই শেখানো বুলি আউড়ে চলেছে রেডিও গায়েবী আওয়াজে গ্রামোফোন কোম্পানির কুকুরের ছবিওয়ালা সেই রেকর্ডের মতো। পিন দিয়ে চড়িয়ে দিলেই হলো কলের গান বাজতে শুরু করবে। বাঁধা গৎ গান হবে। সকাল-সন্ধ্যা-রাত, যখনই শুনুন না কেন, পড়ানো লব্‌জই বেতারের একমাত্র পুঁজি। সকালবেলা উঠেই শুনতে পাবেন, "অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" দুপুরে—"দেশপ্রেমিক জনসাধারণ দুষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় তো দিচ্ছে না-ই বরং সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিচ্ছে। এরপর রাত গভীর হওয়ায় সাথে সাথেই পিন পাল্টে দেয়া হবে। আর তোতার কণ্ঠে শোনা যাবে—"একদল অনুপ্রবেশকারী আমাদের সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের সেনাবাহিনী শুরুতেই তাদের বাধা না দিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরে সময়মতো আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে অনুপ্রবেশকারীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়।" এর পরেই একটি অস্ত্রপাতির লম্বা ফর্দ পেশ এবং হতাহতের সংখ্যা বহু বলে উল্লেখ করা হবে। সবশেষে বলা হবে, "কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে"। দিনের পর দিন তোতার কণ্ঠে রেডিও গায়েবী আওয়াজের এই বাণীই শুনতে পাওয়া যাবে। অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও আবার কয়েক হাজার। কিন্তু তোমার প্রভুর ক'জন বরকন্দাজ মারা গেল সে সম্পর্কে গায়েবী আওয়াজ একেবারেই চুপ।

সমরবিদ্যার সবচেয়ে খারাপ ছাত্রটির পেটের পিলে এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে ফেটে যেতে পারে হাসতে হাসতে। "সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে, হতাহতের সংখ্যা বহু, কয়েকজন গ্রেফতার"—অর্থাৎ সঠিক সুস্পষ্ট কোনও তথ্য তোতার মুখে ভুল করেও শোনা যাবে না। যদি প্রশ্ন করা যায়—মাথা খারাপ হয়েছে, ও কথা মুখে আনবেন না। কোনও তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা সাফ মানা। তার উপর তোতা কি প্রশ্ন করতে পারে? কিন্তু মুশকিল হয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানির তোতা আর তার প্রভু ছাড়াও বাইরের যে জগতটি রয়েছে তাকে নিয়ে। তারা তো তোতা নয়, তাই প্রশ্ন তারা তুলছে। বলছে, নাদীরশাহের বংশধর আর গোয়েবলসের মন্ত্রশিষ্যরা হাতে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে ছাড়ুন না! কয়েক হাজার অনুপ্রবেশকারী, কয়েকশ' গজ ভেতরে, কয়েকজন গ্রেফতার, হতাহত বহু—এসব কথা শুনলে তো পাগলেও হাসবে।

---

* 'পিন্ডির প্রলাপ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলো তোয়াব খান রচিত।

বাংলাদেশে কি ঘটেছে বা এখন কি ঘটছে সে সম্পর্কে তোতার মুখের কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু যাতে দুনিয়ায় প্রচারিত না হয় তার জন্যই ইয়াহিয়া খাঁ আর সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমেই সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। পরে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদের মুখে নিজেদের ইচ্ছামতো বাছাইকরা সাংবাদিককে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। সেইসঙ্গে বলে দেয়া হলো—অমুক অমুক জায়গায় যেতে পারবেন না, তমুক তমুক কথা লিখতে পারবেন না। অমান্য করলে হয় ফাটক, না হয় লেখা গুম। এতসব বাধানিষেধ সত্ত্বেও বিদেশী খবরের কাগজগুলো যা লিখছে তাতে জঙ্গীশাহীর বিচারের বেলুনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

'নিউজউইক' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। এই মার্কিন সাপ্তাহিকীটির সাথে সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য বলেছিলেন। সেই কাগজই লিখেছে, ইয়াহিয়ার সরকার যাদেরকে অনুপ্রবেশকারী, ভারতীয় চর বলছে তারা তো শুরু থেকেই লড়ছে সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে। এরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কিছুই নয়। পত্রিকাটিতে ভারতীয় গোলাবর্ষণের পাকিস্তানি অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, শেলগুলো পরীক্ষা করলেই যে-কোনও পর্যবেক্ষক বুঝতে পারবেন—এগুলো নিকটপাল্লার কামান বা দু'ইঞ্চি মর্টার থেকে বর্ষিত হয়েছে। দূরত্ব বিচার করে একথা অনায়াসে বলা চলে ভারত থেকে বর্ষণ করলে শেলগুলো এত দূরে আসতে পারে না। বিলেতের কাগজগুলো বলছে, বিবিসি বলছে, ফ্রান্সের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র 'লামদ্' বলছে একই কথা। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তোতার শেখানো লব্‌জ্ তো পাল্টে যাবে না!

এরপর ধরুন না 'অবস্থা স্বাভাবিক, দেশপ্রেমিকরা দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিচ্ছে' তোতার এ বাণীর কথা। দেশপ্রেমিক নাগরিকরা জঙ্গীশাহীর সাথে এমনই সহযোগিতা করছেন যে এখন তাদের উপর পিটুনি ট্যাক্স ধার্য করতে হচ্ছে জঙ্গীশাহীকে। এতেও যদি নিজেদের দৈন্য প্রকাশ না পায় তবে 'দৈন্য' শব্দের আভিধানিক অর্থই পাল্টে ফেলতে হবে। বিবিসি'র ভাষ্যকারের মতে, পিটুনি ট্যাক্স ধার্য থেকে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, জঙ্গীশাহীর এ দাবীর অসারতা দুনিয়া মানুষ বুঝতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনীর লোকজন বাংলার মানুষের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাচ্ছে, এ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। গার্ডিয়ান, ডেলি টেলিগ্রাফ ও বিবিসি'র মতে বাংলাদেশের মাইলের পর মাইল এলাকায় ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বা তার ক্রীড়নক সরকারের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি ইয়াহিয়ার চামুর দল রাতের বেলা কোথায়ও বের হতে সাহস করে না।

মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জঙ্গীশাহীর এই যখন হাল্‌হকিকত, সৈন্যদলের মোরাল ঠিক রাখার জন্য তখনই খাঁ সাহেবরা গোয়েবলসের প্রেতাত্মার ঘাড়ে ভর করেছেন। তাই প্রতিদিন কুৎসা আর মিথ্যার বোঝা তাদের বেড়েই চলেছে। কিন্তু এমন দিন আর দূরে নয়, যখন মিথ্যার বোঝা চাপা পড়ে জঙ্গীশাহীকে পুঁজিপাটা-সমেত পৈত্রিক প্রাণটাও হারাতে হবে।

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

একেবারে গোমর ফাঁক! ইয়াহিয়া খাঁ'র জবর বাক্যবাগীশ-জেনারেল, এ, এ, কে, নিয়াজীকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে মার্কিন কাগজ 'নিউজইউক'। এত জাঁক করে তিনি বলেছিলেন, মার্চে যা করেছি, প্রয়োজনবোধে আবার তা করবো ঢাকার রাজপথে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলো অপেক্ষা করছে। কিন্তু নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর আরনড-দ্য-ব্রচগ্রেভ তো আর নিয়াজীর ক্যান্টনমেন্টের সিপাই নয়। সাফ বলে দিয়েছেন, জেনারেল তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছো। পায়ের তলায় মাটি যে কতটা সরে গেছে তার খবর রাখ না। বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ থানার উপর তোমাদের কোনও কর্তৃত্ব নেই। মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। খোদ ঢাকার উত্তরাংশ এখন মুক্ত।

বাংলাদেশে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান শেষ করার লম্বা-চওড়া আশ্বাসদানকারী নরঘাতক জেনারেল টিক্কা খানের সুবৃহৎ বেলুনটি চুপ্‌সে যাওয়ার সাথে সাথেই এ, এ, কে, নিয়াজীর আবির্ভাব। পাঞ্জাবের সাবেক সামরিক প্রশাসক এই জেনারেলের ভূমিকা সামরিক চক্রের জঘন্য ষড়যন্ত্রগুলিতে কোনও অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। '৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ—যখন সারা দেশ গর্জে উঠেছিল। আইয়ুবের স্বৈরাচারী কুশাসনের বিরুদ্ধে, হরতাল মিছিল আর ঘেরাওয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল সামন্ত প্রভু একচেটিয়া পুঁজিপতি আর সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ, পশ্চিমী আমলারা আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছিল সামরিক অফিসারদের বাড়িতে বাড়িতে সেই সময়ে এই নিয়াজীকে দেখা যায় ঝিলামের একটি সামরিক ছাউনী এলাকায় অফিসারদের সাথে শলাপরামর্শ করতে—সংগঠিত করতে। '৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ইয়াহিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছিল, জেনারেল নিয়াজীর—যাকে সামরিক চক্র টাইগার নিয়াজী বলে অভিহিত করে থাকে— নেতৃত্বে একদল অফিসার এই মর্মে আলটিমেটাম দিয়েছিল যে তারা বাংলাদেশের তথাকথিত অরাজকতা কোনোমতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাদের মতে, এই সময়ে যা চলেছে তাকে বাড়তে দিলে সব যাবে। শোনা যায়, ঝিলামের সেই কুখ্যাত বৈঠকেই ঠিক করা হয়েছিল, বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য যদি দরকার হয় তবে লক্ষ লক্ষ লোককে সাবাড় করে দেওয়া হবে। শহরে-নগরে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের উপর প্রয়োজনবোধে চালানো হবে ট্যাঙ্ক। তবে নিয়াজীর বড় আফসোস ছিল '৬৯ সালেই এগুলো ঘটেনি বলে। অতএব নিয়াজী এ্যান্ড কোম্পানিরা বাংলাদেশের গণহত্যার ব্লুপ্রিন্টটা দু'বছরের জন্যে কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিলেন। তাই '৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশের মানুষের অসহযোগ আন্দোলনের আলোতেই এইসব জেনারেলরা তাদের বিপদের সঙ্কেত দেখতে পেলো কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন। তাই তারা চক্রান্তের জাল ফেলতে শুরু করলো একে একে। অবশেষে এল ২৫শে মার্চের সেই কালোরাত। টিক্কা খাঁর সাথে সাথে জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশে এলেও প্রেক্ষাপটে তার আগমনবার্তা ঘোষিত হয়নি। কিছুটা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন তিনি। দায়িত্ব দেওয়া হলো বাঙালি নিধনের অপারেশনের। তারপর একদিন রণাঙ্গনে তার আবির্ভাব সামরিক প্রশাসক ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডাররূপে।

কিন্তু এবারে জেনারেল সাহেবের ইস্টার্ন কমান্ড একেবারেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে মুক্তিবাহিনীর গোলা আর বুলেটের আঘাতে আঘাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজাকার নামক একদল ক্ষুদে ডাকাত সৃষ্টি করা হলো, যাদেরকে 'নিউজউইক' পত্রিকা "রাস্তার বখাটে তস্কর দল" বলে অভিহিত করেছে। পত্রিকাটির মতে, "হাতে অস্ত্র আছে বলে রাজাকারদের দল নিজেদের খোদা বলে মনে করে। যত্রতত্র নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করছে। যারা তাদের আশ্রয় দিতে বা মেয়েলোক সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে হত্যা করছে গুলি করে। এরপর মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় অভিযানের সামনে সেনাবাহিনী প্রথমেই ঠেলে দিচ্ছে, এইসব নির্বোধ রাজাকারের দলকে।"

এসব সত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজীর লম্বাচওড়া দাবী কেন? নিউজউইকের মতে, পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা লাঘবের জন্য জেনারেলের জল্লাদ বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে ব্যাপকাকারে, চালাচ্ছে লুঠতরাজ। সংবাদদাতা ঢাকার ডেমরা এলাকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যদল এই গ্রামটি ঘেরাও করে ১২ থেকে ৩৫ বছরের প্রত্যেকটি মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের উপরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। এই হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিকতায়ও শেষরক্ষা যে অসম্ভব, বাংলার দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে একবার তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

**২৮ নভেম্বর, ১৯৭১**

মিথ্যেবাদী রাখালের কান্নায় ভিজে তার মহাপ্রভু শ্বেতপ্রাসাদ থেকে একেবারে দূরপাল্লার টেলিফোন করে বসেছেন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে। অভিপ্রায়—কিভাবে বাঁচানো যায় রাখালটিকে। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক-টৈঠক কিছু করা যায় কিনা, তারই সলাপরামর্শ নাকি চলছে। হাজার হলেও এই রাখাল আর তার দেশ দীর্ঘদিন ধরে সাথে সাথে আছে সবকিছুতে। সেই বাগদাদ চুক্তি, সিটো আর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি থেকে শুরু করে সবসময়ে দুর্দিনে-সুদিনে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে পিন্ডির জঙ্গীচক্র। '৫৮ সালের ইরাকী বিপ্লবের পর বাগদাদ জোট থেকে খোদ বাগদাদ খসে পড়ার পরেও পিন্ডির জঙ্গীচক্র উৎসাহী দোসর হিসাবে পাশ্চাত্যের সাথে থেকেছে সেন্টো চুক্তির বাঁধনে। আর এশিয়ার মাটিতে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও পিন্ডির জল্লাদের দল কোনও সময়েই সিটো জোট থেকে সরে দাঁড়ায়নি। অতএব এ ধরনের একটি বিশ্বস্ত দালালকে তো রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জাতিসংঘ নামক সংস্থাটির সনদ নিয়ে। এই সনদ অনুযায়ী একমাত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখা দিলেই শুধু স্বস্তি পরিষদ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পিন্ডির জঙ্গীচক্র এখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি, যাকে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হওয়ার মতো পরিস্থিত বলে অভিহিত করা চলে। অন্যদিকে জঙ্গীচক্রের বরকন্দাজেরা একথা ক্রমান্বয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, বৈদেশিক হামলা-টামলা নয়, মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণেই এখন তারা চোখে সর্ষের ফুল দেখতে

শুরু করেছে। বরকন্দাজ দলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজী তো খোলাখুলিভাবে বলেই ফেলেছেন যে একমাত্র ঢাকাতেই দু'হাজার গেরিলা সক্রিয় রয়েছে। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ বলছে, যশোরের চৌগাছার কাছে লড়াই চলছে। তবে কিনা মুক্তিবাহিনী এখনও সরাসরি যুদ্ধ করার পর্যায়ে যায়নি! অতএব জঙ্গীচক্র শীঘ্রই চৌগাছা আবার দখল করতে পারবে—এই তাদের আশা। বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রেডিও গায়েবী আওয়াজ এটা প্রচার করলেও, একটি সত্য সকলের কাছে এটা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়— চৌগাছায় মুক্তিবাহিনীর সাথেই জল্লাদ দলের লড়াই চলছে। অতএব বৈদেশিক আক্রমণের জুজুটা যে একেবারেই নির্জলা মিথ্যা, এটা রেডিও গায়েবী আওয়াজও স্বীকার করে নিল। এমতাবস্থায়, অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর সাথে জল্লাদ দলের লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে শ্বেত-প্রাসাদের মহাপ্রভুরা রাখাল বালকের জন্য তাদের উদ্বেগকে নিয়ে স্বস্তি পরিষদের কোথায় রাখবেন? আন্তর্জাতিক আইন-কানুনেই তা স্পষ্টতই ধোপে টেকে কি করে? বাংলার মানুষের মুক্তিসংগ্রামের আটমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ আটমাসের তীব্র ও তিক্ত সংগ্রামকালে যাদের মুখ থেকে এমনকি সমবেদনার একটি কথাও শোনা যায়নি আজ তারা এতই উদ্বিগ্ন যে স্বস্তি পরিষদে হাজির হওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবছেন। অবশ্য মিথ্যেবাদী রাখালটিকে নিয়ে শ্বেতপ্রাসাদের মহাপ্রভুরা উদ্বেগে আজ সোচ্চার হলেও নতুন কিছু নয়। কিছুদিন আগে ছ'জন সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্তদল গঠনের কথা তারা ঘোষণা করেছিলেন। এটার মাধ্যমে তারা আসর জাঁকাতে চেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঐ রাখাল বালকটিকে কিছু কিছু সুপরামর্শও দেয়া হয়েছে। এই সেই অনুযায়ী বাংলার গভর্নর পদে আবদুল মোতালিব মালিক নামক জনৈক দালাল দন্তচিকিৎসককে বসানো হয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনগণের কাছে পরিত্যক্ত কতিপয় রাজনীতিককে নিয়ে একটি তথাকথিত বেসামরিক সরকারও খাড়া করা হয়েছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনকে তথাকথিত 'সুবিচার' হিসেবে দেখানোর জন্য একজন অনুমোদিত কৌসুলি দেয়া হয়েছে। আরো শোনা যায়, মার্কিনী সুপারিশ অনুযায়ীই গঠন করা হয়েছে রাজাকার বাহিনী, দেখানো হয়েছে সাধারণ ক্ষমার প্রহসন।

বাংলাদেশের মানুষ, সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কেউই এই ধরনের কোনও ফাঁদে পা দেননি। সকলের কাছেই এই ধরনের সুকৌশল-চাতুর্যের আসল মতলবটা সবসময়েই ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। এবার তাই মরণোন্মুখ রাখাল বালকটিকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা শুরু হয়েছে শ্বেতপ্রাসাদ আর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে। যে সংস্থা বাংলার লাখ লাখ মানুষ হত্যার, গণহত্যার অভিযোগ শুনতে চায়নি, জল্লাদ দলের অত্যাচারে পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি মানুষের আকুল আবেদন যাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি তাদের নতুন যেকোনও চক্রান্ত বাংলার মানুষ বানচাল করে দেবে। হানাদার বাহিনীকে চিরতরে খতম করে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে অম্লান অক্ষয় রেখেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এই নতুন চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বস্তি পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মার্কিন চক্রান্ত একের পর এক চলতে থাকলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এটা অস্বীকারের অর্থ সকালের নবীন সূর্যের আলোকরশ্মি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। নিরাপত্তা পরিষদে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে কতিপয় পেটুয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে এবং চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ তথা ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছে। আর তাদের সাথে এ ব্যাপারে ভিড়ে গেছে ইসলামের বেশধারী কতিপয় ইসলামপন্থী রাষ্ট্র। কিন্তু জাতিসংঘে যত তাড়াহুড়ো করেই তারা প্রস্তাব পাস করুক না কেন বাংলাদেশে পিন্ডির জল্লাদ দলের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দুর্বার অভিযান তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। জাতিসংঘের ফরমান বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধের সকল প্রাচীর ধসে পড়বে, এটা এখন প্রায় সুনিশ্চিত। সত্যি কথা বলতে কি, জাতিসংঘ নামক ঠুঁটো জগন্নাথকে রবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আর পাচ্ছে না বা এ সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার যে সূর্য আজ আপন মহিমায় বিকশিত হয়েছে তাকে কলঙ্কিত করার মওকা পাক-দোস্ত চীন বা পিন্ডির মহাপ্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের রবার স্ট্যাম্প জাতিসংঘ পাবে না।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে সংগ্রাম শুরু করেছেন মহান গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতির পর তা আজ এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মুক্তাঞ্চলে নবজীবনের রূপায়ণের মহান দায়িত্ব আজ মুক্তিসংগ্রামী সকলের উপর বর্তেছে। তারাই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সুখী শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নকিব। এজন্যেই প্রথমে মনে রাখা দরকার আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও মূলনীতির কথা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাঁদের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীন বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছেন। এই নীতির ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তাঁরা বলেছেন, মানুষের উপর মানুষের শোষণের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক ব্যবধানের অবশ্যই বিলোপ সাধন করতে হবে। আজ তাই এমনভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ উপকৃত হয়। যাতে শ্রমিক-কৃষক পায় সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের জীবনযাত্রার পুনর্বাসনের জন্য।

বস্তুতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোটি কি ধরনের দাঁড়াবে তার একটি মোটামুটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে। এতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা, ভারী ও বৃহৎ শিল্পসহ পাট, তুলা, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি সমেত আমদানী-রফতানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা বলা হয়েছে। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং কর

কাঠামোর প্রগতিশীল রূপায়ণের দিকও নির্দেশিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান ও কৃষিনির্ভর দেশ সেহেতু গ্রাম-বাংলার উন্নয়ন তথা কৃষির পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনীতির বৈপ্লবিক রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। দারিদ্র তার সর্বগ্রাসী সংহার মূর্তি নিয়ে সর্বত্র সমান ছায়া ফেললেও পাকিস্তানি শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চেহারা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পাকিস্তানি শোষকরা দরিদ্র কৃষককুলের কল্যাণের জন্য কোনও ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেই নি বরং এমন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে ভূমিহীন কৃষকের হাতে এককাঠা জমি না যায়। এক সময়ে ভূমির সর্বোচ্চ সীমা পরিবার প্রতি ৩৩ একর নির্ধারণ করে যে আইন পাস করা হয়েছিল, জল্লাদ ইয়াহিয়ার গুরুদের আইয়ুব খাঁ তাকে রদ করে ১২৪ একরে নির্ধারণ করে। যার ফলে উদ্বৃত্ত ভূমি বাংলাদেশে বন্টনের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই আজকে বাংলাদেশের মেহনতি কৃষক সমাজের ৭৬ শতাংশ হয় ভূমিহীন আর না হয় নিতান্তই গরিব। পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্ত ভূস্বামী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সীমাহীন শোষণের ফলে বাংলাদেশের কৃষকের ঋণের পরিমাণ শুধু সরকারের কাছেই দাঁড়ায় একশো কোটি টাকার উপরে। জোতদার ও মহাজনী ঋণের পরিমাণ তাতে ধরা হয়নি। আর কৃষকদের মধ্যে এই মহাজনী ঋণের পরিমাণ যে কত ব্যাপক তা সকলেরই জানা আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ আবাদী জমিও এদের কব্জার মধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার বলে বিবেচিত জেলাগুলো—সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে মহাজনী ও জোতদারী শোষণের রূপটা সবচেয়ে প্রকট। এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার অবসানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে। ভূমিব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে যাতে সত্যিকারের কৃষক উপকৃত হয়। বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ জমির জন্য বকেয়া কোনও খাজনা দিতে হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-ব্যবসায়ী তথা আপামর জনসাধারণের জন্য এক সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের দায়িত্ব আজ সকলের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজ হাতে নিয়েছেন। নয়া জামানার নতুন নকীবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আজ নবজীবনের শপথ, নতুন সমাজ গঠনের রণতূর্য।

# রক্তের অক্ষরে লিখি

**১৪ নভেম্বর, ১৯৭১**

শান্তির ললিতবাণী যাদের কাছে পরিহাসের সামগ্রী সেই দানবের সঙ্গে সংগ্রামের তরে সংগ্রামীরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে—এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছিলেন বহু বছর আগে। আজ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করছি সংগ্রামীদের পদচারণা, বীরের মতো তারা যুদ্ধ করছে শত্রুর সঙ্গে, প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। প্রাণ দেয়া-নেয়ার এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের সোনার বাংলা ও তার শান্তিপ্রিয় মানুষকে সুখের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার মহান সংকল্প নিয়েছে। জেগেছে মানুষ, জেগেছে প্রাণ, খুলেছে দুয়ার। কার সাধ্য বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে! কার সাধ্য অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করে।

সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলাদেশ, রক্তাক্ত বাংলা, সংগ্রামী বাংলা। সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলার মানুষ, প্রমাণ তাদের সংগ্রামী চেতনা। সেই চেতনার কথা বলেছেন বাংলারই এক কবি :

আমার চেতনা ঘিরে বিচ্ছুরিত এক কণা
গড়ে তোলে আর এক রক্তিম চেতনা
পৃথিবীর সব কথা ম্লান ভেবে, অনেক বিস্মৃতি
মুছে ফেলে আজ জেগে থাক রক্তাক্ত স্মৃতি।

এই রক্তাক্ত অনুভূতির কথা বাংলার হৃদয়কে উজ্জীবিত করেছে। বাংলার যে মানুষ চিরকাল শান্তি চেয়েছে, চেয়েছে সবাইকে ভালোবাসতে, চেয়েছে পরের তরে সব কিছু উৎসর্গ করতে, ভালোবেসেছে বন্দুকের বদলে কবিতা—তারা আজ তুলে নিয়েছে হাতিয়ার। নেমেছে মানুষের শত্রু, শান্তির শত্রু, সভ্যতার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আজ শত্রুহননের পালা। জীবন আজ উৎসর্গিত হবে জীবনকে বাঁচাতে—জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে এমনভাবে যেন শত্রু আর শান্তির নীড়ে হানা দিতে না পারে। তাই আজ চারিদিকে লাল সূর্যের অভ্যুদয়। ...

**২১ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জোরদার করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'জয়বাংলা' সাপ্তাহিক বাদে বাংলার বাণী, নতুন বাংলা, বিপ্লবী বাংলা, স্বদেশ, দাবানল প্রভৃতি নানা নামের পত্র-পত্রিকায় আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতির সংবাদ, অজেয় মনোবল ও অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী সহ দেশী-বিদেশী সংবাদ সব সময় বেরুচ্ছে। দেশের জনসাধারণকে সব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল রাখতে এই পত্র-পত্রিকাগুলো নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে।

---

* 'রক্তের অক্ষরে লিখি' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত।

হানাদারদের মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দেশপ্রেমিক সাংবাদিকরা মন-প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ার যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা দেশের মানুষ সব সময় করে চলেছে এটা তারই একটি অংশ। দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সংবাদপত্র যে মহান ভূমিকা পালন করতে পারে সেই ভূমিকাই আন্তরিকভাবে এইসব পত্রিকাগুলো পালন করে চলেছে।

সংগ্রামীরা যুদ্ধের সংগে সংগে কলম ধরেছেন এবং দেশপ্রেম ও সংগ্রাম এক হয়ে যে আগুন ঝরাচ্ছে তা অনুভব করতে হলে এই পত্রিকাগুলো বারবার পড়া দরকার।

মুক্তিযোদ্ধারা ডায়েরি আকারে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা সবসময় লিখছেন এখানে। 'দাবানল' পত্রিকায় ' গেরিলার ডায়েরী' লিখেছেন মুকুল নায়ক। ৩১শে অক্টোবর সংখ্যায় ইনি লিখছেন :

"আমি একজন গেরিলা নায়ক। গত মাসে পাবনার বিভিন্ন মুক্ত এলাকা ঘুরেছি। গ্রামবাংলার মানুষ এত দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতনের মাঝেও সুকঠিন মনোবল নিয়ে থাকতে পারে এটা একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের বাড়িঘর দস্যুসেনারা জ্বালিয়েছে, লুট করেছে মা-বোনের ইজ্জত, হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে, তবুও তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন মুক্তিবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায়। ... তাঁরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। ... তাঁদের সকলের কথা 'অস্ত্র চাই, মরতে হয় যুদ্ধ করে মরবো, দেশকে স্বাধীন করবোই'। কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল তাঁদের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে।"

এরপর লেখক দালাল, দস্যু ও পাক-সেনাদের খতম করার কাহিনী বলেছেন :

"রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে এল আমাদের গেরিলা ইউনিটসমূহের দলপতিগণ।... গাজনার বিলে অপারেশন করে এগারোজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে ধরে এনে গণআদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বাকী দুষ্কৃতকারীগণ গ্রাম থেকে পালিয়েছে।... তৃতীয় দল নগরবাড়িগামী পাকসেনা বোঝাই ট্রাকের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২ জন পাক-সেনাকে খতম করেছেন।

তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা শুনে সত্যি আনন্দ অনুভব করছিলাম।"

'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকায় নিয়মিত 'মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী' প্রকাশিত হচ্ছে। বরিশাল থেকে মিজানুর রহমান লিখেছেন তাঁর উপর পাক-সেনাদের নির্যাতনের কথা, কিভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন তার কথা। তিনি লিখছেন :

"মৃত্যুর হাত থেকে আমি বেঁচে এসেছি। বাঁচিয়েছি মুক্তিসংগ্রামী আবদুল জলিলকে। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি শহীদুল হাসান, শাহজাহান ও আমির হোসেনকে। ওরা আজ মৃত্যুর দেশে বসে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে। ..."

এই স্মৃতিচারণের পর লেখক বর্ণনা করেছেন কিভাবে তাঁরা পাঁচ বন্ধু খান-সেনাদের হাতে বন্দি হলেন। এরপর তিনি লিখছেন :

"পাক হানাদাররা আমাদের পাঁচজনকে পাঞ্জাবি পুলিশের হেফাজতে রেখে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। ..এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। সেখানে পাঁচজনের উপর চলল নির্যাতন। ..শরীর কেটে লবণ পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। সমস্ত রাত ধরে চলল এমনি অত্যাচার, পরদিনও কাটল। আবার রাত হলো ...

দেখতে দেখতে এক সময় চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, ফায়ারের অর্ডার হলো। তিনজন পাঞ্জাবি পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠল, লুটিয়ে পড়ল শহীদুল হাসান, শাহজাহান, আমির হোসেন। আবার ট্রিগার টানা হলো। মুহূর্ত পরেই লুটিয়ে পড়ব আমরা বাকী দুজন, কিন্তু এমন মৃত্যুই কি চেয়েছিলাম?

না, না, প্রতিশোধ নিয়ে তবে মরতে হবে। পাশেই স্রোতস্বিনী নদী বয়ে চলেছে—বাঁচতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে। আবার ফায়ারের অর্ডার হলো। কিন্তু তার আগেই জলিলকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীর বুকে। হে দেশমাতা, তোমার বুকে ঝাঁপ দিয়েছি, তুমিই গ্রহণ কর।

রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল নদীর বুকে, জলিলকে ধরে ডুব দিতে দিতে ওদের নাগালের বাইরে চলে এলাম, এবার প্রতিশোধ।"...

**২৫, নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এক বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে এ বছরের ঈদ উদযাপন করলো। দেশের মধ্যে পশুশক্তির প্রতীক ইয়াহিয়া চক্র নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, নিরস্ত্র বঙ্গবাসী প্রাণ রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত, আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনপণ করে লড়ছে শত্রুর সঙ্গে। বিভিন্ন সেক্টরে খান-সেনারা আজ কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, দিন গুণছে মৃত্যুর। এমনি পরিবেশে ঈদের চাঁদ উঠলো, ঈদও হয়ে গেল—কিন্তু বাঙালি আজ দরদভরা কণ্ঠে, আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে শুনতে পেলো না নজরুলের সেই বিখ্যাত গান : 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।'

এতে বাংলাদেশের মানুষ দুঃখিত নয়। কারণ তারা জানে যে, কোনও জাতির জীবনে কোনও কোনও সময়ে এক-একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে যখন তাকে স্থায়ী একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে ভাবতে হয়, জীবন বির্সজন দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় শত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। শত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তাকে এ কথা নিশ্চিত প্রমাণ করে যেতে হয় যে, পরবর্তী বংশধরেরা আর অত্যাচারিত, শোষিত, নিষ্পেষিত হবে না। সেই ঐতিহাসিক ও চরম মুহূর্ত আজ এসে গেছে। আমরা সেই ইতিহাস পরিবর্তনকারী, ইতিহাস সৃষ্টিকারী গৌরবময় মুহূর্তের মধ্যে আছি যখন আমরা বুঝতে পারছি 'ফুল খেলবার দিন আজ নয়—আজকের দিন হচ্ছে চরম সংগ্রামের, চরম আত্মত্যাগের, আত্মোপলব্ধির।

বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অবস্থা বিরাজ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার ঈদ সম্পর্কে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্র-পত্রিকায়।

সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকা ২রা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছেন : এবার শারদোৎসবে বুড়ীগঙ্গার পারে যেমন বাজনা বাজেনি, তেমনি এবার ঈদেও খুশীর চাঁদ বাঙালির আকাশে ওঠেনি। খুশি হওয়ার, উৎসব করার অবকাশ কই এখন বাঙালির জীবনে? গোটা জাতি যখন তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত, নরপশু ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের বিরুদ্ধে জাতি যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন উৎসব করার, আনন্দ করার অবকাশ মানুষের জীবনে থাকতে পারে না।

গতবারও বাংলাদেশের মুসলমান রোজার ঈদে উৎসব করতে পারেনি। বারোই নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঝড়ে সেবার বিশ লাখ বাঙালি মৃত্যুবরণ করেছে। দেড় হাজার মাইল দূরে তথাকথিত ইসলামাবাদের শাদ্দাদী বেহেশতে বসে ইয়াহিয়াচক্র বিশ লাখ বাঙালির মর্মন্তুদ মৃত্যু দেখে উপেক্ষার শয়তানী হাসি হেসেছে এবং আরো দশ লাখ বাঙালিকে হত্যার জন্য ছুরি শানিয়েছে। গতবার বাংলার মুসলমান বিশ লাখ মানুষের মৃত্যুর শোকে রোজার ঈদে শোকাশ্রু চোখে কাতারবন্দি হয়েছে নামাজের ময়দানে,— এবার আরো দশ লাখ ভাই-বোনের লাশের স্তূপের উপর বসে তারা আকাশে দেখছে বাঁকা খঞ্জরের মতো ঈদের চাঁদ। এবারও তারা উৎসব পালন করতে পারে না।

আজ নয়, বাংলার আকাশে খুশির ঈদের চাঁদ একদিন উদিত হবে। এবং সেদিন সুদূর নয়— যেদিন ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হবে এবং স্বাধীন ও মুক্ত বাংলার নীলাকাশে শওয়ালের চাঁদ সব অশ্রুর কুয়াশামুক্ত হয়ে আবার খুশির রোশনাই ছাড়বে।

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঈদ সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত একটি পাকা মসজিদের ছবি-সহ এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছে :

বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে এসে ঈদ যেন এবার ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল। তার নাকে যেন কী একটা উৎকট দুর্গন্ধের দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ফেললো। কী এক বিকট হাহাকার ও আর্তনাদের ধ্বনি যেন তার কানে তালা লাগিয়ে দিল। চোখ তুলে এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল সে। ধ্যাননেত্রে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় কোথাকার কোন্ রক্তপিপাসু রক্তপায়ী দানবের দল কামড়ে-আঁচড়ে লাখো লাখো বাঙালির মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্ত ঝরিয়ে চলে গেছে। ধর্ষিতা বাংলার মা হতচেতন অবস্থায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আর এখনো যারা বাংলাদেশে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে আছে তারা প্রায় সকলেই প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় শোকাতুর, ব্যথাতুর ম্লানমুখ, জীবন্মৃত অবস্থায় ধুকছে। আমি কি করে এদের মুখে হাসি ফোটাব?

মৃত্যুর সঙ্গে, শত্রুর সঙ্গে যে পাঞ্জার লড়াই চলছে তার সংবাদ দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনীর নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের উদ্দেশ করে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, আমরা শত্রুকে চারদিক থেকে আঘাত হেনে চলেছি, দেশবাসী যেন তৈরি থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলেছিলেন সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে। শত্রুকে নির্মূল করে এমন এক সুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে একজন আর একজনকে শোষণ করতে পারবে না। সবাই সমান সুযোগ-সুবিধে পাবে।

এর পর পরই মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসেনার উপর আঘাত হেনেছে এবং খুলনা, যশোর, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রামে খান-সেনারা প্রচণ্ড মার খেয়ে ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। মুক্তিবাহিনী এখন বিজয়ের পথে। সে কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী গত ২৩শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক বেতার ভাষণে দেশের প্রতিটি মানুষকে শত্রুর ওপর

চরম আঘাত হানার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, শত্রু দাঁতভাঙ্গা জবাব পাচ্ছে। সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।' তার মনোবল ভেঙে গেছে। সে বুঝতে পারছে অন্যায় টিকতে পারে না, অহঙ্কারের পতন অবশ্যম্ভাবী, অত্যাচারীর ধ্বংস অনিবার্য, পশুশক্তি মানবতার কাছে কিছুই নয়। বাংলার মানুষ আজ ইতিহাসের শুভ্রতম পৃষ্ঠাগুলো অধিকার করছে, আর ইয়াহিয়া-চক্র ইতিহাসের কৃষ্ণতম পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ছে। এরই নাম ইতিহাস, এরই নাম মহাকাল। এরই নাম সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়।

**২ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

... ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তখনও আমরা জানতাম পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনধারণ পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই আমাদের মিল নেই, তাদের সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় নেই, বহু দূরে অবস্থিত সেই দেশের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সব সময় পরিচয়েরও সুযোগ নেই। তবু আমরা মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিলাম। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি নিয়েও একসঙ্গে বাস করা যায়। রাশিয়া, ভারত, চীন তার প্রমাণ। আমরা আশা করেছিলাম ইতিহাসের দৃষ্টান্ত যেমন আমরা অনুসরণ করছি তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও অনুসরণ করবেন। দেয়া-নেয়া, মিলনের মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে। সেজন্যেই আমরা সব সময়ই স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম, স্বার্থত্যাগ করেছিও। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদে সমান সমান প্রতিনিধিত্ব আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এ কথা আমরা বলিনি যে একমাত্র বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা আমরা চেয়েছিলাম, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা আমরা বলিনি যে উর্দু সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে— যে উর্দুকে আমরা জানবো না, উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। বরং উর্দু ছোটগল্প, কবিতা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ-ই ছিল। সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ-সহ অনেকেই আমাদের পরিচিত ছিলেন। শুধু উর্দু কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সবকটি ভাষা সম্পর্কেই আমাদের গভীর আগ্রহ ছিল। পশতু বা সিন্ধী সাহিত্য জানবার চেষ্টা করেছি আমরা। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন সিন্ধী ভাষার বহু পুরানো পুথি পুড়িয়ে দেয় তখন ও আমরা অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। বস্তুত, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি ভাষা ও সাহিত্য কেন পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও সাহিত্য জানবার দরজা আমরা সবসময়ই খোলা রেখেছি। বাঙালি কি ইতিপূর্বে সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, উর্দু, ইংরেজি শেখেনি? সেইসব ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অধিকার অর্জন করেনি?

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনওরকম বাধানিষেধ বা ঘৃণার জন্ম দিতে কখনও রাজী হয়নি। আমরা জানিয়ে দিয়েছি কোনও কিছু জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে আমরা মেনে নেবো না— যেমন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি; কিন্তু তখন আমরা বলিনি, উর্দু

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। এমনকি বাংলাদেশে যে সমস্ত উর্দুভাষী বাস করছেন তাঁদেরকে উর্দু বাদ দিয়ে কেবল বাংলাই শিখতে হবে এমন কথাও আমরা বলিনি। আমরা সবসময়ই উদার নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা স্মরণ করেছি যে, হিটলারের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছে তখনও জার্মান সাহিত্য গ্রন্থ বা সংগীত বন্ধ করে দেয়নি ব্রিটেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদের লেখকরা বার বার কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন; বিশেষ করে ভারত থেকে বাংলা গ্রন্থাদি আমদানী করার সময় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা বলেছিলাম যে, যে জাতি জ্ঞানের দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয় সে জাতির মৃত্যু অনিবার্য। কেবল গায়ের জোরে একটি জাতি টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী। ...

**৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

... আমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা, সবসময় পারস্পরিক সহযোগিতায় ভিত্তিতে বাস করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বলেই দীর্ঘকাল ধরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রচণ্ড স্বার্থত্যাগ করেছিলাম। বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, আর বাংলাদেশে সামান্য কয়েকশ কোটি টাকার অভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচার জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। লক্ষ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। তবু পশ্চিমী কুচক্রীদের চৈতন্যোদয় হয়নি। শেষ পর্যন্ত বীর বাঙালি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও করছে শত্রুর সঙ্গে। এখন চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণার সময়, এখন শত্রুর পরাভব শিকারের সময়, এখন শত্রুর অস্ত্র ত্যাগ করে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার সময়। এখন সত্যের জয়, আলোকের জয়, ন্যায়ের জয় ঘোষণার সময়। এখন নতুন সূর্য ওঠার সময়। ...

বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি আজ সেই গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে। তারা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। প্রাণ দেয়ার মহান কর্তব্যে বাংলাদেশের লক্ষ তরুণ আত্মনিয়োগ করেছে। তাদেরই একজন আমিন। সেই আমিনের আত্মত্যাগের কথা লিখেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবী বাংলাদেশ'। পত্রিকাটি লিখছেন :

"তেঁতুলিয়া নদীর পাড়ে ছোট একটি গ্রাম, নাম তার সোনাহাটি। কবে অনাদি কালে কে এই মিষ্টিমধুর নামটি রেখেছিল জানি না, তবে সোনার হাট না হলেও ঘর আলো করা অফুরন্ত সুখ-সৌন্দর্য এই গ্রামটিকে ঘিরে ছিল—আজও কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার সবটুকু হরণ করে নিতে পারেনি। সোনাহাটির প্রতিটি গাছ, পাতা, লতা আর ধুলোমাটির সাথে তার অন্তরের একান্ত আত্মিক সম্পর্ক। সে বন্ধন কেউ কোনোদিন ছিন্ন করতে পারে না—পাক-হানাদার বাহিনী তো দূরের কথা মহাকালও সেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়।"

এরপর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তেঁতুলিয়াতে যে যুদ্ধ হয় তার প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখছেন :

"তেঁতুলিয়ার বুকে আজ দস্যুদের গানবোট। গোলাগুলির বজ্রগম্ভীর শব্দে অকস্মাৎ সোনাহাটির আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখের পলকে ছোট ছোট কুটিরগুলো

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বিশ্বাসঘাতক বেঈমানেরা হানাদারদের খবর দিয়েছে—খবর দিয়েছে আমিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা সুসংগঠিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করছে। আর যোগ্য সেনানীর ন্যায় পরিচালনা করছে ওর সহ-যোদ্ধাদের। এ যুদ্ধ হলো বিপ্লবী বাংলাদেশের বীর সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধ, যে মুক্তিযুদ্ধ কোনোদিন ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেল আর হাল্কা মেশিনগানের গুলি হানাদারদের আক্রমণের জবাব দিতে আরম্ভ করল। পাক পশুরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সারাদিন ধরে এইভাবে চললো গুলি বিনিময়। একশো'র উপর খানসেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—পশুদের উষ্ণ তাজা রক্তে সোনাহাটির মাটি তর্পণ করছে। এক সময় পশ্চিম দিকের মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি চালনা থেমে যায়। এই সুযোগে অবশিষ্ট হানাদাররা গানবোটে পালিয়ে গেল : পেছনে ফেলে গেল ১০/১২ খানা গানবোট ও অসংখ্য আধুনিক মারণাস্ত্র।"

এই যুদ্ধে আমিন শহীদ হয়। আমরা জানি ইতিমধ্যে শত্রুরা তেঁতুলিয়া সহ বহু জায়গায় পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। আমিনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছেন :

"আমিন মরেনি, আমাদের মাঝে ও বেঁচে আছে— বেঁচে আছে বাংলার মাটির সাথে, মিশে আছে তেঁতুলিয়ার উদ্দাম তীরভাঙ্গা পাগলা ঢেউগুলোর সাথে যা কোনোদিনই বাংলা মায়ের কাছ ছাড়া হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশে আবার সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাবে—ফিরে যাবে সেই ছোট গ্রাম সোনাহাটিতে। সেই গ্রামে অজস্র ঝরা বকুল ফুল কবরটাকে ঢেকে রেখেছে। মিষ্টিমধুর গন্ধে মাতোয়ারা মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছটাকে ঘিরে, লক্ষ আমিন জন্মেছে বাংলাদেশে। আমিনরা কোনোদিন মরবে না, আমিনরা কোনোদিন মরে না।

# দৃষ্টিকোণ

**১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের হবু বেসামরিক সরকারের হবু উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর জাতিসংঘ প্রাসাদ চত্বরে পদার্পণের সাথে সাথেই হাজার হাজার মাইল দূরের ভিয়েতনামের টন্‌কিন উপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। গন্তব্যস্থল অনির্দিষ্ট বলে উল্লেখ করা হলেও আপাতত উদ্দেশ্য নাকি ঢাকার মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করা। ঢাকায় মাত্র কয়েকশ' মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের জন্য সপ্তম নৌবহরের পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজের ন্যায় রণপোতকে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই খোঁড়া অজুহাতটি দুগ্ধপোষ্য বালকেও বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া মার্কিন নাগরিকরা হয়তো ইতিমধ্যেই ঢাকা ছেড়ে গেছেন। তাই সপ্তম নৌবহরের এই আকস্মিক আনাগোনা বা শক্তি প্রদর্শনের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে, এটা সকলেই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ করবেন। এদিক দিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ন্যাক্কারজনক কীর্তিকলাপের রেকর্ড কেউই বিস্মৃত হবেন না। মার্কিন সমর দফতর পেন্টাগণের গোপন দলিলপত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর দুনিয়ার মানুষ জেনেছেন কিভাবে বিনা প্ররোচনায় এই সপ্তম নৌবহর টনকিন উপসাগর থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এখনও ভুলে যাওয়ার কথা নয় ১৯৫৬ সালে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর কিভাবে লেবাননে তথাকথিত গৃহযুদ্ধের অজুহাতে বৈরুতে অবতরণ করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন হানাদার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থারের নৌবহর বলে পরিচিত এই সপ্তম নৌবহরকে কোরিয়ার হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। লোক অপসারণের নামে এরা অবতরণ করেছিল চীনের উপকূলীয় দ্বীপ কুময় মাৎসুতে। সপ্তম নৌবহরের নৌ-সেনানী নামানো হয়েছিল ১৯৬২ সালে থাইল্যান্ডে। পর্যবেক্ষকরা তাই ১২৫টি জাহাজ, ৬৫০টি বিমান ও ৬৫ হাজার নৌ-সেনা গঠিত এই সপ্তম নৌ-বহরকে উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গানবোটের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব অবরুদ্ধ মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের অজুহাত যে একেবারেই বাজে একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র ইতিমধ্যেই তাই বলেছেন; মানবিক চাপ সৃষ্টির জন্যই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এই পদচারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের পিন্ডি-প্রেম বর্তমানে প্রায় চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও একেবারে নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সকল জাতির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় সবার আগে এগিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে পিন্ডির জল্লাদ দলের গণহত্যা তথা এক কোটি বাঙালির পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের ব্যাপারে এই মার্কিন প্রশাসন তাই উচ্চবাচ্য করেনি। মার্কিন সংবাদপত্র এবং উদারপন্থী সিনেটরদের প্রবল চাপের মুখে নিক্সন সরকার শরণার্থীদের জন্য কিঞ্চিৎ খয়রাতি বিতরণ করলেও পিন্ডির জল্লাদচক্রকে অস্ত্রশস্ত্র সহ সবকিছুর সাহায্যে মদদ দিয়েছে। যার পরিণতি ভারতের উপর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের প্রকাশ্য নগ্ন হামলা। আজ নিজের চক্রান্তজালে আটকে

জরবদস্ত সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁর যখন নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে তখন পেয়ারের পিন্ডিকে বাঁচানোর জন্য স্বস্তি পরিষদের দুয়ারে ছুটে গেছে নিক্সনের অগ্রদূত বুশ সাহেব। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ায় দিনের পর দিন নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে গ্রামের পর গ্রাম এমনকি বনাঞ্চল সাফ করে দিলেও আজ শ্যামচাচারা এই উপমহাদেশে শান্তির জন্য একেবারে বেচায়েন হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণে যে মার্কিন প্রশাসন অস্বীকৃতি জানিয়েছে সেই একই প্রশাসন আজ বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবারে চক্রান্তে মার্কিনী "কাগুজে বাঘ" রা একা নয়। চীনের বিপ্লবী সাত্বিক নায়করা এবার মার্কিন শ্যামচাচার সাথে ভিড়ে গেছেন। স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব পেশ ও ভোটদানের ব্যাপারে এ দুটো দেশ একই সাথে চলেছে হাতে হাত মিলিয়ে।

পিকিং ও ওয়াশিংটন একের পর এক প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদের উত্থাপন করেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করার জন্য, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে। কিন্তু মহান সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে তাদের সে চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে প্রতিবারেই। সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেনের বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার মূল অনুসন্ধান না করে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগ অধিকারের কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালে তাতে সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। তিনি স্বস্তি পরিষদে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিকে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাতেও সমর্থন জানানোর প্রয়োজনবোধ করে নি।

জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদে ব্যর্থ হওয়ার পর পিন্ডির মহাপ্রভু ওয়াশিংটন আর জানি-দোস্ত পিকিং একই সাথে জাতিসংঘের বাইরে দাবার ঘুঁটি চালাতে শুরু করেছে। নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর সায়গন দরিয়ার পানি কেটে এগিয়ে চলেছে তথাকথিত মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের অজুহাতে। অন্যদিকে তিব্বতে চীনা সৈন্য নাকি নড়াচড়া করতে আরম্ভ করেছে। মার্কিন বা চৈনিক কার্যক্রমের পেছনে যে গূঢ় অভিসন্ধিই থাক না কেন তাদের লেজের আগুনে আর একটি ভিয়েতনাম এই উপমহাদেশে কখনই করতে দেবে না বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি এবং ভারতের ৫৫ কোটি মানুষ। 'স্বাধীন দুনিয়ার' বড় মোড়ল গণতন্ত্রের মেকি ভজনাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ঘৃণাভরে উপেক্ষা করবে এই দু'দেশের সাধারণ মানুষ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও সাম্প্রতিক এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, এই উপমহাদেশ সম্পর্কে মনগড়া যে ধারণা নিয়ে কতিপয় বৃহৎ শক্তি থাকুন না কেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। নিক্সন প্রশাসনে চোখরাঙানি আরো একবার প্রমাণ করলো, গণতন্ত্রের জন্য যতই তারা চীৎকার করুক না কেন আসলে এরা দুনিয়ার সকল জঙ্গীচক্রের শয্যাসঙ্গিনী। ভিয়েতনামের থিউ, কম্বোডিয়ার লন নল, লাওসের ফুমি নোসাভান, থাইল্যান্ডের কিত্তিকাচরণ, কঙ্গোর মোবুতু আর পিন্ডির ইয়াহিয়া সবাই শ্যামচাচার অবৈধ সন্তান।

নিক্সন প্রশাসনের বাসনা থাকলেও বাংলাদেশকে আর একটি ভিয়েতনাম বানানোর পথে বড় বাধা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাগ্রত জনমত। ভিয়েতনামের জঙ্গীচক্রের শাসন বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকার শত শত মা হারিয়েছেন তাঁদের সন্তান, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, পিতা হারিয়েছে পুত্রকে। তাই আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টির ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর মাস্কি, সিনেটর ম্যাক্‌গভার্ন এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সিনেটর মাইক ম্যান্সফিল্ড ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সম্পর্কে নিক্সন প্রশাসনের ভ্রান্তনীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। এই সিনেটরদের মধ্যে অন্তত দুজন আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হতে পারেন। আশা করা যায় এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিক্সন সাহেব যত লম্ফঝম্ফই করুন না কেন আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজনৈতিক সমাধি রচনায় তিনি সাহসী হবেন না। সর্বোপরি, মার্কিন দুঃসাহসের পথে প্রচণ্ডতম অন্তরায় হয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পদগর্নি ইতিমধ্যেই বৃহৎ শক্তিবর্গকে এই উপমহাদেশের সঙ্কট থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে নাক গলানোর বিরুদ্ধে সকলকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত সত্য। জাতিসংঘ বা বিশ্বের অন্যান্য দেশ যত তাড়াতাড়ি এই সত্যকে স্বীকার করে নেবেন, এই উপমহাদেশে সঙ্কট তত তাড়াতাড়িই নিষ্পত্তি হবে। এতে বিভ্রান্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনও অবকাশ নেই।

(লেখকের নাম জানা যায় নি।)

**১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকার অধিকৃত এলাকা থেকে চমকপ্রদ খবর এসে পৌঁচেছে। দখলদার বাহিনীর তথাকথিত বেসামরিক প্রশাসনের শেষ কাঠামোটুকুও ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর গভর্নর ডা. মালিক সদলবলে মন্ত্রিসভা সমেত ইস্তফা দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। চিফ্ সেক্রেটারি ও পুলিশের আই-জি সহ আমলাদের একটি দলও মহাজনী পন্থা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ঢাকার লাখ লাখ বেসামরিক অধিবাসী এখন কি ভাবছেন, কি করছেন? বিগত নয় মাস ধরেই তারা বাস করছেন ইতিহাসের দীর্ঘতম অমাবস্যার রাত্রিতে। ২৫শে মার্চের কালরাতে অমাবস্যার যে অন্ধকার নেমে এসেছিল এখনও তার অবসানের প্রতীক্ষা। স্বজন হারিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, একটিমাত্র আশা তাঁদের—কবে আসবে, মুক্তির সেই সোনালী দিন? আবার যখন বলতে পারবো 'আমার সোনার বাংলা সোনার বাংলার মুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তির দ্বারপ্রান্তে ঢাকায় এখন চলেছে চূড়ান্ত সংগ্রাম—পিন্ডির জল্লাদ দলের

শাসন-শোষণের অবসানের শেষ সংগ্রাম। মুক্তির এই উষালগ্নে জঙ্গীশাহী যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন ঢাকার মানুষ কি ধাতুতে গড়া তা তারা ভালোভাবেই জানে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক হবেন যে ঢাকার মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ, একথা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা চলে। গত এক দশকের ইতিহাস যাঁরা জ্ঞাত আছেন, যাঁরা দেখেছেন কিভাবে ঢাকার মানুষ এই সময়ে জঙ্গী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একের পর এক দুর্বার গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলেছে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। কামানের গোলা, মর্টারের শেল আর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে হাজার হাজারে। কারফিউ আর ১৪৪ ধারা সেখানে নিত্যসহচর। সমুদ্র যেখানে শয্যা পাতা, জঙ্গীচক্রের আজকের শেষ চোখরাঙানিতে সেখানে ভয়ের কি আছে! ঢাকার সংগ্রামী নাগরিকরা পিন্ডির জল্লাদ দলের সকল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে বার বার। ইয়াহিয়ার গুরুদেব আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের খবরদারিকে ছিন্নভিন্ন করে পথে নেমেছিলেন ঢাকাবাসী গণতন্ত্রের দাবী কণ্ঠে নিয়ে ১৯৬২ সালে। মিছিলে মিছিলে রক্ত ঝরেছিল সেদিন আইয়ুবের ছবিগুলো হয়েছিল টুকরো টুকরো। আইয়ুবের দেওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে সংগ্রামের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল রমনার রাজপথে, পটুয়াটুলির অলিতে-গলিতে। আইয়ুবের মৌলিক ধরনের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ঢাকার মানুষ সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। এল ১৯৬৬ সাল। ঐতিহাসিক ছ'দফা আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্ন। বাংলার স্বাধিকারের দাবীতে গর্জে উঠলো ঢাকা। ৭ই জুন স্তব্ধ হয়ে গেল নগরীর প্রতিটি ধমনী। মিছিলের ভৈরব গর্জনে প্রকম্পিত হলো একনায়কত্বের পাষাণ কারা। জনসন রোড, জিন্নাহ এভিন্যু, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শত শত শহীদের রক্ত ম্লান করেছিল কৃষ্ণচূড়ার লাল রং। এর পর থেকে ঢাকার মানুষের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে বার বার ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। ৬৮-৬৯ সালের আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পিন্ডির শাসক চক্রের সকল জঞ্জাল। ঢাকার মুক্তিপাগল মানুষ সেদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে শাসক শ্রেণীর মিথ্যার বেসাতির কারখানাগুলোকে সাফ করে দিয়েছিল আগুনের লেলিহান শিখায়। বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবীতে ঘেরাও করেছিল ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট। সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা নথিপত্র সমেত পুড়েছিল ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমানের বাসভবন। বাঙালি গৃহভৃত্যের মহানুভবতায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। ১৮ই ফেব্রুয়ারির রাত। ঢাকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে সে এক অনন্য রাত। পাকিস্তানের সশস্ত্র সামরিক বাহিনীকে মুখোমুখি মোকাবিলা করেছে নিরস্ত্র মানুষ সারারাত। অবরোধ করে রেখেছে ঢাকা নগরীকে। কারফিউর বিধিনিষেধ দিয়েছে উড়িয়ে মেশিনগানের গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছিল তারা। শ্লোগানে শ্লোগানে ঝংকৃত ঢাকা নগরীতে সে রাতে হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছিল আইয়ুবের বেতনভুক সেনাবাহিনীর। রক্তের বিনিময়ে মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে এনেছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের লৌহকারা থেকে। বিগত সাধারণ নির্বাচনেও ঢাকার মানুষ বিচ্যুত হয়নি তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য

থেকে। ঢাকার দুটো জাতীয় পরিষদের আসনে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গবন্ধুকে জয়যুক্ত করে ধন্য হয়েছিল তারা। তারপর মার্চের অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতেও ঢাকা আপন মহিমায় থেকেছে অম্লান। বস্তুতঃপক্ষে ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করলে ঢাকার মানুষই প্রথমে ছুটে গিয়েছিল তাঁদের নেতার কাছে নির্দেশের জন্য ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে তখন বৈঠক চলছিল বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির। নির্দেশ এল সর্বাত্মক গণঅসহযোগ আন্দোলনের। কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া উড়লো না। ট্রেনের চাকা গেল থেমে। লঞ্চ-স্টিমার স্তব্ধ। বাস-ট্যাক্সি-রিকশা চললো না। এমন যে সাধের পি.আই.এর বিমানগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো মাটিতে। মিছিলে পতাকায় ব্যানারে ফেস্টুনে শ্লোগানে সে আরেক ঢাকা। পিন্ডির শাসক-চক্রের বাংলাদেশ বিরোধী অনড় মনোভাবের মুখে ঢাকার মানুষই প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন একটি নতুন জাতীয় পতাকার, নতুন জাতীয় সঙ্গীতের। মিছিলের বজ্রমুঠিতে সেদিন উচ্চকিত হয়েছিল একটি নতুন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম শপথ।

নিষেধাজ্ঞা-বিধিনিষেধের বেড়াজাল ফেললেই ঢাকার মানুষ প্রতিবাদে আলোড়িত হয়, ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারফিউ দিলে তারা রাস্তায় নামে। কাউকে ডাক দিতে হয় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। আওয়াজ তোলে। গুলিতে বুক পেতে দেয়। আবার শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে আকাশ-বাতাস।

অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে এখনও সে মানুষ আছে। পিন্ডির জল্লাদ দলের পাশবিক হামলাকে বিশেষ এক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা মুখ বুজে সহ্য করেছে। গত ন' মাস শুধু সেই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রতীক্ষায়, যখন তারা ফেটে পড়তে পারবে আগ্নেয়গিরির মতো। নাদিরশাহের সুযোগ্য বংশধর জল্লাদ সরদার ইয়াহিয়া খাঁর পাইক বরকন্দাজের দল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে বিভীষিকাই কায়েম করুক না কেন, ঢাকায় তাদের নিস্তার নেই।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

# রাজনৈতিক মঞ্চ

**৪ অক্টোবর, ১৯৭১**

পূর্ব বাংলা—পূর্ব পাকিস্তান—বাংলাদেশ। এ রূপান্তর ২৫শে মার্চের সেই কালো রাতে বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর ইয়াহিয়ার ঘাতক দলের উন্মুক্ত আক্রমণের ফলে চূড়ান্ত রূপ নিলেও বিগত ২৫ বছরের অনেক বঞ্চনা আর রক্তঝরার ইতিহাস জমাট বেঁধে ছিল এর পিছনে। বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ফল্গুধারার সেই বাঁধটি খুলে গেছে, যা প্রতিনিয়ত পিষে মারছিল বাঙালির সঞ্জীবনী শক্তিকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে রাখার জন্য, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার জন্য একের পর এক চক্রান্তের জাল বুনেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত সামরিক চক্র। বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আঘাত এসেছে একের পর এক। এসবের প্রতিবিধান দাবী করে বাঙালি পেয়েছে শুধু বুলেট।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্জাবি-বেলুচ পাঠান-সিন্ধি সকলের অবস্থানের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বীকৃতি পায়নি শুধু বাংলার মানুষ। ভাগ্যের এ এক নিদারুণ পরিহাস। দেশে জনসংখ্যার যারা শতকরা ৫৬ ভাগ, যাদের ভোটের জোরে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে অতীব কৃত্রিম একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তারাই হলো অবহেলিত। অবজ্ঞা আর বঞ্চনার হলো শুরু। সদ্য স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠলো। সদর্পে ঘোষণা করা হলো—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আর একথা বাঙলা মুলুকে সরবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্ণধাররা ড্যাকোটা বিমানে চেপে ঢাকা এলেন। প্রতিবাদ জানালো ঢাকার ছাত্র সমাজ। মুসলিম লীগের দোর্দণ্ড প্রতাপের সেই দিনগুলিতেও ছাত্ররা রেসকোর্স ময়দানে মুসলিম লীগের মহানায়কের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার তীব্র প্রতিবাদ জানালো। পুলিশ বাহিনী আর গুণ্ডাদলের সম্মিলিত হামলার মাধ্যমে এই প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা হলেও শাসকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে তখন প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিয়েছিল। এল রক্তস্নাত ১৯৫২ সাল। শাসনতন্ত্রের মুসলিম লীগ সংক্রান্ত বিষয়ে আবার এল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। গোলাম মোহাম্মদ-নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠী আবার বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলো উর্দুর বোঝা। এবার ছাত্র-জনতা পথে নামলো ফেস্টুন-ব্যানার-প্লাকার্ড নিয়ে। রাজপথ হলো প্রকম্পিত। বিধিনিষেধের বেড়াজাল গেল উড়ে। খুনী নূরুল আমিনের পুলিশের গুলিতে বরকত-সালাম সহ শাহাদাত বরণ করলেন বহু ছাত্র। জনতা গর্জে উঠলো "আমরা সালামের ভাই! আমরা বরকতের ভাই!!" সেই গর্জন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, কলে-কারখানায়, হাটে মাঠে। একর পরে এক, সর্বদলীয় সমাবেশ ঘটতে থাকলো কুখ্যাত মূলনীতি কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে। জনতার একবাক্যে রায়—মানি না।

এল নির্বাচন। পূর্ব বাংলার মানুষ আইন সভায় নিজেদের বক্তব্য পেশের প্রথম সুযোগ পেলেন। গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট— শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। শাসক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সহ ছোটখাট অনেকেই শরীক হলেন এই যুক্তফ্রন্টে। নির্বাচনী রায়ে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সমাধি রচিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হক বাংলাদেশের স্বার্থে যখনই কিছু করতে ও বলতে শুরু করলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তা নস্যাৎ করে দিল। ৯২ (ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো।

পরবর্তী বছরগুলিতে বুড়ীগঙ্গায় অনেক পানি বয়ে গেছে। বাঙালির রক্তে রমনার কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছ আরো লাল হয়েছে। কিন্তু চক্রান্তের রাজনীতি শেষ হয়নি। মরহুম সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন এবং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমী সামন্ত সামরিক গোষ্ঠীর একমাত্র উপজীব্য ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ রাজনীতিকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে খতম করার।

এবারে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সকল আশা-আকাংক্ষা নস্যাৎ করার জন্য সেনাবাহিনী সরাসরি এগিয়ে এল। সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁর অধিনায়কত্বে এবং তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো সারাদেশ দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ। আইয়ুবী আমলের এই কালো দশকে বাংলার মানুষের জাতীয় সত্তার প্রতিটি তন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার নিষ্ফল চেষ্টা হয়েছে বার বার। শত শত ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে গুলি করে। কারাগারে আটক করা হয়েছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিককে। বাংলা ভাষা-সাহিত্য ধ্বংস করার জন্য চালানো হয়েছিল বর্ণমালা-বানান সংস্কারের দানবীয় অভিযান। বেতার-টেলিভিশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিষিদ্ধ।

রাজনীতিতে এই যখন অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র সে সময়ে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আইয়ুব খান দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবস্থাটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। সেই কমিশনের একবাক্য রায় ছিল—আয়ুবের তথাকথিত "উন্নয়ন দশকে" বৈষম্যের পরিমাণ আরো ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলার জাতিসত্তা বিকাশের সুযোগ-সুবিধার দাবী কণ্ঠে নিয়ে গড়ে উঠলো ঐতিহাসিক ছ'দফার আন্দোলন। আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো "জাগো জাগো, বাঙালি জাগো" আওয়াজে। হুঙ্কার ছাড়লেন 'বন্ধু নয় প্রভু'র ফিল্ড মার্শাল—অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হবে। বাংলার মানুষ অবিলম্বেই বুঝতে পারলো একথার তাৎপর্য। সাজানো হলো কুখ্যাত "আগরতলা মামলা"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে অনেককেই জড়ানো হলো এই সাজানো মামলার জালে। কিন্তু বাঙালি এটাকে মেনে নেয়নি। আর মেনে নেয়নি বলেই ১১-দফা আন্দোলনের সূচনা, ৬৯-এর আয়ুব-বিরোধী গণবিপ্লবের অভ্যুদয়। আইয়ুব খানের পতন ঘটলেও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত

হলেন তাঁরই বরকন্দাজ পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্ত ধনকুবের সামরিক চক্রের আরেক প্রতিভূ আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রতি এবার তাদের নীতিতে কপটতার আশ্রয় নিল। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হলো। তারা মনে করেছিল জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শোষণের পাকাপোক্ত একটা রূপ দিতে পারবে। কিন্তু এবারেও বাংলার মানুষ এই চক্রান্ত প্রতিহত করলেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়যুক্ত করে। জাতীয় পরিষদে চক্রান্তের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষের উপর সরাসরি সামরিক হামলার পথ বেছে নিল।

পাকিস্তানের বিগত ২৩ বছরের ইতিহাসে এইভাবে বারবার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের প্রচেষ্টাকে হিংস্র পন্থায় দমন করতে চাওয়া হয়েছে। ৪৮, ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০ সালগুলো বাংলার মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক-একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাল্টা হামলা চালিয়েছে নব নব কৌশলে। তাই '৭১ এর ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার শুরু হয়েছে স্বাধীন জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার পালা।

(আহমদ নাদিম রচিত)

শিরোনাম : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও কয়েকটি নিয়মিত কথিকা।

সূত্র : 'শব্দ সৈনিক', ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। তারিখ : আগস্ট-ডিসেম্বর ১৯৭১।

# দর্পণ

২৬ আগস্ট, ১৯৭১

ক্যাম্পে বসে বসে সে তার পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবছিল। সেই নদী, শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি, বন্দুকের শব্দ, পরান মাঝির চোখ—এক এক করে সব কথাই মনে পড়ছে। প্রথম যেদিন বন্দুক থেকে গুলি ছুড়েছিল সেদিনের কথাও।

সোনাগাছির চর পাখি শিকারের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে নদী ক্রমশ শুকিয়ে এলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর পড়ে। এই চর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে তোরণের বাড়ি। বাড়ি বলতে অবশ্য ছোট দুটি কুঁড়েঘর, একটা আমগাছ, গোটা কয়েক সুপারি গাছ। চালের উপর সারা বছর কুমড়ো গাছের লতা ছেয়ে থাকে। শীতের খুব ভোরে উঠে তোরণ সোজা চলে আসত নদীর পাড়ে। বর্ষা পরিত্যক্ত নদীর পরিসর তখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। ঘাটে বাঁধা নৌকায় নদী পার হয়ে, চরের শিশিরে ভিজে ওঠা বালুর উপর দিয়ে আরও মাইল খানেক হাঁটার পর এলোমেলো চরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খালের পাড়ে এসে দাঁড়াত। খালের পাশেই বালুর উপর দুটো ছই পাতা। তার একটাতে খড়ের উপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ পরান মাঝি তখনও ঘুমাচ্ছে। তোরণ তাকে ডেকে তুলতো। খালে বেড় দিয়ে মাছ ধরার যন্ত্র সারারাত পেতে রাখা হতো; তোরণ আর পরান দু'জনে মিলে গামছা পরে সব মাছ খাঁচিতে ঝেড়ে তুলতো। তারপর তোরণ নিজ হাতে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে মালসা জ্বালিয়ে তাতে দুজনেই হাত-পা সেঁকে নিত। পরান নিজ হাতে হুকো ধরিয়ে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে আয়েশ করে খোঁচা খোঁচা মুখে ধোঁয়া ছাড়ত। এরপর একটা বাঁশের টুকরোর দু'পাশে দুটো খাঁচি বেঁধে নিয়ে নদীর ঘাট পার হয়ে কুয়াশা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেত গঞ্জের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে রাতের অন্ধকারে বসে থাকা তোরণের এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়ল। তখন ওর বয়স প্রায় ২৩ বছর। বছর ন'য়েক পূর্বে ওর বাবা মারা গেছে। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। পনের বছর বয়স থেকে সে পরান মাঝির সাথে কাজ করে। বৃদ্ধ পরান তাকে ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করত।

সে শীতের সেই সকালগুলোর কথা ভাবছিল। পরান গঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলে, তোরণ মালসার পাশে বসে নতুন করে হুকো ধরিয়ে পরানের মতো ভঙ্গিতে টানতো। ক্রমে ক্রমে কোনও কোনও দিন কুয়াশা আরও পাতলা হয়ে আসত, কোনও কোনও দিন আরও ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চরের বালু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিত। সূর্য উঠবে উঠবে ভোরবেলার ভাবটা যখন এইরকম ঠিক তেমনি সময় থেকে সোনাগাছির চরে অসংখ্য সৌখীন শিকারির পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করত। এবং তাদের সবাইকে যেতে হ'ত পরান মাঝির মাছ ধরার জায়গার উপর দিয়ে। তার পরই বিস্তীর্ণ চর— যেদিকে খুশি চলে যাওয়া যায়। এইসব শিকারিদের একজনের কাছ থেকে সে প্রথম বন্দুক চালান শেখে।

সেদিনও তোরণ যথারীতি বসে বসে হুকো টানছিল। বন্দুক হাতে জনাতিনেক লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, চরের কোন্ অঞ্চলটায় ভালো পাখি পাওয়া যায় এবং এর জন্য তোরণকে তারা সঙ্গে নিতে চায়। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথাও তারা উল্লেখ করল। তোরণ বন্দুক কোনোদিন হাতে নিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "যাবার পারুম এক শর্তোত, হামাক বন্দুক মারা শিকাবার নাগিবে।" যে ভদ্রলোক কালো একটা ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলেন তিনি হেসে উঠলেন। মাছ মেরে শখ মেটে না, পাখি মারার ভীষণ শখ তাই না?

তোরণ কোনও উত্তর দেয়নি, ভদ্রলোকরা রাজী হয়ে গেল। সেদিনই সে প্রথম বন্দুক ছুঁড়লে। লাল একটা কার্তুজ ভরে যখন তার হাতে বন্দুকটা দিল তখন সে নতুন একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের আনন্দে কেঁপে উঠেছিল, কিছুটা ভয়ও করছিল। নির্দেশমতো বাঁটটা বুকের কাছে শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা ডানহাতের আঙুল দিয়ে চেপে দিয়েছিল। এখনও সেইদিনের কথা ভাবলে তোরণের নাকে বারুদের গন্ধ এসে লাগে।

সেইদিনের থেকেই প্রায় প্রত্যেকদিন বন্দুক ছোড়ার শর্তে চরের যেসব অঞ্চলে প্রচুর পাখি সেইসব এলাকায় শিকারিদের নিয়ে যেত। তারপর দুপুরবেলা মাছ ধরার ডেরায় ফিরে আসত। ভোরে গঞ্জে যাওয়া বৃদ্ধ পরান দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরে আসত। আসার সময় বাড়ি থেকে খেয়ে আসত। পরান ফিরে এলেই তোরণ বাড়িতে ফিরে যেত। আবার সন্ধ্যেবেলার দিকে কিছুক্ষণের জন্য আসত— তারপর আবার সেই ভোরের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে বসে এক এক করে তোরণের সব কথা মনে পড়ল। কবে তার বাবা মরে গিয়েছিল। কবে একবার নদীর পাঁকে পড়ে ডুবতে ডুবতে আশ্চর্যভাবে বেঁচে এসেছিল, একবার মাছের ডেরা ফেলে সারা রাত যাত্রা শোনার জন্য বুড়ো পরান মাঝি তাকে ভীষণ মেরেছিল। সব কথা এক এক করে মনে পড়ছে। কিন্তু একদিনের কথা তোরণ কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন দেখল অসংখ্য নৌকায় চড়ে দলে দলে সব লোক যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কুড়িগ্রামে নাকি বিরাট মিটিং— শেখ মুজিব বক্তৃতা করবেন। অতি পরিচিত নামটা শুনে তোরণ যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। বলে কয়ে কুড়িগ্রামমুখী একটা নৌকায় উঠে বসল।

এখনও মনে পড়ছে কি সে মিটিং। লক্ষ লক্ষ লোক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অসংখ্য স্পিকার লাগান হয়েছে। ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। শেখ মুজিব বক্তৃতা দিলেন, বাংলার কথা বললেন, বাংলার মানুষের কথা বললেন, তোরণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমস্ত বক্তৃতা শুনলো।

মিটিং ভাঙলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ফিরতি কোনও এক নৌকায় ফিরে এসেছিল। ভোররাতের দিকে তাকে ঘাটে নামিয়ে দিল। তোরণ ভয়ে ভয়ে মাছের ডেরায় ফিরে এসে দেখলো ছই-এর নিচে পরান চাচা নেই। সে অবাক হয়ে গেল। এরকম একটা ব্যতিক্রম পরান মাঝির জীবনে নেই বললে চলে। ভোরের দিকে মাঝি ফিরে এল। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলো পরান মাঝিও মিটিং-এ গিয়েছিল। মাছের ডেরা ফেলে মিটিং-এ যাওয়া পরান মাঝির জীবনে এই প্রথম।

তোরণের জীবন থেকে একটা একটা দিন প্রতিদিনের মতো খসে যেতে লাগল। এক সময় সারাদেশ জুড়ে ভোট হলো, শেখ মুজির নির্বাচিত হলেন। তারপর বাংলার

বুকে খুব দ্রুত কতকগুলো দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত ফাঁদলেন। আবার নতুন করে শুরু হয় শ্লোগান, মিটিং, পোস্টার, ব্যানার। ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক বসল।

গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকজনের কাছ থেকে সব খবরই সে পেত। কিন্তু পরান মাঝি বিশ্বাস করত না। তোরণও বিশ্বাস করত না। 'ভোট দিনু যাক' ক্ষমতাও যাবার নয় এটা হবার পারে না।"

পরান মাঝি তখন নিশ্চিন্তে মাছের ডেরা নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন দেখল গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকগুলো খুব উত্তেজিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে পত্রিকা। গ্রামের ছাত্ররা দল বেঁধে যেন দিন-রাত কিসব সলাপরামর্শ করে। থানার পুলিশদের মধ্যেও এ কি উত্তেজনা!

তারপর একদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ভোরে গঞ্জের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পরান মাঝি ফিরে এল না। অন্যান্য দিন গঞ্জ থেকে সারি সারি নৌকা ফিরতো। সেসবও দেখা গেল না। রাত্রিবেলার দিকে সে মাঝির বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। না, তখনও মাঝি ফেরেনি। তারপর রাত আরও বাড়লে গঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা একজনের কাছ থেকে জানতে পারল বন্দরের উপর পশ্চিমা সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড গুলি চালিয়েছে। তোরণ মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ল। কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে পরান মাঝি নিশ্চয়ই ফিরে আসত।

পরের দিন তোরণ গঞ্জের দিকে রওয়ানা দিল। স্কুলবাড়ির থেকে একটু দূরে পাটের গুদামের পাশ দিয়ে গঞ্জের ভেতর ঢুকতে যাবে এমন সময় সমস্ত গা ছমছম করে উঠল। একটা লোকজন নেই। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেল বাজারের পোড়া ধ্বংসাবশেষ। তোরণের আর ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জোরে পা চালিয়ে বেরিয়ে সোজা গ্রামে চলে এসেছিল।

তোরণের এখন অন্য জীবন শুরু হয়েছে। বসে বসে পরান মাঝির চোখ দুটোর কথা মনে করল। সেই চোখ দুটো থেকে তোরণের জন্য সবসময় স্নেহ ঝরে পড়ত। না, পরান মাঝি আর গঞ্জ থেকে ফিরে আসেনি। সব বুঝতে পেরে তোরণ মাছের ডেরার পাশে বসে একলা একলা কেঁদেছিল। বাড়িতে পরানের বউও কেঁদেছিল।

তারপর পশ্চিমা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন তোরণ মাছের ডেরায় কাজ করছিল, এমন সময় তাদের গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল। তোরণের ছেঁড়া জাল মেরামত করা বন্ধ হয়ে গেল। সে খুব ভয় পেয়েছে। ঘণ্টা খানেক পর গুলির শব্দ থেমে গেল। বাড়িতে ফেরার সময় বার বার কেন যেন পরান চাচার কথা মনে পড়ল। গঞ্জে গুলি হয়েছিল। পরান চাচা আর ফিরে আসেনি। মা, পরান চাচার বউ এখনও কি বেঁচে আছে? ঘাটে নৌকো পেল না। পশ্চিমা দস্যুরা নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। সাঁতারে তোরণ নদী পার হ'ল।

তোরণ এখন মুক্তিযোদ্ধা। গতকাল একটা অপারেশনে গিয়েছিল। আবার আগামীকাল রাতের অন্ধকারে পশ্চিমা দস্যুদের খোঁজে গ্রেনেড, এল-এম-জি নিয়ে কয়েকজন মিলে বেরিয়ে যেতে হবে। আজ রাতটা শুধু একটুখানি বিশ্রাম। ক্যাম্পের

বাইরে একটা অন্ধকার গাছের নিচে বসে বসে তোরণ এইসব ভাবছিল। সাঁতরে তোরণ নদী পার হয়ে কাছাকাছি আসতেই সে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। গ্রামের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঠিক শ্মশানের পরিত্যক্ত চিতার মতো। গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখতে পেল গুলি চালনার সময় যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা ফিরে এসে ছাইয়ের ভেতর থেকে তাদের আপনজনের মৃত লাশ খুঁজছে। তোরণ পাগলের মতো দৌড়ে তার বাড়ির দিকে ছুটে গেল। ভিটের উপর তার মায়ের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। তারপর বাড়ির আশেপাশের ফিরে আসা দু'চারজন লোককে জিজ্ঞেস করল। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। তোরণ পাগলের মতো বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এমনও তো হতে পারে মা গুলি খেয়ে বাঁশঝাড়ে ঢুকে সেখানেই মারা গেছে। তন্নতন্ন করে সেখানে খুঁজতে লাগল। সেখানেও পেল না। তারপর বাড়ির থেকে আরও দূরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

ক্যাম্পের বাইরে বসে থাকা তোরণের চোখ দিয়ে দু'ফোটা উত্তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে পড়ল। তাদের গ্রাম থেকে আধা মাইল খানেক দূরে একটা আমবাগান আছে। তার ভেতর তার মায়ের লাশের পাশে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিল তোরণ।

এখনও মায়ের কথা মনে পড়লে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন কানে এসে বাজে।। শীতের খুব ভোরে মাছ ধরার ডেরার দিকে যাবার সময় মা তাকে বলতো, "জার নাগিবে যে তোরণ, জার নাগিবে। মোর একখান শাড়ি জড়ায়া নে ক্যানে?"

এই মা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

তোরণ শুধু ভাবছে। সে প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিল, তারই বন্ধু কাজল যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত তার সাথে একদিন দেখা হয়ে গেল। সে-ই তাকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

শেষবারের মতো তার মায়ের কাঁচা কবরের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পোড়া ভিটেটাকে পেছনে ফেলে রেখে কখনও নৌকায়, কখনও হেঁটে কাজলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে এসেছিল।

প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল। রাতের পর রাত জেগেছে। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু তোরণের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নামেনি। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দিনের পর দিন লড়াই করে চলেছে। সে জানে মাকে আর কোনোদিন সে ফিরে পাবে না। পরাণ মাঝি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে লড়ছে। তোরণ আবার সেই ফেলে আসা শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস এইসব হারিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো সুখ আবার আগের মতো ফিরে পেতে চায়।

(আশরাফুল আলম রচিত)

# রাজনৈতিক মঞ্চ

২ নভেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও গোপন দূরভিসন্ধি যে কি ছিল গত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল রহস্যের উপসংহার ঘটলো গত ২৫শে মার্চ থেকে। জন্ম নিলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লাখো মানুষের গলিত লাশের তলায় কবর হয়ে গেল পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কিছু অংশের উপর আজও যেহেতু দখলদার হানাদার বাহিনী তাদের মরা পাকিস্তানের লাশকে জিন্দা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই কারণে বাংলাদেশে মৃত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্কে দু'চার কথা বলার অবকাশ আজও আছে। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী সমাজ, রাজনৈতিক কর্মী, যুদ্ধরত তরুণ এবং কৃষক-মজুর সকল শ্রেণীর মানুষকেই জানতে হবে পাকিস্তান নামক সেই মৃত রাষ্ট্রের প্রকৃত শ্রেণী-চরিত্র কি ছিল, এবং কোন্ অনিবার্য কারণে তার মৃত্যু ঘটলো। এবং বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে আমরা শত্রুবাহিনী তথা শত্রুর নাম-নিশানা ও অস্তিত্বকে কেনই বা দ্রুত নিশ্চিহ্ন করতে চাইছি। এসব বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা আজ স্পষ্ট হতে হবে।

একথা সবাই জানেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে যে মূল রাজনৈতিক শক্তি কাজ করেছিল তার নাম হলো মুসলিম লীগ। এই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল দুটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে। একটি হলো বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান জমিদার শ্রেণী এবং অপরটি হলো তদানীন্তন ভারতের গজিয়ে ওঠা মুসলমান বণিক শ্রেণী, যারা সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য বণিক শ্রেণীর কাছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছিল : যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় মূলত কৃষিজীবী, সেই কারণে তাদের মুক্তি নিহিত আছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অমুসলমান জমিদার, জোতদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অমুসলমানদের উৎখাতের মধ্যে। মুসলিম লীগ বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক প্রচার জোরদার করে কাজ হাসিল করে নিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের বাসস্থান বাংলাদেশকে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উদ্বাস্তু বণিক শ্রেণীর একটি স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরলপ্রাণ বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দিকে তাদের এই গোপন দুরভিসন্ধি ধরতে পারেনি। তারা আশা করেছিল দেশ ভাগ হলে সামন্ত ও আমলাদের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে। সোনার বাংলা তার হৃত শ্রী আবার ফিরে পাবে। এই আশাতেই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে প্রথম দিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের অবাঙালি কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকাশ পেলেও শুরু থেকে বাংলাদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে তার প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যেই তা সীমিত

ছিল। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও ওই পর্যায়ের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিন্তু শুরুতেই আর একটা খেলা খেলেছিল। সেটা হলো ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার। এবং আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এই সাম্প্রদায়িক প্রচারকে স্থায়ী করতে তারা ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করে। জন্মলগ্নে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের পক্ষে একটা সুবিধে হয়ে গেল। তারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের প্রথম এবং প্রধান জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করলো। এবং কাশ্মীর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেশের চিন্তাভাবনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি সবকিছুই যাচাই করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতারা কাশ্মীরের দোহাই দিয়ে এগুতে লাগলো তাদের আসল উদ্দেশ্যের পথে। এর মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আত্মকলহ যে বাধেনি তা নয়। বরং বলা যায় তাদের নিজেদের মধ্যকার কলহ-বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেশে ঘটলো সামরিক অভ্যুত্থান। গজিয়ে ওঠা পুঁজিপতি ও আমলারাও তথাকথিত নেতাদের ঝগড়াবিবাদ ও কামড়াকামড়িতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সামরিক শাসনকে সমর্থন করে চললো। তারা সামরিক শাসনের সাহায্য নিয়ে রাতারাতি ফুলে উঠতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করার সব রকম আয়োজন তারা গ্রহণ করলো। আইয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় অর্থাৎ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের গতি হলো অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে এই দীর্ঘকালীন সামরিক শাসনে দেশে গণআন্দোলনের সর্বনাশ করা হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে যে গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল আইয়ুব তাকে গুঁড়ো করে দিলো।

পাকিস্তান সৃষ্টি শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করা হয়। গোটা দেশের সমস্ত চিন্তা-ভাবনায় সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবিদ্বেষের প্লাবন বইয়ে দিয়ে তারা এপথে এগিয়েছে। সচেতন বাঙালিরা যে এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি তা নয়, কিন্তু জানতে পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত ও উগ্র সাম্প্রদাকিতার প্লাবনের মুখে তাদের করার কিছু ছিল না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল তার প্রথম একটা চিত্র পাওয়া গেল। আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৩ সালে। এই সময় সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫ ভাগ, বিমান বাহিনীতে ছিল শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ এবং নৌবাহিনীতে ছিল শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। প্রশাসনযন্ত্রের উপরতলায় অর্থাৎ সি-এস-পি ক্যাডারদের মধ্যে ছিল শতকরা ৩ ভাগ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে পুরোপুরি ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এর কৃষি উন্নয়নের জন্যে কোনও রকম ব্যবস্থা করা হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান—অনুর্বর অনাবাদী পশ্চিম পাকিস্তানকে কৃষি ও খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিকে বাংলার যে সোনালী আঁশে পশ্চিম পাকিস্তানটা গড়ে উঠলো তাকেও শেষ করার চেষ্টা করা হয়। পাটচাষ ও পাটচাষিদের কৃত্রিম অসুবিধে সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৯ সালে টাকার

অবমূল্যায়ন নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসায় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পাটের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল এবং তাতে পাটচাষিরা ডুবে গেল।

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হলো। সুতীবস্ত্র, পশমীবস্ত্র, ইস্পাত, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি শিল্প-কারখানাগুলোর মধ্যে সবগুলোই করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় বা বাংলাদেশের যা করা হলো তা অত্যন্ত নগণ্য, এবং তা করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানি বণিক পুঁজিপতি তথা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থেই। সরকারি খাতে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায় রয়ে গেল। বেসরকারি বিনিয়োগ আরও শোচনীয়। সারা পশ্চিম পাকিস্তানকে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি শিল্প কারখানায় ভরে তোলা হলো। বাংলাদেশ হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপণ্যের বাজার। শুরু হলো বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ শোষণ। বাংলাদেশ পৃথিবীর বাজারে পাট বিক্রি করে ও চা বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা পেতো তার শতকরা আশি ভাগেরও বেশি খরচ করা হতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণের কাজে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের স্বার্থে বিদেশ থেকে সাধারণের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানী বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিরা নিজেদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অত্যধিক চড়া দরে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করলো তাদের দ্বিমুখী শোষণ। রফতানী ও বৈদেশিক সাহায্যের সবখানি ফলে ভোগ করতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তান।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তনের জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বাদ দেয়া হয়েছে তা যদি না দেয়া হতো তাহলে আর যাই হোক বাংলাদেশকেও ওদের কলোনীতে পরিণত করতে পারতো না। অবশ্য এ সবই হচ্ছে আজ গৌণ বিষয়। আজকের দিনের বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানিদের দীর্ঘদিনের শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে নিজেদের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে। দেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানি সামরিক দস্যুদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার মহান লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা দ্রুতগতিতে।

(সাদেকীন রচিত)

# জনতার সংগ্রাম

**১৪ নভেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমি যতদিন শত্রু কবলিত থাকবে ততদিন আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। চূড়ান্ত জয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ আর থামবে না। এই এই যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই কথাগুলি আজ আর উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগে চালিত নয়, এই কথার সত্যতা আজ প্রতিটি বাঙালির ধমনীতে প্রবাহিত; বিশ্ববাসীও বিস্ময়ে লক্ষ করছে বাঙালির এই অভূতপূর্ব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে।

নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিজের জমিতে চাষ করতে করতে কৃষক লাঙলের ফলা হাতে আজ শত্রুনিধনে তৎপর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে পার্শ্ববর্তী চাষি ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলে ওঠে, পশ্চিম পাকিস্তানি শত্রুসৈন্যরা যতদিন আমাদের সবুজ মাটিতে আছে ততদিন আর শান্তি নেই। তার রক্ত জল করে উৎপাদিত পাট-চা-ধান-পানের মুনাফা লুটবে পশ্চিম পাকিস্তানি ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তা আর কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। কারখানার শ্রমিক আজ বুঝতে পেরেছে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি মুনাফাখোর শিল্পপতিদের শিকার মাত্র, কাজেই সর্বপ্রথমে তাদের সরাতে হবে এবং ঐ ধনিক গোষ্ঠীর অনুচর হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদল। ছাত্ররা আজ দিশেহারা, স্কুল-কলেজে আজ শিক্ষক নেই, ক্লাসগুলি বলতে গেলে প্রায় শূন্য, তারা আজ মিলিটারি জান্তার শিকার মাত্র। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই. পি. আর-এর সৈন্যরা বুঝতে পেরেছে তাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ, কেননা তাদের উপরে বসে আছে পাঞ্জাবি সামরিক অফিসাররা। দিনে দিনে সর্বস্তরের এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষা। মার খেলে বাঙালি অস্ত্র তুলে নিয়েছে, তারা হাতিয়ার তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

তাই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আজ সর্বস্তরের মানুষ সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে আজ কৃষক-মজুর-ছাত্র-পুলিশ-সৈন্য সকলেই যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। সামরিক অফিসার থেকে গ্রামের একেবারে সাধারণ একজন কৃষক যুবক প্রত্যেকেই মুক্তিবাহিনীর আজ সক্রিয় সদস্য, অর্থাৎ বীর যোদ্ধা। একজন কারখানার মজুরের পাশে বসে একজন ছাত্র বলছে সে কয়জন শত্রুকে নিহত করেছে। একজন শিক্ষক, যে কোনোদিন রাইফেল ধরার কথা চিন্তাও করেনি সে আজ একজন পরিপূর্ণ যোদ্ধা। এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, এবং তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়।

অনেক ত্যাগ এবং অনেক রক্ত দিয়ে বাঙালি আজ আরো রক্ত দিতে ও নিতে শিখেছে। এবার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঝরবে শত্রুর রক্তের বদলা নিতে। অনেক রক্ত দেবার পর বাংলাদেশের সবুজ মাটি আজ নির্মম হয়ে উঠেছে। এই রক্তপাত ব্যর্থ হবার নয়। বীরের রক্ত কখনো ব্যর্থ হয় না—এই সত্য মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা বুঝতে পেরেছে।

আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের প্রথম দিকের অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান এখন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে আমাদের ভয় ছিল আমরা অস্ত্র পাব কোথায়। এখন আমাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে, আরো আসছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র। এমনকি তাতে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। আমাদের টাকায় কেনা অস্ত্র আজ আমাদের হাতে এসেছে শত্রুর হাত হয়ে। বাঙালিদের

টাকায় শত্রুরা যে অস্ত্র কিনেছিল দেশরক্ষা করতে, সেই অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের মারছে। আমরা রুখে দাঁড়িয়ে সেই অস্ত্র কেড়ে নিয়েছি এবং নিচ্ছি। প্রতিটি গেরিলা আক্রমণে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে রাইফেল, মর্টার, মেশিনগান, কামান। সেই অস্ত্র বাঙালির ঘরে ঘরে উঠছে। মুক্ত এলাকায় আজ প্রত্যেকেই রাইফেল চালাতে জানে, অস্ত্র আজ তাদের খেলা। বাঙালি আজ বুঝতে শিখেছে যে, এই অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, এই অস্ত্রই আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এবং অস্ত্র দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে—নিয়মতান্ত্রিক পথে কিছু আদায় করা যাবে না, শত্রুর সঙ্গে কোনও আপোস নেই। যুদ্ধ করেই মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কিউবার মুক্তিসংগ্রাম থেকে আমরা শিখেছি স্বাধীনতাস্পৃহাই হচ্ছে বড় কথা। এই স্বাধীনতার আকাংক্ষাই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। বুকের মধ্যে একবার এই আগুন জ্বলে উঠলে তা আর কোনোদিন নেভে না। আমাদের বুকের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন প্রতিনিয়ত খেলা করছে তাকে পৃথিবীর কোনও শক্তি নির্বাপিত করতে পারে না, সেই আগুন দিনে দিনে শুধু বেড়েই থাকে। একবার সেই আগুন জ্বলে উঠলে কোনোদিন আর নেভে না। বাংলার বুকে আজ সেই আগুনের অনির্বাণ শিখা। শত্রুকে চিরতরে শেষ করে তাতেই তার শান্তি। এমনকি স্বাধীনতার এই স্পৃহা বা আগুন থেকে কোনও মানুষ নিজেকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলেও এই আকাংক্ষা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। এমনকি এক সময় এই স্বাধীনতাস্পৃহা এমনভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে যে ভীতু এবং দুর্বল লোক পর্যন্ত সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়ে ওঠে। তখন সে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়, শত্রুর ওপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোনও বাধা তখন তার কাছে আর বাধা থাকে না। আমাদের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী বলেছেন, "আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে রাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে হবে। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে হবে যাতে শত্রু এক মুহূর্তের জন্যেও অবকাশ না পায়।" তিনি আরো বলেছেন, "আপনাদিগকে দলমতনির্বিশেষে সকল পার্থক্য ভুলে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। পরিকল্পনা প্রস্তুতি নিতে হবে, শত্রুর উপর আঘাত হানতে হবে, এবং শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। শেষ শত্রুটি ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না।"—এই যুদ্ধ তাই প্রত্যেক বাঙালির যুদ্ধ, এই মুক্তিযুদ্ধে তাই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে সংগঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। তারা রাতদিন চেষ্টা করছে। তারা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃঢ় মনোবল আমাদের সহায়। আমাদের অস্ত্র যোগাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া শত্রুর হাতের অস্ত্র। এবং মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়েই। এমনিভাবে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রগতি চলছে দুর্বার ও দুর্দম গতিতে; তারা আর থামবে না, কোনোদিন থামবে না। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পূর্বে, চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ থামবে না। কারণ প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা জানেন—

আমি সেই দিন হব শান্ত—
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না :
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

(বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত)

# অভিযোগ

... ১৯৭১

বাঙালির মনোবল ভাঙতে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম ক'দিন হাজার হাজার বাঙালির লাশ ওরা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রাখলো। সংসার-নিস্পৃহ ডক্টর গোবিন্দ দেব, আমার বন্ধু অধ্যাপক জ্যোতির্ময়, ডক্টর মনিরুজ্জামান, সপ্ততিবর্ষী আইনজীবী ধীরেন্দ্র দত্ত, নব্বই বৎসরের ভিষগাচার্য যোগেশ ঘোষ, মিউনিসিপ্যালিটির মেথর, স্টেশনের কুলি, নৌকার মাঝি, ক্ষেতের চাষি, নদীর জেলে, গায়ের তাঁতী, ঘাটের ধোপা, পথের নাপিত, হাটের পশারী, গঞ্জের মহাজন, মসজিদের ইমাম, গির্জার পাদ্রী, মন্দিরের পুরোহিত—সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল শ্রেণী-ধর্মের নিরীহ বাঙালির শবদেহ অসনাক্তভাবে কুকুর-শকুনের ভক্ষ্য হলো সকলের চোখের সামনে। মনুষত্বের এতবড় অবমাননা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও সম্ভব হতো বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর সেই জন্যেই বোধ করি এই অমানুষিক বর্বরতা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবু বলব, দুষ্কৃতি দমনের নামে যারা বাঙালির কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুঠ করল, জাহাজ ভর্তি নতুন নতুন গাড়ি, টেলিভিশন, রেডিও, রিফ্রিজারেটার, এয়ারকুলার ব্যক্তিগত মালিকানায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করল, কোটি কোটি টাকার অর্থ, অলংকার প্রকাশ্য মনি অর্ডার, পার্সেল অথবা পি-আই-এ কার্গো মারফত নিজের নিজের এলাকায় পাঠিয়ে দিলো, হাজার হাজার হাট-বাজার, গ্রাম-জনপদ পুড়িয়ে শ্মশান করে ফেললো, দশ লক্ষাধিক বাঙালির মৃতদেহ খাইয়ে জলের হাঙ্গর-কুমির এবং ডাঙ্গার কুকুর-শেয়াল-শকুনের সখ্যতা অর্জন করলো, দীর্ঘ দিন ধরে যারা সেই ঘাতক দস্যুদের এই সব ক্রিয়াকীর্তি সার্কাসের দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালির শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে চিরনির্বাসনের সড়ক তাঁরা নিজেরাই প্রশস্ত করে নিলেন।

পাকিস্তানি হানাদারদের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা শহীদ মিনারগুলো ধ্বংস করে নিজেদের পদলেহী কিছুসংখ্যক গরুচোর দিয়ে সেখানে নামাজ পড়াচ্ছে। অর্থাৎ ওই সব জায়গার এক-একটা মসজিদের দাবী খাড়া করানো হচ্ছে। মজার ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটগাছটিকেও তারা নির্মূল করে উপড়ে ফেলেছে। যেন ওই বটগাছের ডালগুলোতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা ট্রাপিজ খেলতো। বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব পাকিস্তানি সংহতির পরিপন্থী। কাজেই তাবৎ হিন্দুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* কবি সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই একটি অভিযোগ-ইশতেহার প্রকাশ করেন। এটি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়। এখানে তার অংশবিশেষ সংকলিত।

যারা পালিয়ে বেঁচেছে তারা এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকছে কিন্তু একজনেরও সম্পত্তি নিজেদের দখলে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের পেশাদার বাঙালি গুণ্ডারা সেগুলো দখল করে বসে আছে। তাই যখন ইয়াহিয়া খান বাঙালি হিন্দুদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তখন অতি দুঃখেও হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, হিন্দুরা ত আসবে কিন্তু উঠবে কোথায়? নিজের নিজের বাড়ি বলতে যা বোঝাতো সে তো পুড়ে-জ্বলে খাক। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও কি আর খালি আছে?....হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মাটি বরাবর করা হচ্ছে তা-ও দেখছি চোখের সামনে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন এলাকার লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমানের সম্পত্তি এখন অবাঙালিদের দখলে। ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বাঙালি খেদানো এবং নির্বিচার বাঙালি নিধন শুরু হয়েছে ২৩শে মার্চ থেকে। ওই দুটি অঞ্চলের তাবৎ বাঙালির সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং অবাঙালিদের অধিকৃত। ভারতে শরণার্থী বাঙালি মুসলমানেরা ফিরে এলে যথাসময়ে ওইসব অবাঙালিদের অস্ত্রের শিকার হবে। আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের হাজার হাজার বাঙালি ছাত্র যুবককে পাকিস্তানি ঘাতকরা ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলেছে। এখনও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো মেরেও ফেলেছে। উদ্দেশ্য, সক্ষম বাঙালি যুবকদের খতম করে বাঙালির বাহুবল ভেঙ্গে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের দেয়া ভারতীয় সংহতির চেহারা—"শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন"—আমরা দেখলাম, পাকিস্তানি সংহতি কসরতে হানাদার সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি পাঠান বিহারী বালুচ অফিসার জওয়ান পাইকারী হারে অপহৃতা বাঙালি নারীদেহে লীন হচ্ছে। দূরপ্রসারী অভিসন্ধি হয়তো একটি মিশ্র জেনারেশন সৃষ্টি করা। সেটা রোধ করতে গেলে, আমার আশঙ্কা, যে পরিমাণ গর্ভপাতের প্রয়োজন হবে তাতে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় মেটারনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে শত শত বিশেষজ্ঞ ধাত্রী আমদানী অপরিহার্য। আজ এদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ আমদানী হচ্ছে। বাঙালি অফিসার বাদ দিলে তাদের যায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। বাঙালি অফিসারদের যারা অবাঞ্ছিত তাদের মেরে ফেলা এবং আধা-বাঞ্ছিতদের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্যে জেলে পোরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই একই ব্যবস্থা হবে শিক্ষক, সংস্কৃতিবিদ এবং সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও। ফলে গড়ে উঠবে অবাঙালি তাঁবেদার গোষ্ঠী এবং সুবিধাভোগী বাঙালি মীরজাফর শ্রেণী। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁবেদার গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি বাড়িয়ে। এই সংহতি অভিযানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কোনও ফললাভের সুযোগ আমাদের নেই। কারণ এসবই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত বাঙালি আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে মুক্তি সংগ্রামের দুর্জয় অঙ্গীকারে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক বাংলার বাছাই করা বীর সন্তানেরা। তাদের সঙ্গে নিজেদের বন্ধু-আত্মজনের রক্তস্নাত তৎকালীন ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার বাহিনী আর মুক্তি-মাতাল বাঙালি তরুণ কিশোর ছাত্র এবং ছাত্রীরাও। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন "বাঙলার মাটি বাঙলার জল বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল পুণ্য হউক"—আজ এতদিনে শ্রেণী-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-নির্বিশেষে নিরীহ বাঙালি নরনারীর রক্তধৌত বাংলার মাটি পুণ্যস্নাত হয়েছে,

মহাপুণ্যস্নাত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার ঘাতকেরা ইতিহাসের একটি সহজ সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি যে, সার্বিক মৃত্যু ছিটিয়ে একটি জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত রাখা যায় না।

জাতীয়তাবাদ কোনও একটা নির্ভরযোগ্য নীতি নয়। আমার মানসিক প্রস্তুতি আন্তর্জাতিকতাবাদ গ্রহণ করারই সপক্ষে। কিন্তু পাকিস্তানের কবলে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই আমি বলিষ্ঠ আকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। এর কারণ, প্রথম থেকেই বাঙালির সমস্যা হয়েছে নবজাত পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করার জন্যে, অস্থিমজ্জায় একান্ত আত্মীয়তার পরিচয়ে স্বাক্ষরিত, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বর্জনের তাগিদ। এই তাগিদ এসেছে প্রধানত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা এবং তাদের অনুগামী গোষ্ঠীর কাছ থেকে, পাকিস্তান যাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে এক উজ্জ্বল সূর্য-সম্ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এদের প্রায় অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতি এবং পাকিস্তানি জঙ্গীযন্ত্রের পরিচালক। দেশ-বিভাগের প্রথম দিন থেকেই এরা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমূলে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং সেই একই দিন থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে বাঙালি যতই লুণ্ঠিত, নিগৃহীত এবং অপমানিত হয়েছে ততই হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধ তার কাছে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর দীপ্তিলাভ করেছে। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য—নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং নারীধর্ষণের অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতা লাভের আগে দীর্ঘ দুই শতাব্দী শৃঙ্খলিত শিকারি কুকুরের মতো ঔপনিবেশিক প্রভুর পদলেহনের কৃতিত্ব। বাঙালির আত্মমর্যাদা এই চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে কোনোদিনই তাকে আত্মহননে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানি ঘাতকেরা আজ বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিকল্পনা সূচিত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটি থেকে।

আর সার্বিক অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালির পক্ষে আত্মসংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। শিক্ষক হিসেবে যাঁদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশ্নাতীত মর্যাদা, তাঁরা আজ শুধুমাত্র পেশাদার চাকুরে। ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার, বিচারপতি কিম্বা আইনজ্ঞ হিসেবে নিজের নিজের কৃতিত্বে যাঁরা গোটা দেশের জন্যে অপরিহার্য তাঁরা আজ অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আত্মবিস্মৃত চাষি-মজুর বাস্তহারা, দিশাহারা। সরকারি কর্মচারী আজ নিরক্ষর সিপাই প্রভুর ভ্রূকুটিলাঞ্ছিত মর্যাদাহীন হুকুমের নফর। ব্যবসায়ী-শিল্পপতি আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় নিষ্পিষ্ট নিরুপায় সরীসৃপ। ছাত্র-ছাত্রীরা আজ উদ্দেশ্যহীন আকাঙ্ক্ষাহীন। এমন সামগ্রিক মৃত্যুর আবর্তে কোনও জাতি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। তাই বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন আজ অগণিত আত্মপরিজনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে—মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাংলার মাটির পুণ্য-পীযূষধারায় সঞ্জীবিত-প্রাণ একটি বাঙালি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হবে না।

(সিকান্দার আবু জাফর রচিত)

# চরমপত্র

.... ১৯৭১

মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরোমুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচকা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আ-আ-আ দম ফেলাইতেছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ ভৈরব থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মধ্যে তো দেখতাছি— লেখা রইচে ভৈরবে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস ব্যাস আর কইতে হইবো না—বুইজ্যা ফালাইছি। বাকীগুলার বুঝি হেই কারবার হইয়া গেছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও—এই যে পাইছি কালিয়াকইর—১২৫ জন। তা হইলে ১১৪ জনের ইন্নালিল্লাহে ডট ডট ডট রাজেউন হইয়া গেছে। হউক, কোন ক্ষেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলোরে বাঙ্গালুমুলকে আনা হইছিলো। আরে এইগুলি কারা? যশুরা কই মাছের মতো চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা। ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড়লেড়া হইয়া গেছো। অ্যাঁ : তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা? কী কইলা—তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল না : —ও-অ-অ--অ বাকী হগ্‌গলগুলারে বুঝি বিচ্ছুরা মেরামত করছে? গাং-এর পারে পাইয়া আরামসে পানির মাইদ্দে চুবানী মারছে। কেইসডা কী? আমাগো বকশীবাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস না। কইছিলাম না, 'বাঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইদ্দে মছুয়াগো মউত তেরা পুকরাতা হ্যায়।' নাঃ তখনই কী চোট-পাট—হ্যান করেগা, ত্যান করেগা; আর অখন! অখন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে, 'ইডা হ্যামি কী করছনুরে, হামি ক্যা নানীর বাড়িত আচিছনুরে। হামি ইডা কী করনুরে।' আতকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, 'ভাইসাব, আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতেছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! মাথাডা এ্যাঙ্গেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহী কী! শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর তাগো জিগাইলো 'তুম লোগকো কাপড়া কেধার গিয়া?' জবাব আইলো 'যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডারউইয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি—হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া—ডরাইয়েন না ডরাইয়েন না। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাবড়াইতে শুরু করছে—'পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার দাদা মরেছে, গাবুর বাড়ির চোটে আমরা কাম সেরেছে।' ব্যাস মওলবী রাও ফরমান আলী, ঠেটা মালেক্যা ভাগোয়াট হওনের গতিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনোরকম মহব্বৎ থাইক্যা

থাকে, তা হইলে তুরন্ত আমাগো কইয়া দাও কীভাবে বিষ্ণু আর হিন্দুস্থানী ফোর্সের পা ধরলে আমার লেড়লেড়া আর ধ্বজভংগ মার্কা বাকী সোলজারগো জানটা বাঁচানো সম্ভব হইব।' এই খবর না পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজী আর সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? হুদর ইয়াহিয়া লগে লগে উ থান্টের কাছে টেলিগ্রাম করলো, 'ভাই উ থান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এইরকম কারবার করছে। হের চিডিডারে চাপিশ কইরা ফালাও। এইদিকে আমি আর শাহনেওয়াজ ভুট্টোর ডাউটফুল পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতেছি। একটুক নজরে রাইকখো।' বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে। সাবে কইছে কীসের ভাই, আহলাদের আর সীমা নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা। ব্রাকেট শেষ জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে টু-উ-উ মারত মানে কিনা লুকোচুরি খেলা খেলতাছিলো। তারপর জাতিসংঘে আতকা কান ধইর‍্যা উঠ বস্ উঠ বস্ কইরা ভুট্টো সাবে চিল্লাইতে শুরু করলো, আর লাইফে এইরকম কাম করুম না। বাঙ্গাল মুলুকে আমরা গেনজাম কইর‍্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি।— আমাগো এইবারের মতো ক্ষমা কইর‍্যা দেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব বহুত লেইট কইর‍্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ কথাবার্তায় আর কাম চলবো না। ঠাস ঠাস কী হইলো? কী হইলো? সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসংঘে ভেটো মাইরা হগ্‌গল মিচকী শয়তানরে চীৎ কইর‍্যা ফালাইছে। কইচে ফাইজলামীর আর জায়গা পাও না? এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরান জানের জান চাচা নিক্সন কড়া কিসিমের টিরিক্স করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহররে সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে সোভিয়েট রাশিয়া একটুকু হিসাব কইর‍্যা কাম করণের লাইগ্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি ক্রেমলিন থাইক্যা কইছে পাক-ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলাইলেই ভালো হয়। ব্যাস, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো। এ্যাঃ এ্যাঃ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ, হেইটা গেলো গাথার মাইন্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টোলের মাইন্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে, আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কি হইবো, আমি পাইট করুম, পাইট করুম। আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া উঠলো এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজীর ফুলপ্যান্টের দুই রকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং, কেইসডা কী? অনেক থিংক করলে বোঝন যায় এর মাজমাডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম...

(এম. আর. আখতার রচিত)

# সাময়িকী

২৮ মে, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের নিধনযজ্ঞে নেমে পাকিস্তানের সামরিকশাহী অকল্পনীয় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। লন্ডনের যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় হাজার মাইল দূর থেকে এসে বাংলাদেশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর দৈনিক এককোটিরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে—এ হিসেবে যুদ্ধের প্রথম পঞ্চান্ন দিনে পাকিস্তানের আড়াই শ' কোটি টাকা খরচ ও ঘাটতি হয়েছে। মার্চ মাসের শুরু থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও মাল রপ্তানি না হওয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ নেমে কমেছে ১৫ কোটি ডলারে। বাণিজ্য খাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

ফ্রান্স-এর পত্রিকা 'লা ফিগারো'র মতে যুদ্ধের প্রথম মাসে অর্থাৎ প্রথম ত্রিশ দিনে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান এক শ' কোটি টাকা হারিয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা ছিল ১২৭ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৯০ কোটি টাকা। যুদ্ধের দরুন এপ্রিলের শেষে সেই অংক কমে নেমেছে ৮২ মিলিয়ন ডলারে অর্থাৎ প্রায় ষাট কোটি টাকায়। এবং বর্তমানে সেটা এসে ঠেকেছে ২০ কোটি টাকার কাছে।

পাশ্চাত্যের অর্থ-বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো দেশের সংরক্ষিত তহবিলে বিশ কোটি ডলার অর্থাৎ এক শ' কোটি টাকা জমা থাকা উচিত। এর কম হলে সে দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়া দেশ বলা হয়। পাকিস্তানের সংরক্ষিত তহবিলে এখন জমা আছে মাত্র ২০ কোটি টাকা। এদিক থেকে পাকিস্তান এখন সত্যসত্যই দেউলিয়া দেশ।

ফলে পাকিস্তানি টাকার মূল্যমান কমানো অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্যমান কমাতে সম্মতও হয়েছে। কারণ এখন আর উপায় নেই।

ফ্রান্সের 'লা ফিগারো' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, মার্কিন সরকার পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে এ বছর ষাট কোটি টাকা সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,—কিন্তু এখন আর তা দেয়া হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫শে মার্চ অর্থাৎ বাংলাদেশের পশ্চিম পাকিস্তানি সেনানায়করা যুদ্ধ শুরু করার দিন থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া স্থগিত রেখেছে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকার সাহায্যও বন্ধ রয়েছে।

এদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মি. এম, এম, আহমদকে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো ঋণ দেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে।

জার্মান পত্রিকা 'আলগেমাইনে জাইটুং'-এ এই মর্মে সংবাদ ছাপা হয়েছে যে, বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তনের রফতানী বাণিজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং যুদ্ধ খাতে প্রচুর ব্যয়ের জন্য পাকিস্তান এখন আর্থিক দেউলিয়া দেশে পরিণত হয়েছে।

ইয়াহিয়া খাঁনের অর্থ-উপদেষ্টা মি. এম, এম, আহমদ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বলেছেন, পাকিস্তানে মাত্র তিন-চার মাসের খাদ্যশস্য মজুত আছে। সেখানে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করতে গিয়ে পাক-সেনারা বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ রেলপথ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বর্তমানে শতকরা ৮০ ভাগ রেলপথই অকেজো। ফলে বাংলাদেশে সরবরাহ ব্যবস্থা বিলকুল বন্ধ—মানে প্রায় তিনমাস ধরে বন্ধ। তাছাড়া প্রায় তিনমাস ধরে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বাংলাদেশের কল-কারখানা বন্ধ—ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নেমে এসেছে রীতিমতো আকাল।

অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত কোনো জিনিসপত্র গত তিনমাস ধরে বাংলাদেশে আমদানী করা সম্ভব হয়নি। অথচ এই বাংলাদেশেই গত ২৩ বৎসর ধরে পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের বাজার ছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অচলাবস্থার দরুন বাংলাদেশ থেকে যেমন চা, পাট, পান, সুপারি পশ্চিম পাকিস্তানের নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও কোনও মালামাল এখানে আমদানী করা সম্ভবপর হয়নি। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদনকারীরা অতুলনীয় ব্যবসায়িক সংকটে পড়েছেন। এদিকে বাংলাদেশে পাক-সেনারা জানমালের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং এখনো করছে তার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে বিরল।

এ অবস্থায় পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করেছেন। ১৪ বৎসর ধরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম থাকায় এবং এবার জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বরং বাংলাদেশে নির্বিচার গণহত্যা, নারী-নির্যাতন ও লুটতরাজসহ যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মতো লাভজনক বাজার হারাতে বসায় পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র খান-সরকারের অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ইয়াহিয়াশাহী অবলিম্বে সেনাবাহিনী গুটিয়ে না নিলে আর্থিক ও জানমালের ক্ষতি যে কি পর্যায়ে পৌঁছাবে তা বলা দুষ্কর—তাই জঙ্গীশাহীর অর্থ-বিশেষজ্ঞরা আজ আতঙ্কিত হয়ে কি ভাবছেন না যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি?

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ রচিত)

# বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত

৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্রপত্রিকা সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে এবারই প্রথমবারের মতো সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি মুসলিম দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আশা ও আনন্দের বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে আমরা বিশ্ববাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়ে আসছি।

* সিরিয়ার 'আল-তাউরা' পত্রিকায় ২৭শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

  পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকগোষ্ঠী দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা ফিরে আসুক, এটা চাননি। তাঁরা এটাও চাননি যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে হোক।

  তুরস্কের দৈনিক 'জমহুরিয়াত'-এ ২৯শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

  পশ্চিম পাকিস্তান তাদের কামান-বন্দুক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে দমন করতে শুরু করেছে কিন্তু একটু আগে বা পরে পূর্ব বাংলা তার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

* মালয়েশিয়ার দৈনিক 'উতশান মালয়েশিয়া' পত্রিকার ৩০শে মার্চ তারিখে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

  পাকিস্তানের মিলিটারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং বুঝেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার জনগণের অবস্থা ও ভাগ্যের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা ও উদাসীন মনোভাব পোষণ করায় বাংলাদেশে গণ-অসন্তোষ বিরাজ করছে। বর্তমানে ইয়াহিয়া খান পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, পূর্ব বাংলা কোনও স্বাধীন দেশের অংশ নয়—বরং পূর্ব বাংলাকে বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি।

* সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আরবি সাপ্তাহিক পত্রিকা ' রোসে আল-ইউসুফ'-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

  অনেক পর্যবেক্ষক এই ভেবে অবাক হয়েছেন যে, পূর্ব বাংলা এতদিন পরে কেন স্বাধীনতা চাইল! পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক

বাস করে পূর্ব বাংলায়। অথচ পাকিস্তানের মোট সাধারণ বাজেটের ৪ ভাগের ১ ভাগের চাইতে কম অর্থ ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বাজেটের তিনভাগের একভাগের চেয়েও কম টাকা ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। আর বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিজাত আয়ের মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ পায় পূর্ব বাংলা। সরকারি চাকুরির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং সামরিক বিভাগীয় চাকুরির শতকরা মাত্র ১০ ভাগ পেয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় দেখা গেছে যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই বেশি নজর দিয়েছে।

* সুদানের দৈনিক 'আল-সাহাফা' পত্রিকার ৫ই এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র দ্বারা বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করে আসছে। পূর্ব বাংলার এই অভিযোগের কারণ হলো এই :

১। পাকিস্তানি সামরিক অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হয়েছে।

২। বেসামরিক সরকারি অফিসার পদে ৮০% পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। পাকিস্তানের বার্ষিক আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

৪। রপ্তানিজাত আয়ের ৮০% ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র ২০% ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়।

এ সকল কারণেই পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত মনে করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে পূর্ব বাংলায় ১৭% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২%। পূর্ব বাংলার অধিকার সচেতন মানুষের কাছে এখন এ বিষয়টি একেবারে খোলাসা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পাট, চা ও চাউল বিদেশে রপ্তানী করে যে আয় পাকিস্তানের হয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্যই ব্যয় করা হয়। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা পূর্ববাংলার মানুষের কাছে তাদের সম্পদের শোষক ও বঞ্চনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব বাংলার মানুষের টাকা দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে যে রাজধানী গড়া হলো তাতেও খরচ করা হয়েছে ৫শ' কোটি টাকা।

এ সকল ন্যায্য কারণেই পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন চেয়েছে।

আফগানিস্তানের দৈনিক 'আফগান মিল্লাত'-এর এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

পশ্চিম পাকিস্তানি একচেটিয়া পুঁজিবাদী এবং ফৌজী নেতারা এ অবস্থা দেখতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না যে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা বাঙালির হাতে যাক। এ কারণেই তারা জাতীয় পরিষদের বৈঠক বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল। এবং

পরিষদের অধিবেশন বসবার আগে একটা কিছু গোঁজামিল দিয়ে বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতা করতে ফন্দি এঁটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খানই এসব বেআইনী ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর দাবী ছিল, যেকোনও সমস্যার সমাধানের পন্থা পরিষদের বৈঠকে বসেই স্থির করতে হবে।

পশ্চিমা শাসকচক্র দেখলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব বাংলাকে শোষণমুক্ত করতে চান না, একই সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত ও বঞ্চিত প্রদেশগুলোকেও পুঁজিপতি ও সামরিক জান্তার শোষণ থেকে মুক্ত করতে চান। কাজেই ক্ষমতা হাতছাড়া হবার আশংকায় ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ করার জন্য আঁটলেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র—পূর্ব বাংলায় এঁরা পাঠালেন সেনাবাহিনী।

* কুয়েতের দৈনিক 'আখবার আল্-কুয়েত'-এর ৬ই এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছে :

শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁর দল পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনের তাঁর দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো। শেখ সাহেবের দাবী ছিল ন্যায্য, আইনসঙ্গত এবং গঠনমূলক। তিনি চাইলেন গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে লক্ষ্যে পৌছতে এবং দেশের সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে সশস্ত্র ধ্বংসাভিযান চালিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই হত্যাকাণ্ড সৃষ্টির অপরাধে ইয়াহিয়া খানকে ভবিষ্যৎ বংশধররা কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ অনূদিত)

# মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা

১১ জুন, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চের রাত্রির সুপ্তি থেকে সমগ্র বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। মধ্যরাতের দুঃস্বপ্নে অকস্মাৎ কেঁদে উঠেছিল ঢাকা নগরী। সে কান্না মায়ের জঠর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে নবতর জন্মলাভের কান্না। বিশ্বাসঘাতকতার খোলস ছেড়ে নতুন সূর্যোদয়ের মতোই স্বাধীন বাংলা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। তার মুক্ত আলোকচ্ছটা সূর্যকরের মতোই সত্য আর স্বচ্ছ।

সুজলা সুফলা বাংলা আজ বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত। কৃষাণের লাঙ্গল রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ারে, শ্রমিক তার হাতুড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে গ্রেনেডের মতো, দেশের অগণিত জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পোস্টার লিখছে। এ কোন্ বাংলাদেশ? এই অচিন্তনীয় বাংলার রূপ কি পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেছিল? হয়ত দেখেনি, কিন্তু বাংলার কবিরা চিরকালীন আবহমান বাংলাকে অনুভব করেছেন এই বিস্ময়ময় রূপের মধ্যে। তাই বাংলার রণক্ষেত্রে আজ তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং তাঁদের দেশের একান্ত প্রিয় কবিদের কাব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একদিকে হিংস্র বন্য পশুদের নির্মম অত্যাচারের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর, অন্যদিকে স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগময় ভালোবাসা। এই ভালোবাসার প্রতিভাস ফুটে উঠেছে এ দেশের কবির সৃষ্টিতে। মসি এখানে অসির সহযোগী। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণ জীবনানন্দের অনুভবে একাত্ম হয়ে উচ্চারণ করেন : "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"

ভাষাই সম্ভবত বাঙালির চেতনার উৎসমুখ। নদীর স্রোতের মতো অগণিত কাব্যের প্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে এদেশের মানুষ আত্মশুদ্ধ হন। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব ভাষা ও ভাবের আত্মীয়তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের মুক্তি আবিষ্কার। এ জন্যেই একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষার আন্দোলন নয়; একুশে ফেব্রুয়ারি আজকের স্বাধীনতা-বাসনার প্রথম প্রজ্বলন।

দেশের প্রতি কবিদের আত্মনিবেদনে দেশের মানুষ সমান অংশীদার। তাই এদেশের মানুষের কাছে একজন সৈনিক ও একজন কবি পাশাপাশি পথ চলেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'—এ কেবল জাতির সঙ্গীত নয়, জাতির হৃদয়সঙ্গীত। অন্তরের প্রতি প্রান্তে স্বদেশের মাটির প্রতি কবির যে সংবেদন, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রতিটি বুলেটে সেই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর তাই অকুতোভয় বাঙালি সৈনিকের কাছে মৃত্যুকেও মৃত মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয়।

বাংলার জাতীয় জাগরণে জসীমউদ্দীন কেবল কবি নন, তিনি সংগ্রামের সৈনিকও বটে। মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি তাঁকে নিয়ে এসেছে সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে তাই তিনি বলেন :

'সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া
দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে
হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া
শাসন ত্রাসণ ভয়
আমরা বাঙালি মৃত্যুর পথে
চলেছি আনিতে জয়।'

আমাদের স্বাধীনতার মূল উদ্দীপনা আহৃত হয়েছে দেশের প্রতি উৎসারিত মমত্ববোধ থেকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রেও এই স্বদেশপ্রীতিই হচ্ছে আসল হাতিয়ার। দেশকে ভালোবাসার অপরিমেয় আগ্রহ এক নতুন রণশক্তির সৃষ্টি করেছে যা মানবিক মূল্যবোধহীন বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম। এখানেই বাংলাদেশের কবিরা হয়ে উঠেছেন মুক্তিসেনার পরম সহায়ক। যুদ্ধ এক ধরনের হিংস্রতা সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন দেয়া-নেয়ার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের মুখে যে নির্ভীক সাহসিকতার উজ্জ্বল্য প্রকাশমান, তার প্রেরণা বাংলা-মায়ের মুখ। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই যেখানে অস্ত্র, সেখানে পশুশক্তির পরাজয় অনিবার্য। হাসান হাফিজুর রহমান এমনিতর অস্ত্রই আবিষ্কার করেছেন যা জনগণের চোখের দৃষ্টি আর বুকের ভাষা থেকে উৎসারিত :

'অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায়?
মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
দ্যাখো না লক্ষ কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাঁদের আকাশ বাতাস চেরে?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা।'

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি আজ অতি স্পষ্ট। ইতিহাসের অনিবার্য গতিতেই আসন্ন হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা। মানুষ মারার জন্যে বুলেটের সাথে অমানবিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু পশুহত্যার জন্যেই চাই মানবিক দৃঢ়বদ্ধ চেতনা। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি এখন রক্তক্ষয়ী আপোসহীন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা ভাড়াটে হানাদল বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে উঠেছে। কোনও নৈতিক মনোবলশূন্য সামরিক শক্তি যত বিশালই হোক না কেন, আত্মিক বলে বলীয়ান নিরস্ত্র মানুষের শক্তিও তার চেয়ে কম নয়। এহেন মনোবলের বোধ পাকিস্তানের শূন্যগর্ভ বুলিতে কোনোকালেই জাগ্রত করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে বাংলাদেশের কবিরা বাঙালির আত্মিক প্রেরণার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছে। রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে যদিও বাংলাদেশ ধুয়ে যাচ্ছে, তবু মহান মুক্তিসেনারা আজ মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। তাঁদের মনের নির্ভীক প্রতিরূপটিকে ব্যক্ত করে এদেশের কবি বলেন :

'মৃত্যুকেও মৃত মনে হয় আজকাল, কারণ মৃত্যুতে
মোমবাতির শিখাটি নড়ে না,
শোকধ্বনির মধ্যে গভীর আনন্দে খোল করতাল বাজে
অন্ধকারে আলো ওঠে জ্বলে
স্বপ্নে রং গুঁড়ো হলে কারা তবু আঁকতে চায় ছবি
বারুদের পোড়া গন্ধ শুঁকে
স্বদেশের ঘ্রাণ পায়, প্রাণে নেয় আশ্বাসের বায়ু
দুঃখ ক্লান্তি ভীতি নেই, যেহেতু তাদের
প্রত্যেক দুঃখের সঙ্গে আনন্দ ঘুমায় অবিরত,
যেহেতু এখন
মায়ের জঠরে কাঁদে বাংলাদেশ নবতর জন্মের পুলকে।'

ইতিহাসের অমোঘ ধারাকে লংঘন করার সাধ্য পাশব শক্তির প্রতিভূ ইয়াহিয়া খানের নেই। বাংলাদেশ এখন সেই মহাজাগতিক সত্যের ধারায় স্নাত হয়ে মুক্ত সত্তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। 'এ পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়— জীবনানন্দের এই চিরন্তন বাণী মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে স্বাধীনতার পরম সত্যের মাঝখানে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই অনঘ অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন। জীবনকে ভালোবাসি বলেই আমরা বরণ করি মৃত্যুকে।

('কামাল মাহবুব' ছদ্মনামে মাহবুব তালুকদার রচিত)

# রণ দামামা

৬ জুলাই, ১৯৭১

"এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তৃষ্ণাহারা তাপহারা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।"

গ্রীষ্মের খরদাহ তাপক্লিষ্ট রুদ্র রূপের পর বর্ষা তুমি এসেছ। তোমার রুমঝুমাঝুমু নৃত্য আমার হৃদয়ে ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোলে না। রুদ্র দাহনের পর তোমার শ্যামসুন্দর সরল আগমন। আজ জনমন সঞ্জীবিত তোমার রসসিঞ্চনে। হারান সম্পদ বিয়োগব্যথায় ত্রিধরা প্রকৃতি আজ শীতল হলো।

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গরজে গগনে গগনে'। সেই সাথে গরজে আমার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মন। আজ হৃদয় দুর্জয়, অশান্ত, টালমাটাল। ঘন বর্ষায় বাংলার ঘুমন্ত রাণীর তন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্ন বেশ। ঝমঝম করে একটানা ঝরছে। ঝরে পড়া জলের সমুদ্দুরে আরও নতুন ধারা পড়ে বান্যায় হয়ে উঠছে। আমার হৃদয় সমুদ্রেও তেমনি বিক্ষুব্ধ কল্লোলধারা অশান্ত উর্মিমালা উত্থিত-পতিত হচ্ছে ভীমবেগে। আজ 'জনতা সাগরে জেগেছে উর্মি টালমাটাল'। স্বাধীন বাংলায় বর্ষা এসেছে নতুন জাগরণের বাণী নিয়ে, নব উত্থানের মন্ত্র নিয়ে—ঘুমপাড়ানীর গান যেন নয় শিকল-ছেড়া বাঁধনাহারার গান গেয়ে। তরুণ অরুণের বহ্নিশিখার মতো প্রতিজ্ঞার ভাস্বরতা নিয়ে।

হৃদয়-বারিধি তীরে সে আহবানের অনুরণন। নতুন নতুন শপথের দীপ্ত প্রতিভাস, নবীন প্রত্যয়ের সুরে ঝংকৃত অসংখ্য প্রতিজ্ঞার মালা হৃদয়কে আরও কঠিন, আরও ভৈরব-রুদ্র করে তুলছে। বরষার মল্লার মঞ্জরী উত্তরীয় আর হৃদয়পদ্মর কোমল পাপড়িকে আন্দোলিত করে না, বরং নব উচ্ছ্বাসে হৃদেয় ঘুমন্ত বিদ্রোহী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। আজ প্রাণের রুদ্রবীণায় একটি সুরের লয় মিলে—মুক্তির সুর, স্বাধীনতার সুর। রিমঝিম সুরের ঐকতান হৃদয়ে নিকুঞ্জবনকে স্বর্ণমদিরায় অলস-উতল ঘুম আর্দ্র করে তোলে না, বরং বিসুভিয়সের সুপ্ত লাল লাভা উদগীরণ করে। বর্ষার কলকল্লোল বারিধারা, ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর উদ্দাম কলহাস্য, তাল-তমালের শিহরণ এখন আর হৃদয়ের পেলবতন্ত্রীতে সুন্দরের ঝঙ্কার তোলে না বরং দুরন্ত দুর্দম কালবোশেখীর প্রলয়বিষাণ বাজায় হৃদমধ্যে। কদম্ব-কেতকী-কামিনী আর কুমুদ-কহলার অনুপম অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে দেখি ভয়ঙ্কর সুন্দরের প্রতিভাস। স্ফীতকায়া নির্ঝরিণীর সলিল-উল্লম্ফনে রক্তের ফিনকি চমক দিয়ে যায়। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়ের মালায় একটি রক্তকবরী গেঁথে দেই। যেন এক শপথের গুচ্ছ শহীদী রক্তে সিক্ত হয়ে নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। বিজলী চমকের ঝিলিকে সে প্রত্যয় আরও প্রোজ্জ্বল, আরও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘমল্লার রাগে নতুন করে বাজুক রণদামামা—'জয় নিপীড়িত প্রাণ, জয় নব উত্থান'।

(দিলীপ কুমার ধর রচিত)

# কথিকা

১৩ আগস্ট, ১৯৭১

২৪ বছর পরে আজ ১৪ই আগস্টে মনে পড়ছে আজ থেকে ২৪ বৎসর আগেকার দিনটির কথা। সেদিন কি উজ্জ্বল ছিল বাংলাদেশ, আর প্রাণদৃপ্ত ছিল বাংলার মানুষ। সারাদেশে কাগজের রঙিন পতাকা আর মালার ছড়াছড়ি। আলোয় আলোয় সারাদেশ ঝলমল। আমরা স্বাধীন হয়েছি, এবার আমাদের দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী শাসন, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ আর সামাজিক অসাম্যের হাত থেকে রেহাই পাবে বাংলার মানুষ। সারাদেশের মানুষ অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিল ১৪ই আগস্টের ভোরের লগ্নটি।

তারপর প্রতিবছর ১৪ই আগস্ট ঘুরে ঘুরে এসেছে। বাংলার মানুষ তাদের ন্যায়সংগত প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিবছর ১৪ই আগস্টের ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ভেবেছে, যে দিনগুলো চলে গেল সে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এবার নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত নতুন জীবনের বাণী বহন করে আসছে ১৪ই আগস্ট। কিন্তু প্রতিবারই ভুল ভেঙ্গে গেছে বাংলার মানুষের। তার অতি কাঙ্ক্ষেয় জীবনের প্রতিশ্রুতি বহন করে এল না কোনও ১৪ই আগস্ট। বিদেশী শাসনের পরিবর্তে তার ঘাড়ে চেপে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন। ১৪ই আগস্ট বাঙালির জন্যে মুক্তি নিয়ে এল না কোনোবার। শুধু তীব্রতর হলো শোষণ। জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনের শোষণের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের বর্বরতম অত্যাচার ও তীব্রতর শোষণে তারা জর্জরিত হয়ে উঠলো। সামাজিক অস্বীকৃতি আর অনাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ।

এই শৃঙ্খলিত শাসন আর সামাজিক অবিচারের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকবার প্রতিটি উপকরণের জন্যে তাদের লড়তে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশের প্রতিটি দাবীকে অস্বীকার করেছে, আর প্রতিটি দাবী আদায়ের জন্যে বাংলার মানুষকে লড়তে হয়েছে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টের পর বাংলাদেশের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে বাংলার বীর সন্তানেরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবীতে বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে তাজা তাজা প্রাণগুলো উৎসর্গ করেছে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাত কোটি বাঙালির প্রাণের দাবী ছয়-দফাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে ভাই মনু মিয়া এবং আরো অনেকে। ১৯৬৯ সালের বাংলার স্বাধিকারের দাবীতে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবীতে, বাঙালির প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে বুকের তাজা রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি লালে লাল করে দিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকশ্রেণী, আমলতন্ত্র, সামরিকচক্র এই তিনশক্তি বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে বার বার হামলা করেছে। প্রতিবারই বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের সম্মুখে পিছু হটে গিয়েছে এবং চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। তারপর তারা তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করলো ২৫শে মার্চের গভীর রাত্রিতে। বুলেট, সঙ্গীন, মেশিনগান, মর্টার আর বোমার আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো বাংলার মুক্তিকামী জনতার কণ্ঠকে। কিন্তু বাংলার মুক্তিকামী জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের সম্মুখে আবার পিছু হটে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর শোষকশ্রেণী এবং তাদের স্বার্থবাহী সামরিক চক্র। তাদের এই অভিজ্ঞান হয়েছে যে, পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত—মৃত্যুর ঘণ্টা বেজেছে।

বাংলায় আজ রক্তের স্রোত বইছে। ঘরে-ঘরে, মাঠে-মাঠে, রাজপথে জমাট-বাঁধা রক্ত। ধর্ষিতা মা-বোনদের মরণ আর্তনাদ অভিশপ্ত ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট আর তার নায়কদের প্রতিমুহূর্তে ঘৃণার সাথে ধিক্কারে ধিকৃত করছে। '৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বাংলার জন্য এনেছে প্রতিশ্রুতির আড়ালে বঞ্চনা, শোষণ আর রক্তস্নান; কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।

তাই আজ ১৪ই আগস্টে স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকল-ছেঁড়া বাংলার মানুষ অতীতের অপমান আর গ্লানিভরা দিনগুলোকে স্মরণ করছে প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে। আর সেজন্যেই সেদিন ছোট ছেলেটি বললো—মা, কি পুণ্যাই যে ছিল তোমার, যার জন্যে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্টের কলঙ্কিত দিনটির মুখ দেখতে পাইনি, আর তোমাদের মতো আমার দু'হাত দিয়ে এমন দিনটির জন্যে মালা গাঁথতে হয়নি।

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত)

# বাংলাদেশ গেরিলা

২৯ আগস্ট, ১৯৭১

'গেরিলা' শব্দটি এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত। এ শব্দটা শুনলেই মানসপটে ভেসে ওঠে একটা ছবি—"রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি চলেছে এক যুবক, কখনও ঝড়ের রাতে তার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে বাংলা মায়ের আনন্দাশ্রু বৃষ্টিধারায়, কখন স্রষ্টার বরাভয়ের মতো ঝরে পড়ছে তালনবমীর আধো আধো জোছনা। পরনে কোনও নির্দিষ্ট যুদ্ধসাজ নেই। কখন লুঙ্গি, কখন পাজামা, উর্ধ্বাংগে কখন শার্ট কখনও ফতুয়া। সে চলেছে শত্রুপক্ষে কোনও গুপ্ত অবস্থানের খবর পেয়ে। অস্ত্র তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকোনো। কিছুক্ষণ পরেই গর্জন করে উঠবে প্রচণ্ডভাবে ...।

এখন প্রশ্ন— গেরিলা কে? তাকে দেখতে কেমন? কী এমন তার মাঝে আছে যা তাকে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে?

প্রথম প্রশ্নের একমাত্র উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ' গেরিলা' সবাই। ' গেরিলা' যে কেউ হতে পারে, সে ছাত্র হোক অথবা শিক্ষিত হোক। কৃষক শ্রমিক মজুর মালিক যে কেউই গেরিলা হতে পারে। জীবিকার জন্যে যে যে-পেশায় নিয়োজিত আছে—যেমন মুদি দোকানী, হোটেল বা রেস্টুরেন্টের মালিক, কর্মচারী, রিকশাঅলা, বুদ্ধিজীবী-সবাই গেরিলা। গেরিলা শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক হতে পারে। যেমন, শত্রুনিধনে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদেরই শুধু নয়, বরঞ্চ যারা সক্রিয় গেরিলাদের প্রকারান্তরে সাহায্য করছে গেরিলা বলতে তাদেরকেও বোঝায়। বাংলাদেশের মা-বোনেরা যারা মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের খাবার দিয়ে বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করে তারাও ' গেরিলা' শব্দের বৃহত্তর সংজ্ঞায় পড়ে। আমি দেখেছি পাবনার পথে পথে অশীতিপর বৃদ্ধা, বেঁকে যাওয়া কোমরের ভাঁজে মুড়ির ধামা আর লোলচর্ম হাতে জলের বালতি নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর জন্যে অক্লান্ত স্মিত মুখে। সেই অর্থে এখন বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সবাই ' গেরিলা।'

(শামীম চৌধুরী রচিত)

# আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২৩ বছর ধরে নিরপরাধ নিঃসহায় বাঙালির উপর যে অত্যাচার অবিচার আর নির্যাতন চলে আসছিল সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বাঙালির দানাবাঁধা ক্ষোভ এবার ফেটে পড়েছে '৭১-এর ২৫শে মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামের আকারে। বাঙালির বাঁচার দাবীকে দাবিয়ে রাখতে বছরের পর বছর জঙ্গীশাহীর নরঘাতকরা অসহায় বাঙালির উপর অস্ত্র ব্যবহার করেছে। রক্তপিপাসু নরপিশাচরা বার বার রক্ত পান করেছে। কিন্তু এবার বাঙালির সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী বাঙালি তার স্বাধীনতার রক্ষাকল্পে এবার হাতে অস্ত্র নিতে শিখেছে—হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

আর তাই বাংলার তরুণ যুবকরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর তরুণ যোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাহস আর কৃতিত্বের সহিত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করে অস্ত্রের ভাষায় অস্ত্রের জবাব দিচ্ছে।

আজকে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম বাংলার সাড়ে সাত কোটি নরনারীর মুক্তি-সংগাম। বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের এ ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে অকাতরে এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। বাংলার সামগ্রিক জনতার অর্ধাংশ যে নারী তারাও আজ পিছিয়ে নেই, তারও স্বাধীনতা-চেতনার পরিস্ফুটন আজ আমরা আমাদের মুক্তিসংগ্রামে দেখতে পাই। তাই দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায় বীরাঙ্গনা খাওলা, চাঁদ সুলতানা থেকে শুরু করে জামিলা বোখারীদ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আর লায়লা খালেদের পাশে বাংলার বীরাঙ্গনা রওশনারা নিজের নাম যোজনা করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে কবির সেই বৈপ্লবিক চেতনার কথা স্মরণ করতে হয়। কবির ভাষায়—

এ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কিংবা—

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।

আজকে আমাদের এ সংগ্রামও বাংলার মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আজকে দেখি বঙ্গমাতার হীরের টুকরো ছেলে যখন অশ্বমেধের বলির মতো বর্বর পশুর হাতে স্বাধীনতা শিকারে পরিণত হয়েছে তখনও শোকসন্তপ্ত মাতা সগর্বে অপর এক সন্তানকে তার প্রতিশোধ নিতে মুক্তিসংগ্রামে পাঠাচ্ছে। আজকে বাংলার ভগ্নীকুল তার নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও ভাইকে দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকে বাংলার কুলবধু স্বামী হারিয়েও রণাঙ্গনের পাশে পাশে বীর সৈন্যদের সেবাশুশ্রূষা করছে।

নরপিশাচরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে হত্যা করে, পাইকারী হারে লুঠতরাজ করে, মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করে—কামান, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক চালিয়ে, নাপাম বোমা ব্যবহার করেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে পারে নাই। কেননা আমাদের ভাইরা যখন রণাঙ্গনে থেকে শত্রু খতম করছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা, সড়ক, সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে তখন বাংলার মহিলারা তাদের অনুপ্রেরণায় শরীরে ডিনামাইট বেঁধে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছে।

তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা তাদের স্বেচ্ছাসেবিকা কেন্দ্র স্থাপন করে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং গ্রহণ করছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে মহিলা সমাবেশে সৈন্যদের খাবার ও পোশাক তৈয়ার করা হচ্ছে। সর্বোপরি মহিলা চিকিৎসকরা সূর্য-সৈনিকদের সাথে সাথে যুদ্ধাঙ্গনে রয়েছে। আহত সৈন্যদের পাশে চিকিৎসালয়ে মায়েরা বোনেরা নার্স হিসাবে তৎপর রয়েছে।

'কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।'

তাই বাংলার বিজয়লক্ষ্মী নারীরাও আজ বঙ্গবন্ধুর 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব' মন্ত্রে আজ দীক্ষা নিয়েছে। জয় বাংলা ॥

(মেহের খন্দকার রচিত)

# দেশবাসীর সমীপে নিবেদন

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশবাসী ভাই-বোনেরা,

কী বুকফাটা আহাজারী আর কান্নার দরিয়া সাঁতরে সাঁতরে আমাদের দিন কাটছে, তা ইসলামাবাদের দুর্বৃত্তেরা না জানলেও, পৃথিবীর মানুষ জানে। অনেকেই আজ একে অপরের কাছ থেকে ছিট্‌কে পড়েছে। লক্ষ মানুষ ছিট্‌কে পড়েছে দিগ্বিদিক—স্বদেশহারা, গৃহহীন, আত্মীয়স্বজনহারা। একদিন যারা কাছে ছিল, আজ নেই।

শুধু মানুষ নয়, আমাদের অতি মেহনতে-গড়া শহর—সবুজের ভাঁড়ার ঘর আমাদের গ্রাম— যেখানে ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে হাসিকান্নায় দিন কাটত—পরম শান্তির নিবাস আমাদের বহু গ্রামও ধ্বংস হয়ে গেছে। আগুনে বোমা, কামানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে সবুজের ভাণ্ডার। ঝোপেঝাড়ে যেখানে পাখি ডাকত সেখানে একমাত্র আওয়াজ মানুষের গোঙানি—রমণীর আর্তনাদ। বেঁচে যাওয়াটাই এদেশে দৈবী ব্যাপার। ছোট ছেলেমেয়ে, এমন দৈবীভাবেই যারা বেঁচে গেছে, আজ তাদের মুখে স্বাভাবিক হাসি নেই। কান্না ভুলে স্তব্দ হয়ে গেছে। শুধু ফ্যালফ্যাল চেয়ে আছে সেই রাস্তার দিকে যে-পথে ঘরবাড়ি তছনছ করার পর বুটপরা খাকী লেবাস জানোয়ারেরা কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। এরা কেউ বাংলার বাসিন্দা নয়। বাংলাদেশের দুঃখ-আনন্দের শরীক তারা কী করে হবে? লুটতরাজের মালে পকেট বোঝাই এইসব জানোয়ারদের কাছেই কিন্তু আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

কিসের পরীক্ষা? তা আপনাদের জানা। অনেককে ব্যক্তিগতভাবে এই মসিবৎ পার হতে হচ্ছে। পরীক্ষা—আমরা বাঙালিরা মুসলমান কি না। তাই চার-কলেমা পড়তে হয়েছে উদ্যত সঙ্গীন বা রাইফেলের মুখে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! যে বাঙালির তাগদ ও তাগিদের জোরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে বাঙালি নিজ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও অন্য প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি প্রীতি-পরবশ পাকিস্তান চেয়েছিল, যে বাঙালি শাসনতন্ত্র পরিষদে লিয়াকত আলি প্রমুখ অবাঙালিদের বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, নেহায়েৎ বাঙালিসুলভ উদারতায় এবং নিজে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা মাইনরিটি হয়েছিল। শাসনতন্ত্র পরিষদে— সেই বাঙালিকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ও হচ্ছে : সে মুসলমান কি না। অদৃষ্টের পরিহাস বটে!

পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বা হয়েছে কার কাছে? যে পাঞ্জাবি সৈন্য লুটতরাজ করে, নিরীহ নিরস্ত্রকে হত্যা-খুন করে, জুলুমের চাকা নির্দয় চালিয়ে যায়, বোনকে ভা'য়ের সামনে বলাৎকার করে—এমন জন্তুর কাছে। পশু ইসলামের ফর্মাবরদার। আর আমি আমার ভালোমানুষিয়ানা এবং উদারতা নিয়ে মুসলমান নই। অদৃষ্টের পরিহাস বটে।

ভাইবোনেরা আমার, আমাদের ভালোমানুষিয়ানার দাম দিচ্ছি। বড় চড়া দাম। রক্ত অশ্রু অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা প্রাণের বিনিময়ে—বড় চড়া দাম। অথচ বাংলাদেশের পাটচাষিরা তার ফসলের দাম পায় না। রোদে-বৃষ্টিতে অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাদের

আবাস জীর্ণ কুঁড়েঘর। ভরপেট দু'বেলা অন্ন তাদের কাছে স্বপ্ন। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবে না, যেহেতু কুলকিনারা অসম্ভব। সেই পাটে আদমজী-ইস্পাহানীরা শুধু ধনকুবের হয় না, ঐ ফলসজাত বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা অস্ত্রে সজ্জিত হয় পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী। সেই অস্ত্র আজ আমাদের বুকে বিঁধছে। ভালমানুষিয়ানার দাম এইভাবে দিতে হয় না কি? কেউ কোথায় দিয়েছে?

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভালোমানুষিয়ানা ও সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। আজও তার কামাই নেই। পূর্বে আমাদের তারা বাঙালি হতে দেয়নি। মুসলমান বানানোর চেষ্টা নিয়েছে। এর উপর ফিরিস্তি আজ দেয়া সম্ভব নয়। আপনারা জানেন। মিসর, ইরান, তুরানে মুসলমান থাকতে পারে—মিশরি ইরানি তুরানি হয়েও। কিন্তু আপনি আমি বাঙালি হলে আর মুসলমান থাকতে পারি না। শোষণের চাকা সদা সচল রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার কিছু দেশি দালাল সব সময় এই দাগাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করতে জিন্না সাহেবের পর্যন্ত এতটুকু বাধেনি।

ওদের জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। তাইতো হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মাদারীর পুরাতন খেল্ চালু করতে ওদের কসুর নেই।

পঁচিশে মার্চের রাত থেকে নেক্‌ড়ের মতো যখন বাংলাদেশের নিরীহ-নিরস্ত্রের উপর ওদের পোষা জন্তুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তারা জাতিধর্মনির্বিশেষে বাঙালি হত্যা করতে লাগল। মনে রাখবেন, এই হত্যা খুচরা নয়। পাইকারী। কত্‌লে আ'ম। ধর্ম ছাড়া আরও হাজার রকম মানবিকতার মিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। বর্ণের দিক থেকে এক। দেখতে একই রকম। পঁচিশে মার্চ থেকে নামটা উচ্চারণ করতে ঘৃণা হয়, টিক্কা খান ও অনুচরেরা বাঙালি ধ্বংস করতে নামল। এক মাস পরে যখন নিজেদের কৃতকর্মের চেহারা ওরা দেখতে পেল, তখন আবার সেই পুরাতন ফন্দি—সাম্প্রদায়িকতায় ফিরে গেল। প্রথম কিস্তি, হিন্দু মুসলমানকে নির্যাতন করছে, তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। কিন্তু শয়তানের জন্মগত খাসলৎ অভ্যাস কী সহজে যায়? জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফন্দি পুনরায় চালু হলো। এবার বেছে বেছে হিন্দু হত্যা, হিন্দুর গৃহদাহ ওরা শুরু করল। তাই বলে কেউ মনে করবেন না, মুসলমানদের তখন টিক্কা খান ভগ্নিপতীর আদরে আপ্যায়িত করছিল। মুসলমানের ক্ষেত্রেও তাদের বাড়ি লুটতরাজ, তাদের হঠাৎ গুম, আটক, লোকচক্ষুর আড়ালে হত্যা—এসব চলছিল। হিন্দুর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে, মুসলমানের ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে। তফাৎ এতটুক। বাঙালি ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে পাঞ্জাবি মুসলমান (হায় মুসলমান নামধারী!) সেনারা এতটুকু নড়েনি। কৌশল বদলেছিল, নীতি যথারীতি অব্যাহত। এইভাবে মুসলমানদের কাছে গোঁসাই ঠাকুর সাজার ফন্দি। নিজেদের অপরাধের বোঝা হাল্কা করার অপচেষ্টা ওরা নিয়েছিল। এইভাবে আবার মৃত সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চলে।

কিছুটা সফল হলো বৈকি পাঞ্জাবাগত এই হানাদারের দল। নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামীর ধর্মান্ধ পশুর দল যারা এতদিন গণঅভ্যুত্থানের সামনে কেঁচোর মতো মাটিতে মিশেছিল, তারা তাদের মিলিটারি আব্বাজানের ডাকে এবং উৎসাহে কেউটের

মতো তৎপর হয়ে উঠল। নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামীর গুণ্ডারা বাঙালি নয়। পাঞ্জাবি মিলিটারিরা সত্যি ওদের বাবা বা বাপ্‌জান। নচেৎ বাংলাদেশের মাটিতে জন্মে, বাংলার মা-বোনের বেইজ্জতি দেখেও ওরা কীভাবে মিলিটারির সঙ্গে হাত মিলায়? যারা দেশকে বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে পারে, তারা মা-বোনকেও বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে সক্ষম। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক—আশা করি এই কথাটা স্মরণ রাখবেন।

কিন্তু সকলেই তো নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর অনুচর নয়। সাড়ে সাত কোটির মানবজননী বাংলাদেশের কি সাচ্চা সন্তান নেই, জন্মভূমির অপমান যাদের বুকে যন্ত্রণার ঝড় তোলে; দেশের চাষিমজুর ও অন্যান্য সকলের দুঃখ-কষ্ট যাদের বিচলিত করে। তারা এগিয়ে এসেছে বৈকি। শুধু এগিয়ে আসেনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাতিয়ার হাতে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকান। কত সামরিক অফিসার নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন নি। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল, পুলিশ ভায়েদের গৃহসুখ, স্নেহমমতা বলে আটকে রাখতে পারেননি। জন্মভূমির প্রেমের বেদীতে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। আর আছে আমাদের দেশের তরুণেরা—যাদের অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছেলে। নিজেদের সকল সাধ-আরাম-আয়েস হারাম ভেবে যারা সৈনিকজীবনের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। হিন্দু-মুসলমান এখানে এক-কাতার। যে বিভেদ মারফৎ বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ বছরের পর বছর শোষণ করেছে, তা মুছে দিয়ে এক-কাতারে দাঁড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান। নতুন বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। নতুন আদর্শের প্রদীপ জ্বালিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। সেই প্রদীপের শিখা-রোশ্‌নাই অনির্বাণ রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমরা যারা ঠিক লড়াইয়ের ময়দানে নেই, তারাও জন্মভূমির মুক্তিসংগ্রামে শরীক। মনে রাখবেন, এই লড়াই সর্বাত্মক লড়াইয়ের পর্যায়ে পড়ে। আজ আমরা প্রত্যেকেই সৈনিক-হাতে হাতিয়ার থাক বা নাই থাক। পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি সামগ্রী যে কেনে না সেও লড়াইয়ের ময়দানের আছে বৈকি। শত্রুকে সেও ঘায়েল করছে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। যে পাটচাষি পাট চাষ করে না, ধান চাষ করে সেও লড়াইয়ে শরীক। কোন সভ্য দেশে নজীর নেই, দুশমনেরা আমাদের প্রতিটি বাজারে চাল-ডাল ধ্বংস করে দিয়েছে, যেন আমাদের অন্ন না জোটে এবং দুর্ভিক্ষ আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়—যার ফলে গোলামি আমরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেব। এই চ্যালেঞ্জ—তাল-ঠুকা আস্পর্ধার মোকাবিলা করছে সেই চাষি যে প্রচুর পরিমাণ ফসল ফলানোর চেষ্টায় কোমর বেঁধেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা যাতে শত্রু না পায় তার জন্যে সতর্ক—সে পাট চাষ করছে না। এই কৃষক কোনও সৈনিকের চেয়ে কম নয় যদিও স্রেফ কাস্তেধারী, অস্ত্রধারী নয়। এমনিভাবে জন্মভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হতে পারি।

আমরা লড়ব বৈকি। যতদিন একটি হানাদার সেনা (আশ্চর্য, এগুলো আবার ধর্মে মুসলমান) আমাদের জন্মভূমির মাটির উপর থাকবে ততদিন আমাদের সংগ্রামের বিরতি নেই। ব্রিটিশের শিকল ছিঁড়ে আমরা গোলামির নতুন জিঞ্জির পরেছিলাম— এতদিন পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী যাকে ইসলামী জেওর বা অলঙ্কার বলে জাহির করেছে। সেই

জিঞ্জির ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে। আমরা আর ধোঁকাবাজির শিকার হবো না।

আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ব—যেখানে শোষণ চিরতরে নির্বাসিত—যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মেহনতের দাম পায় যথাযথ মর্যাদায়— যেখানে জাগতিক অসহায়তা কারো মনুষ্যত্বের বিকাশ-পথে বাধা নয়। আমরা গড়বো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত শ্রেয়বোধ প্রিয়বোধে দীপ্ত খাড়া শিরদাঁড়া নাগরিকের কলকণ্ঠঝংকৃত নতুন বাংলাদেশ। জয় বাংলা ॥

(শওকত ওসমান রচিত)

# যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গত ২৫শে মার্চ রাত ১২টা থেকে বাংলাদেশে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সে আন্দোলন আমাদের মুক্তির আন্দোলন, সে আন্দোলন আমাদের বাঁচার আন্দোলন, আমাদের স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বর্বর জঙ্গীশাহী সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমাদের বুকের রক্ত শোষণ করে আমাদের সোনার বাংলাকে নিঃস্ব করে তার বুকে মেরেছে ছুরি। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের শস্য-শ্যামলা মাকে তারা পরিয়েছে শ্বেত বসন, মাঠের ফসলে জঙ্গীশাহী বিমান থেকে ফেলেছে বিষ। আমাদের ঐতিহ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকদেরও তারা রেহাই দেয়নি। বিখ্যাত দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে বিছানা থেকে পথে টেনে এনে জঙ্গীশাহী তাঁর বুকের উপর করল বেয়নেট চার্জ। এমনি করে মারা হয়েছে মনিরুজ্জামানকে ও আরো অনেককে। জগন্নাথ হল, ইকবাল হলের ছাত্ররা রাত ১১টার দিকে নিদ্রামগ্ন ছিল। সেই অবস্থায় তাদের উপর চালান হয়েছে মেশিনগান। ঘুম থেকে তারা আর উঠতে পারেনি। যখন তাঁরা পড়াশুনা করে ঘুমিয়েছিল তখন তাদের মনে ছিল কত আশা, কত স্বপ্ন। কিন্তু না, তারা সেই যে ঘুমিয়েছিল—সে ঘুম তাদের আর ভাঙ্গেনি। তারা আর ঘুম থেকে ওঠেনি, আর উঠবেও না কোনোদিন। রোকেয়া হলে রাত ১২টায় জ্বালিয়ে দিল আগুন। ঘুমন্ত হল আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। আরো কত হাজার হাজার মানুষকে এই হিংস্র জানোয়ারদের বর্বরতার শিকার হতে হয়েছে তার কোনও হিসাব নেই। ভাবতে পারেন? কল্পনা করতে পারেন? কি নির্মমভাবে জঙ্গীশাহী আমাদের রক্ত দিয়ে আমাদের জন্মভূমিকে রক্তস্নান করিয়েছে?

হিংস্র পশুর মতো টিক্কা খান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের উপর ২৪ ঘন্টা সময় নিয়ে। দম্ভভরে বলেছিল জঙ্গীসর্দার ইয়াহিয়াকে, "আমার হাতে ক্ষমতা দাও, আমি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সব ঠিক করে দেব।" হ্যাঁ, নেমেছিল সে তার সবটুকু ক্ষমতা নিয়ে কিন্তু পেরেছিল কি? না পারেনি, পারবেও না। ২৪ ঘন্টা অতীত হয়ে কতদিন পার হয়ে গেল তবুও পারেনি। শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেয়ে হাল ছেড়ে পালিয়ে গেল। এবার আর এক মিরজাফর ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসেছে গদিতে। দেখা যাক ক'দিন এর আয়ু? এই ক'দিনেই ডা. মালিকের অবস্থা হয়েছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

যাক সে কথা। জঙ্গী সরকার যেভাবে আমাদের অগণিত মা-বোনদের নিঃস্ব করে গৃহছাড়া করেছে, আমাদের ভাইকে হত্যা করেছে, আমাদের বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—সেই হানাদারদের আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতেই হবে। আজ আমাদের দেশে যে সংগ্রাম চলছে সে হলো মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অর্থাৎ নারীদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যেমনভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছে আমাদের ভাইয়েরা। ভাইয়েদের সাথে আমাদের হাতে হাত মেলাতে হবে। এখন দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আজ

ঘরে বসে থাকলেও চলবে না। আমাদের ভূমিকা আমাদেরকেই পালন করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রীবোনদের কাছে আমার আবেদন, তোমরা এস—এগিয়ে এস—আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের ভাইয়েদের মতো আমরাও মেশিনগান-মর্টার হাতে নিয়ে শত্রুনিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি। আমাদের এগিয়ে আসতেই হবে। বোনেরা আমার এগিয়ে এস। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমরা কেন ঘরে থাকব? মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তোমরা কেন ঘরে থাকবে? পথে নামো। আজ আমাদের ঘরে থাকার দিন নয়, আমাদের সামনে আজ বহু কাজ। ঝাঁসির রানীর বাহিনীর মতো আমাদেরকেও সেনাবাহিনী গঠনে অগ্রণী হতে হবে। আমাদেরকে নার্সিং-এ অংশগ্রহণ করতে হবে। আহত ভাইদের সুস্থ করে তাঁদেরকে আবার দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনে পাঠাতে হবে। যেদিন দেশমাতৃকাকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করতে পারব—সেদিন আবার আমরা আমাদের ঘর আলোকিত করব—আবার স্বপ্নের জাল বুনব। শুধু বোনদেরই এগিয়ে আসলে চলবে না। মায়েদেরও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। মায়েরা তাঁদের সন্তানকে উৎসাহিত করবেন এই মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই সংগ্রাম আমাদের সকলের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে আমাদের সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় আমাদের হবেই। আমাদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।

(মিস ডলি নাথ রচিত)

# সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাংলাদেশ

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

... সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর যাবৎ পশ্চিমা শাসক ও শোষক গোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বার বার শুধু জনগণের কণ্ঠই রোধ করেনি অধিকন্তু জনগণের অন্তরের আশা ও ভাষার মূর্ত প্রতীক নির্ভীক মুখপত্রগুলোর উপরও চালিয়েছে বিবেকহীন ধারালো কাঁচি।

১৯৪৭ সন থেকেই পশ্চিমা শাসক ও শোষক গোষ্ঠী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই পথটি বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, নিজস্ব স্বার্থে তারা জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির উপরও জঘন্য হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশ তার অনন্য শিকার। আর সেই শাসকচক্র বাংলাদেশে তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক দালাল গোষ্ঠীর মতোই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কিছু তোষামোদকারী ও চাটুকারের দল খুঁজে পেয়েছিল। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা সব সময়ই জনগণের স্বার্থকে নিদারুণভাবে বলি দিয়ে গেছে। অপরদিকে স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর না দিয়ে যারা শোষিত জনগণের অন্তরের কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছিল, তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও চরম দারিদ্র।

বিগত চব্বিশ বছরে বাংলার জনগণের প্রিয় মুখপত্র দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও জনতাসহ আরো কয়েকটি পত্রিকা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকদের সেদিনকার সে দুরবস্থা কোনোদিনই ভোলার নয়। তবু তারা হার মানেনি কোনোদিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে—সকল প্রকার দুঃখ-দারিদ্র, জেল-জুলুম, অন্যায় ও নির্যাতনের কাছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে জনতার সাথে তাঁরা ছিল একাত্ম এবং সোচ্চার। অগ্নিক্ষরা ছিল তাঁদের লেখনী।

সরকারি বিধিনিষেধ, জেল-জুলুম এবং সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াও পশ্চিমা শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর পদলেহী কিছুসংখ্যক এদেশীয় পত্রিকার মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক তাঁদের প্রভুদের চেয়েও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি বর্বরতার পরিচয় দিয়েছেন। ... তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবরসহ প্রায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। মালিকপক্ষ ছাড়াও বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কয়েকজন লোক অপ্রয়োজনীয় আগাছার মতো সম্পাদকের আসন গেড়ে বসে আছেন—যারা সব সময়ই জাতীয় স্বার্থ, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সর্বপ্রকার শোষণ, শাসন ও নির্যাতন চলাকালেও একতা, সংহতি ও ইসলামের জিগীর তুলে বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকারকে নির্দয়ভাবে চাপা দিয়ে গেছেন। ...

এছাড়া বাংলাদেশের বাইরে—পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব সম্পাদক এবং সাংবাদিকই 'পাকিস্তান টাইমস্' এর দীর্ঘস্থায়ী সম্পাদক জেড, এ সুলেরির চেয়ে গুরুত্বের দিক থেকে কোনও অংশেই কম নয়। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি তাঁর লেখনীতে সর্বপ্রকার ছলা, কলা ও ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে কোনোদিন কার্পণ্য করেননি।

সারা বাংলাদেশ আজ একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে মুক্তির লাখো কোটি মশাল। তার আগুন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার দিকে দিকে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অগণিত বাঙালি শ্রমিক কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবহারজীবীর দল। তারা প্রত্যেকেই আজ এক-একটি মুক্তিসেনায় পরিণত হয়েছে। জীবনকে বাজি রেখে তারা লড়ে যাচ্ছে মুক্তির জন্য দুর্জয় সাহসে অপ্রতিরোধ্য গতিতে শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। সে আক্রমণে পশ্চিমা জঙ্গীশাহীর তখতে তাউস কেঁপে উঠেছে।

এ মুহূর্তে কি করছেন শত্রুকবলিত আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিকরা? কি আজ তাদের নৈতিক এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব? বিবেকসম্পন্ন মননশীল সেসব সাংবাদিককে কোনোকিছু বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও ছিল একটি সংগ্রামী ভূমিকা। কিন্তু আজ যখন তারা সম্পূর্ণ পরাধীন—বিবেক যেখানে বিধিনিষেধের বাহুল্যে ক্ষতবিক্ষত—চোখের সামনেই যেখানে ২৫শে মার্চের পর একমাত্র বাঙালি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা বলেই Eastern News Agency-কে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ENA ছাড়াও দি পিপল, সংবাদ, স্বরাজ, বাংলার মুখ, একতা, স্বাধিকার, বাংলার বাণী, গণশক্তি, গণবাণী, হলিডে, এক্সপ্রেস ও আরও অনেকগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও তাদের সংবাদকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এহেন অন্যায়কে তারা কিভাবে সহ্য করে যাচ্ছেন? শুধু তাই নয়—হানাদার এহিয়া সরকারের সর্বৈব মিথ্যা সংবাদ কিভাবে তারা দিনের পর দিন প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন? আমরা জানি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা। তবুও বলবো, আজ যারা বাংলাদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণ এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তারা তাদের চেয়েও কি মানসিক দুরববস্থায় আছেন! হার না মানা সেসব বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিকরা তো মরে যান নি! মুক্তিপ্রত্যাশী সেসব সাংবাদিকরা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখনো জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও মনোবল যোগানোর জন্য লেখনীতে অগ্নি ঝরিয়ে যাচ্ছেন। বাঙালি জাতি তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা কোনওদিনই ভুলে যাবে না। মুক্তিসংগ্রামে তাদের অমূল্য অবদান অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালি জাতির সংগ্রামী চেতনায় এবং ইতিহাসে।

পশ্চিমা হানাদার বাহিনী—যারা পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালি জাতিকে ষম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল—যাদের আক্রমণে ১৪ লক্ষ নিরস্ত্র লোক নিহত হয়েছে—যাদের অত্যাচারে ৯০ লক্ষ নিরপরাধ, নিঃসহায় মানুষ নিজেদের আবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে—তাদের ক্ষমা নেই। বাঙালি জাতি তার সমুচিত প্রতিশোধ নিতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু তাই নয়—বাংলাদেশের যেসব পত্রিকা মালিকপক্ষ ও সাংবাদিক গোষ্ঠী আজো সেই নরঘাতক ঔপনিবেশিক সরকারের নারকীয় কার্যক্রমকে সহায়তা করছেন এবং মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন তাদেরও ক্ষমা নেই। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়। এর যথাযোগ্য প্রতিদান তারা পাবেনই। পশ্চিম পাকিস্তানে

কোনোদিনই তাদের ঠাঁই হবে না। আত্মশুদ্ধি এবং দোষ স্খালনের পথ এখনো খোলা আছে। আমরা তাদের সংগ্রামী আহ্বান জানাই তারা যেন হানাদার এহিয়া সরকারের তাঁবেদারী ও দালালী ত্যাগ করে, এখনো জনগণের মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসেন।

বাঙালি জাতি হানাদার জঙ্গীশাহীর কোনও প্রকার চাতুরিতেই আর বিভ্রান্ত হবে না। তারা জানে বাংলাদেশে অসামরিক পুতুল সরকার নিয়োগ, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও আলোচনার জন্য ভারত সরকারকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে তাদের আন্তরিকতা ও সততা কতটুকু আছে। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই হচ্ছে বাঙালি জাতির শেষ কথা। বাঙালি জাতি তাদের জীবনে আর কখনো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না, বরং পশুশক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তাদের বজ্রকঠোর শপথ। সে সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিদীপ্ত বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিক শ্রেণীই বা কেন পিছিয়ে থাকবেন। বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আজ যখন সে দিন অত্যাসন্ন তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিনা দ্বিধায় তাদের এগিয়ে আসা উচিত। পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান মুক্তিসূর্যের দীপ্ত আভাস ফুটে উঠছে। তাকে জীবন্তভাবে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার অনেকটা দায়িত্বই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর ন্যস্ত।

(গাজীউল হাসান রচিত)

# আমরা তাদের ভাতে মারবো

**১ অক্টোবর, ১৯৭১**

রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে দিয়ে জিন্না এভিন্যু হয়ে ফকিরাপুল আমার গন্তব্যস্থল। রেলওয়ে হাসপাতাল পেরিয়ে শ'দুয়েক ফুট যাওয়ার পরই রাস্তার ডান দিকের টেলিফোন ভবনের গোপন স্থানে মেশিনগানের ট্রিগারে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা কয়েকজন সৈনিক দৃষ্টিগোচর হবে। জানোয়ারের রুক্ষ হিংস্রতা নিয়ে তারা অদৃশ্য শত্রুর দিকে নিশানা করে রয়েছে। এ ছাড়াও টেলিফোন ভবনের চারদিকে প্রকাশ্য ও গোপন যায়গা থেকে প্রহরারত রয়েছে আরও শ'খানেক সৈনিক। দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারা সশস্ত্র। কিন্তু টেলিফোন ভবনের মূল ফটকে অস্ত্রের সমাবেশ বেশি চোখে পড়বে না। সেখানে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল হাতে কয়েকজন অবাঙালি মোহাজের রাজাকারকে দেখা যাবে। তাদের চোটপাট দেখার মতো। টেলিফোন ভবনে ঢুকতে প্রত্যেককেই তল্লাশী করা হয়। শার্টের কলার থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে নিষ্ঠার সাথে বোমা, অটোমেটিক সমরাস্ত্র, এসিডের বোতল রয়েছে কিনা পরখ করে দেখা হয়। এ টেলিফোন হাউজ তাদের রক্ষা করতেই হবে। কারণ এ ভবনের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হলে পশ্চিমের সাথে পূর্বের তার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা বিকল হলে একমাত্র ভরসা থাকবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অয়ারলেস সিস্টেম। আমি বাসা থেকে যে রিকশায় উঠেছিলাম তার চালকের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ দাড়ির অর্ধেকেরও বেশিতে সাদা ছাপ লেগেছে। রিকশায় উঠে বসার পরেই হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলতে পারেন সাহেব, এটা কার দেশ" আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। রিকশাওয়ালা বললেন, "এটা হারামজাদা বদমাশ পাঞ্জাবিদের দেশ, না মানুষের দেশ?" আমি চারদিকে তাকিয়ে আস্তে কথা বলতে অনুরোধ জানালাম। বুড়োর দু'চোখে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে। বুড়োর কাহিনী হলো : পাঁচদিন রিকশা চালিয়ে সঞ্চয় করেছিলেন তের টাকা। একটি ছোট্ট কাপড়ের থলেতে তার জীবনের নিঃশ্বাসের মতো মূল্যবান সঞ্চয়গুলো গোপন করে রেখেছিলেন। মালীবাগের কাছে মোড়ে এক পাঞ্জাবি বর্বর সৈন্যের লোভের লুটেরা হাত তার সে সঞ্চয় কেড়ে নিয়ে গেছে। বুড়ো বললো, "হারামজাদাটি আমার রিকশা থামিয়ে আমার কাছে টাকা চায়। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রথমেই রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। আমার মুখের দিকে তাকালে চোর-ডাকাতের মনেও দয়া হতো। কিন্তু তার মনে দয়া নেই। আবার রাইফেল উঠানোর পর থলে থেকে আমার সঞ্চয় তাকে দিয়ে দেই। বলতে পারেন সাহেব, আর কতদিন এ ভাবে চলবে? আল্লার গজব পড়বে না তাদের ওপর! আল্লা আর কত সহ্য করবে? হে খোদা, তাদের ওপর তোমার গজব নাজেল করো।" বুড়ো এরপর থেমে গিয়ে একমনে রিকশা চালাতে শুরু করলেন। এ তো শুধু বুড়োর অভিযোগ নয়। রাস্তা থেকে পথচারীদের হাতের ঘড়ি খুলে নেওয়া, পকেট হাতড়িয়ে টাকা-সিগারেট বের করে নেয়া তো সাধারণ ব্যাপার। একটি দেশের সেনাবাহিনী নয়, নিকৃষ্টতম লুটেরা, ছ্যাঁচড়া চোরেরা পর্যন্ত এ ধরনের লুটতরাজ করে না। সৈন্যদের দূর

থেকে আসতে দেখলেই হাতের ঘড়ি, চোখের গগলস খুলে পকেটে লুকিয়ে রাখা তো সাধারণ ঘটনা। দু-এক টাকার বেশি পকেটে নিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় না।

টেলিফোন ভবনের সামনে আসার পর দেখলাম একটি কিশোরের দেহ জনৈক রাজাকার তল্লাশী করছে। কিছু না পেয়ে পকেট থেকে কলম নিয়ে ক্যাপ খুলে নাকের সামনে তুলে তা পরীক্ষা করে দেখলো। উর্দুভাষী লোকজন এ অপমানজনক তল্লাশী ব্যবস্থা থেকে রেহাই পাচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো তারাই। তারাই মালিক-মোখতার।

এ টেলিফোন ভবনের অভ্যন্তরে ২৫শে মার্চ রাত বারটায় এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে। রাত বারটা বাজার কয়েক মিনিট আগে হিংস্র হায়েনার ক্ষিপ্রতা নিয়ে একদল রক্তলোলুপ এ্যালসেশিয়ান টেলিফোন ভবনের কন্ট্রোল রুমে ঢুকে পড়ে। কন্ট্রোল রুমে কয়েকজন বাঙালির ডিউটি ছিল। বাইরের হত্যাকাণ্ডের খবর সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন রাতেও তারা ডিউটি করছিল। আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক যা করার সে কাজই করছিল। হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে রক্তখেকো কুকুরগুলো সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই মনে করে কয়েকজন কর্মী কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রপাতি চোখের পলকে যতদূর সম্ভব বিনষ্ট করে দেয়।

এর ফলেই ঢাকা শহরের সব বেসামরিক টেলিফোন ২২ দিনের মতো অকেজো ছিল।

হঠাৎ কি মনে করে গুলিস্তান এলাকায় রিকশা ছেড়ে দেই। দিনের বেলাও চারদিকে থমথমে ভাব। এখানে কয়েকটি পশ্চিম পাকিস্তানি রেডিমেড শার্ট বিক্রির দোকান রয়েছে। দু-একটা দোকান ঘুরে দেখলাম। মালিক মুখে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। বিক্রি নেই। একজন দোকানদারের সাথে পরিচয় ছিল। তাই কণ্ঠে সহানুভূতির রেশ নিয়ে বেচাকেনার খবর জিজ্ঞেস করলাম। উর্দু ভাষা ব্যবহার করলাম। কারণ উর্দুভাষী দোকানদারদের সাথে বাঙালির বাংলা ভাষায় কথা বলাও প্রায় দেশদ্রোহিতার শামিল। কোনও অবস্থাতেই অধিকৃত এলাকায় বাঙালিত্ব প্রকাশ পায় এমন কিছু করা হারাম। প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে।

'বেচাকেনা কেমন চলছে' প্রশ্নের উত্তরে দোকানদার যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে—কোনও বাঙালি পাকিস্তানি কাপড় কেনে না, আর অবাঙালিরাও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অর্থ ব্যয় করতে চাচ্ছে না।

এরপর গেলাম বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়ামের একটি শাড়ির দোকানে। দোকানদার বললে, তাঁতের শাড়ি কিছু বিক্রি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাড়ি সারা দিনে একটিও বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ।

দখলীকৃত এলাকার আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোটি কোটি বাঙালি ইয়াহিয়াশাহীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের এমনি প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছেন। এমনভাবে কোটি বাঙালি জনতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান 'আমরা তাদের ভাতে মারবো' বাণীকে বাস্তবায়িত করছেন।

('ইলিয়াস আহমদ' ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

# যুদ্ধই একমাত্র পথ

**১৫ অক্টোবর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন তারা শত্রুর সঙ্গে লড়ছে। পাঞ্জা। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একই সঙ্গে বাঙালিরা ইতিহাসের এ-সত্যও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কোনও স্বাধীনতাই অল্প কয়েকদিনের যুদ্ধে অর্জন করা যায় না। কোনও দেশে কোনো কালে তা সম্ভব হয় নি। সুতরাং আমাদের আবেগ যতই তীব্র হোক না কেন, সত্যকে, অভিজ্ঞতাকে, বাস্তবকে, যুক্তিকে অস্বীকার করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে আমরা প্রচণ্ড আবেগে বার বার মনে করেছি দু-একদিনের মধ্যেই আমরা হানাদার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারবো, কিন্তু এখন আমরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, যুদ্ধের বাস্তব কলাকৌশল শিখেছি, এখন আমরা যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছি—তাই আমরা জানি, যুদ্ধ শুধু আবেগের ব্যাপার নয়, যুদ্ধ যুক্তির ব্যাপার, পরিশ্রমের ব্যাপার, বুদ্ধির ব্যাপার, জীবন উৎসর্গ করার ব্যাপার। শুধু আবেগ থাকলেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। কারণ তাহলে এতদিনের বাংলাদেশে হানাদারদের অস্তিত্ব থাকতো না। যুদ্ধ শুধু অস্ত্রেরও ব্যাপার নয়, কারণ তাহলে এতদিনের মধ্যে হানাদাররা নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করে দিতে পারতো, আমাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে তারা এতো দিশেহারা হয়ে পড়তো না। যুদ্ধজয়ের জন্য পারিপার্শ্বিকতার সাহায্য লাগে। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মাটির সমর্থন, যে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মানুষের সমর্থন—এ দুটোই হানাদারদের বিরুদ্ধে, আর এ দুটোই আমাদের পক্ষে। কিছু পিছনের তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো যে, যুদ্ধ করার জন্য আমরা কোনও প্রস্তুতি নেইনি। আমরা ধারণা করেছিলাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের পাওনা আদায় হবে। দেশের লোক বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দিয়েছিল। শেখ মুজিব আশা করেছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশবাসী সেই আশাই করেছিল। দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি যে, ধীরে ধীরে তারা এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে যাচ্ছে। সে কথা বুঝতে পারলে আমরাই সর্বপ্রথম তাদের ওপর আঘাত হানতে পারতাম। সমস্ত পরিস্থিতিই আমাদের অনুকূলে ছিল। বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ও বাঙালি সৈন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেখ মুজিব সেনানিবাসে আবদ্ধ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ, যশোরের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ, রংপুর-রাজশাহীর পরিস্থিতি ও যুদ্ধ এবং সিলেটের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ যাঁরা দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারকারীদের ধ্বংস করার জন্য কেবল প্রয়োজন ছিল পূর্বপ্রস্তুতির। উপযুক্ত প্রস্তুতির নাম অর্ধেক যুদ্ধজয়। চট্টগ্রামের সেনানিবাস থেকে ২৫শে মার্চের আগেই শত শত বাঙালি সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেয়া হয়, বহু বাঙালি সৈন্যের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া

হয়। অথচ সে পথ বন্ধ করতে পারলে, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে দূরপাল্লার কামান বসাতে পারলে ও বিমানবন্দর দখল বা অকেজো করে দিতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু আমরা কেন তা করিনি? কেন আমরা হানাদারদের তৈরি হওয়ার সুযোগ দিলাম? কেন আমরা অসহায়ের মতো তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলাম? এর তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের মতোই আশা করেছিল আলোচনাই একমাত্র পথ।

আমাদের সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক শাসকবৃন্দ এবং সামন্তপ্রভু ও বড় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে শোষণ করা বন্ধ করতে পারে না। ছয়-দফা বাস্তবায়িত হলে শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যেতো। শেখ মুজিব বার বার চেয়েছিলেন যে-কোনও প্রকারে হোক বাংলাদেশকে আর শোষণ করতে দেবো না, বাংলাদেশকে শোষণ করার পথ বন্ধ করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের ভক্ত শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব যেমন বলেছিলেন 'কিসের গোলটেবিল, কার সঙ্গে গোলটেবিল', আজ দেশের সাধারণ মানুষও বলছে 'কার সঙ্গে গণতন্ত্র?' পশ্চিম পাকিস্তানি কুচক্রীদের সঙ্গে কি গণতন্ত্রের পথে মিত্রতা করা যায়? তাদের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যুদ্ধ। যারা হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছেন সেই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, শত্রুর সঙ্গে কোনোরকম আপোস করা চলে না। বিশ্বাস করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শত্রুর বিনাশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা তাই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পেরেছি যে, তাঁরা সবাই দুটি সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এক : শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকাই বলেছেন, প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হানাদাররা ৩ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোঝা যায়। আধুনিক অস্ত্র যেমন এদের রয়েছে তেমনি মনের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙালি-বিরোধী। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বাঙালিরা ছোট জাত, তারা শাসিত হতেই জন্মেছে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। সাধারণ সৈনিকদের এই মজ্জাগত ধারণার জন্যই তারা দুঃসাহসী হয়ে 'ইয়া আলী' ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ও এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং আমাদের সাহসী বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার পাক-সেনা খতম হয়েছে, পাক-সেনাদের মনোবলও ভেঙে পড়েছে, তবু জয় নিশ্চিত জেনেও শত্রুকে খাটো করে দেখা চলে না। দুই : শত্রু কোনোদিনই অপরাজেয় নয়। কারণ শত্রু রয়েছে অন্যায়ের পক্ষে, অসত্যের পক্ষে, সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। আমরা রয়েছি সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ কোনোদিনই পাক-সেনাদের অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন জানাবে না। কিছু দালাল যা গজিয়েছে তা নতুন কিছু নয়। কারণ ফ্রান্সের মতো দেশেও হিটলার মার্শাল পেঁতার মতো বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। সুতরাং দালাল নতুন কোনও ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দালালরা আসলে সুবিধাবাদী। হাওয়া

ঘুরেছে বুঝতে পারলেই তারা তাদের ভোল পাল্টে ফেলবে। সুতরাং বিদেশে দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থনশূন্য পাক-সেনারা চরমভাবে পরাজিত হবেই। আঘাতের পর আঘাত হানলে পাহাড়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাসের শিক্ষাই তাই। সুতরাং আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে।

আজ যারা যুদ্ধ করছে তারা কি কোনোদিন যুদ্ধ করেছিল? তাদের কি যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল? তাদের হাতে কি আগের থেকেই অস্ত্র ছিল? এর উত্তর হচ্ছে—না। কিন্তু তবু কেমন করে যুদ্ধ চলছে, কেমন করে অস্ত্র এল? এর উত্তর হচ্ছে—যুদ্ধ করতে চাইলে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে চাইলে অস্ত্র এসে যায়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও হয়, যুদ্ধ জয়ও হয়। আলজিরিয়া তার প্রমাণ, ভিয়েতনাম তার প্রমাণ। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইচ্ছাটাই বড় কথা।

আমাদের যোদ্ধারা, যুবকেরা বার বার বলেছেন যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিচার করছেন, সে ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনও আকর্ষণ নেই। তাঁরা বলছেন, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যাচ্ছি। আমাদের নেতারাও সেই কথা বলছেন। কারণ, তাছাড়া বাংলাদেশের শোষণ বন্ধ হওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ শোষিত হয়েছে। তাদেরকে শোষণমুক্ত করতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। শেখ মুজিব শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার একমাত্র নাম যুদ্ধ। আমাদের যুবকরা প্রাণ দিয়ে শোষণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে আজ বদ্ধপরিকর। দেশের মানুষ চায় বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশে থাকবে, আমরা সবাই সেই টাকা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো। কেউ যেন বলতে না পারে, আমি আমরা ভাগ পাইনি, আমি ব্যথিত, আমি শোষিত। সুতরাং সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে, আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে যারা আমাদের সাহায্য করবে তারাই আমাদের বন্ধু ॥

('জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

# কয়েকটি ছবি—একটি ইতিহাস

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

—কি ভাই, কি দেখছেন? ও, ছবিগুলো? আচ্ছা দেখুন। একের পর এক ছবিগুলো দেখে যাচ্ছিলাম আমি।

প্রথম ছবিটি একটা তুলসী গাছের। অবশ্য এতে দেখার কিছু নেই। শুধু উপলব্ধির। ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৩ই এপ্রিল। ময়মনসিংহ শহরের কোনও এক হিন্দুপাড়া থেকে। ক্ষতবিক্ষত একটি দোতলা দালানের পাশে দেখা যাচ্ছে গাছটি, বোবার মতো দাঁড়িয়ে। বাড়িতে কোনও লোকজন নেই। হয়তো তাদের সবাই প্রাণ হারিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের মেশিনগানের গুলিতে। অথবা সবাই প্রাণভয়ে পালিয়েছে, ওপার বাংলায় শরণার্থী হয়ে। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ আর মাথা নিচু করে, নতজানু হয়ে পূজা দেবে না সকাল-সাঁঝে—তুলসী তলায় বসে প্রার্থনা জানাবে না হরি-মাধবের কাছে আর কোনওদিন।

দ্বিতীয় ছবিটি কোনও এক নবদম্পতির—মুখোমুখি অবস্থায়। তবে জীবিত নয়, মৃত। হাতে মেহেদীর কাঁচা রং। তরুণের মুখটা থ্যাবড়া হয়ে গেছে— চেনার জো নেই। তরুণীর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে—টকটকে লাল রক্তিম কলজেটা দেখা যায় শুধু। এদের বিয়ে হয়েছিল ২৪শে মার্চ আর ছবিটি তোলা হয়েছিল ২৬শে মার্চ—ঢাকা মিটফোর্ড থেকে। ২৫শে মার্চ। গভীর রাতের নির্জন নিস্তব্ধতায় এ নবদম্পতির মাঝে ছিল এক মধুময় পরিবেশ। কিন্তু অকস্মাৎ গর্জে উঠলো পশ্চিমা বর্বর সেনাদের কামান। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা। চিরদিনের মতো নিঃশেষ হলো ওদের পরস্পরের সকল চাওয়া-পাওয়া।

তৃতীয় ছবিতে বুড়ীগঙ্গার সীমাহীন জলরাশি। একটি বৃদ্ধ সাঁতরে যাচ্ছেন প্রাণপণে। কিন্তু জানা নেই কোথায় যাবে, কখন যাবে বা আদৌ কোথাও গিয়ে উঠতে পারবে কিনা। ছবিটি ২৯শে মার্চ সকালে তোলা। হয়তো এ বৃদ্ধ ছিল রাজধানীর কোনো এক ঝাড়ুদার, সরকারি অফিসের পিয়ন, নিম্নবেতনভুক্ কর্মচারী—নতুবা ছিল বড়দরের সরকারি অফিসার কিম্বা কারখানার মালিক। ইয়াহিয়ার জঙ্গী সেনাদের বেয়নেট ও বুলেট থেকে কোনোমতে রক্ষা পেয়ে অতি সন্তর্পণে পালাচ্ছেন শহর ছেড়ে, তার সর্বস্ব ত্যাগ করে। হয়তো চলে যাচ্ছেন কোনও এক দূর পল্লীতে, অথবা অতি কষ্টে দেশ ছেড়ে বিদেশে। যেখানে আর দেখা যাবে না পশ্চিমা জল্লাদ বাহিনীর চেহারা—শোনা যাবে না সন্তানহারা জননীর বিলাপ অথবা বেয়নেট উঁচিয়ে আসবে না কেউ হৃদপিণ্ডটি বিঁধে ফেলতে।

এটি চতুর্থ ছবি। তোলা হয়েছিল ২৭শে এপ্রিল ভৈরবের পুলের উপর থেকে। ছবিতে অসংখ্য মরা লাশ—ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোতে। কে জানে কতদিন এরা নদীতে ভেসে চলেছে এমনি করে। ফুলে ওঠা বীভৎস দেহ ওদের। কতকগুলো কাক-শকুন বসে আছে এদের উপর।

এরপরের ছবিটি তোলা হয়েছিল কুমিল্লা শহরে। ৪ঠা মে সকালে। ছবিটির একপাশে দেখা যাচ্ছে একদল লোক লুট করছে দোকানের মাল। অপর পাশে খাকী

পোশাক পরা একজন লোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে : ঠিক এর পরের ছবিতেও এরাই। ব্যতিক্রম শুধু এ্যাকশনে। কারণ এটিতে লুটেরার দল 'হ্যাণ্ডস-আপ' হয়ে একলাইনে দাঁড়িয়ে। আর সেই ক্যামেরাম্যান স্টেনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে তখনও অপেক্ষমান। হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রিগারে চাপ পড়বে। কড়-কড় করে উঠবে স্টেনগান। অসহনীয় যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে থাকবে লুটেরার দল। এর পরের দৃশ্যে হয়তোবা এরা পড়ে থাকবে অবাঞ্ছিত আবর্জনার মতো কপালে হাতে রেখে। ওদের প্রাণবায়ু তখন অনন্ত অসীমের সন্ধানে উর্ধ্বগামী।

এবারের ছবিতে ছনের ছাউনি দেয়া একটা ঘর। দুটো কুকুর মুখোমুখী বসে। মনের সুখে লেজ নাড়ছে ওরা। আর একটি ছাগল ওদিকে তাকিয়ে হা করে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্! এ ঘরটা তৈরি না হলে বেচারা ছাগল আর এ কুকুর দুটো ভর দুপুরের এ কাঠফাটা রোদে কি মুসকিলেই না পড়তো! ছবিটি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি পাক জঙ্গীশাহীর কোনও এক অভ্যর্থনা শিবিরের সম্মুখভাগ থেকে নেয়া। কিছুদিন আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এ অভ্যর্থনা শিবির। শত্রু-কবলিত ঢাকা বেতার অহরহ মিনতির ফাঁদ পেতে চাইছিল শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এতোই দুর্ভাগ্য যে, কেউ গেল না পাক-জঙ্গীশাহীর অভ্যর্থনা কুড়াতে, এতো সাধের শিবিরে এক রাত ঘুমাতে, বিষ মেশানো তাদের দুধ-কলা খেতে।

এ ছবিতে একদল তরুণ রাইফেল হাতে ট্রেনিং নিচ্ছে। চেহারায় তাদের দারুণ জিজ্ঞাসার ভাব। চোখে সংগ্রামের সীমাহীন দীপ্তি। হয়তো এরাই হবে বাঙালি মুক্তিবাহিনী। উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে আক্রমণ চালাবে গেরিলা কায়দায়, নতুবা অবতীর্ণ হবে সম্মুখসমরে। আজ হোক বা কাল হোক বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করবেই এরা। মায়ের বুকে ফিরে আসবে সান্ত্বনা—প্রিয়ার মুখে হাসি। ছবিটি তোলা হয়েছিল বাংলাদেশের কোনও এক মুক্ত এলাকা থেকে।

এর পরের ছবিতে পাক-তস্করদের ২০টি শবদেহ পড়ে আছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে। বঙ্গ শার্দূল মুক্তিসেনাদেরই এ কাজ। হয়তোবা এদের কোনও এক গেরিলা ইউনিট লুকিয়ে ছিল ঝোপের আড়ালে, টহলদার পাক-সেনাদের গতিবিধি লক্ষ করে আক্রমণ চালিয়েছিল ওরা। শত্রুকে সম্পূর্ণ খতম করে ওদের অস্ত্র-গোলাবারুদ দখল করে নিয়ে নিমিষেই উধাও হয়ে গিয়েছিল ওরা। আর পাক-সেনারা পড়ে রইলো বাংলার কুকুর-শেয়ালের খাবার হিসেবে। ছবিটি তোলা হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনের কসবা এলাকা থেকে।

ছবিগুলো দেখা হলে চলে এলাম আমি। পথে এক পা দু'পা করে হাঁটছিলাম, আর ভাবছিলাম শুধু ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, সে অনেক কথা! হয়তো বন্ধুটি ক্যাপশন লিখবে ছবিগুলোর। এরপর তার এ্যালবামে সাজিয়ে রাখবে একে একে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে। এরপর চলে যাবে এক বছর, দু'বছর—দশ বছর, বিশ বছর বা আরও কয়েক বছর। কিন্তু ছবিগুলো? এগুলো ঠিকই থেকে যাবে এ্যালবামে। এরপর হঠাৎ একদিন এ্যালবামটা পড়বে বন্ধুটির কোনও এক ভবিষ্যৎ বংশধরের হাতে। সে ছবিগুলো দেখে যাবে, তা থেকে শিক্ষা নেবে—তবে ঠিক ছবি হিসেবে নয়, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে।

(জাহাঙ্গীর আলম রচিত)

# মুক্তি সংগ্রামে মায়ের প্রেরণা

৪ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলেই মায়েদের সভা ডাকা হয়েছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলছিল সভার কাজ। একে একে সবাই বিদায় নিয়ে গেলেন। সারাদিনের খাটুনিতে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। টেবিলের উপর মাথাটা রেখে চোখ বুজেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি আনুর মা ভাবী এসে দাঁড়িয়েছেন আমার টেবিলের কাছে।

আমাকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে দেখে বললেন, "মাথাটা ধইরছে বুঝি, টিইপ্যা দিমু!" হেসে বল্লাম, "না, তেমন কিছু না, ও এমনি সেরে যাবে।" "না না সরম কইর না, খাডনী পইড়ছে ধরব না ক্যান!" আনুর মা ভাবী সত্যি সত্যি হাত লাগাতে আসছে দেখে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বললাম, "তেমন কিছু মাথা ধরেনি। সভা শেষ হবার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। যাক্ ওসব। আচ্ছা ভাবী সভা তো হলো। সবাইকে বললাম এবং সবাই স্বীকার করলেন প্রত্যেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের জন্য কাপড়, জামা কাঁথা সেলাই করে দেবেন। সত্যি, হবে তো?" "অইব না মানে? আইজ থাইক্যা হগলে লাইগ্যা যাইব। মুক্তিবাহিনীর ছাওয়ালগুলা আমাগো ছাওয়াল না? ছাওয়ালগো বাঁচান আমাগো ফরজ না?" একটা গর্বিত দীপ্তিতে আনুর মা ভাবীর মুখখানি ঝলমল করে উঠল। মাতৃত্ব ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে। বিস্মিত হলাম এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলার তেজস্বিতায়, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদে। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ভাবি, আনুর কোনো সংবাদ পেয়েছ?" আনোয়ার ওরফে আনু ভাবীর একমাত্র ছেলে। আর একটি ছেলে ছিল, নাম হাবিব। কারখানায় কাজ করতো। এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে দু'বছর আগে। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে, যার যার স্বামীর বাড়িতে থাকে। আনুই ছিল ভাবীর কাছে। বোশেখের শেষের দিকে বিয়ে ঠিক হয়েছিল একটা লক্ষ্মী মেয়ের সাথে। সে বিয়ে আর হতে পারেনি। এরই মধ্যে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বাংলাদেশের উপর চালিয়েছে নারকীয় আক্রমণ। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে সারাটা দেশ। যে মেয়েটির সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে খুনী পাকসেনা। মেয়েটির কোনও হদিস নেই। আনু তার মাকে নিয়ে চলে এসেছে মুক্তাঞ্চলে, তার মামার বাড়িতে। এখানে এসে আনু শুধু ছট্‌ফট্ করতো আর বলতো, "মা, আমাকেও কিছু করতে হবে।"

ভাবী প্রথমে ভয় পেতেন, আনুকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন—"আমাকে দেখাই তোর এখন ফরজ কাম।" আনুও বেশিকিছু কথা বাড়াতো না।

একদিন আনু ফিরলো বিকেলে। মুখখানা থমথম করছে। মাকে ডেকে বললো, "শুনছ মা, রিজিয়াকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে।" রিজিয়া মেয়েটির সাথেই তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

আনুর মা ভাবী আফসোস করেছিল সংবাদটি শুনে কিন্তু তার জন্যে আরও কিছু অপেক্ষা করছিল। আনুই বললো, "মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে যাবো। রিজিয়াকে উদ্ধার করবো।"

আনু মুক্তিবাহিনীতে যাবে শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন আনুর মা ভাবী। বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, "রিজিয়াকে উদ্ধার কইরা কি কইরবি?"

"বিয়ে করবো, তার দোষ কি মা? আমারই সাথে তার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। আমারই তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল। আমি পারিনি। আমারই দোষ। ও যদি বেঁচে থাকে আর ওকে যদি উদ্ধার করতে পারি তবে আমি ওকেই ঘরের বউ করে আনব।" আনু লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলে ফেলে কথাটি। আনুর মা ভাবী আনুর কথার জবাব দিতে পারেন নি। ঠিকই তো। রিজিয়ার দোষ কি? আজ যদি তার দুই মেয়ের এই অবস্থা হতো? ছেলের কথায় রাগ হয় না। তার—গর্বই হয়। এর কয়েকদিন পরে আনু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এখন সে আছে পূর্ব রণাঙ্গনে। তারই কুশল জিজ্ঞাসা করলাম ভাবীকে।

"তার লাইগ্যাই ফিরা আইলাম। এইহানে আইবার আগে একখানা চিডি আইছে। তোমার কাছে পইড়া শুনম বইলা লইয়া আইছি। তোমাগো কথা শুইনতে শুইনতে ভুইলা গেছলাম। মনে হইতে ফিরা আইছি।"

আনুর মা ভাবী তার জামার বুকের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করলেন। আটদিন আগেকার লেখা চিঠি। আনু লিখেছে :

মা,

কয়েকদিন তোমাকে কোনও খবর দিতে পারিনি। কারণ আমাদের দুটো লড়াই লড়তে হয়েছে। মা, তোমার দোয়ায় দুটো লড়াইতেই আমরা জিতেছি। হানাদার পাকসেনাদের আমরা মেরে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়ে দুটো ঘাঁটি দখল করেছি। দুটো লড়াইয়ে আমরা ৮১জন পাকসেনাকে মেরেছি। তোমার দোয়ায় আমাদের কারো গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। জান মা, লড়াইতে যাওয়ার আগে আমি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুঁজে তোমার মুখটা স্মরণ করতাম, আর আমার দেহে শক্তির বান ডাকতো। কেন এমন হয় মা? আমার মনে হয় মায়েরাই সকল শক্তির উৎস। তাইতো আমরা দেশকে মা বলে ডাকি, বলি দেশমাতা। আর একটি খবর বলি মা, একটা ঘাঁটি থেকে আমরা ১৩ জন মেয়েকে উদ্ধার করেছি। বর্বর দস্যুরা ওদের উলঙ্গ করে আটকে রেখে ওদের ওপর বর্বর পাশবিক অত্যাচার করতো। সবগুলো মেয়েই রেজিয়ার বয়সী। উদ্ধার করার পর কি কান্না ওদের! দুইজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আমিই ওদের বাঁচিয়েছি। জানো মা, ও দুজনের কাছে রিজিয়ার গল্প বলেছি, বলেছি—রিজিয়াকে উদ্ধার করতে পারলে আমি ওকে বিয়ে করবো, সম্মান দেবো। ওরা তাতে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছে। আমাকে ওরা ভাই ডাকে। ওরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমাদের হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করে।

মা, আমার দেশকে যাঁরা ধ্বংস করেছে তাদেরে আমরা ধ্বংস করবো। আমরা পশুদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। তুমি দোয়া করো মা। আমরা জিতবো, নিশ্চয়ই জিতবো। তারপর একদিন তোমার কোলে মাথা রেখে খুউব করে ঘুমাবো।

ইতি—

তোমার আনু।

পড়া শেষ হলো। আনুর মা ভাবীর চোখ থেকে টস টস করে জল পড়ছে।

"কেঁদো না ভাবী, আনু নিশ্চয়ই ফিরবে। মন খারাপ করো না।" আনুর মা ভাবীকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম।

"মন খারাপ না। খুশি লাইগতাছে। আনু আমাগো দেশের লাইগ্যা লড়তাছে। এর থাইক্যা খুশির আর কী অইতে পারে! কারবালায় কাশেমের মাথায় কাশেমের মা যুদ্ধে যাওনের আগে পাগড়ি বাইন্ধ্যা দিছিলো। আমিও তারে নিজের হাতে কাপড় পরাইয়া দিছি। আনু আমার কাশেম।" চোখের জল মুছে ফেলে আনুর মা ভাবী হাসলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি। ...

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত।)

# মুক্তি সংগ্রাম ও বঙ্গ বীরাঙ্গনা

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

নারী জাতির ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন—

যুগে যুগে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী ॥

আজকে যখন বাংলাদেশের এক অন্ধকারময় দুর্দিনে পশ্চিমা পশুদের বিতাড়নের জন্য দিকে দিকে আমাদের সংগ্রামী যুবকগণ জীবনকে তুচ্ছ করে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তখন বাংলাদেশের মা-বোনেরাও এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পশ্চিম পাকের বর্বর পশুগুলো বাংলাদেশের মা-বোনের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছে মানবতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের মা-বোনেরা এই অবমাননার কথা কোনোদিন ভুলতে পারেন না। তাঁরা দেখেছেন তাঁদের সামনেই সন্তানদের কিরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—তাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্বামীর করুণ মৃত্যু, স্বজনদের রক্তাক্ত নিধন। আর দেখেছেন অসংখ্য মা এবং কন্যার ওপর বর্বরতম পাশবিক অত্যাচার। আজও বোধ করি কয়েক হাজার মা-বোন পশুসৈন্যদের শিবিরে শিবিরে ছাউনিতে ছাউনিতে গ্লানিকর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই করুণ বেদনার কথা ভুলি নাই, ভুলতে পারি নাই। তাই বাংলাদেশের মা-বোনেরাও আজ সংগ্রামের পথকেই বেছে নিয়েছেন।

নারীর স্থান যে শুধু ঘরে নয়, বাইরের জগতেও যে তার সমাজকল্যাণমূলক এবং দেশসেবার প্রচুর কাজ আছে, বাংলাদেশের জাগ্রত নারী সমাজ তা প্রমাণ করেছেন। আজকের মুক্তিসংগ্রামেও বাংলাদেশের ললনাগণ সেই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমরা জানি, আমাদের কোনও কোনও রণাঙ্গনে অনেক উৎসাহী ছাত্রী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে পাক-সেনাদের খতমের কাজে তাঁদের সংগ্রামী ভাইদের সাহায্য করছেন। কিন্তু নারীর পক্ষে শুধু অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করাই আধুনিক যুদ্ধের বড় কথা নয়—নারীর পক্ষে আহত সৈনিকদের সেবার মাধ্যমে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করাও একটি বড় এবং মহান কাজ। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের বহু সক্ষম ছাত্রী ও মহিলা আজ এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের সেবায় আমাদের বহু সংগ্রামী বাঙালি উপকৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় মেয়েদের জীবন যে কত সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সেকথা ভেবে আমরা বেদনায় অস্থির হই। সেখানে খাদ্যাভাব, অর্থাভাব এবং চিকিৎসার নিদারুণ অভাব ছাড়াও রয়েছে নিরাপত্তার অভাব। দখলীকৃত এলাকায় যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও স্থানে পশ্চিম পাকের পশুসেনারা অথবা রাজাকার বাহিনীর গুণ্ডারা যে-কোনও মেয়েকে তাদের পাশবিক আনন্দের শিকারে পরিণত করতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, দখলীকৃত এলাকায় এই সংকটের মুখে বাস করেও আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। দখলীকৃত এলাকার যে গ্রামে মুক্তিবাহিনীরা বীর সেনানীর আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই গ্রামের মেয়েরা

দল বেঁধে তাঁদের জন্য রুটি প্রস্তুত করতে বসেন, ভাত রান্না করেন এবং পরম উৎসাহ সহকারে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, গ্রামের মেয়েরা মুক্তিবাহিনীর সেনানীদের জন্য খাবার তৈরি করে যে কি এক গভীর তৃপ্তি অনুভব করে তার সীমা নেই। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি গ্রাম ও শহরের সর্বত্র দখলীকৃত বাংলাদেশের মেয়েরা কি অসীম প্রতীক্ষায় দিন গুণছে—কখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে বিজয়ের দিন আসবে আর বাংলাদেশ এই পশুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে। এই আন্তরিক শুভেচ্ছার মূল্য যুদ্ধের দিনে কম নয়। আমরা মনে করি, মহিলারা মুক্তিবাহিনীর সেনানীদের খাবার প্রস্তুত করে, তাদের উৎসাহ প্রদান করে যেভাবে সাহায্য করছে তারও অপর নাম সংগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মহিলা সমাজও তাই কৃতিত্বের দাবীদার।

কিন্তু বাংলাদেশের মহিলারা কৃতিত্ব চান না—পার্থিব কোনও কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশের মহিলারা কাজ করেন না। সন্তানের মুখে, ভাইয়ের মুখে, স্বামীর মুখে, পিতার মুখে তাঁরা যদি দেখতে পান অমলিন হাসি, তবে সব কষ্ট, সব ত্যাগকে তাঁরা সার্থক মনে করেন। দেশজোড়া এই হাসিমুখ যদি তাঁরা দেখতে পান তবে তাই হবে তাঁদের সবচেয়ে বড় পাওয়া, সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

আরো একটি উপায়ে বাংলাদেশের মহিলারা এই সংগ্রামে সাহায্য করতে চলেছেন। মায়েরা সন্তানকে, বোনেরা ভাইকে এবং স্ত্রীরা স্বামীকে বার বার তাগিদ দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রেরণ করছেন। রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে এমনি একজন মহিয়সী মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির বয়স বাইশ বছর। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। ছেলেটির পিতা যদিও দেশপ্রেমিক—তবুও একমাত্র ছেলের প্রতি অসীম দুর্বলতা। বস্তুত তিনি ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু মা বলেছেন, না—আজ যখন মা-বোনের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করেছে পাক-সেনারা তখন আমার ছেলেকেই সেই ইজ্জত রক্ষার্থে প্রথম যুদ্ধে যেতে হবে।

ছেলেটিকে হাসিমুখে তিনি যুদ্ধে পাঠিয়ে এখন পবিত্র প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। তাঁর ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আবার তাঁর কোলে ফিরে যাবে। তাঁর মনে দুঃখ নেই, কোনও সংশয় নেই। সেই মহীয়সী মায়ের কথা মনে পড়ে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ এমনি মায়ের পবিত্র মুখ আমরা দেখতে পাব। সেই মুখগুলো শুধু পবিত্র নয়—যেন বঙ্গজননীর মুখচ্ছবির মতোই সে মুখগুলো সোনালী অরুণাভায় সমুজ্জ্বল। আর তাঁদের সেই সংগ্রামের মূল্যও আমাদের মুক্তিসংগ্রামে অপরিসীম মূল্যে স্বাক্ষরিত।

(নূরজাহান মযহার রচিত)

# বাংলার মুখ

**২২ নভেম্বর, ১৯৭১**

হেমন্তের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে এল। আমরা এখানে এসে পৌঁছুনোর অপেক্ষাতেই যেন সে বসেছিল। এসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ত্বরা পড়ে গেল। আমার চার পাশে, সমুখের ওই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর আর ওই দূরের গ্রামগুলোর কোল ঘেঁসে ঘেঁসে নীল নীল ধোঁয়ার মতো কুয়াশারা জমে উঠেছে। চাপা কান্নায় ভেজা দৃষ্টির মতো হালকা কুয়াশারা জমে উঠেছে ঢাকার উপকণ্ঠের এই বনানীর প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

একটু আগেই আমরা এই ছোট্ট উপবনটিতে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু জিনিসপত্র রয়েছে—কিছু অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটা হালকা মর্টার, কিছু বিস্ফোরক, গোলাবারুদ ও তিনটি হালকা মেশিনগান। এ সবই আমরা পেয়েছিলাম শালদা নদীর তীরে পাকিস্তানি-সৈন্যদের বেলুচ রেজিমেন্টের ১০৩ ব্রিগেডের একটা কোম্পানির সঙ্গে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ের পর। এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের ১৪৩ জন নিহত হয়েছিল। আর আমাদের পক্ষে একজন বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনজন আহত হয়েছেন। শালদা নদীর তীরের এই লড়াইকে আমরা আমাদের কোনও বড়রকম বিজয় বলে মনে করি না। কারণ এ লড়াইয়ে আমাদের একজন মুক্তিসেনারও আহত হওয়ার কথা ছিল না। এই লড়াইয়ে আমাদের গেরিলা বাহিনীর যে ইউনিটটি অংশগ্রহণ করেছিল তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত, অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। আমাদের আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনাটিও ছিল নিখুঁত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য নিহত হবার কথা ছিল। কিন্তু ওদের কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ গরম আলোচনা হয়েছে, আমাদের সামান্যতম ভুলত্রুটি ও শিথিলতার কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, আমরা পাঁচজন মুক্তিসেনা সঙ্গে করে যেসব অস্ত্রশস্ত্র এনেছি ওজনে বেশ ভারী ছিল। আমাদের এক-একজনের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। এগুলো পিঠে-কাঁধে ঝুলিয়ে একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা আমাদের হাঁটতে হয়েছে। হাঁটতে হয়েছে নদীতীরের বালুকারাশির ওপর দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে জলাভূমি ভেঙে ভেঙে। আবার কখনো হেঁটেছি ছবির মতন শান্তস্নিগ্ধ ছোট ছোট সব গ্রাম আর ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পিঠ আর কাঁধের বোঝা নামিয়ে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হাতিয়ারটা নিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা একটা ঝোপের পাশে এসে বসলাম। সঙ্গীরাও আমার পথ অনুসরণ করলো।

এই উপবনটিতে এসে পৌঁছুনোর পরমুহূর্ত থেকেই একটা পাখির ডাকের জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বাংলাদেশের এমনি সব বন-উপবন মুখর করা একটি অত্যন্ত পরিচিত পাখির ডাক।

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বেশিক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হলো না। কয়েক মিনিট পরেই শুনতে পেলাম আমাদের সেই আকাংক্ষিত পাখির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচজন

সঙ্গীর একজনের কণ্ঠে সে ডাক প্রতিধ্বনিত হলো। একটু পরেই দেখতে পেলাম তিনজন শীর্ণকায় লোক। গ্রামের সাধারণ ক্ষেতমজুর ছাড়া তাদের আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়। এদের আগে কখনও দেখিনি। এরা তিনজনই ভয়ংকরভাবে রোগা। এদের বুকের পাঁজরের হাড়গুলো মাঠের বা গ্রামের খাল-নালার ওপরকার বাঁশের সাঁকোর মতো উঁচু উঁচু। এরা তিনজনেই আমাদের গেরিলা বাহিনীর অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক। আগে ইপিআর প্যারামিলিটারি গ্রুপে কাজ করতেন। তাদের সঙ্গে আমরা অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিলাম। আজ রাতেই এই এলাকা আমরা ছেড়ে যাবো। যাবো—ঢাকা শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, শত্রুবাহিনীর চেকপোস্টগুলোর কাছাকাছি। ওই তিনজনের সঙ্গে কথাবার্তার পর বুঝলাম এ স্থান ত্যাগ করতে আরও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের এগোতে হবে এবং তাও ওদের সিগন্যাল পেলে তবেই। সুতরাং হাতে আমাদের অঢেল সময়। ওরা আমাদের জন্যে কিছু খাবার এনেছিলেন— ঢেঁকিভাঙ্গা চালের আটার রুটি আর হাঁসের মাংস। পাশের গ্রামের এক গৃহস্থ পরিবার আমাদের জন্যে এই খাবার পাঠিয়েছে।

হাঁসের মাংসের হালকা একটা গন্ধ পেলাম।—বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো।—বুকের অনেক গভীরে একটা বেদনা, ভারি একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার আর বিক্ষিপ্ত কুয়াশার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আমার সমুখে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল আমার মা, আমার নিঃসন্তান বিধবা বড়ো আপার মুখ। বুকের ভিতরের যন্ত্রণাটা ক্রমশ যেন আমার আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। হেমন্ত-সন্ধ্যার মাঠের তৃণের মতোই আমার দুচোখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

তাড়াতাড়ি করে কোনও রকমে খাওয়া সেরে আমি আবার সেই ঝোপটার পাশে এসে বসলাম। একটা পোড়া সিগ্রেট ধরিয়ে সমুখে তাকিয়ে ছিলাম। সুমখের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়—দেখা যায় আমার প্রিয় নগরী আমার ঢাকার প্রান্তদেশ পর্যন্ত চারপাশে বহুদূর বিস্তৃত ঝোপঝাড় থাকলেও এখান থেকে সমুখের অনেক দূর দূর এলাকা দেখতে পাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যে জায়গাটিতে বসে ছিলাম সেটি ছিল বেশ উঁচু—বলা যায়, এই বনান্তরে একটা উঁচু ঢেউয়ের চূড়ায় বসেছিলাম।

সমুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কিছুটা উদ্দেশ্যহীন এক দৃষ্টি নিয়ে। একটু পরেই জ্বলে উঠলো ঢাকার উপশহর সাভারের আলোকমালা। দেখতে পেলাম ঢাকা বেতারের হাইপাওয়ার ট্রান্সমিটারের টাওয়ার লাইট, লাল একটা জ্বলন্ত বুলেটের মতো ঝুলছে।

সহকর্মীদের সঙ্গে দু'একটা কথার মাঝ দিয়ে আমার সময় কাটছিল। কাজের কথাই বলছিলাম। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ বা ঘটনা নিয়েও আমরা কথা বলছিলাম।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা রওয়ানা হবো। কিন্তু মাঝখানের সময়টা বড়ো অসহ্য মনে হচ্ছিল। আর এই অসহ্য ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বেশ কিছুটা নির্ভাবনা ও নির্লিপ্ততার ভাব নিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। সমুখে ফেলে দেয়া জ্বলন্ত সিগ্রেটের থেকে শেষ ধোঁয়ার শীর্ণ রেখাটি তখন বিসর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে ছোট্ট একটা শটিঝোপের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

শটিবনে হারিয়ে যাওয়া এই বিশীর্ণ নীল ধোঁয়ার মতোই মনটা আমার হারিয়ে গেল পিছনে ফেলে আসা নাম-না-জানা অনেক গ্রাম—জনপদ, নদী, নদীর তীরভূমি—মাঠ,

মাঠের মাঝখানের বিজন বটগাছটি—আপনমনে ঘাস ছিঁড়ে খাওয়া কতগুলো গরু। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের একান্তে বাঁধা একটা গরু—লম্বা মুখ তুলে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের গ্রামটির দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের মাঝখানে চিলতে একটুখানি জায়গায় জমে থাকা পানির ধারে ধারে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মতো অসংখ্য বক—কয়েকটা অল্প উঁচু দিয়ে ইতস্তত উড়ছে।

হঠাৎ করে আমার চিন্তার নীল বিশীর্ণ রেখাটি যেন সমুখের শটিবন ছড়িয়ে আরো অনেক—অনেক দূরে হারিয়ে গেল। উপশহর সাভারের ওই ঝিল্‌মিল্ আলোক-মালার চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার গ্রাম—গ্রামের মাঠের সেই বিজন বটতলাটি, যেখানে কেটেছে আমার শৈশবের দিনগুলোর অনেক অলস দুপুর, চারপাশের গ্রামের বৃত্তরেখার অনেক ওপরে ছড়ানো আমার সেই শিশু আমির কল্পনাগুলো যেখানে রামধনু হয়ে থাকতো।

অত্যন্ত গরিব এক কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলাম আমি। তবু আমার মা-বাবার সাধ ছিল, আশা-আকাংক্ষা ছিল—আমি বড়ো হবো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো—সীমাহীন দারিদ্রের কশাঘাত থেকে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমার মা-বাবার গোটা জীবন—তাদের আজীবন বাঁচার লড়াই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল লেখাপড়া শিখতে। গাঁয়ের নওশের মাস্টারের পাঠশালে যেতাম। পাঠশালা বসতো সকালে, কারণ নওশের মাস্টারকেও আমার বাবার মতো মাঠে কাজ করতে হতো শুধু পেট চালানোর জন্যেই। দুপুরে আমার মাঠে কাটতো। আমাদের একটি গাই গরু ছিল। পাঠশালার পড়া সেরে আমি তাকে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতাম। দুপুরের মাঠের মাঝখানের বটগাছের তলার বসে বসে কেমন যেন এক দারুণ একাকীত্ব আমায় ঘিরে ধরতো। একটা বাঁশির অভাব আমি বোধ করতাম।

একদিন অনেক রাতে মায়ের কোলে, ঘুমোবার সময় মাকে কথাটা বলেছিলাম। মা রাজী হয়েছিলেন, আমাদের গাঁ থেকে দু'মাইল দূরে বৈশাখী মেলা বসলে আমাকে একটা তালপাতার রাঙা বাঁশি কিনে দেয়া হবে।

এর পর থেকে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমার কল্পনায় ভাসতে লাগলো তালপাতার একটা বাঁশি। মুহূর্ত দিন গুণতে গুণতে সত্যি সত্যিই সেই মেলার দিনটি ফিরে এল। মা আমাকে দু' আনা পয়সা দিলো। সাতরাজার ধন মানিকের মতো ওই দু'আনা পয়সা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে চঞ্চল এক হরিণশিশুর মতো আমি ছুটে যাচ্ছিলাম। পুকুরের পাড়ে বসেছিলেন ফকির দাদু। আশি বছরের এক সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ। গাঁয়ের সব ছোটরা তাঁকে দাদু বলতো। আমাকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখে তিনি আমায় ডাক দিলেন: কোথায় যাচ্ছো দাদুভাই! হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম : আমি—আমি মেলায় যাচ্ছি—বাঁশি কিনতে। মা আমাকে দু'আনা পয়সা দিয়েছে। বৃদ্ধ আমার শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, মেলা থেকে ফেরার সময় বৃদ্ধকে ওই একই জায়গায় আমি দেখেছিলাম। তিনি অবশ্যি সকাল-সন্ধ্যে ওই জায়গাতেই বসতেন। সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন বিকেলের হলুদ রোদ গাছের চূড়োয় চূড়োয়। বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞেস করলেন: কই দাদুভাই তোমার বাঁশি কই? আমি সহজভাবে বললাম : কিনিনি তো। বৃদ্ধ বললেন : তবে তুমি যে বললে বাঁশি কিনবে? বললাম : সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে আমার খুব খিদে পেয়েছিল, মুড়ি কিনে খেয়ে ফেলেছি। বৃদ্ধ অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত

ধরে তাকিয়ে ছিলেন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন : বেশ, বেশ করেছো দাদুভাই! মুড়ি খেতে আমারও বেশ ভালো লাগে—এখন সব নতুন চালের মুড়ি তো, বেশ মিষ্টি লাগে—তাই না দাদুভাই!

মিষ্টি আমার মোটেই লাগেনি। প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় মুড়িগুলো গিলেছিলাম মাত্র। মেলায় ঘুরে ঘুরে রকমারি মিষ্টি আর নানা ধরনের নানা স্বাদের খাবার দেখার পর ওই শুকনো মুড়িগুলো মিষ্টি লাগার কথাও নয়। তাছাড়া বৃদ্ধ যতোই উচ্ছ্বাস আর হাসির সঙ্গে কথাগুলো আমায় বলুন না কেন, আমার কাছে তা বিষণ্ন মনে হয়েছিল।

সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মাও আমার বাঁশি কেনার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। মা দারুণ স্নেহের আবেগে বুকে টেনে ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই চম্‌কে উঠলাম। মায়ের দুচোখে জল। কান্নার বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো টলটল করতে করতে মায়ের গাল বেয়ে পড়লো। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না—উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম আমাদের ভিটের এক প্রান্তে একটা ডালভাঙ্গা সজনে গাছের তলায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকের অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীদের আলো আর আমার বিধবা আপার ধরানো চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে আমিও কাঁদছিলাম।

সেদিন আমাদের দাদুভায়ের কন্ঠের সেই বেদনাভারাক্রান্ত বিষণ্নতা, আমার মায়ের সেই আবেগাকুলতা, চোখের জল, আমার কান্না—এসবের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাইনি।

অর্থ খুঁজে পেয়েছি আরও অনেক পরে—দীর্ঘ একুশ বছরের পর, ঢাকায়—গত ২৫শে মার্চের সেই বীভৎস রাতে। একটি সংবাদপত্র অফিসের ছাদে বসে। আমাদের গায়ের ভিটের সেই ডালভাঙা সজনে গাছের চারপাশের অন্ধকার আর হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীর আলোর মধ্যে নয়, চারদিকে পাকিস্তানি বর্বরদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার ও ট্যাঙ্কের গোলাগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আমার বিধবা আপার ধরানো চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে নয়, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, সদরঘাট, শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, চকবাজার, পিলখানা আর ফার্মগেটে হাজার হাজার ঘরে পাকিস্তানি বর্বরদের লাগানো ভয়াবহ আগুন দেখতে দেখতে।

সেদিন রাতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমার সেই গ্রাম, গ্রামের মাঠ আর বৈশাখী মেলায় ঘুরে বেড়ানো আমার সেই শিশু আমিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম প্যান্ট পরা নগ্ন গায়ের সেই চঞ্চল শিশু—তার মাথাটা ওরা গুলির আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে—কালো পিচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তধারা—মাথার খুলির টুকরোগুলো।— সেইদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের গাঁয়ের সেই দাদুভায়ের কান্নাভারাক্রান্ত কন্ঠের অর্থ, বুঝতে পেরেছিলাম আমার মায়ের আবেগাকুল বুকের দ্রুত স্পন্দন আর চোখের জলের অর্থ। বুঝতে পেরেছিলাম আমার সেই শিশু আমির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার অর্থ।

অতীতের এইসব টুকরো টুকরো স্মৃতির কথা ভাবতে অজান্তেই কখন যে হাতের এল-এম-জি টাকে ইস্পাতের সাঁড়াশির মতো দুহাতে চেপে ধরেছিলাম তা আমার মনে নেই।

(সাদেকীন রচিত)

# বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

.... ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিস্ময়ের ও যুগান্তকারী ঘটনা। এর পটভূমিতে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও জীবনদানের করুণতম গাথা। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বাধীনও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বিশ্বের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত নৃশংসতম ও বর্বর পাক-সৈন্যদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের এ স্বাধীনতার সূর্যোদয় সম্ভবপর হয়েছে। অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের মতোই আমাদের মুক্তিযুদ্ধও প্রথমদিকে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন—পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম স্তরে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলেছিল। এই গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নাজেহাল করা। মূলত কতগুলি ফ্রন্টে বিভক্ত করে শত্রুকে কোণঠাসা করে আনা গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি। এই ফ্রন্টগুলি হলো অর্থনৈতিক, সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষতি সত্ত্বেও শত্রুকে কোণঠাসা করার জন্য বাংলাদেশ গেরিলাদের বিভিন্ন পুল, রেলওয়ে, ব্রিজ, কালভার্ট, প্রধান প্রধান সড়ক প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করতে হয়। শত্রুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আঘাত হানার জন্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের অনেক শিল্প-কারখানাও নষ্ট করতে হয়।

পরে শত্রুমুক্ত করার তথা স্বাধীনতা অর্জনের চরম মূহর্তে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে নিশ্চিত পরাজয় জেনে বর্বর হার্মাদ পাক-সৈন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে বহু বছর পিছিয়ে দেবার মানসে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের উপর ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় এবং সাবিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। তাই বিজয়ের পরে আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সব মন-প্রাণ নিয়োগ করা।

মুক্তিসংগ্রামের থেকে মুক্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন আরো কঠিন ও কঠোর। এ বিরাট দায়িত্ব স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং সরকারও এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রতিশ্রুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানি হার্মাদ নরপিশাচরা স্বেচ্ছায় হাতের অস্ত্র ছাড়েনি। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারা পারজয়ের শেষ মুহূর্তে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জের কল-কারখানাগুলি নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এছাড়া দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃষকরা ঠিকমতো চাষাবাদ করতে পারেনি। শিল্প ও কৃষি দেশের প্রধান দুইটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর মারাত্মক আঘাত পড়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত নয় মাস যাবৎ বাংলাদেশের অধিবাসীদের ওপর যে দুর্যোগ ও কালরাত্রি নেমে আসে তাতে ১২ লক্ষাধিক লোক নিহত হয়, ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশের অভ্যন্তরেই গৃহহারা হয়। এই ছিন্নমূল অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করার অনুকূলে ছিল না। অন্যান্য সকল লোকমাত্রেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং কল-কারখানা, কৃষিকার্য, স্কুল, কলেজ, কোর্টকাচারী প্রভৃতি সবকিছু বন্ধ অবস্থায় ছিল।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল স্বর্ণতন্তু পাট। এই পাটচাষের প্রতি কৃষকদের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মনোনিবেশ করতে হবে। বিশ্বে এর অসম্ভব চাহিদা অনস্বীকার্য। এছাড়া চা ও বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ দুটি ব্যবসায় ব্রিটেনের বাংলাদেশের সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এমন ধারণা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই দুইটি শিল্পে ব্যাঘাত না সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্রিটেন বাংলাদেশ সমস্যায় পাক-জঙ্গীশাহীকে শেষের দিকে সমর্থন করেনি।

এছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পের পুনর্গঠনে বহু অর্থের প্রয়োজন। এটা কিছু সময় সাপেক্ষও বটে। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব নেই। আর বাংলাদেশ সরকারের বিরাট ও নিরঙ্কুশ জনসমর্থন আছে। তাই মনে হয় বাংলাদেশে এই সমস্ত সমস্যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে। দেশের সাংগঠনিক কার্যের মানুষ চরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহনশীলতা দ্বারা দেশকে গড়ে তুলবেন।

দেশের সাংগঠনিক কার্যে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করতে হবে। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই এ ব্যবস্থা সীমিত রাখলে চলবে না। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সাহায্য তর্কাতীত। তাই রণবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতকেই এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে আগে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জল, নৌ ও বিমানপথের যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য ইতিমধ্যেই বনগাঁ, বেনাপোল, শিয়ালদহ ও যশোরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, তথাপি তা আরো প্রসারিত করার আশু ব্যবস্থা দুই সরকারকেই করতে হবে— যদিও তা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্থলপথ ও জলপথের এই অসুবিধাগুলি আকাশপথে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করে অনেকাংশে দূর করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে সত্বর বিমান যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এটা ঠিক, যুদ্ধে অনেক বিমানক্ষেত্রে রানওয়েগুলির ক্ষতি হয়েছে, তথাপি সেগুলির সংস্কার খুব বেশি সময়সাপেক্ষ নয়।

বাংলাদেশের সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর, দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখায় যা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থের কোনও স্থান থাকবে না, পুঁজিবাদ বা আমলাতান্ত্রিকতা কোনও সুবিধা করতে পারবে না, নতুন করে কোনও সুবিধাবাদী চক্রকে গড়ে উঠতে দেয়া হবে না। সরকার এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, সংগঠন ও পুনর্গঠনের জন্যে রয়েছে যেটা সেটা হলো দেশের সর্বত্র অসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা প্রসারিত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। ইতিমধ্যেই সরকার দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, বাংলাদেশে আর কোনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে দেশ আর কলুষিত হতে পারবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা যুবকদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানি রক্তলোভী হার্মাদরা বাংলাদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, চিকিৎসক অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্মী, সাহিত্যিক প্রভৃতি

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই দেশের পুনর্গঠনে অধিকতর সহায়ক হবে জানতে পেরেই ইয়াহিয়ার লুটেরারা বেছে বেছে এদের হত্যা করে। কাজেই নানা দিক দিয়ে সরকারের অসুবিধা হবে। অবশ্য যতই বাধা থাকুক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আবার দেশ গঠনেও আত্মনিয়োগ করতে পারবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোণিতমূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি—এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে এবং দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্যেও আমরা তেমনি প্রাণপণ করব। এ ব্যাপারেও আমরা বিশ্বে নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ব।

(নাসিম চৌধুরী রচিত)

# বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

... ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে গড়ে তুলতে হয় নতুন জীবন, নতুন সভ্যতা। মানুষ যুদ্ধ চায় না। চায় শান্তি। তবু যুদ্ধ চলে আসছে মানব অস্তিত্বের আদিকাল থেকে। আমরা যুদ্ধ চাইনি। তবু যুদ্ধ চেপে বসেছিল আমাদের উপর। নয় মাস ২২ দিন পরে বাংলাদেশের পাক দখলদার বাহিনী সর্বত্র আত্মসমর্পণ করেছে। এখন আমাদের ভাববার পালা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন নিয়ে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করা। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দুঃখ-দারিদ্র্যকে দূর করে, সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল দেশ। এখানে গড়পড়তায় প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার হার ৯০০ জনের উপরে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ এখানে খুব বেশি। আমাদের প্রধান এবং প্রাথমিক সমস্যা এই বিরাট জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগান।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৩৫.৩ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ হলো ২২.৫ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে বৎসরে একাধিকবার আবাদ করা হয় এমন জমির পরিমাণ হলো ৩ মিলিয়ন একর। তাই বলতে হয় মোট ফসল উৎপাদকে জমির পরিমাণ হল ৩৮.৮ মিলিয়ন একর।

একটা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় দু'ভাবে :

(১) নতুন জমিকে কর্ষণ উপযোগী করে; এবং

(২) আবাদী জমিতে ফসলের উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়ে।

বাংলাদেশের বর্তমানে চাষ করা হয় না কিন্তু চেষ্টা করলে কর্ষণ উপযোগী করা যায় এমন জমির পরিমাণ প্রায় ১ মিলিয়ন একর। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, যেমন কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে এই ভূমিকে কর্ষণ উপযোগী করা সম্ভব। বিগত কয়েক বছরে অনেক উন্নয়নগামী দেশে খাদ্য উৎপাদনের মাত্রা দ্রুত বেড়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত নতুন জমি আবাদ করে। কিন্তু বাংলাদেশের আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাই ফসল বাড়াবার প্রধান উপায় হিসাবে এখানে গ্রহণ করতে হবে বর্তমানে যে আবাদী জমি আছে তাতেই অধিক ফসল ফলানোর উপায় উদ্ভাবন করে—উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রয়োগ ঘটিয়ে।

বাংলাদেশে ফসলের ফলনের মাত্রা খুবই কম। যেখানে বাংলাদেশের ধানের গড়পড়তা ফলনের পরিমাণ একর প্রতি ৯০০-১০০০ পাউণ্ডের মতো সেখানে জাপানে একর প্রতি ধানের ফলন হচ্ছে ২০০০ পাউণ্ডের উপর। আমাদের দেশে ধানের ফলন-মাত্রা কমের একটি বড় কারণ জমিতে যথাযথভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের জমিতে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রদান করে ফসলের হার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। যেমন : একর-প্রতি ৪০ আউন্স নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিয়ে দেখা গিয়েছে যে, এর ফলে আউশ ধানের ফলন শতকরা ৩৭ ভাগ,

আমন ধানের ফলন শতকরা ৪০ ভাগ ও বোরো ধানের ফলন শতকরা ৪৬ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

আমাদের দেশে মাটির নিচে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার সাথে বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস যুক্ত করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার পরিমাণ হলো ৯.৩৪ মিলিয়ন কিউবিক ফুট। এই গ্যাস আমরা বহুদিন ধরে ব্যবহার করতে পারবো। সার উৎপাদনের কাজে ও জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আবাদী জমির কম করে শতকরা ৬০ ভাগ শীতকালে পতিত থাকে। এর প্রধান কারণ শীতকালে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়পড়তায় দেড় ইঞ্চির বেশি নয়। শীতকালে জলসেচের ব্যবস্থা করে তাই বহু জমিতে ফলান সম্ভব। এইভাবে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা বহুলভাবে সমাধা করা চলে। পাকিস্তানি আমলের সরকারি হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ৫ ভাগ জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত আরো অনেক জমিতে সেচ-ব্যবস্থা সম্ভব।

বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা বন্যা। বন্যার পানি প্রতিবছর যথেষ্ট পলিমাটি বহন করে বাংলার মাটিকে উর্বর করে। কিন্তু বড় বন্যা হলে তাতে বাংলাদেশের ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে যখন মাঝারি রকমের বন্যা হয়, তখন প্রায় ৯ মিলিয়ন একর জমি জলমগ্ন হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধান এ পর্যন্ত চালান হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভারতের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক কারণে, ভারতের সাথে এতদিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যপারে কোনও সহযোগিতা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সহযোগিতার প্রতিবন্ধক এখন দূর হয়েছে।

একটা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্তমান যুগে রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা এখন মোটামুটি সব অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন। কিন্তু সব পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে যেমন পরিকল্পনা তৈরির নির্ভুলতার উপর, তেমনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকর করার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাদের নিষ্ঠা ও সততার উপর। কেবল আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গণসংগঠনের। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, যে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে দেশকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত করল, তাদের দেশপ্রেম ও কর্মশক্তিকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগাতে হবে। এদের সাহায্যে গ্রামবাংলার কৃষি অর্থনীতিতে দ্রুত বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব।

(ড. এবনে গোলাম সামাদ রচিত)

# অগ্রগামী মুক্তিবাহিনী

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানি বর্বর সেনারা মুখের উপর এক বিরাশী-সিক্কার চড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ার উপক্রম। গত মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সমানে জ্বালাতন করে, বাংলার বুকে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে, সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানে পরিণত করে, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করেছে ভেবে, বাংলার পথে পথে শকুনী-গৃধিনী এবং শিবাদলের অট্টহাসিতে ভরে তুলেছিল বাংলার আকাশ। কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি তাদের বোধের অন্তরালে কখন যে জেগে উঠেছে, অনুধাবন করতে পারেনি অদূরদর্শী বর্বর হায়েনার দল। আচমকা কোন্ দিক থেকে গালের উপর পড়ল বিরাশী সিক্কার চড়।

আর অমনি বন্ধুর দল হায় হায় করে উঠলো। নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বিতাড়িত হয়ে সাধারণ পরিষদে হাজির। গণতন্ত্রের জিগির তুলে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে, পাকিস্তানের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানি বন্ধুরা আরামকে হারাম করে বিশ্বের দরবারে হাজির হলো। বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ কর।

কারণ কী? কারণ আছে তো বটেই! মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। একের পর এক পতন হচ্ছে নিরাপদ দুর্গগুলোর। সাহায্যদ্রব্য আনয়নের এবং পাঠানোর পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দুটি প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম এবং চালনা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বিমান বাহিনী যে সাহায্য করবে সে উপায়ও নেই। কুল্লে দুখানা বিমান এখন পাকিস্তানের বেঁচে বর্তে আছে, তাও আবার লুকানোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেননা সারা বাংলাদেশে জানোয়ারগুলোর আর লুকানোর কোনও ঠাঁই নেই। মুক্তিবাহিনী খুঁজে খুঁজে ওদের আঘাত করছে, শেষ করছে। সারা বাংলা এখন হয়ে উঠেছে শয়তানদের মৃত্যুফাঁদ।

বাংলাদেশের অর্থে কেনা সমরসম্ভার নিঃশেষিত প্রায়। এতদিন যে ধর্মের আফিমের নেশায় বুঁদ হয়েছিল সারা পাকিস্তানের সুবিধাবাদী জল্লাদ আর দালালের দল, আজ তাদেরও নেশা ভাঙতে শুরু করেছে। জাতীয় সংগ্রামের আগুনের আঁচে আফিমের নেশাও চড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছে। পাঞ্জাবি মহাপ্রভুদের মনোরঞ্জনার্থে আর অস্ত্র ধরতে রাজী নয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেকেই। আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জবানবন্দিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে।

এবার দিন গুণবার পালা সামরিক জান্তার এবং তাদের চেলাচামুণ্ডা মওদুদী, ভুট্টো, কাইয়ুম খান, নূরুল আমিন, মাহ্মুদ আলী প্রমুখের। নিয়াজী বাংলার মাটিতে বসে ইয়ানফসী, ইয়ানফসী শুরু করেছে। ঢাকা বেতার তবু আজও প্রলাপ বকছে। ওদেরই কথার প্রতিধ্বনি তুলে নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অনুভব ভুলের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

মুক্তিবাহিনীর মর্টার সেলের আঘাতে এবং মেশিনগানের গুলিতে সচকিত দালালের দল কোন বিবর খুঁজছে? বোমার আঘাতে প্রকম্পিত ঢাকা নগরীতে আজ কি আর

বর্বরদের জীবনের উচ্ছলতার কোনো অবশিষ্ট আছে? না, নেই। যশোর দুর্গ পতনের পর, ময়নামতি দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পর, সিলেট জেলা, রংপুর এবং যশোর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পর আর কি ভাবছে বাঙালার স্বার্থবিরোধী, বাঙলার চরম শত্রু পাকবাহিনী এবং তার অনুচরেরা?

আজ মুক্তিবাহিনীর পথ রোধ করবে কে? কোথায় সে শক্তি? নিষ্পেষিত শক্তি পাকিস্তানের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। যারা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে তাদের নিজেদেরই স্থান করে নিতে হবে সেই কবরে।

দুঃসাহসী মুক্তিবাহিনীর দৃঢ়পণ, বজ্রমুঠিতে ধরে রাখা হাতিয়ার আজ বদ্ধপরিকর সব অনাচারী, অত্যাচারী, জুলুমবাজদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য। লাখো শহীদের রক্তলাল বাঙলায় উদিত আজ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। উত্তাল বিজয়-উল্লাসে মুখরিত বাংলার আকাশ-বাতাস।

আজ শোন বর্বরের দল, হয় মৃত্যুবরণ কর নয় পরাজয়ের কালি ললাটে লেপন করে আত্মসমর্পণ কর। বাংলার মাটিতে ঠাঁই নেই তোমাদের।

দুর্জয়, দুর্বার বাঙলার মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলো। সংহার করো, নিঃশেষ করো অনাচারী বর্বরদের। বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তোমাদের বিজয়-আহ্বান জানাতে প্রস্তুত।

সুদূর দিনাজপুরের বাংলাবান্ধা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত দৃঢ় দুর্দমনীয় হোক তোমাদের পদক্ষেপ। মনোবলহীন, ক্লীব, কুৎসিৎ হানাদার আজ মৃত্যুর দিন খুঁজছে বন্দিপ্রায় বিবরে।

তোমাদের জয়যাত্রায় শরীক সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষ। গণহত্যাকারীদের নিঃশেষ করো বাংলার মাটি থেকে।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

# এখন অনেক কাজ

**২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশ এখন মুক্ত, কিন্তু আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই সবে শুরু। মুক্ত বাংলার আকাশে নতুন সূর্যের প্রভাতী আবীরে সদ্য স্নান করে উঠেছি আমরা একটা জাতি। তাই নতুন জাতির জন্ম হলো—এখনই না বলে—একটি বাস্তব সত্য মিথ্যার কারামুক্ত হলো, একথাই ঠিক। সত্য বনাম মিথ্যার চূড়ান্ত এই মুখোমুখি সংঘর্ষে পতন হয়েছে মিথ্যার, কিন্তু এ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে সত্যও হয়েছে মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত। সে জন্যেই এখনই বিজয়ের উল্লাসে বুঁদ হয়ে আমাদের খুশির তুফানে ভেসে যাওয়া চলবে না। এখন অনেক কাজ।

কারামুক্ত হলেই মুক্তি নয়, মুক্তির জন্য দরকার বেশুমার ত্যাগের—অনাবিল একতার। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমরা শোষিত, ধর্মের নামে ভণ্ডের অত্যাচারে জর্জরিত। আমাদের আকাশে এখন নতুন সূর্য—কিন্তু মাটিতে ২৪ বছরের ভাগাড়ের ধ্বংসাবশেষ। শকুনেরা চব্বিশ বছর ধরে—আমাদের মরা আত্মাকে নখ দিয়ে ছিঁড়েছে, গায়ের জোরে এই ভাগাড়েই কামড়াকামড়ি করেছে একে অন্যে। এই চব্বিশ বছরের নৃশংস ভাগাড়কে, শকুনের উচ্ছিষ্ট এই হাড়গোড়ের পাহাড়কে অপসারণ করে যদি সজীব করতে পারি তাহলেই হবে আমাদের সত্যিকারের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্।" নজরুল বলেছেন, "সজীব করিব মহাশ্মশান।" এই শপথই আমাদের সত্যিকারের মুক্তির শপথ।

আমাদের অনেক ক্ষত—জাতীয় দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত। এই মুক্তির প্রভাতে আমরা হয়তো মনের ক্ষতই উপলব্ধি করছি গভীরভাবে।

আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৫২-র সেই ভাষা আন্দোলনে, আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৪৮-এর মোহাম্মদ আলী জিন্নার সেই সমাবর্তন বক্তৃতায়, যে বক্তৃতায় জিন্না বলেছিলেন—"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে।"

আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বরকত, সালামের মায়ের কথা—আজকের খসরু ড্রাইভারের মায়ের মতোই। এ স্বাধীনতাতে তাদেরও ভাগ আছে সমান সমান। স্বাধীনতার প্রত্যেকটি শহীদকে আমাদের জানতে হবে। এ যুগের দধীচির মতোই। এবং সেখান থেকে শুরু করতে হবে এই নতুন জাতির পুনর্গঠন।

শত্রুরা আমাদের অর্থনীতিকে যেমন তছনছ করেছে তেমন তছনছ করেছে সংস্কৃতি ও জাতীয় সম্ভ্রমকে। একটা জাতির বিকাশে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা যেমন বাধাস্বরূপ, তেমনই সমান প্রতিবন্ধক হলো সাংস্কৃতিক সংকট। আমাদের সামনে এখন দু'টোরই সংকট অতিমাত্রায়। জাতির অর্থভাণ্ডার আজ মুক্তির উষা লগ্নে যেমনই শূন্য, সংস্কৃতিও একইভাবে শূন্য। শত্রুরা জাতীয় তহবিলের অর্থের মতোই শেষবেলায় রাইফেল দিয়ে লুটিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী তথা শিল্পী গোষ্ঠীকে।

সব খুইয়ে মুক্তি পেয়েছি বলে আমাদের হতাশায় ভেঙ্গে পড়া ভুল—শূন্যতা আমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের ধ্বজাধারীরা সাথে কোনও

তহবিল নিয়ে আসেনি—আমাদের সম্পদ নিয়েই তারা মোড়লী করেছে এতকাল। আমাদের মাটিতে ফসল ফলে—আমাদের ভেতর থেকেই এসেছিলেন জাতীয় সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিজীবীরা। সুরের ইন্দ্রজাল বা মধুকণ্ঠ আমাদেরই ঘরের ফসল। তাই শূন্য দেখে ভেঙ্গে যাওয়া মানেই পূর্ণতার পথে কাঁটা দেওয়া। শত্রুর শিবিরে নির্যাতিতা বোনদের দেখে আমাদের শিউরে ওঠার প্রয়োজন নেই। তাদের সামনে আমরা মুখ তুলেই দাঁড়াবো। আমাদের ছেলেরাই দেবে তাদের এই চরম ত্যাগের বখশিস। তাদের ত্যাগের মর্যাদা দিতে যদি আমরা না পারি তাহলে অসংখ্য শহীদকেও আমরা অপমানিত করবো—কারণ শহীদের আত্মার সঙ্গে এই নির্যাতিতা আত্মার যোগ খুবই নিবিড়।

আমরা জীবন দিয়েই নতুন জীবন লাভ করেছি। ত্যাগের মধ্য দিয়েই এসেছে আমাদের এই মুক্তির প্রভাত, তাই সেই ত্যাগ দিয়েই এই মুক্তিকে আমাদের বরণ করতে হবে— ভোগ দিয়ে শুরু করে নয়। আমরাই প্রমাণ করেছি— ভোগের জগৎ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই আজ চব্বিশ বছর পরে ভোগের ফিরিস্তি চুকলো।

আজ নতুন দিনের এই প্রভাতবেলায় আমাদের আরো ত্যাগের জন্য শপথ নিতে হবে। কারণ, কোনও মতেই আবার যেন আমাদের এই মুক্ত আকাশ কালো মেঘে না ঢেকে যায়, কোনোমতেই যেন আজকের এই মুক্ত বাতাস আবার বিষিয়ে না যায়।

অর্থ নাই—তাতে কী? আমাদের মাটিতে সোনা ফলে। যে সোনার বাংলাকে কবি ভালোবেসে গেছেন, কবি যে বাংলার মুখ দেখে আশান্বিত হয়েছেন— সে বাংলাকে আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আবার ভরিয়ে তুলতে পারবো।

শকুনেরা চলে গেছে, ফেলে গেছে অজস্র হাড়গোড়। তাই আমরা এখনও মুক্ত নই, শকুনমুক্ত মাত্র। এই জন্যেই আনন্দ মিছিলে আমাদের উল্লাস করার মতো সময় নেই— এখন ত্যাগের মুহূর্ত। ঝটিকাবিধ্বস্ত জাতির ভাঙ্গা কাঠামোকে পূর্ণ উদ্যমে গড়ে তোলার কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরই। মনে রাখতে হবে, ব্যথা আমাদের এবং তা আমাদেরই দেহে। তাই এখন শুধু উল্লাস নয়, এখন অনেক কাজ।

(হাফেজ আলি রচিত)

# রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে

**১৪ আগস্ট, ১৯৭১**

আজ উনিশশো একাত্তর সালের চৌদ্দই আগস্ট! মাত্র এক বছর আগেও এই দিনে আমি ছিলাম ঢাকায়। আমার প্রিয় পরিজন, পরিচিত পরিবেশের মধ্যে। আমার চোখে কত স্বপ্ন, দেশ স্বাধীন, স্বাধীন দেশে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনে দেশে আসবে বাক্-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নাগরিক-স্বাধীনতা। সর্বোপরি দেশের মানুষ পাবে তাদের হারানো অধিকার।

এই অধিকার আমরা পাইনি। তার বদলে পেয়েছি বুলেট। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, চারদিকে কামান আর ট্যাঙ্কের গর্জন। অসহায় মানুষের ভীত আর্তনাদ। রক্তে ঢাকা শহর ভেসে গেছে। সারা বাংলাদেশ ভেসে গেছে। আর সেই রক্তের স্রোতে ভাসমান স্তূপীকৃত লাশ। শিশু-নারী-বৃদ্ধ-যুবকের মৃতদেহ। এই লক্ষ মানুষের মৃতদেহের স্তূপের নিচে ইয়াহিয়া চাপা দিতে চেয়েছে হত্যা করেছে, আমার বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, আমার পিতার সাধের গোলার ধান পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমার মাকে দিয়েছে এক-বুক হাহাকার উপহার। গত ২রা জুন তারিখে আমার কৈশোর আর যৌবনের হাজারো স্বপ্নমাখা ঢাকা শহর ছেড়ে যেদিন মুক্তাঞ্চলের দিকে পা বাড়াই, সেদিন জ্যৈষ্ঠের বাংলার তপ্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলেছি, মাগো, আবার যেন তোর কোলে ফিরে আসতে পারি। ফিরে আসতে পারি স্বাধীন বাংলার পতাকাশোভিত তোর ছায়া-সুনিবিড় নীড়ে। খুনী ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী আমার চোখ থেকে স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে, আমার কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে দিয়েছে, আমার দেশের সবুজ-শ্যামল আঁচল রঞ্জিত করেছে আমারই ভাই আর বোনের রক্তে। কিন্তু সে আমার মৃত্যুঞ্জয় কালজয়ী আবহমানের স্বাধিকার-চেতনা হরণ করতে পারেনি। তাই আজ মুক্ত বাংলার বুকে লক্ষ মুক্তিফৌজ প্রস্তুত। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমি আমার দেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিফৌজের পাশে রয়েছি। যদি মরতে হয় স্বাধীনতার জন্য মরবো, যদি বাঁচতে হয় স্বাধীন জাতির গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচবো।

চৌদ্দই আগস্টের কথা বলছিলাম। এই দিনটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু গত ২৫শে মার্চ বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া মধ্যরাতের বর্বরতায় যে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে, তার আবার স্বাধীনতা-দিবস কী? বাঙালির স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করবো ঢাকায়, রাজপথ থেকে ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের রক্তচিহ্ন মুছে, শিশুঘাতী নারীঘাতী বর্বরতার শেষচিহ্ন লুপ্ত করে স্বাধিকার-চেতনার নতুন উৎসবে মুখর হবে ঢাকা, উদ্ভাসিত হবে সারা বাংলাদেশ। বিশ্বাস করুন, এই প্রত্যয় নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার বিশ্বাস, বাঙালিমাত্রেই এ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন।

চৌদ্দই আগস্ট আমারও স্বাধীনতা দিবস হতে পারতো। কিন্তু তাকে হতে দেয়া হয়নি। যা হতে পারতো আমার প্রাণের, ধানের, গানের সৌরভ, তাকে করা হয়েছে আমাকে দমনের—নির্মমভাবে দমনের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার আজ ভেঙে গেছে। তাই চৌদ্দই আগস্ট আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জীবনে মৃত। আর এই একটি দিবসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নব-জন্মগ্রহণ করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলা। বঙ্গবন্ধু যার নেতা। আমি, আপনি সকল বাঙালি যে স্বাধীনতার অগ্নিরথের আরোহী।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় সমঅংশীদারিত্ব দেয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না করাচী ও ইসলামাবাদের শাসক চক্রের। তারা চেয়েছে বাংলাদেশে একটি অর্থনৈতিক কলোনি প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই কলোনি শাসনের জন্য চেয়েছে বাঙালির উপর একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভুত্ব। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ততোধিক সংখ্যালঘু একটি আমলাতান্ত্রিক সামরিকচক্র গত তেইশ বছর বাংলাদেশকে শাসন করেছে, তাদের অনুগৃহীত তেইশটি পরিবার বাংলাদেশকে যথেচ্ছ শোষণ করেছে, তাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার করে রেখেছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কোনও কোনও খ্যাতনামা রাজনৈতিক ভাষ্যকার পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় অশ্বেতাঙ্গদের উপর মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের শাসনের অনুরূপ। পিন্ডির শাসকচক্র ও প্রিটোরিয়ার শাসকচক্রের ফ্যাসিস্ট, অগণতান্ত্রিক ও মানবতাদ্রোহী ভূমিকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। বাঙালির ভাষা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি—এক কথায় যা কিছু বাঙালির জাতীয় চেতনার মহত্তম প্রকাশ, ১৯৪৮ সাল থেকে তাকে বার বার ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে, এই একটিমাত্র লক্ষ্য থেকে। এবং সেই লক্ষ হলো বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার হরণ। বাংলাদেশে পিন্ডির একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা।

এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, এই নির্মম শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে যিনিই কথা বলেছেন, বাংলাদেশে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, করাচী এবং পিন্ডির শাসকচক্রের চোখে তিনিই হয়েছেন দেশদ্রোহী। ব্রিটিশ আমলের আমলা গোলাম মোহাম্মদ শেরে বাংলা ফজলুল হকের মতো বরেণ্য নেতাকে বলেছেন দেশদ্রোহী, তার বিচার করতে চেয়েছেন। মীরজাফরের বংশধর ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দিয়েছেন, তিনি গুলি করে মারবেন বয়োবৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানীকে। ইংরাজ আমলের পা-চাটা সিপাই আইয়ুবের চক্রান্তে শহীদ সোহ্‌রাওয়াদীকে দেশের বাইরে সুদুর বৈরুতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। আজ আইয়ুবের বিশ্বাসঘাতক দক্ষিণ হস্ত ইয়াহিয়ার চক্রান্তে বাঙালির প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাই রাষ্ট্রদোহিতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত। চলছে তার প্রাণ হননের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

বাংলাদেশের এমন একজন বরেণ্য নেতা নেই, যিনি পিন্ডির প্রাসাদ-চক্রীদের কাছ থেকে দেশদ্রোহী আখ্যা পাননি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধিকারের দাবী যিনিই করেছেন, তিনিই অভিযুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে। পিন্ডির এই নির্মম পীড়ন-চিহ্ন আজ সারা বাংলাদেশের শরীরে। ১৯৪৭ সালের পর এমন একটি বছর নেই, যে বছর বাংলাদেশের রক্ত ঝরেনি, মায়ের

বুক খালি হয়নি, সন্তানহারা বাপের বুকফাটা আর্তনাদ বাংলাদেশের আকাশ বিদীর্ণ হয়নি। বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখ কি একটি? ১৭ই মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৭ই জুন, ২০শে জানুয়ারি, ২৫শে মার্চ কত রক্তাক্ত তারিখ আর এই তারিখের বীভৎস বর্বরতার কথা বলবো? সবশেষের তারিখ এই ২৫শে মার্চ তারিখ। ছাত্র-যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী মজুর, ঘুমন্ত বস্তিবাসী নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষকে অকাতরে হত্যা করা হলো একটিমাত্র উদ্দেশ্যে, এবং তাহলো বাঙালির স্বাধিকার হরণ।

তাই বাংলাদেশ আজ বিদ্রোহী। স্বাধীনতার রক্তপতাকার নিচে জমায়েত হয়েছি আমরা কোটি কোটি বাঙালি। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির প্রিয় মুজিব ভাই। এই একটি নাম আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষরে সংগ্রামী প্রেরণা। বাঙালির স্বাধিকার চেতনার সঙ্গে এই একটি সংগ্রামী মানুষকেও হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে পিন্ডির খুনী চক্রীদের মধ্যে।

আমি সূর্যসম্ভাবনায় বিশ্বাসী। বুড়িগঙ্গার পলিমাটিতে তৈরি নতুন জীবন সম্ভাবনাতেও আমি আস্থাবান। এত রক্ত আমরা দিয়েছি, এই রক্তপিচ্ছিল পথে স্বাধীনতার সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী।

আমরা আবার ফিরবো ঢাকায়। আমাদের নতুন স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব হবে। প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উৎসব দিবসটি পালনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আমি জানি, আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক্ষা সফল হবেই।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

# প্রতিধ্বনি

**১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

যেখানে অন্যায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যেখানে মানুষ মানুষের রক্ত চোষে, যে দেশে রক্তের স্রোত বয়, পঙ্কিলতা আর কুটিলতার শত আচ্ছাদন ভেদ করে সেখানেই ফুটে ওঠে নতুন সূর্য। রক্তনদীর ঢেউ চুরমার করে দেয় শোষণ-নির্যাতনের যাঁতাকল। এটাই চিরন্তন সত্য। আর এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এই নরম রোদের দেশ বাংলায় আজ আমরা হয়েছি সৈনিক। পক্ষান্তরে পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে শোষণ, নির্যাতন ও নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েও যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারেনি বরং বাংলাদেশের অর্থের ওপর নির্ভরশীল গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বজনতকে ধোঁকা দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ইয়াহিয়া চক্র।

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় খুনী টিক্কার পরিবর্তে ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগ এমনি একটি চক্রান্ত। এর পেছনে জঙ্গীশাহীর চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত বাঙালি গবর্নর নিয়োগ করে বাঙালিদের বিভ্রান্ত করে যুদ্ধকে দুর্বল করে দেয়া। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন চালু হচ্ছে বলে বিশ্ব-বিবেককে ধোঁকা দেয়া।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের তৃতীয় কারণটি হচ্ছে : ইয়াহিয়া খান একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সুনিশ্চিত যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গবর্নর আজ হোক কাল হোক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের হাতে নিহত হবেই। সুতরাং জঙ্গীশাহীর কথা হচ্ছে, মরবেই যখন পশ্চিম পাকিস্তানি কেন, একজন বাঙালিই মরুক। চূড়ান্ত এবং প্রধান কারণটি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসনের মুখোশ পরে ভেঙ্গেপড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য বাগানো। কারণ বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জঙ্গীশাহীকে সাহায্য দান বন্ধ করে দিয়েছে।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে বিশ্ববিবেকের কাছে। তাই বিশ্বের নামকরা পত্রপত্রিকা ও বেতারে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া চক্রের কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশনের রিপোর্টার মি. শ্যোন ও কনার ঢাকা সফর শেষে বলেছেন, টিক্কা খানকে সরিয়ে ডা. মালিককে দখলীকৃত এলাকার গবর্নর নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য বিদেশী সাহায্য বাগানো এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা।"

এ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান পত্রিকার মি. মার্টিন এডিনি বি. বি. সি থেকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অসামরিক গবর্নর নিয়োগ করা হলেও সামরিক তৎপরতার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। অর্থাৎ, "বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর পাক বর্বরতা ঠিকই চলবে এবং বেসামরিক গবর্নর ডা. মালিক সামরিক বাহিনীর হাতের পুতুল মাত্র।"

জন্মভূমি থেকে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেশকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে আজ আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দুর্বার প্রতিরোধের সম্মুখে টিকতে না পেরে দখলীকৃত এলাকায় জাতিসংঘের রিলিফ কর্মী নিয়োগের আরেকটি চক্রান্ত এঁটেছে জঙ্গীশাহী। কিন্তু আমরা জানি এই রিলিফ কর্মী নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য কি জঙ্গীশাহী চাচ্ছে : রিলিফ কর্মীর কথা বলে বাংলার বুভুক্ষ জনতাকে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যাবে, তেমনি বিশ্বজনমতকে বাঙালির দরদী সেজে ধোঁকা দেয়া যাবে।

আমরা এও জানি, জাতিসংঘের এই তথাকথিত রিলিফ কর্মীদের বাংলাদেশে নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গীশাহীর বর্বরতা ও পৈশাচিকতায় সহায়তা করা। অর্থাৎ এদের ভূমিকা হবে দস্যুবাহিনীর দালালদের প্রতি আমাদের যে ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে এদের প্রতিও তাই করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বি. বি. সি থেকে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে গেরিলা বাহিনীর একজন মুখপাত্র জাতিসংঘকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তাদের রিলিফ কর্মীদের জঙ্গীশাহীর দালাল বলেই গণ্য করা হবে এবং তারা দালালদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থারই আওতায় পড়বে।" বি. বি. সি থেকে আরও বলা হয়, "এ ব্যাপারে জাতিসংঘ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীর মুখপাত্রের এই হুঁশিয়ারি জাতিসংঘকে বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে।"

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হয়, "ডেমোক্রাটি দলের নেতা এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রিপাবলিকার দলীয় সিনেটর পার্সিও পাকিস্তান সরকারকে আমেরিকান সাহায্য দান বন্ধের দাবী জানান।"

বি. বি. সি'র রিপোর্টার মি. মার্টিন বেল সম্প্রতি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের জন্য ভারত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শরণার্থীদের অসীম দুঃখ-দুর্দশাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন—শুনেছেন পাক জঙ্গীশাহীর চরম বর্বরতা ও পৈশাচিকতার অনেক করুণ কাহিনী। কিন্তু তিনি লাখ লাখ লাঞ্ছিত মানুষের শুধু একটা প্রাণই দেখেছেন। শুনেছেন একই কথা। চাপ চাপ যন্ত্রণায় সে কথা চাপা পড়ে যায়নি বরং আরো বলিষ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা বিশ্বে। আর সে কথাটি হচ্ছে বাঙালির অন্তর মথিত হৃদয়-সঙ্গীত "জয় বাংলা"।

(শহীদুল ইসলাম রচিত)

# অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্মরণে

**১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন বাংলাদেশের ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে সরকারি শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেছিল। সেই থেকে এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে, দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে ১৯৬২ সালের শিক্ষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি চিরকালই ছিল জনসাধারণের স্বার্থের থেকে বিযুক্ত। নানরকম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হয়নি, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষালাভের সুযোগের ক্ষেত্রেও দেশের দুই অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে এর সংখ্যা ছিল অনেক কম। গত বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানে সে সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারের চেয়ে বেশি।

শুধু স্কুল-কলেজের সংখ্যা নিয়েই কথা নয়। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুল-কলেজের যে পাঠ্যতালিকা তৈরি করা হয়, তা প্রকৃত শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক ছিল না; বরঞ্চ ভাষার চাপ, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং অগণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রবর্তনে এই পাঠ্যতালিকা ছিল গঠনশীল চিত্তের পক্ষে ক্ষতিকর। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তার ও বক্তব্যের স্বাধীনতা হরণ ছিল সরকারি শিক্ষানীতির অঙ্গ। শিক্ষার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকার যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে-ছিলেন তাও স্বাধীন ও ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের বিষয়েও সরকারি উদাসীনতা ছিল এই নীতির অংশস্বরূপ।

আইয়ুব সরকারের আমলে যে নতুন শিক্ষানীতির অবতারণা হয়, তাতেই এই অগণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বভাবতঃই এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছাত্রসমাজের প্রাপ্য। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

সরকারি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও, তা শুধু শিক্ষানীতির প্রতিবাদস্বরূপ ছিল না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খান যে একনায়কত্ববাদী শাসনের প্রবর্তন করেন, ১৭ই সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ সেই অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। যখন সারাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক সামরিক শাসনের নিষ্পেষণের পীড়িত হচ্ছিল, তখন ছাত্ররাই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল এবং প্রাণের বিনিময়ে সে আন্দোলনে তারা সাফল্য অর্জন করেছিল। একনায়ক আইয়ুবের সেই ছিল

প্রথম পশ্চাদপসরণ। আর এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালে—যখন আইয়ুবকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এরপর ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া-সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দেখা গেল শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনের আরো স্বীকৃতি ঘটেছে। প্রস্তাবিত নীতিতে শিক্ষা-প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের ধারণা কিছুটা গৃহীত হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতির জন্য যে দাবী শিক্ষক ও ছাত্ররা করেছিলেন, তা স্বীকার করা হয়নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রস্তাবও সেখানে ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা দেয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকে মেনে নেয়া হয় নীতি হিসাবে। আশা করা গিয়েছিল যে, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। তার আগেই সামরিক শাসনের বর্বরতম আঘাত নেমে এসেছে দেশের মানুষের উপর।

আজ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পরে সার্বিক পুনর্গঠনের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার নব রূপায়ণ ঘটবে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্ত, সেই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের কলঙ্কস্বরূপ। শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে সকলকে। শিক্ষার ভিত্তি প্রসারিত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে আমাদের। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কাজের সুযোগ। সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার এই অভিপ্রেত পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে না।

আজ আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত। ইতিহাসে অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার যেদিন উদঘাটিত হবে, সেদিনই ১৭ই সেপ্টেম্বরের আন্দোলন সতর্কতায় উপনীত হবে।

(ডক্টর আনিসুজ্জামান রচিত)

# ইয়াহিয়া জবাব দাও

## প্রথম সওয়াল

**২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আমার সওয়াল খুব ছোট। ইচ্ছে করলে এক কথায় জবাব দিতে পারেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ১৯৭০ সনে আপনি ইলেক্‌শান কেন দিয়েছিলেন? একদম সোজা জবাব দেবেন। সাফ, সাফ। তালিমালি করবেন না। কারণ, আপনার খাসলৎ আমাদের জানা আছে। খালি আপনার নয়, পাঞ্জাবে যত ইসলামের চ্যাম্পিয়ান আছে, সকলের খাসলৎ আমাদের জানা। সাংবাদিক হিসেবে আপনার সঙ্গে সফর করবার বদ-নসীব বা খোশ-নসীব আমার হয়েছে। বেলা এগারোটা না বাজতে আপনার ছাতি শুকিয়ে যায়, আপনার বড় পেয়াস লাগে। আপনার তেষ্টা আবার সাধারণ পানিতে যায় না। পেগের পর পেগ হুইস্কি জরুরৎ হয়। তাই বলছি সাফ-সাফ জবাব দেবেন। বাংলাদেশের মানুষের চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন, আর তা চেষ্টা করবেন না।

আসুন, আসুন, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এবার টুক্ করে জবাবটা বলে ফেলুন, আপনি নির্বাচন বা ইলেক্‌শান কেন দিয়েছিলেন?

এখন মনে হচ্ছে আপনি নির্বাচনের মানে জানতেন না। ইলেক্‌শান মানে জনগণের রায়। তখন বাংলার মানুষ কী চেয়েছিল? দেশের সাচ্চা জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসুক। ইলেক্‌শানের ফল বেরুনোর পরই আপনি বললেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং আপনার যে জনগণের রায়-কে সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা বোঝা যায়। আর কথাটা আপনি মুখ দিয়ে বলেন নি আর কোন জায়গা দিয়ে বাতাসে বের করেছিলেন? তার প্রমাণ তখন ছিল না। আপনি মুখই ব্যবহার করেছিলেন।

তবে ওয়াদার খেলাফ করলেন কেন আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান? তার ফলাফল কি আপনি জানেন না? জেগে ঘুমাচ্ছেন? আপনার নাম নারীঘাতী, শিশুঘাতী—অন্ধকারে আগুন-লাগানো চণ্ডাল নামে দুনিয়ায় পরিচিত। যারা বেঁচে আছে, তারা নিজের বাপ-দাদার বাস্তুভিটা থেকে খারিজ যাযাবর। আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে হয়রান। তাদের বুকফাটা আহাজারী, দুর্দশা—সব আপনার ওয়াদা-খেলাফের ফল অথচ নির্বাচন বা ইলেক্‌শানের পর কী আপনি বগল বাজাননি? নিজের ঈমানদারী দুনিয়ার কাছে জানাতে বুক টান্ টান্ করে ফুলিয়ে দাঁড়াননি? আপনার বোধ হয় খেয়াল নেই? একটু শলা দিয়ে উস্কে দিচ্ছি। আপনার প্রচার বিভাগের পুস্তিকা মানে ছোট কেতাবে—Election in the word's third largest democracy—"দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাজ্যে নির্বাচন" এর পাতায় পাতায় কী নিজের সাফাই গাননি? বইটা এবার খুলে দেখুন। বাংলা তর্জমা করে বলছি, কান খুলে শুনুন দেখি : " সেনাবাহিনী সাধারণত বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এই

নির্বাচন ঠিক নাটকীয়ভাবে তার বিপরীত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণের কাছে তার কথা, প্রতিশ্রুতি, ঈমান ঠিক রেখেছেন, স্বাধীন এবং ন্যায্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছেই তিনি ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন।"

শুনলেন ত? আপনার প্রচার বিভাগের কেতাব একথা বলছে। আরো জানিয়েছে, ঐ বইয়ের দ্বিতীয় পাতা খোলেন, "The Election results underlined the political maturity, sound commonsense and practicality of the average voter ....... Parties preching regionalism, tribalism, racialism and religious bigotry have been short shrift. অর্থাৎ "এই নির্বাচন থেকে বোঝা যায়, জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক থেকে কত পাকা। তাদের সাধারণ জ্ঞান কত খাঁটি। যে-সব পার্টি আঞ্চলিক, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলেছে, সাধারণ মানুষ তাদের তওবা করার সময় পর্যন্ত দেয়নি।

এর পরও কী আপনি বলতে পারেন শেখ মুজিব দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল? যা ঘটছে সব হিন্দুদের কারসাজি? সব গণ্ডগোল ভারতের ফন্দি—এসব ধুয়া আপনি তুলতে পারেন? না তোলার কোনও সুযোগ আছে, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান?

আজ সর্দার আমানুল্লাহ খান যে বাংলাদেশে আপনার জনসংযোগ-অফিসার, তিনিই ত ঐ পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার দপ্তর থেকে প্রকাশিত।

সর্দার আমানুল্লাহ্ পাঠানের বাচ্চা। তাকেও আপনি ঝুঁটুটা বানিয়ে ছেড়েছেন। এ-ই ঘটে দুনিয়ায়। মিথ্যেবাদীর সঙ্গে যে বসবাস করে, সেও মিথ্যুকে পরিণত হয়। সঙ্গ দোষ।

ইয়াহিয়া, জবাব দাও, তুমি কেন ওয়াদা খেলাফ করলে?

(শওকত ওসমান রচিত)

# ঝিলামের চার ভাই

**২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে অবস্থানকালীন কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি আজও আমার মনে আরও অনেক অনেক ঘটনার সাথে জেগে রয়েছে। অজস্র ঘটনার সমষ্টি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমার অবসর সময়ে জাতীয় অনেক অনেক চিন্তার মেঘ এসে আবৃত করে ফেলে। আমি যেন সম্বিতহারা হয়ে পড়ি। হৃদয়ের কোন সূর্য তারে এক অদৃশ্য হস্তের টোকায় যে শব্দ-ধ্বনি উত্থিত হয় তা যেন বেদনার মতো শীতল। অগ্রাসী নিস্তব্ধতা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে ছেঁকে ধরে। আমার উন্মনা উদাসী মন আমার শ্যামল বাংলার পথ-ঘাট গঞ্জ-গ্রাম বন্দর-নগরের পরিধি পেরিয়ে চলে যায় (এক সময়ে আমাদেরই দেশের অংশ হিসেবে (বিবেচিত) পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলাম, নওশেরা, লায়ালপুরে। সেখানকার খেটেখাওয়া মজুর চাষিদের পর্ণ কুটিরে। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্লান্ত অভুক্ত কোনও পরিবারের মরুভূমি আবাসে।

সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের একটি স্টিল ফার্নিচারের দোকানের সামনে। আমার কাছে একটি গোপন বার্তা। এ বার্তাটি নিয়ে একজন মুক্তিসেনা চলে যাবে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্পে। এ বার্তার আলোকে রাতের কমান্ডো আক্রমণের ধারা রচিত হবে। বার্তা যার হাতে দেওয়ার নির্দেশ তাকে আমি চিনি না। আমার হাত থেকে যিনি বার্তা নেবেন তিনিও আমাকে চেনেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়কে প্রথম দৃষ্টিতে চিনে নেয়ার একটি বিশেষ সংকেত ছিল। আমাদের শার্টের বিশেষ একটি দৃশ্যমান স্থানে একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। আমরা দু'জন দু'জনকে চিনলাম এবং কৌশলে বার্তাটি হস্তান্তর করলাম। এরপর আমার কাজ শেষ। তেজগাঁর কোনো এক স্থানে চলে যাবো পরবর্তী নির্দেশ গ্রহণের জন্য। অনেক চেষ্টা করে একটা বেবিট্যাক্সি পাকড়াও করলাম। গ্যারিসন শহর ঢাকা নগরীতে বেবিট্যাক্সি পাওয়া দুষ্কর। চালকের অভাবে অধিকাংশ যানই মালিকদের গৃহে পড়ে রয়েছে। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালানোর পর বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে অসংখ্য বেবী ট্যাক্সি চালকও মার্কিন ও চীনের বুলেটের শিকার হয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন জীবনধারণের তাড়নায় তাদের কেউ কেউ রাস্তায় বেবিট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু রাস্তায়ও ভয়। কারণ শাহেনশাহ্ ইয়াহিয়ার লুটেরা বাহিনী যানবাহনের অভাবে ডিউটি করার জন্য সাইকেল-রিকশায় আর বেবিট্যাক্সিতে আরোহণ করে—কিন্তু ভাড়া দেয় না। ভাড়া চাওয়ার দুঃসাহস দেখলে চালক সাথে সাথে ভারতীয় চর বা মুক্তিবাহিনীর এজেন্টে পরিণত হয়ে যায় এবং এদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার অবাধ অধিকার জল্লাদ বাহিনীর রয়েছে। এমনকি রাজাকাররাও এ জাতীয় হত্যা চালাতে পারে। হত্যার জন্যে কোনও জবাবদিহি করতে হয় না, বুলেটের হিসাব দিতে হয় না। এ জাতীয় হত্যার জন্যে উপরি বাহবা পাওয়া যায়।

বেবি ট্যাক্সিতে আমি উঠে বসেছি। এমন সময় একজন দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সৈনিক আমাদের থামতে ইশারা করলো। সৈনিকটির কাঁধে একটি অটোমেটিক চীনা রাইফেল। রাইফেলের নলটি আমাদের দিকে উদ্যত নয় বলে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তবু যেন আমার মনে হলো বেবিট্যাক্সির দিকে প্রতিটি বুটের পদক্ষেপ যেন আমার মৃত্যুর সময়সীমাকে ঘনিয়ে আনছে। একটি চীনা সীসার গুলি আমাকে প্রাণহীন করে দেবে। যেমন ১০ লক্ষ বাঙালিকে তারা প্রাণহীন করে দিয়ে ৭ কোটি ৪০ লাখ বাঙালিকে রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য অবিস্মরণীয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে।

কিন্তু না— সৈনিকটি আমাকে গুলি করল না। বাঙালির জাত তুলে গালাগালিও করলো না। আমাকে লাথি মেরে বেবি ট্যাক্সি থেকে ফেলেও দিলো না। শুধু উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথায় যাবো। আমি বললাম, তেজগাঁ ফারম গেট। সে বেবিট্যাক্সিতে উঠে বললো আমিও ওদিকে যাবো। প্রতিবাদ করার সাহস আমার ছিল না। আমি সরে জায়গা করে দিলাম। সৈনিকটি কাঁধ থেকে রাইফেলটি হাতে নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে তা দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। জি-পি-ও ছাড়িয়ে, প্রেসক্লাব সামনে ফেলে হাইকোর্টের কাছে আসার পর নির্বাক সৈনিকটি সবাক হলো। সে আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম। জিজ্ঞেস করলো আমি মুসলমান কিনা। বললাম নামেই তো বুঝতে পারছো। সৈনিকটি আবার চুপ করে গেল।

আবার সে মুখ খুললো। অনেকটা জনান্তিকেই যেন বললো—তোমরা বেশ আছো! তোমরা বেশ আছো!

আমি এবার কথা জিজ্ঞেস করার সাহস খুঁজে পেলাম। আমি বললাম, আপনারাও তো বেশ আছেন। বাঙালি কেমন আছে একথা তাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার কাছে যে হায়েনাটি বসে আছে কত বাঙালির রক্ত তার দেহে লেগে রয়েছে! হয়তো আমার কোনও বোন এ পশুটির লালসার শিকার হতে অস্বীকার করায় বেয়নেটের খোঁচায় জীবনকে আলিঙ্গন করেছে। আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলো না। তাই আবার বললাম—আপনারা তো বেশ আছেন। ভালো খাওয়া, ভালো পোশাক আর জীবনের নিরাপত্তা। প্রশ্নে একটু যেন জ্বলে উঠলো।

বললো সে তার কথা। সুখে থাকার কথা। ঝিলামের সুদেহী দীর্ঘকায় যুবকটি বললো তার কথা। সে বললো—সকালে নাস্তা দেওয়া হয় এক চামচ সেমাই আর এক চামচ ভিটামিন। ব্যাস। এ খাবার খেয়ে হয়তো বেঁচে থাকা যায় কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। খাওয়ার মান অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ক্ষিধে পেলেই সৈন্যরা দোকানে ঢুকে খেয়ে নেয়। পয়সা চাওয়ার সাহস করে না দোকানদাররা।

একটি বিমর্ষ কণ্ঠ থেকে শব্দ ঝরে ঝরে পড়ছিল। আমি খেতেও পারিনে। খেতে গেলেই ভাইদের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার আম্মার মুখ ভেসে ওঠে।

ভাবলাম ভাইদের হয়তো খুব ভালোবাসে। তাই বিদেশ বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে এসে ভাইদের কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছে। বললাম—তারা বুঝি ঝিলামে রয়ে গেছে? সৈনিকটি বললো—না। তারা মাশরেকী পাকিস্তানের মাটির নিচে শুয়ে আছে।

এই সৈনিকটির চার ভাই বাংলাদেশের যুদ্ধে রত ছিল। তিন ভাই ফেনী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে। আমার পাশে বসা এই জানোয়ারটিও আরও অনেক জানোয়ারের মতো আমার বাংলাদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশু-হত্যার জন্য দায়ী। তার খাকী রং আমাদের অনেক অনেক রক্তে রঞ্জিত। তবু পশুটির সাথে আমি বসে রয়েছি বলে আমার চাঞ্চল্য চাপা রাখতে হলো। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো যে, সে তার মাকে কি জবাব দেবে। যে মায়ের চার সন্তান ছিল এখন তার মধ্যে তিনজনই চিরদিনের জন্য অনুপস্থিত হয়ে গেছে। তেজগাঁ আসার পর সে নেমে পড়ে। আমি এবং বেবিট্যাক্সি ড্রাইভার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

('ইলিয়াস আহমদ' ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

# রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম

**৬ অক্টোবর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বছরের অর্ধভাগ পেরিয়ে গেল। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছ'মাস পূর্ণ হয়েছে। একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ছ'মাস সময় তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এই ছ'মাস সময়ের ব্যাখ্যা অনেক বেশি, অনেক ভিন্নভাবে মূল্যবান। কেননা যে সামরিক এক-নায়কতন্ত্রের হিসেব কষা ধারণা ছিল মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেখানে ছ'মাস প্রতিনিয়ত সংগ্রামমুখর একটি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্ব আমাকে নিঃসন্দেহে সগর্বিত জবাব দেবার অধিকার দেয়, আমি গর্ববোধ করি।

আমরা গর্ববোধ করি, আমরা যুদ্ধ করছি। আমরা গর্ববোধ করি আমাদের বাঁচার সংগ্রামে। কারণ আমরা যুদ্ধ করে বেঁচে আছি, আমরা যুদ্ধ করে মরছি। আমাদের অস্তিত্ব আজ তাই পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী, পুঁজিপতি কিংবা বর্বর সামরিকতন্ত্রের অনুগ্রহ নয়, আমাদের অস্তিত্ব আমাদের অর্জিত অধিকার। এ কারণে আমি গর্ববোধ করি।

আমরা সবাই যুদ্ধ করে বেঁচে আছি কিম্বা বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করছি আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্যে যুদ্ধ করছি—এ আমার অহংকার, এ আমার সম্মান। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অস্তিত্বকে আমরা নিরাপদ না করে পারি না; আমরা সেজন্য যুদ্ধ করছি। আমরা যুদ্ধ করছি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ। মনে পড়ে ছ'মাস আগের কথা। ২৮শে মার্চ ঢাকা থেকে বেরিয়ে চলেছি গ্রামের দিকে। ঢাকা থেকে পাবনা দীর্ঘ পথ। যানবাহন নেই। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকায়, এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছি। আমার একজন সহযাত্রী বন্ধু নিজের হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে পুরে অতি সন্তর্পণে একটি রেডিও সেট নিয়ে এসেছিলেন। ফরিদপুরের দিকে পদ্মায় আমরা নৌকা নিয়ে চলেছি। রেডিও সেটটি হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি। সহসা বুকের মধ্যে লাল রক্ত যেনো ফিনকি দিয়ে উঠলো। স্থান কাল ভুলে আমরা ক'জন সহযাত্রী আনন্দে একসংগে চিৎকার করে উঠলাম, চিৎকার করে উঠলাম আমরা বেঁচে আছি, আমরা বাঁচবো।

হয়তো পদ্মার বক্ষ থেকে আমাদের সেদিনের সেই উল্লাসধ্বনি ক্ষণিকেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রক্তের মধ্যে সেদিন যে প্রবল উত্তাপ অনুভব করেছিলাম তা আজো ভোলা যায়নি। জানি না, যুদ্ধের জন্যে কখনো এমন হয় কিনা। এতো দিন নিজের মানসিকতা সম্পর্কে যতটুকু সচেতন হয়েছি, তাতেও জানি যে নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের সপক্ষেই আমার মানসিক প্রস্তুতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন যুদ্ধের সংবাদে, আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের ঘোষণায় পবিত্র আনন্দে ফেটে পড়েছিলাম। দীর্ঘ শীতরাত্রির নিরুত্তাপ নিঃশব্দ অন্ধকারের পর এই যেনো প্রথম আমাদের রক্তের মধ্যে দারুণ উত্তাপ বোধ করেছিলাম। যুদ্ধ কোনো মানুষকে এমন জীবিত করে তোলে এর আগে কখনো

এমন ভাবতে পারিনি। পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ংকর দুঃসহ অন্ধকার ২৬, ২৭, আঠাশের দিবালোকেও ছিল এরা বেশি, স্পষ্ট, সমাচ্ছন্ন। আর বহু হাতড়িয়েও সে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, নিজের সবকিছু নিয়ে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও এলোমেলো ভাষারাজী নিয়ে ক্রমাগত যেনো কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি; কোথায় তা জানিনে, তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে ভয়ানক অস্বাভাবিক অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।

দীর্ঘ পাঁচদিন পর এই আমাদের প্রথম ভোর হলো। জানিনে ইতিহাসে কারো জীবনে কখনো দীর্ঘ পাঁচ দিন পর রাত শেষ হয়েছে কিনা, কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ রাত্রি আমার কাছে শেষ হয়েছিল পুরো পাঁচদিন পরে। পুরো পাঁচদিন পর এই প্রথম বুঝলাম, ভোর হচ্ছে, আলো আসছে। অথচ আমরা তখন কোনো বন্দিশিবিরে ছিলাম না, ছিলাম না দেয়ালঘেরা কারান্তরালে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যখন প্রথম শুনলাম আমরা যুদ্ধ করছি, বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তখনই কেবল প্রথম অনুভব করলাম যে দীর্ঘ পাঁচদিন পর ভোর হলো। তখন কেবল বোধ করলাম যে আমি বেঁচে আছি। নিজের পায়ে হাত দিলাম, রক্তের উত্তাপ নিলাম। দেখলাম আমি মরিনি।

আমি তাই জানি না আর কোনো মানুষের যুদ্ধের সংবাদ এমন শিহরণ এনেছে কিনা। কিন্তু আমি জানি আমরা সেদিন অস্ত্রহাতে পথে না নামলে আমরা মরে যেতাম, এই মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুলে মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারলে আমরা মরে যেতাম। অথবা বেঁচে থাকতাম—কিন্তু সে দুই-ই মৃত্যু।

কারণ আমরা জানি এ আমাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধ, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেন হানাদার দস্যুদের অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে তাদের ওপর মরণ আঘাত হেনে। তারা যুদ্ধ করেন, এক-একটি অঞ্চল মুক্ত করেন হানাদার দস্যুদের পাপপঙ্কিল অধিকার থেকে। সেখানে উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের ভালোবাসার বিজয় পতাকা। সেখানে খুলে দিয়ে আসেন আমাদের উত্তর পুরুষের; আগামী সুখী-স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনের সোনালী স্বপ্ন; ওরা তাই যুদ্ধ করে; যুদ্ধ করে বাঁচে, যুদ্ধ করে মরে—মরেও বেঁচে থাকে।

আমরা বেঁচেও মরে ছিলাম তাই আমরা যুদ্ধ করছি, আমরা মরেও বেঁচে থাকবো। তাই আমরা রক্ত দিচ্ছি, আমরা রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের দুর্জয় স্বপ্নের ফুল। ফ্রন্টে আমাদের মুক্তিসেনারা অবিরাম যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে; ঘরে আমাদের জায়া-জননী-ভগ্নীরা যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে, শরণার্থী শিবিরে শিবিরে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনের সংগে যুদ্ধ করছে বেঁচে থাকার জন্য, আমাদের অস্তিত্বের জন্যে। হানাদার আক্রমণকারীর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তার যুদ্ধ সাময়িক, কিন্তু আমরা যারা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছি—এ যুদ্ধের শেষ নেই।

(মহাদেব সাহা রচিত)

# রেনেসাঁর সূচনা : বাংলাদেশ

**৪ নভেম্বর, ১৯৭১**

রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ কথাটা আজ নানা সূত্রে—বিশেষ করে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ প্রগতি উপলক্ষে বারংবার উচ্চারিত। রেনেসাঁর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সামনে রয়েছে বহু-আলোচিত ইওরোপীয় রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁধর্মী নবজাগরণ। বর্তমানে বাংলায় যে মুক্তি আন্দোলন বাঙালি জীবনে দুকূলপ্লাবী জোয়ার সৃষ্টি করেছে আমি তাকে জাতীয় জীবনে রেনেসাঁর লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে চাই। এই জাগরণ বা অভ্যুত্থানকেই রেনেসাঁ না বলে রেনেসাঁর লক্ষণ বলতে চাই এই কারণে যে, রেনেসাঁ মুখ্যত গঠনধর্মী, আর এখন আমরা একটি অচলায়তন ভাঙার কার্যে ব্রতী—ভাঙার পরে গড়বার পালা—স্বভাবতঃই সে দায়িত্বও হবে দুরূহ এবং তাতে প্রয়োজন হবে মুক্তিযুদ্ধের মতোই চরিত্র ও সংকল্পের প্রতি একনিষ্ঠতা। বর্তমান সংগ্রামে যে দুর্জয় শক্তি ও মানসিক বলের পরিচয় বাঙালি দেখিয়েছে—তা মুক্ত নবজীবনকে অঙ্গীকার করার প্রবল বাসনা থেকেই জাগ্রত।

বাঙালিচিত্তের এই নবজীবন প্রয়োগের পশ্চাতে যেসব অনুপ্রেরণা কার্যকরী সে-সবের চরিত্রলক্ষণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব রেনেসাঁর সূচনা কতো স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীনতা নিজেই একটি জাতির জীবনে অনুপ্রেরণাস্বরূপ হতে পারে এবং তার নবজাগরণ সূচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সে আমাকে সফল হতে দেয়নি। দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করার চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তার জাগরণ-সম্ভাবনাকে সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় মেতে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জাবি চক্রান্ত। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর ফল হয়েছে বিপরীত। জলস্রোত যেমন আপন গতিপ্রবাহেই সব বাধাকে অতিক্রম করে সম্মুখগামী— তেমনি বাঙালির নবজীবনতৃষ্ণাও কোনও ষড়যন্ত্র বা বাধাকে গ্রাহ্য করেনি বরং বিরুদ্ধতা তার শক্তিকে সংহত করেছে।

রেনেসাঁর বিশেষত্বগুলিকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন :

১। জাতির অতীত ঐতিহ্য থেকে রস আহরণ এবং তার পুনর্মূল্যায়ন।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ।

৩। অপরিমেয় জীবনতৃষ্ণা।

মাটির রস যেমন বৃক্ষদেহে সঞ্চারিত হয়ে তাকে সজীব রাখে তেমনি ঐতিহ্যও একটি জাতির জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। পাকিস্তানি শাসকচক্র প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালি যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্য সম্পদের ওপর। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লোকশ্রুতিকে হিন্দুয়ানীর গোড়া অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা হয়, নজরুলের সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর উল্লেখের জন্যে তাকে পৌত্তলিক বলে উপেক্ষা করা হয়—সর্বোপরি দেশের শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে

ফতোয়া জারি করে বাঙালির প্রাণরস শুষ্ক করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে এই কীর্তিমানেরা। কিন্তু মনন-সমৃদ্ধ বাঙালি সেদিন ধরে ফেলে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপ। সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করল, বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্য-ইতিহাস, সাহিত্য সংস্কৃতি সমস্তই তার রক্তধারায় প্রবাহিত। বাংলা ভাষা তার বুকের রুধিরের চেয়েও প্রিয়। প্রমাণ দিতে হলো বুকের রক্ত দিয়েই। ভাষার জন্যে প্রাণদান! লিখিত হলো নব ইতিহাস। বাঙালি মুসলমান তার ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও খর্জুর কুঞ্জের পরিবর্তে আম্রবীথির শোভা নিরীক্ষণ করলেন। শুরু হলো বাঙালি আত্ম-অন্বেষা এবং তার পুনর্জাগরণ। ইওরোপের এবং উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও দেখি ঐতিহ্যের পুনরালোচনা এবং তার থেকে শক্তি সঞ্চয়। সুতরাং ঐতিহ্যের নব-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনেও রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছে এ ঘোষণা করা চলে নির্দ্বিধায়।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ রেনেসাঁর একটি বিশেষ লক্ষণ। সংস্কারের আবাসস্থল হলো অচল মন। যে মন নিত্য-বহমান সে মনে কখনো সংস্কারের জড়বুদ্ধি আশ্রয় পায় না, সেই অচল মনের নিত্য-সংগ্রাম বিশ্ব-মানবসমুদ্রের চিন্তা-তরংগে। মধ্যযুগের অন্ধকার অতিক্রম করে ইউরোপ রেনেসাঁ যুগের আলোকোজ্জ্বল পথে পা বাড়ালো মুক্তবুদ্ধির প্রদীপ হাতে নিয়ে। উনিশ শতকে বাংলার চিত্ত বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল ইউরোপের এই সচল মনের স্পর্শেই। মানস-মুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদক্ষেপের বেলায়ও একথা অনেকখানি সত্য। এই আলোকাভিসারের প্রথম যাত্রী ঢাকার শিখা গোষ্ঠী। সংস্কারমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের সেদিনের ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল অর্থপূর্ণ প্রয়াসের ফল ভেতরে ভেতরে আজও অবশ্যিই ক্রিয়াশীল। মহৎ কাজ বা আন্দোলন—তা যত সামান্যই হোক—এইভাবেই যুগাতিক্রমী হয়। সেদিন তাঁদের আন্দোলন নির্বিরোধে হয়নি। বর্তমান জাগরণের সূত্রপাতে বাধা এসেছে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল পাণ্ডাবিচক্রের তরফ থেকে। তাদের আশংকা, আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি হবে শোষণের প্রতিবন্ধক। তাই ওদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেয়াল গাঁথার আর আমাদের নিয়ত প্রয়াস দেয়াল ভাঙার। শিক্ষার সংকোচন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের লাঞ্ছনা, বাংলার ঐতিহ্যকে বিদেশীয় বলে ঘোষণা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা এক-জাতীয়তার ধারণাকে বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস—এর প্রত্যেকটি বাঙালিকে অন্ধকারে রাখার ষড়যন্ত্রের অংশ।

তবে এ ষড়যন্ত্রের পূর্ণ স্বরূপ বাঙালির নিকট পরিষ্কার। সর্বপ্রকার অচলায়তনকে দূর করে জাতির যাত্রা এক মহাজীবনের পথে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এক বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথে।

এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যি স্বীকারযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর এই রাজনীতি-প্রাধান্যের যুগে যেহেতু সবরকম আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজনীতির অবস্থান, সুতরাং বাংলাদেশের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি এখানেও নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এবং এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধজয়ের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সমগ্র জাতির পরম লক্ষ্য এক বিপুল জীবনের আহ্বান—সেই আহ্বানের পথে সার্থক পদক্ষেপেই হবে বাঙালি জীবনের সাবিক জাগরণ বা রেনেসাঁ।

(সুকুমার ঘোড় রচিত)

# রণাঙ্গনে বাংলার নারী

**৮ নভেম্বর, ১৯৭১**

পবিত্র রমজানের কঠোর উপবাস পালন করছেন এখন দেশ রণাঙ্গন বাংলার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষেরা। অশেষ পুণ্যের মাস এই রমজান। সাধারণভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহারবিরত থাকাই রমজানের বাহ্যিক উপবাস অনুষ্ঠান। এছাড়া কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করা রমজান মাসের অবশ্য করণীয় ইবাদত।

এবারের রমজান এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনের এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগসন্ধিক্ষণে। এখন আমাদের সন্তানরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার সার্বক্ষণিক যুদ্ধে নিয়োজিত, আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ তথা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। পবিত্র রমজানের কঠোর সিয়াম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ হয়েছে আমাদের মা-বোনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কৃচ্ছ্র সাধনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে তাঁর বেতার বাণীতে বলেছেন, গত বছরের রমজান মাসে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এক প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করেছে, প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবে সেবারে এখানে সংঘটিত হয়েছে এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুল সংখ্যক মানুষের আকস্মিক মৃত্যু। আর এবারের রমজানের আমরা সাত মাস আগে সূচিত এক আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরতিহীন পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করছি, যে আক্রমণ আমাদের ওপরে এসেছে এক পশু প্রকৃতির সামরিক জান্তার কাছ থেকে একান্তই অতর্কিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জীবনের তাগিদে আমরা সেবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিলাম, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছিলাম বানের জলে ভেসে যাওয়া ক্ষেতে-খামারে, আত্মীয়-স্বজনহারা ঘর-সংসারে। আর এবারের জাতীয় জীবনের তথা বাংলাদেশ ও বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমরা আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জীবন-যুদ্ধই দেশ রণাঙ্গন বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে এবারের রমজান মাসের পুণ্যময় শপথরূপে অভিষিক্ত হয়েছে।

বরকতের মাস রমজান। এ মাসে আমাদের মুসলিম পরিবারে সাধারণত বাড়তি খাদ্রসামগ্রীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইফতারি, সেহ্‌রি ইত্যাদির সরঞ্জাম হয়ে থাকে ব্যয়বহুল। সারাদিন উপবাস পালনের ওপর প্রচুর খাদ্য, ঘ্রাণযুক্ত ও সুস্বাদু খাবার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এবারে অন্য রকম। বাংলার গৃহিনীরা এবারে সর্বময় সংযম ও কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষপাতী। অল্পে তুষ্টির সুশিক্ষাই তারা আজ গ্রহণ করেছেন—গ্রহণ করেছেন জাতীয় স্বার্থের কারণেই।

আজকের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহেস্ সালামের সেই সুমহান হাদিসের শিক্ষাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—বলা হয়েছে, এক বেলার খাবার, উপস্থিত পরিধানের জন্য এক প্রস্থ কাপড় এবং এক রাতের মতো মাথা গুঁজবার আশ্রয় বা ঘুমোবার বিছানা যার আছে, সে কাঙাল নয়। তার জীবনে

থাকা উচিত পূর্ণ পরিতৃপ্তি। আমরা পরিতৃপ্ত। রমজানের সত্যিকার সংযম সাধনার শুভ মুহূর্তে আমাদের বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আমাদের পরিতৃপ্তি শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহারবিরত থাকাতেই নয়, বরং এই বরকতের মাসে ব্যয়-বাহুল্য বর্জন করে। আমাদের পরিতৃপ্তি উপবাসের চেয়ে কঠোর ত্যাগ বুকের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। আমাদের পরিতৃপ্তি দেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার কাজে আমাদের রক্তবীজ সোনামাণিকদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে।

ত্রিশদিনের আনুষ্ঠানিক উপবাস পালনের শেষে যে ঈদ— সে ঈদকে আমরা কিসের মূল্যে আনন্দমুখর করে তুলবো, সে ভাবনা থেকেও আজ বাংলার মা-বোনরা নির্লিপ্ত নন। আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার পশুশক্তি যেদিন আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে, সেদিনই জমে উঠবে আমাদের ঈদের উৎসব। এজন্যে যত ত্রিশদিনই আমাদের কেটে যাক, আমরা করে যাবো সংযম-সাধনা। একটি স্বাধীন জাতির ভবিষ্যৎ হিসাবে যেদিন আমাদের বংশধরবা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে, সেদিনই তো শুভ সমাপ্তি হবে আমাদের উপবাস পালনের।

এবারে আমরা দেখেছি, পূজোপার্বণে আমাদের দেশ ঢাক-ঢোল, সানাই-কাঁসি, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত হয়নি। কেবল কানে শুনেছি মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দ। পূজামণ্ডপে রক্তচন্দনের লেপ দেখিনি, দেখেছি রক্ত। দুর্বৃত্ত হানাদার সৈন্যদের রক্ত। আমাদের দুঃসাহসী গেরিলা সন্তানদের হাতের অস্ত্র অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে চলছে এক-একটি হানাদারের বক্ষদেশ। পূজোর আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি। মহিষাসুর বধের মাধ্যমে। বাংলা-মাকে প্রত্যক্ষ করেছি জাগ্রত রণচণ্ডীরূপে।

আমাদের সন্তানরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। আমাদের মা-বোনরা কেউবা তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন, কেউবা গৃহবাসে যুদ্ধকালীন কর্তব্য পালন করছেন। এ কর্তব্য বড় কঠোর, ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মতোই বাংলার মা-বোনরা আজ মেনে নিয়েছে জাতির এই মুক্তিযুদ্ধকে। এ যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় তাই হয়ে উঠেছে সুনিশ্চিত।

(বেগম উম্মে কুলসুম মুসতারী শফি রচিত)

# দেয়ালের লিখন

**১৭ নভেম্বর, ১৯৭১**

সব ভালো, যার শেষ ভালো। আর সব খবরের সেরা খবর শেষ খবর। সেই শেষ সংবাদটা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আসলে দেয়ালের লিখন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, বিবেচক ব্যক্তিরা, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা আগেভাগেই দেয়ালের লিখন পড়তে। পারেন, পড়ে সাবধান হতে পারেন।

দেয়ালের এই লিখনকে কেউ কেউ হয়তো বলবেন ভবিতব্য, আমি কিন্তু বলি—ইতিহাসের মার।

মরণকালে যাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়, সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে যারা কাণ্ডাকাণ্ড, হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়ে, তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দেয়ালের লিখন তারা পড়তে পারে না।

ইতিহাসের চরম মারের হাত থেকে তাদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

ইতিহাসের মার দুনিয়ার বার। সেই মারের রকমটা কেমন, শুনবেন? ইতিহাসের সেই মারের চোটে দখলীকৃত বাংলাদেশের একটা নতুন ছুতোর-শিল্প গড়ে উঠেছে। চালাও কারবার চলছে সেই ছুতোর-শিল্পের তার নাম হচ্ছে কফিন-শিল্প। ঢাকা, যশোর, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত তৈরি হচ্ছে শুধু কফিনের বাক্স। কফিনের বাক্সের যোগাড় দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ছুতোর-মিস্ত্রিরা। পাক হানাদারদের কর্নেল জাঁদরেলরাই বেনামীতে কফিন সাপ্লাইয়ের ঠিকেদারি নিয়ে বেশ টু-পাইস কামাতে শুরু করেছে। আর কামাইয়ের এই নতুন রাস্তাটা যাতে চালু থাকে, নতুন নতুন লাশ সরবরাহের রাস্তাটাও তারা তৈরি করে রেখেছে। মৃত্যুর এই ঠিকেদাররা সহজে তো আর এমন লাভের কারবার ছাড়তে পারে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব তরতাজা জল্লাদ আমদানী করা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর কবল থেকে, তাদের তো আর বিদেশে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না! তাদের লাশগুলো কফিনের বাক্সে পুরে তাদের স্বদেশে পাঠানো হবে।

বলিহারী আশা!

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধকে যখন এই জল্লাদরা নির্বিচারে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, নৃশংস হত্যার নব নব কৌশল উদ্ভাবন করে চরম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে হত্যা করেছে, তখন তারা এদেশের সেই শহীদদের দাফনের কথা ভাবেনি, মৃত্যুর পরে তাদের কবরে ঠাঁই মেলেনি। পথে-ঘাটে-ভাগাড়ে এদেশের বাপ-মা-ভাই-বোনের মৃতদেহ পড়ে থেকে পচেছে, শেয়াল-শকুনের খোরাক হয়েছে—কবরের কোলে তাই ঠাঁই দেয়া হয়নি, ইয়াহিয়ার জল্লাদরা সে সুযোগটুকুও দেয়নি। নিরপরাধ সদ্য বিবাহিত হারুনকে হত্যা করে ঠাটারী বাজারের পথের ওপরে ফেলে গিয়েছিল জল্লাদরা। হুকুম দিয়ে গিয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ সেই লাশ ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। তেমনি পড়ে থেকেছে যুবক হারুনের মৃতদেহ, ঠাটারী বাজারের পথের ওপরে। জল্লাদদের জিপ বার বার সেই মৃতদেহের ওপর দিয়ে গিয়েছে, এসেছে। আর দানবীয় অট্টহাসো ফেটে

পড়েছে ইয়াহিয়ার জল্লাদরা। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির ডোমের গাড়ি হারুনের নশ্বর দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে এসেছে ভাগাড়ে।

এ ইতিহাস শুধু এক হারুনের ইতিহাস নয়। ইয়াহিয়ার জল্লাদদের হাতে নিহত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বাবা-মা-ভাই-বোনকে তারা শেয়াল-শকুনের খোরাকে পরিণত করেছে।

আজ তারা আশা করে তাদের জল্লাদদের দেহ কফিনের বাক্সে পুরে স্বদেশ পাঠাবে দাফনের জন্যে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হবার নয়। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী জল্লাদদের কাউকেই স্বদেশের মাটিতে যেতে দেবে না—জ্যান্ত অথবা মৃত কোনো অবস্থাতেই না। এই বাংলাদেশের মাটিতেই নির্বান্ধব জল্লাদদের অন্তিম শয্যা রচিত হবে। কফিনের বাক্স যেমনকার তেমনি পড়ে থাকবে।

অনেক বিলম্বে হলেও এই অনিবার্য পরিণতির কথা জল্লাদদের প্রভুরা বোধ হয় কিছু কিছু অনুমান করতে পারছে। তাই তাদের এবং তাদের ভাড়াটিয়াদের কণ্ঠে ইদানিং যেন দরদের বান ডাকছে। তাই তারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর তরুণদের উদ্দেশ্য ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনী গাইছে। আহা, কু-লোকের কু-পরামর্শে বাংলাদেশের এইসব সরল নিরীহ ছেলেরা না-হক প্রাণ দিচ্ছে! ওহো, কি দুঃখের কথা!

একেই বলে গরুর শোকে শকুনের কান্না। বাংলাদেশের তরুণদের জন্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া গোষ্ঠী আর তার দালালদের কি দরদ।

বলি বেহায়া খান, বাংলাদেশের এই তরুণদের, তাদের মা-বাপ-ভাই-বোনকে কিভাবে তোমরা হত্যা করেছ। সে কথা আমরা ভুলে যাব ভেবেছ? ভুলে যাব ভেবেছ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির কথা? তোমরা ঘাতকরা হঠাৎ এক-একটা জায়গা ঘেরাও করে শিশু-কিশোর-যুবকদের ট্রাকে উঠিয়ে পাগলায় নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করেছো। তারপর বুড়িগঙ্গার পানিতে তাদের ঠেলে ফেলে দিয়েছো। শিশু-কিশোর-যুবকদের চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহ থেকে নিঃশেষে রক্ত শুষে নিয়ে হত্যা করেছ। তোমরা। তারপর ফেলে এসেছ ভাগাড়ে। শকুনে শকুনে সেখানকার আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের কণ্ঠে দরদের বান ডাকছে। তোমরা বেহায়া, তোমরা পশুরও অধম, দানবের চেয়েও নৃশংস। ততোধিক ঘৃণ্য তাদের দালালরা যারা আজ ইনিয়ে বিনিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদছে।

ঢাকার রেডিও স্টেশন থেকে পাগলার সেই বধ্যভূমি দূরে নয় যেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু, কিশোর ও যুবককে বেয়নেটের খোঁচায় আর রক্ত নিংড়ে নিয়ে ইয়াহিয়ার ঘাতকরা হত্যা করেছে। বধ্যভূমির আকাশে শুধু শকুন আর শকুন। সে বীভৎস নারকীয় কাহিনী জানে ঢাকার প্রতিটি মানুষ, শকুন-ছাওয়া আকাশ সকলে দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। কিন্তু শিউরে ওঠেনি ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দালালরা। তাই দিনের পর দিন মুক্তিশপথে দৃপ্ত বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদতে কণ্ঠটাও একটু কাঁপে না।

কোনোদিন কি তোমরা পাগলার কাছে বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাবে হাজার হাজার শিশু-কিশোর-তরুণ কণ্ঠের চাপা গোঙানি! আরও কান পেতে

থাকলে শুনতে পাবে শান্ত বুড়িগঙ্গার প্রাণের অশান্ত চাপা গর্জন। শুনতে পাবে বুড়িগঙ্গার আকাশ পাগলার বাতাস সারা বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের ডাক দিয়ে বলেছে—

তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো,
তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো।

সেই চাপা অথচ বজ্রনির্ঘোষ, সেই অবরুদ্ধ লাঞ্ছিত পরাধীন প্রাণের ক্রুদ্ধ হাহাকার যদি তোমরা শুনতে পেতে তাহলে বুঝতে—বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণপ্রাণ শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও কেন জানোয়ার হত্যার শপথ গ্রহণ করেছে। শুনলে বুঝতে পারবে তোমাদের জন্যে শেষ সংবাদে কোন্ বার্তা অপেক্ষা করছে।

(আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী রচিত)

# বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলার মাটিকে, বাংলার আকাশ-বাতাস-মাঠ-প্রান্তরকে এবং বাংলার মানুষকে এমন নিবিড় করে বোধ করি আর কোনও বাঙালি ভালোবাসতে পারেনি। বাংলাদেশকে ভালোবেসে, বাংলার নির্যাতিত শোষিত লাঞ্ছিত মানুষকে ভালবেসে শেখ মুজিবের ন্যায় দুঃখ ও নির্যাতন আর কোনও মানুষ সহ্য করেননি। বাংলার মাটির প্রবাহ শেখ মুজিবের রক্তে সৃষ্টি করেছে তরঙ্গ, বাংলার নিশ্বাস যেন শেখ মুজিবের নিজের শরীরের নিঃশ্বাসে পরিণত হয়েছে—বাংলার সমগ্র অস্তিত্বের সাথে তিনি যেন একাত্ম হয়ে পড়েছেন। তাই বাংলার শরীরে যখন যে ব্যথা বেজেছে সে ব্যথা যেন শেখ মুজিবের শরীরেও ঝংকার তুলেছে। বাংলার মাটিতে যুগে যুগে মানুষ জন্মেছে, কিন্তু "চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী" যিনি বলেছেন সেই বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাংলার প্রাণের সাথে একাত্মতা এমন গভীরভাবে কেউ অনুভব করেননি—আর পরবর্তীকালে শুধু বাক্যে নয়, শুধু অনুভূতি দিয়েও নয়, দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে, সকল শক্তি ও সাধনা দিয়ে যিনি বাংলার সাথে একাত্মতা প্রমাণ করেছেন তিনিই বাংলাদেশের নয়নমণি শেখ মুজিব। বাংলার অস্তিত্ব থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, "তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব" অথবা "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর" এই কবিতা শুনে যিনি বাংলার প্রেমে তন্ময় হতেন, তিনি আজ প্রিয় জন্মভূমি বাংলা থেকে দূরে—বহু দূরে শত্রুর কবলে, দানব পশুর পাহারায় আবদ্ধ—মুজিব আজ হৃদয়হীন পাষণ্ডের দেশ পাকিস্তানে বন্দিজীবনের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত। আজো বাংলার মাটিতে "কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে" এবং " সেখানে খয়েরী ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে"—কিন্তু এই দৃশ্য দেখে যে মানুষটি সবচেয়ে অভিভূত হতেন, যে সিংহপুরুষ সমগ্র বাংলাদেশকে হৃদয়ের কাছে আঁকড়ে ধরতে হাত বাড়াতেন সেই শেখ মুজিব বাংলা থেকে বহু দূরে শত্রুর কারাগারে শত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন অতিবাহিত করে চলেছেন। বাংলাদেশের কাছে এর চেয়ে দুঃখের, এর চেয়ে মর্মান্তিক বুঝি আর কিছুই হতে পারে না। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কি এক নিঃসীম শূন্যতা অনুভব করি, মনে হয়—

যতদূর যাই,
নাই নাই সে পথিক নাই,
মনে হয় : প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে

যতদূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।

কিন্তু না। কে বলে শেখ মুজিব আমাদের মধ্যে নাই। তুমি যদি বাঙালি হও, তুমিও যদি বাংলাদেশের মাটি ও আলো-বাতাসকে শেখ মুজিবের মতোই ভালোবেসে থাকো, তুমি একবার চোখ নিচু করে তোমার হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ— দেখবে শেখ মুজিব তোমার হৃদয়ে বাংলার প্রেমের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছেন আর তোমার হৃদয়কে বার বার নাড়া দিয়ে আহ্বান করছেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তুমি যদি মুক্তিযোদ্ধা হও, সংগ্রামী বাঙালি হয়ে পাকিস্তানের হানাদার কুকুরগুলোকে বিতাড়নের শপথ গ্রহণ করে থাকো— তুমি তোমার হৃদয়ে শেখ মুজিবকে খুঁজে পাবে, তোমার বাহুতে অজেয় শক্তি হয়ে, তোমার বক্ষে দুর্বার সাহসের প্রবাহ হয়ে শেখ মুজিব সর্বদা জাগ্রত রয়েছেন। শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির প্রতীক— তিনি আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে পারেন না, তিনি আছেন আমাদের সবার পাশে পাশে, আমাদের সবার একান্ত নিকটে। পিন্ডির কয়েদখানা শেখ মুজিবের দেহকে আবদ্ধ করে একটি বর্বর আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে—কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, বাংলাদেশের আজাদীর জনক শেখ মুজিবকে বিশ্বের কোনও শক্তির সাধ্য নেই আবদ্ধ করে, কোনও শক্তির সাধ্য নেই তাঁকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। তবু দুঃখ হয়, দুঃখে প্রাণমন সংকুচিত হয়ে আসে এই ভেবে যে, পাকিস্তানের বর্বরদের মধ্যে কি নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবের। বাংলাকে ভালোবেসে জীবনে যিনি সর্বদা যে-কোনও নির্যাতনকে এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত, বাংলার সেই সবচেয়ে দরদী সন্তান আজ একটি বাঙালির মুখ দেখতে পারছেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি দেখছেন সেই হীনতম জানোয়ারগুলোর মুখ, যাদের স্মরণ করলেও আজ প্রত্যেকটি বাঙালির হৃদয় প্রতিহিংসায়, ঘৃণায় ও ধিক্কারে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কবিগুরুর ভাষায় আল্লাহকে বারবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো;
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, বেসেছ তাদের ভালো?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে : শেখ মুজিব কি অন্যায় করেছেন যার জন্য আজ এই নিদারুণ শাস্তি তাঁর ভাগ্যে নেমে এল? বাংলাদেশকে ভালোবাসা, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য শপথ গ্রহণ করাই কি শেখ মুজিবের একটি অন্যায় কর্ম? আর তারই জন্য কি এই মহান নেতার ভাগ্যে এমন বিপর্যয়?

(ডক্টর মাযহারুল ইসলাম রচিত)

# দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আজ দেশের প্রায় সকল এলাকাই শত্রুমুক্ত। এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, যাকে ভালোবাসার অপরাধে বুলেট, বেয়নেট, মর্টার, মেশিনগানে লক্ষ লক্ষ প্রাণের অবসান ঘটেছিল। হারিয়েছি কতজন স্বামী, সন্তান, পিতা-ভ্রাতা। আত্মীয়পরিজন ভরা সুখের সংসার সর্বস্বহারা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কতজন বাহির হয়েছিল পথে—সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে।

আজ শত্রুমুক্ত অঞ্চলে ফিরে আসছে সবাই,—কিন্তু বসতি গড়ে তুলবে এ কোন্ মাতৃভূমির কোলে—চির সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা যার প্রতিরূপ এক পশুশক্তির দাহনে জনশূন্য, শস্যশূন্য গৃহশূন্য দগ্ধ হাহাকারের এক চরম অভিশাপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বর্বর ইয়াহিয়ার অনুচরবর্গের অঞ্চল ত্যাগের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হত্যা-যজ্ঞের অবশিষ্টরূপে রয়েছে দগ্ধ গৃহ, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভগ্নাংশ, স্বজন-সম্পত্তি হারা, শোকার্ত, বুভুক্ষু ও পঙ্গু একদল নরনারী, অনাথ শিশু আর বালক-বালিকা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শত শত মৃতদেহের ভাগ নিয়েছে শিয়াল, কুকুর আর শকুনের লড়াই। শূন্য ভিটায়, ভগ্ন গৃহে কারো বুকে জ্বলছে পিতা-মাতা, ভ্রাতা আর বন্ধু বিয়োগের বেদনা—স্বামী-সন্তান আর সুখের সংসার হারিয়ে কেউ বা কাঁদছে ভূলুণ্ঠিত হয়ে, কারো বা বেদনা ভাষাহীন। বর্বর হামলায় অঙ্গহীন, চক্ষুহীন, পঙ্গু নরনারী নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের দুশ্চিন্তার অর্ধমৃত। প্রিয় বিয়োগের বেদনা, সন্তান আর সম্পদ হারানোর শোক অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিকও নয়—আর এ শোকে সান্ত্বনার ভাষাও নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিষ্ফল শোকও পরিহার করতে হবে। অত্যাচারীর কবলমুক্ত পুনর্জীবিত আমরা। আমাদের এই নবজন্ম ও জীবন পরিচালনার সন্ধিক্ষণে পশ্চাতের শোক, দুঃখ, অনুশোচনাকে দূরে সরিয়ে একতা, শান্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সংগঠনে সক্রিয় হ'য়ে নতুন উদ্যমে বাঁচতে ও বাঁচাতে হবে। এই ভগ্ন হাটের দগ্ধভূমিতে, এই শোকার্ত, নির্যাতিত পঙ্গুদের মাঝেই আমাদের কর্মক্ষেত্র বিছাতে হবে। আত্মনিয়োগ করতে হবে বিপন্ন, বিপর্যস্ত, নিরন্ন এই জনসামাজের কল্যাণমূলক সংগঠনের দায়িত্বে।

দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে মুক্তাঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অব্যবস্থা ও ময়লা নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মশা-মাছির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

তদুপরি রক্তলোলুপ খানসৈন্যদের পলায়নের প্রাক্কালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে নিহত পরিত্যক্ত গলিত মৃতদেহ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যোগে এ সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যা সত্বর নিরসনে অগ্রণী হওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলের ভগ্ন, অর্ধভগ্ন নলকূপ মেরামত, প্রয়োজনবোধে নতুন নলকূপ চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, নর্দমা ইত্যাদি সংস্কারে নিজেদের মনোযোগী হওয়া,— যেখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লা ফেলার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা, জল ফুটিয়ে পান করা—স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রয়োজনীয় এই সমস্ত দায়িত্বগুলিতে

মেয়েরা নিজেদের দৃষ্টান্তে অপরকেও সতর্ক করতে পারেন। নালা-নর্দমায় জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ, ঘরে ঘরে টিকা-ইন্‌জেকশানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ইত্যাদিতে বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূলে মেয়েরা যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন।

বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত প্রায় পল্লী ও শহরগুলির যেখানে আহত-পীড়িতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা সহজসাধ্য নয়, সেখানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, ঘরোয়া চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলে ও সাধ্যানুযায়ী সহায়তা দানে মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারেন—আর্তের সেবা, সাহায্য, পথ্য ও পানীয়ের সমস্যা সকলের সম্মিলিত যত্নে সমাধান হয়ে যাবে।

তাছাড়া, বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিয়মিত বিদ্যালয় চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাঠাভ্যাসে দীর্ঘ অনভ্যস্ত ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে সমান সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে গেলে শিক্ষাদান কার্য অনেকটা এগিয়ে যাবে।

উপস্থিত আমরা সকলেই লুণ্ঠিত, সর্বস্বান্ত—তবুও তার মধ্যে কিছুটা সামর্থ আর সঙ্গতি যাদের আছে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে, কল্যাণমূলক কিছু কাজ পরস্পরের সহযোগিতা আর সামর্থের উপর নির্ভর করে আরম্ভ করতে পারি। শীতবস্ত্রের প্রয়োজনে সূতো—কাঁটা সংগ্রহ করে বসে গেলে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অপরের প্রয়োজনেও সাহায্য করতে পারি। রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডেজ, বন্ধনী, নবজাত শিশু আর প্রসূতির উপযুক্ত বস্ত্রাদি, সাময়িক সাহায্য, কিছু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, শিশুদের পাঠ্যবইও আমরা এ থেকে করে নিতে পারি।

হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারের শিকারে পরিণত, নির্যাতিত নিপীড়িত—যারা সমগ্র মাতৃজাতির অবমাননার কালিমা নিজের গায়ে মেখে জীবন্মৃতবৎ জনচক্ষুর অন্তরালে পড়ে আছে, আসুন আমরা এগিয়ে যাই ব্যথায় বিমূঢ় লাঞ্ছনা, বেদনা আর অপমানের বিষপানে জর্জরিত নিরুপায় সেই মা, বোন, বধূ আর কন্যাদের মাঝে। তাদের দুঃসহ দুঃখ ও লজ্জার গুরুভার যদি সমগ্র অন্তর দিয়ে লাঘব না করতে পারি, তবে বৃথাই আমরা মাতৃ অংকে জন্ম নিয়েছি। সমবেদনার প্রলেপে, দরদের অশ্রুতে আমরা মুছে নেব তাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত ডেকে নেব আমাদের সর্ব কাজে, সর্ব স্তরে। বেঁধে দেব তাদের ভাঙ্গা ঘর, ফিরিয়ে দেব তাদের সুখ শান্তি, সম্মান।

তবে, একতা, শৃঙ্খলা, শান্তি আর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যেন আমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাই। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিশ্বাস যেন আমাদের এই কল্যাণব্রতকে কলুষিত না করতে পারে। সকল স্বার্থ, নিন্দা, ভয়, ভেদ, বিবাদের সমস্যাজয়ী বাংলার নারী—আমরা আমাদের দেশকে, জন্মভূমিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে যদি এগিয়ে যাই, তবে সমস্যা যতই দুরূহ হোক না কেন, সুসমাধান যে হবেই একথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(বাসনা গুণ রচিত)

# স্বদেশ স্বকাল

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে পাকিস্তানের মৃত্যু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে। এবং সেই সাথে শেষ হলো শাসনের এবং শোষণের একটি কলংকজনক অধ্যায়। হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক তুলনাহীন বেঈমানকে, যে ভাইয়ের মুখোশ পরে সিন্দাবাদের গল্পের সেই অসহ্য দৈত্যটার মতো বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল গত চব্বিশ বছর ধরে, অবশেষে আমরা উৎখাত করলাম বাংলাদেশের মাটি থেকে। স্বেচ্ছায় ঘাড় থেকে নামেনি লোভী দৈত্যটা—বার বার প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে একটি পরাজিত আহত কুকুরের মতো সে আত্মসমর্পণ করেছে প্রাণ বাঁচাবার নিতান্ত জৈবিক তাড়নায়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর রচিত হবার সাথে সাথে মৃত্যু হলো উগ্র সাম্প্রদায়িকতার, যে বিষ একদিন বাংলাদেশের মানুষের উপর উগরে দেবার চেষ্টা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রীরা। বিগত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানি প্রভুরা এই উৎকট বিষবৃক্ষটিকে বাংলাদেশের মাটিতে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন শাসন এবং শোষণ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, একজন বাঙালিকে অন্য একজন বাঙালির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এর জন্যে আমদানী করার চেষ্টা চলেছিল সাম্প্রদায়িকতার—যা মানুষকে ঘৃণা করতে অবিশ্বাস করতে এবং অর্থহীন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

এই সচেতন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুরা এ কথা সত্যি, কিন্তু এই বিষবৃক্ষটির লালনে এবং পুষ্টিসাধনে নিরন্তর সহায়তা যুগিয়েছে একদল বাংলাদেশের ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী—যারা সামান্য কিছু লাভের আশায় নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমা প্রভুদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে পদলেহী কুকুরের মতো। সাম্প্রদায়িকতাকে বাংলাদেশের মাটিতে জিইয়ে রাখবার জন্যে এরা সব রকম ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে—এমনকি বাঙালি সংস্কৃতিকে সমূলে বিনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেও এদের বিবেকে বাধেনি। এরাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে উর্দু হরফে বাংলার প্রচলনের, এরাই ফরমান দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ বর্জনের, এরাই মুখর হয়েছে বাঙালি আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিরুদ্ধে। সর্বস্তরে এই উৎকট ব্যাধিটিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে সমগ্র দেশব্যাপী গড়ে তুলেছে বি-এন-আর, পাকিস্তান কাউন্সিল ইত্যাদি মগজ ধোলাইয়ের প্রতিষ্ঠান। এরাই বিকৃত করে রচনা করেছে ইতিহাস, এমনকি সুকুমারমতি শিশুদের মনটিকে পর্যন্ত বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে—সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে। এদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাঙালির বাঙালিত্ব, তার আচার-অনুষ্ঠান, তার ভাষা, তার আজন্মের অন্তরঙ্গ সংস্কৃতি। পশ্চিমা প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে এরাও গান ধরেছিল : বাঙালিয়ানা আসলে হিন্দুয়ানীরই নামান্তর মাত্র। বাংলা ভাষাটাই নাকি হিন্দুদের ভাষা—মায়ের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানের তাতে কোনও অধিকার নেই। অতএব একজন সাচ্চা পাকিস্তানি হতে হলে এইসব বাঙালিয়ানা সযত্নে পরিহার করতে হবে এবং তার বদলে গ্রহণ করতে হবে পশ্চিমা প্রভুদের প্রেরিত

সেই ঘৃণ্য ব্যাধিটিকে, যার নাম সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা। বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতি চলবে না, তার বদলে বরণ করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধোলাই হয়ে আসা 'পাকিস্তানি তমদ্দুন' নামক আজব বস্তুটিকে। এসব কু-কীর্তির বিনিময়ে কুচক্রী প্রভুদের কাছ থেকে কিছুই যে ইনাম মেলেনি তা নয়। এই পাপের পথে পদচারণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কুখ্যাত শিক্ষকটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ লাভ করেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ঘৃণ্য মীরজাফরটি পেয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ। এবং একই ভাবে লাভবান হয়েছে তাদের সমগোত্রীয় ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এই সমস্ত ঘৃণ্য দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত কোনোদিনই বিভ্রান্ত করতে পারেনি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে—ফেলে আসা কয়টি উজ্জ্বল গণ-আন্দোলন এবং আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায় এই মন্তব্যের সপক্ষে রায় দেবে। নগ্ন অর্থনৈতিক শোষণ যখন বাংলাদেশের মানুষকে নিক্ষেপ করেছে এক অকল্পনীয় দুঃসময়ের বিবরে, তাদের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে চক্রান্তের আসল রূপটি।

মুক্ত বাংলাদেশে তাই আজ সাম্প্রদায়িকতার কোনও ঠাঁই নেই। আপন ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে আমরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সূর্যালোকে আলোকিত হয়েছি। ধর্মকে তাই আজ আমরা আর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে রাজী নই। আমার সোনার বাংলাদেশে তাই আর সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে কোনও কথা নেই—প্রতিটি মানুষের আপন আপন ধর্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকার নিয়ে বাঁচবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে, একথা আলোচনা করতে গিয়ে এই মুহূর্তে—অনেক দিন আগে পড়া সুসাহিত্যিক শ্রী মনোজ বসুর একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্পের কথা আমার মনে পড়ছে। দেশ বিভাগকালীন অর্থহীন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার পটভূমিতে লেখা গল্পটি। এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করত দু'টি পরিবার—একটি হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। এই দুই পরিবারের সম্পর্ক ছিল নিবিড় সম্প্রীতির এবং অন্তরঙ্গতার। তারপর—একসময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের একটি ছোট্ট ঢেউ সেই সুদূর গ্রামটিতেও গিয়ে লাগল এবং ফাটল ধরল সম্পর্কের একে অন্যকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। বন্ধ হয়ে গেল মেলামেশা পর্যন্ত। দু'বাড়ির দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে কিন্তু এতসব জানতো না। তাই বাপ-মা'র নিষেধ সত্ত্বেও তাদের লুকিয়ে মেলামেশা বন্ধ হয়নি।

একদিন হিন্দু বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটি মুসলমান বাড়ির মেয়েটিকে বলল, 'জানিস, মুসলমানরা হিন্দুদের দেখলেই কেটে ফেলছে।'

তুই কিচ্ছু জানিস না, মেয়েটি বলল। আসলে হিন্দুরাই মেরে ফেলছে মুসলমানদের। একটি নীরবতা।

তারপর মেয়েটি বলল, আচ্ছা তুই 'হিন্দু' দেখেছিস?

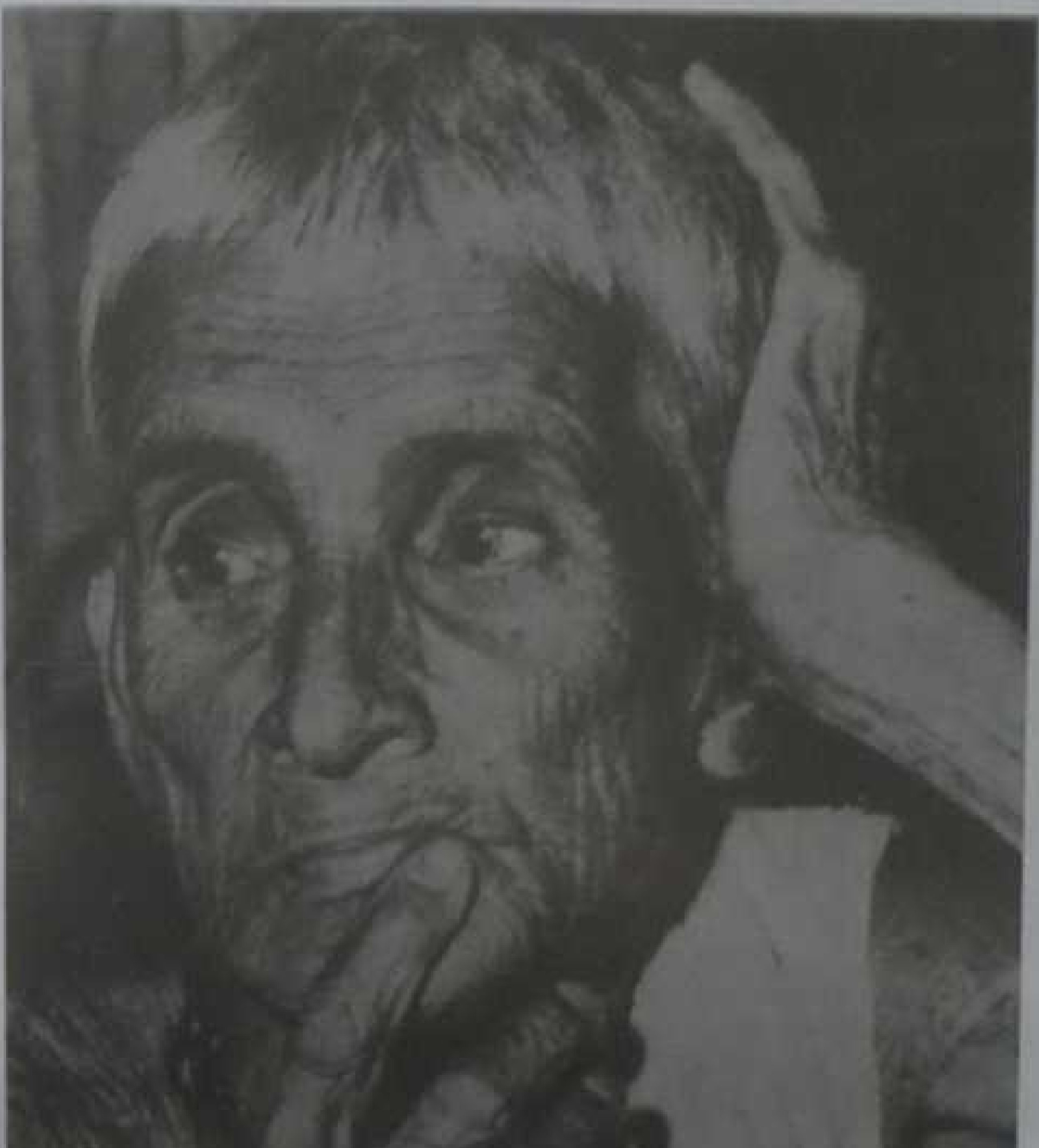
ছেলেটি বলল, নাতো! তা তুই মুসলমান দেখিস নি? মেয়েটি উত্তর করল, না রে! দরকার নেই বাবা ওসব হিন্দু মুসলমান দেখে।

ছোট্ট ছেলেমেয়ে দু'টি খুবই আশ্বস্ত বোধ করল এই ভেবে যে, ওদের কাছাকাছি কোনও 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' নেই।

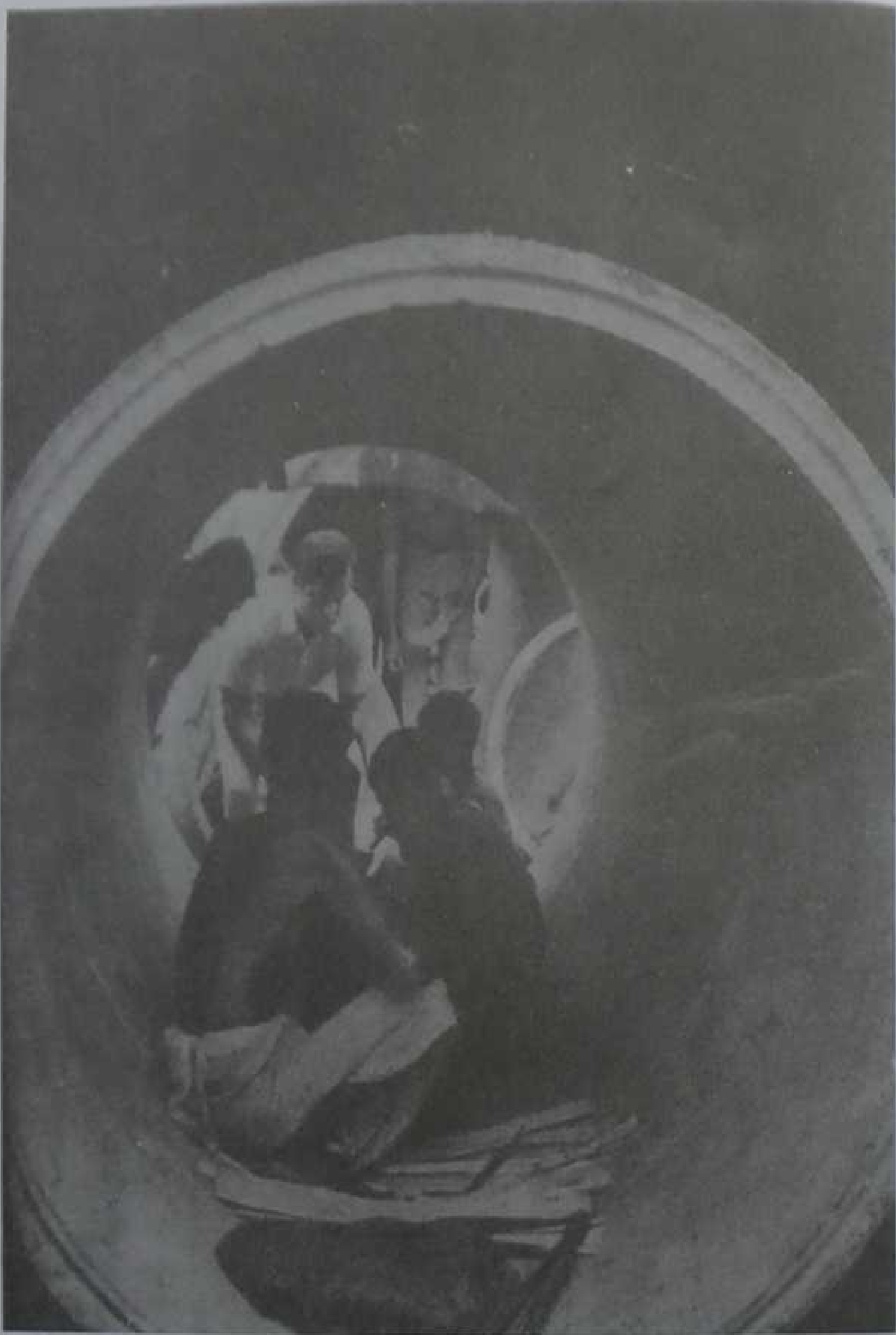
গল্পটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কি হাস্যকর এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, যার নিরর্থকতা ছোট্ট দুটি ছেলেমেয়েও তাদের সহজাত বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে।

উগ্র ধর্মান্ধতা অনেক দেখেছি আমরা বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছি তার বিষাক্ত নখরে। তাই বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে এই কুৎসিৎ বিষবৃক্ষটিকে ঠাঁই দিতে আর প্রস্তুত নই আমরা।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)



উত্থান-পতনময় বহু ইতিহাসের সাক্ষী শত বছরের পুরাতন এই মুখ। দেখেছেন ইংরেজ এল, গেল। দুভাগ হল সোনার দেশ। দেখলেন আয়ুবের উদ্ধত শাসন। ইয়াহিয়ার জঙ্গী বর্বরতা। বৃদ্ধার সব গেছে। এখন আছে কেবল বিড়ম্বনাময় জীবনের মলিন স্মৃতিগুলি।



পাইপবাসী মানুষের পাশে আমেরিকার কেনেডিভ্রাতাদের কনিষ্ঠ ভাই



দুই বন্ধু। ভারতীয় জওয়ান ও শেখ রাসেল।





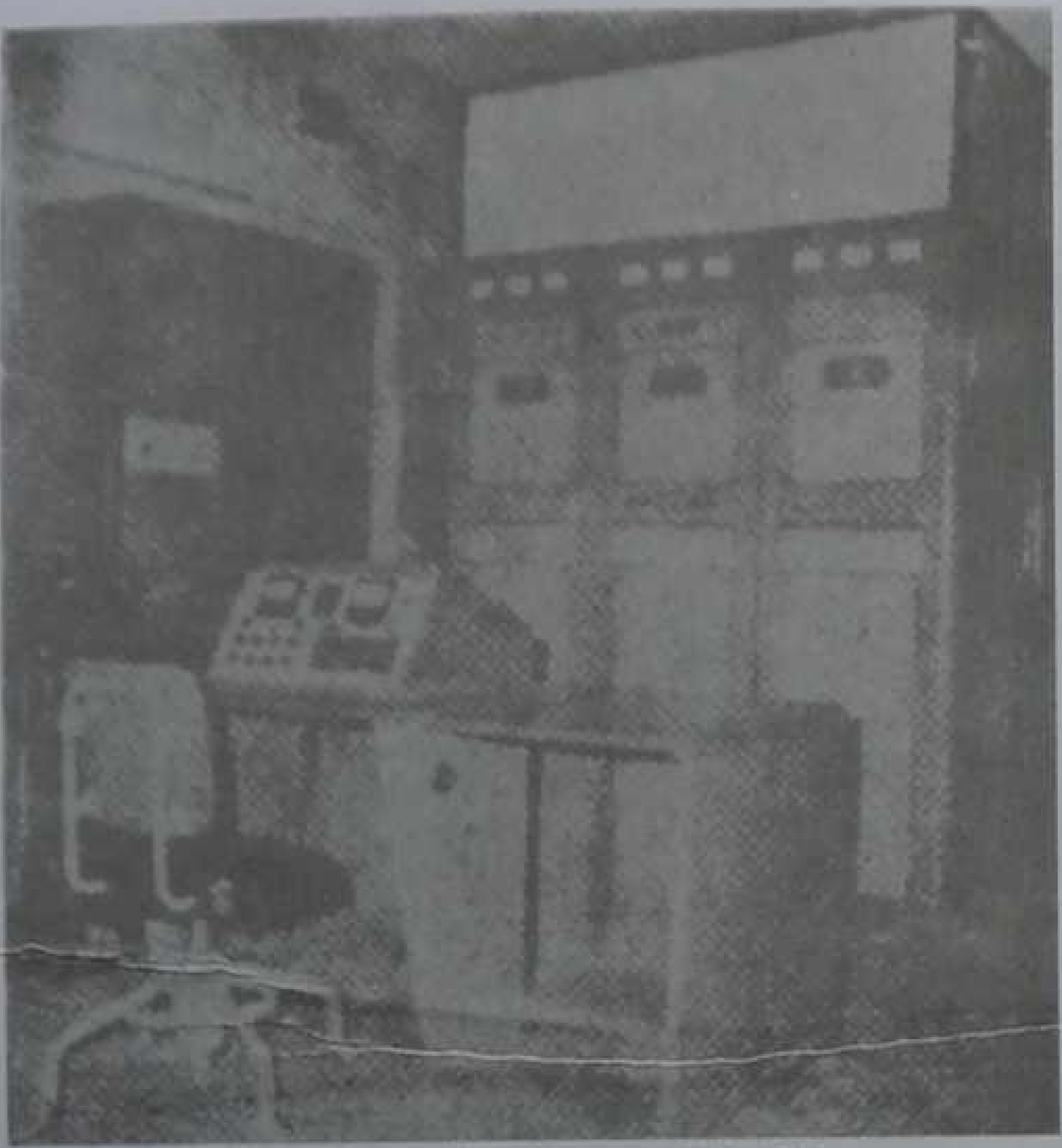
বিদেশে প্রথম বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের পতাকা তুলছেন মিশন প্রধান হোসেন আলী। তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য স্বীকার করেন।



১০ জানুয়ারি। সোমবার শীতের সকালবেলা। লন্ডন থেকে ব্রিটিশ কমেট বিমানে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বাঁ দিকে একেবারে শেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।



কর্নেল (পরে জেনারেল)
মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী,
পিএসসি প্রধান সেনাপতি



চট্টগ্রাম বেতারের ঐতিহাসিক কালুরঘাট ট্রান্সমিটার



স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র। এ সব বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে শিল্পীগণ সৃষ্টি করতেন সুরের মূর্ছনা, যা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে যোগাত অপরিসীম তেজ এবং মনোবল।



কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের স্টুডিও বুথ। এই বুথ থেকেই মেজর (তৎকালীন এবং পরবর্তীকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেছিলেন



কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন









"শুধু একবার দেখে যাও মা
ইতিহাস ওদের করেনি ক্ষমা ।"



রাজধানী শহর ঢাকার উপকণ্ঠে আদমজী মিলের দক্ষিণের দেয়ালের পাশে বধ্যভূমির একটি দৃশ্য। আপনার আমার বাবা, মা, ভাই, বোনের এই হাড়ের ঘর্ষণেই আজ স্বাধীনতার সূর্য জ্বলে উঠেছে। পাকিস্তানি নরপিশাচরা এঁদের পরিকল্পিত উপায়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।



এই সেই ব্যাগ, যাতে বেতারের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের রেকর্ড করা টেপ প্রচারের উদ্দেশ্যে ট্রান্সমিটারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। পথের অসংখ্য জনতার অসংখ্য ব্যাগের ভীড়ে এই ব্যাগটি মিশে যেতো। কেউ জানতো না এই ব্যাগেই রয়েছে তাদের প্রাণপ্রিয় বেতারের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান; সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের খোরাক।



বাঁদিক থেকে চেয়ারে উপবিষ্ট — এ.কে. সামসুদ্দিন, মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, টি.এইচ. শিকদার, শামসুল হুদা চৌধুরী, তাহের সুলতান, বেলাল মোহাম্মদ, কাজী হাবিবুদ্দিন, আলী রেজা চৌধুরী।
পেছনে দাঁড়ানো– মোতাহার হোসেন, মনজুর কাদের (বাবুল আখতার), আবু ইউনুস, মোহসিন রেজা, মাহমুদ ফারুক, দুলাল, নেওয়াজিস হোসেন, নাসিম চৌধুরী।



আশফাকুর রহমান



সৈয়দ আবদুস শাকের



শহীদুল ইসলাম



আশরাফুল আলম



সৈয়দ হাসান ইমাম



জাহিদ সিদ্দিকী



আমিনুর রহমান



সারফুজ্জামান



অনু ইসলাম



আমিনুল হক বাদশাহ্



এম. আর. আখতার



ফয়েজ আহমেদ



আবদুল তোয়াব খান



সলিমুল্লাহ (ইলিয়াস আহমেদ)



নোয়াব জামান চৌধুরী



মাযহারুল ইসলাম



চূড়ান্ত বিজয়ের পরদিন অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর '৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সমভিব্যাহারে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মী-কুশলীদের ধন্যবাদ জানাতে। সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের শুভাগমন উপলক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম এর ভারপ্রাপ্ত এম.এন. এ জনাব আবদুল মান্নান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (পাশে উপবিষ্ট) তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না।

মাঝে জনাব আবদুল মান্নানের ভাষণ রেকর্ড করে নিচ্ছেন অনুষ্ঠান প্রযোজক (তৎকালীন) জনাব আশরাফুল আলম।

## যাঁরা বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের দুঃসাহস করেছিলেন



বেলাল মোহাম্মদ
(দলনেতা, পরবর্তীকালে অনুষ্ঠান সংগঠক)



আবুল কাশেম সন্দ্বীপ
(প্রথম কণ্ঠ, পরবর্তীকালে সাব এডিটর, বার্তা)



সৈয়দ আবদুস শাকের
(প্রকৌশলের দায়িত্বে ছিলেন)



আব্দুল্লাহ্ আল ফারুক
(অনুষ্ঠান প্রযোজক)



আমিনুর রহমান
(প্রকৌশল সহযোগী)



রাশেদুল হোসেন
(প্রকৌশল সহযোগী)



মোস্তফা আনোয়ার
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, নাটক)



সারফুজ্জামান
(প্রকৌশল সহযোগী)



রেজাউল করিম চৌধুরী
(প্রকৌশল সহযোগী)



কাজী হাবিবুদ্দিন
(অনুষ্ঠান সচিব)



বাঁ থেকে সামনে উপবিষ্ট : এ. কে. শামসুদ্দিন, টি.এইচ. শিকদার, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মেসবাহউদ্দিন আহমদ, সুমিতা দেবী, শামসুল হুদা চৌধুরী, তাহের সুলতান, বেলাল মোহাম্মদ, সুব্রত বড়ুয়া, ম. মামুন, কাজী হাবিবুদ্দিন, রাশেদুল হোসেন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মাহমুদ ফারুক।

মধ্যে দাঁড়ানো : অরুণ কুমার গোস্বামী, দিলীপ কুমার ধর, অনিলকুমার মিত্র, হাবিবুল্লাহ্ চৌধুরী, সফিউর রহমান দুলু, আমিনুর রহমান, আপেল মাহমুদ, মোমিনুল হক চৌধুরী, কালিপদ রায়, আবু ইউনুস, শামসুল হক, বিমল কুমার নিয়োগী, নাসিম চৌধুরী, মান্না হক, আলী রেজা চৌধুরী।

পেছনের সারিতে দাঁড়ানো : নেওয়াজিস হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, বাবুল আখতার, রেজাউল করিম চৌধুরী, শাহ আলী সরকার।



এম. আর. আখতার
(বিখ্যাত চরম পত্রের লেখক এবং পাঠক)



আমিনুল হক বাদশা
(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক)



কামাল লোহানী
(সম্পাদক, বার্তা বিভাগ)



আশফাকুর রহমান খান
(অনুষ্ঠান সংগঠক, সঙ্গীত ও উপস্থাপক)



আলমগীর কবীর
(অনুষ্ঠান সংগঠক, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম)



টি.এইচ. শিকদার
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, অগ্নিশিখা)



তাহের সুলতান
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, সঙ্গীত)



আলী যাকের
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম)



আশরাফুল আলম
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, ওবি এবং সাক্ষাৎকার)



জাহিদ সিদ্দিকী
(অনুষ্ঠান প্রযোজক, উর্দু)



শহিদুল ইসলাম
(প্রযোজক, সোনার বাংলা ও বাংলা সংবাদ পাঠক)



বাবুল আখতার
(বাংলা সংবাদ পাঠক)

# বাংলার সংগ্রামী জনতা প্রস্তুত

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মহম্মদপুর কলোনীর একমুঠো মাটি একটা কাগজে মোড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কালচে মাটি। রক্ত আর মাটি মিশে জমাট বেঁধে গেছে। কার রক্ত? হয়তো মুনীর চৌধুরী কিংবা ডা. ফজলে রাব্বির। ডা. আলীম চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, গোলাম মোস্তফা, সিরাজউদ্দিন হোসেন খান—কার রক্ত মিশে আছে এ মাটিতে? জানিনে। হয়ত সকলের রক্তই মিশে একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতার জঘন্যতম নিদর্শন। বুদ্ধিজীবীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিশ্বমানব ঘৃণায় শিউরে উঠেছে; বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের কণ্ঠ। মোঙ্গল হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করেছিল। বাগদাদের রাজপথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হয়নি। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ যুগ ধরে সযত্নে সঞ্চিত গ্রন্থাগারে আগুন দিয়ে বহ্নি-উৎসব করেছিল। রাশি রাশি পোড়া গ্রন্থের ছাই ইউফ্রেটিস নদীর জল কালো করে দিয়েছিল। ৮০০ বছর পর ঢাকার বুকে বিংশ শতাব্দীর হালাকুরা যে ঘটনা সংগঠন করলো তাতে অতীতের হালাকুও লজ্জা পেতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শরীক। কারাবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। ফজলে রাব্বি বিখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসক, ডা. আলীম চৌধুরী চক্ষুরোগ বিশারদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য ইতিহাসের অধ্যাপক, সাংবাদিক মোস্তফা, নজরুল, কেউ-ই কেউ-ই রেহাই পেলো না। বাংলাদেশের মাটিকে, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসার এবং পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী হবার চরম খেসারত দিতে হলো তাঁদের। থোকা থোকা রক্তে বাংলা মায়ের পায়ে আল্পনা এঁকে গেলেন তাঁরা।

বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশের জনতার রক্তদানের ইতিহাস। ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরায় সামান্য মানবিক দাবী আদায়ের জন্য আনোয়ার, হানিফ, কম্পরাম এদের সাতজনকে প্রাণ দিতে হলো। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী করার অপরাধে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকচক্রে সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হলো বরকত সালাম, রফিক, জব্বারদের। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে বাস কর্মচারী ওয়াজিউল্লা প্রাণ দিলেন। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা দাবী, বাংলার স্বাধিকার দাবীতে আবার কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুনে লাল হলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, টংগীর মাটি। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ১১-দফার দাবীতে আসাদ, ডা. শামসুজ্জোহা, মতিয়ার, রোস্তাম এমনি শত শত লোক বুকের রক্তে দেশমাতৃকার তর্পণ করলেন। ১৯৭১ সালে স্বৈরাচারের অবসানের জন্যে আবার শুরু হলো প্রাণ বলিদান পর্ব। ফারুক ইকবাল, পাবনার এ্যাডভোকেট আমরীদ্দীন, যশোহরের মসীউর রহমান, রাজশাহীর বীরেন সরকার, ঢাকার ডক্টর মনিরুজ্জামান, ড. গোবিন্দ দেব, ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী এমনি লক্ষ লক্ষ লোকের বুকের রক্তে বাংলার মাটি আজও ভেজা। একটা অপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল রক্তদানের

মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে শত্রুর কলুষস্পর্শ থেকে মুক্ত করেছে।

বিগত চব্বিশ বছরে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছে। সেই মহান অপূর্ব সংগ্রামের পরিণতি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনতার চূড়ান্ত বিজয়, আজকের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হবার সংগে সংগেই বাংলাদেশের জনতার সংগ্রামের অবসান হয়েছে—এই চিন্তা ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত জনতা আজ এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সংগ্রাম হলো দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর হানাদারেরা বিগত নয় মাসে সুপরিকল্পিত উপায়ে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মনীষা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বত্র এক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালিয়ে সোনার বাংলাদেশকে আপাত-শ্মশানে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, কলকারখানা এবং হাজার হাজার বাড়ি তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আত্মসমর্পণ করবার প্রাক্কালে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলো লুঠ করে সমস্ত টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানের Gold Reserve রাখা হতো করাচী স্টেট ব্যাঙ্কে। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে কোনও স্বর্ণ রক্ষিত হতো না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সদ্যজাত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যে-কোনও দেশের অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধির জন্যে স্বর্ণের একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান শুধু বাংলাদেশ সরকারের একার হাতে নিবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের যে সাড়ে সাত কোটি জনতা তাদের অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং নিষ্ঠার দ্বারা বাংলার মুক্তি অর্জন করলো, সেই সাড়ে সাত কোটি জনতাকেই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কঠিন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর করবে। আর একথাও জানা যে, বাংলার সংগ্রামী জনতা এককণ্ঠে সেই দাবীর প্রতি জানাবে তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা। প্রস্তুত সংগ্রামী বাংলার সংগ্রামী জনতা। জয় বাংলা।

(গাজীউল হক রচিত)

# বাংলাদেশের পুনর্গঠন—৩

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ধর্মের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগতিক তথা রাজনৈতিক কাজে লাগানো হয়েছিল বলেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান টেকেনি। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পটভূমি ছিল ধর্ম। সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ লক্ষ প্রাণের রক্তে অর্জিত হলো—তার সংগ্রামী পটভূমিতে যে সত্যটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তা হলো দেশপ্রেম। দেশের মাটির প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা— দেশের সংগ্রামী শাসনক্ষমতার সংগে দেশবাসীর প্রাণের মিলন। আজ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি নবজাত রাষ্ট্রের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে নতুন স্বপ্নের হাতছানি—কল্পনার অজস্র বিস্তার।

এদেশ কেমন হবে—এ প্রশ্নের উত্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। 'আপনারা কিভাবে এদেশকে গড়ে তুলতে চান'—এর উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ কেমন হবে। সত্যি সত্যিই অনেক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা তুলে যে নতুন রাষ্ট্র আজ এলোমেলো, এবড়োখেবড়ো, বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে আছে তাকে আমাদের মনের মতো করে সাজাতে হবে—রূপায়িত করতে হবে আমাদের প্রতিটি স্বপ্নকে।

এই স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো নিষ্ঠা আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সহযোগী চেতনার। হানাদার বাহিনীর চলাচলের পথ দুর্গম করে তোলার জন্য একদিন যে পুল, কালভার্ট আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম—আজ সেই পথেই আমাদের নিত্যাদিনের যাত্রা। এই বাড়ির পাশের পুলটির পুনঃনির্মাণের জন্য আপনি কি সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবেন? নিশ্চয়ই নয়। আপনার কাজ হবে প্রাথমিকভাবে পার্শ্ববর্তী মানুষের মধ্যে এমন এক চেতনার জন্ম দেয়া—এমন এক নতুন কর্মপ্রেরণাকে সঞ্চরিত করা যাতে শারীরিক সাধ্যের অন্তর্গত পরিশ্রমে দেশের যে কোনো পুনর্গঠন কাজে নির্দ্বিধায় অংশ নিতে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসে। এ ভাঙা পুলটি আপনারাই পুনঃনির্মাণ করতে পারেন। অর্থের সংগে কর্মের নিষ্ঠা যুক্ত না হলে অপচয়কে রোধ করা যায় না।

বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সর্বপ্রথম এই ভেঙেপড়া যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যতশ্রীঘ্র সম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেঘনা নদীর ওপর ভৈরব রেলব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতো বড়ো বড়ো সেতুগুলোর পুনঃনির্মাণের কাজে সরকার ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ বৃহৎ দায়িত্বগুলো নিশ্চয়ই সরকারি ব্যবস্থাধীনেই ত্বরান্বিত হবে—কিন্তু বাড়ির পাশের, গ্রাম-গঞ্জের ছোটখাট পুলগুলো গ্রামীণ স্থানীয় চেষ্টায় মেরামত করা অসম্ভব কিছু নয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে সাধারণ মানুষকেই আপনার বাড়ির পাশের যে স্কুলটি কিম্বা আপনার বাড়ির পাশের মসজিদটি, যা কিছুদিন আগে হানাদার বাহিনীর কামানের গোলা বা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপনাদের দায়িত্ব নিজেদের প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজনীয় পুনঃনির্মাণ। সরকারকে ছোটখাট পুনর্গঠনের দায়িত্বের দিকে টেনে না এনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টাকে কাজে

লাগাতে দেয়া। আজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি যে মহান দায়িত্ব সকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সমবেতভাবেই সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

দীর্ঘদিন শত্রুকবলিত বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদন অসম্ভব রকম হ্রাস পাওয়ায় এবং বহিঃবিশ্বের সংগে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ায় গ্রামে গ্রামে তেল, কেরোসিন, লবণ, সাবান, কাপড়, ঔষুধপত্র প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। যোগাযোগের অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারী-মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াবে। স্থানীয়ভাবেই গ্রামে গ্রামে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসামরিক প্রশাসন গ্রামে গ্রামে চালু হবার সময় এসে গেছে। সুযোগসন্ধানী, যারা সময়ের সুযোগ নিতে চাইবে—দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তিই তাদের প্রাপ্য হবে।

আগামী শুভ নববর্ষের পদার্পণের সংগে সংগেই পূর্ণ উদ্যমে শুরু হবে বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশবাসীর পবিত্র দায়িত্ব—শরণার্থীদের পুনর্বাসন। এই পবিত্র মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সাহায্য, সহানুভূতি ও সশ্রম আত্মত্যাগ অপরিহার্য। এ দায়িত্ব সরকারের নয়—এই পুনর্বাসনের নৈতিক ও মানসিক দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় যে সমস্ত দালাল অনেক-ভাবে অপরের সম্পত্তি, বাড়িঘর ও অস্থাবর মালামাল নিজেদের দখলে রেখেছিল—সরকারি হস্তক্ষেপের পূর্বেই সবকিছু ফিরিয়ে দিয়ে তাদের কর্তব্য হবে পুনর্বাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করা। অবৈধভাবে অপরের সম্পদ ভোগ-দখলের যে-কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আপনার বাড়ির পাশেই তার নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে দীর্ঘ ন'মাসের অনিশ্চিত জীবনযাপনের পর আজ যারা ঘরে ঘরে ফিরবেন—পুরনো বিদ্বেষ, স্বার্থের ব্যাঘাত সবকিছু ভুলে গিয়ে আমাদের উচিত হবে ফিরে আসা শরণার্থীদের দিকে বন্ধুত্বের কোমল হাতকেই প্রসারিত করা। ভাই, বন্ধু ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পরস্পরের সহযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। জনসাধারণের মধ্যে এই শুভবুদ্ধির প্রসার ঘটাতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘৃণা নয়, প্রতিবেশী বলে বুকে টেনে নিতে হবে পরস্পরকে।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টার সফলতা জনসাধারণের সহযোগিতা নির্ভর। যাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, তাদের জন্য ঘর তুলতে হবে—প্রয়োজনবোধে, অর্থ, প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সাহায্য করতে হবে। আমাদের। যে অশুভ শক্তি একদিন তার অসহনীয় বর্বরতা দিয়ে এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া করেছিল—অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা সেই শক্তিকে পরাজিত করেছি। সেই ত্যাগের মহান আদর্শ, সেই সহযোগিতার ঐতিহ্যই বাংলাদেশের প্রতিটি পুনর্গঠনে আমাদের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করুক। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই আমাদের আকাংক্ষিত সোনার বাংলাদেশ নতুন আলোয় স্নাত হবে।

(নির্মলেন্দু গুণ রচিত)

# পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

... ১৯৭১

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁর আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রতিযোগিতা-মূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে থাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, এরা সবাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগপত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নূন আর করাচীর আই, আই, চুন্দ্রিগড়ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে—একটি সামরিক 'জুন্টা'র সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান, মোনায়েম খান, সবুর এরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনসীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে। আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান—পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারিদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর জন্ম, লালন-পালন ও মৃত্যু, সেইহেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তারা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তাঁরা ভাবতেন না, কিম্বা ভাববার অবসর পেতেন না জনগণের কোনো তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। জনগণের আশা-আকাংক্ষা, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবী-দাওয়ার প্রতি সব সময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরিবের দল আরো গরিব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র পাঞ্জাবি ভূস্বামী, পাঞ্জাবি ধনপতি, পাঞ্জাবি আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবি সামরিক 'জুন্টা'র দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো,

সেই হেতু পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশ, পূর্ব বাংলা বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছে পূর্ব বাংলা ও পূর্ব বাংলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা এই শাসক চক্রের হাতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়-করা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসতো পূর্ব বাংলা থেকে, তবু পূর্ব বাংলাকে তার আয়ের সিকিভাগও ভোগ করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যবহার করত পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরির কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাকি সরকারের আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ আসতো পূর্ব বাংলা থেকে, তবুও শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছয় আনা তিন পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র এক পাই। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু পাঁচ টাকা দুই আনা সাত পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-বছরে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। যে-বছরে ঢাকা রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা। সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচজন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বইজন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১.৯ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮.১ ভাগ পূর্ব বাংলার বাঙালি। কী নিদারুণ বৈষম্য! কী ভয়াবহ শোষণ! পূর্ব বাংলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবি করল। স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়-দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলা হচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়।

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। পাকিস্তানের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যে-কোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবি তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবি তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গী আইয়ুবশাহী তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে, যখন অসংখ্য নরনারীকে লক্ষ করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে তখন পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে—এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবি করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সবসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিঘ্নে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তানে একসঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব একসঙ্গে গর্জে উঠল।

খাইবার থেকে টেকনাফ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯-এর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া—হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালি-অবাঙালি বিরোধ, পাঞ্জাবি-পাঠান বিরোধ, শিয়া-সুন্নি বিরোধ। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যখনই গদীচ্যুত হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই যে-কোনো একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯-এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তাঁর পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক-পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন—কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলছিলেন তিনি। নিজেকে সাধু-সজ্জন হিসেবে উপস্থিত করছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ব বাংলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণ হারাল। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো হয়নি।

এই দুর্যোগের সময়ে হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য, বিদেশী সাংবাদিক, বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল পূর্ব বাংলার ঝড়-উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক চক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্ত্বনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লাগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণ কাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন এসে নামবে আমাদের মাটিতে? আমাদের সৈন্যরা বসে বসে করছে কি? এত বড়ো দুর্যোগ ঘটে গেল কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদে বসে বসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেল কোথায়? নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। দশ লক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছ। কিন্তু আরো দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে খুব শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ব বাংলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোনো বিশ্বরাজনীতির দাবা-খেলার ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এল। যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিতও হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল পাকিস্তানের নাগরিকেরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকামী দুটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো, আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আর প্রদেশ তিনটি হলো—পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বাকী দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্‌স্ পার্টি। পিপল্‌স্ পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেরও একচেটিয়া শোষণের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে— সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো, ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচনে কোনও একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরোনো পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শাসকচক্র। আবার সেই পুরনো বিভেদের রাজনীতির দাবা খেলা শুরু করল তারা। এবং এই দাবা খেলার সুযোগ্য সহযোগী হিসেবে ভুট্টো আর কাইউম খান দুজনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রভুক্ত।

খান আবদুল কাইউম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকাকলীন ছয়-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আসলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভূস্বামী।

ভুট্টো এবং কাইউম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে—এক ঢিলে চার পাখি মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে, ভুট্টো ও কাইউম খানের মাধ্যমে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মাটিতে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে একটা সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তাঁরা—তাঁদের অনুচর মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু, পূর্ব বাংলার সদাসচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর মুখোশের কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা যাবে না।

এই ধরনের একটি অযৌক্তিক দাবি ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা— গোপন বৈঠক ও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার

প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চে আহূত সভা কোনো কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতবী ঘোষণা করে দিলেন—যদিও জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনের যোগ দেবার জন্যে ঢাকা এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কাউইম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্তের কথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে একরাতে তাঁর বর্বর সৈন্যেরা প্রায় দু-হাজার দেশপ্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসকচক্রের ভাড়াটে দালালরা পূর্ব বাংলায় বাঙালিও অবাঙালিদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই সমান অধিকারের দাবিদার, সবাই পরস্পরের ভাই। শাসকচক্র দাঙ্গা বাধাতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু অহিংস জনতার ওপরে তাঁরা গুলিবর্ষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গবর্নর হিসাবে নিয়োগ করে ঢাকার পাঠান হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল—যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্যে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েকশ' বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকায়। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী; এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ইয়াহিয়া খান আর তার সামরিক 'জুন্টার' প্রধানরা।

জল এবং বিমানপথে হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব বাংলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকে আরও সুদৃঢ় করলেন। ঢাকা সৈন্যশিবির ও বিমান-পোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসান হলো বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে। একদিকে আলোচনার প্রহসন চলল আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল।

এল সেইদিন, যে-দিনটির জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যেবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান

চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন, এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী, পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরানী, বুদ্ধিজীবী—কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়াল্ডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাংলার মেহনতি মানুষ তার দুর্জয় মনোবল আর তার সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগল।

হিংসাও এই উন্মত্ততার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোনো পথ রইল না। বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত।

পকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাংলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ মৃতের লাশের নিচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলও দায়ী নয়। দায়ী লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা-মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থশিকারির দল—যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালির প্রাণ।

বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে মানুষ প্রাণ ভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে।

লড়ছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্যে।

বাংলার মানুষের এই মুক্তির লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাবে।

(জহির রায়হান রচিত)

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত রণাঙ্গন সম্পর্কিত কয়েকটি কথিকা।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এর দলিলপত্র। তারিখ : সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর ১৯৭১।

# দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এক

মুজিবগনের এসেছিলাম প্রায় দু'মাস আগে। তাই এ দু'মাস শুধু পরের মুখেই শুনেছি দেশের দখলীকৃত এলাকার কথা। শুনেছি পশ্চিম পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যা, নির্মম অত্যাচার, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের লোমহর্ষক কাহিনী। তাই, মনে মনে ভাবছিলাম একবার বাড়ি যাব। স্বচক্ষে দেখে আসব দেশের ও দশের অবস্থা। পারলে ওদেরকে একটু প্রবোধও দিয়ে আসব। আর বলে আসব 'তোমাদের মুক্তির দিন আগত প্রায়।'

কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হয় না। প্রথমত, আমি যে দায়িত্বে ন্যস্ত তা কার হাতে দিয়ে যাই। তার ব্যবস্থাও যখন করলাম তখন দেখা দিল নতুন ফ্যাসাদ বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্খীদের দু'একজন ছাড়া সবাই নিষেধ করে বললেন, ' গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। ওরা পেলে আপনাকে গুলি করে মারবে।'

তবু সব উপেক্ষা করে একদিন রওয়ানা দিলাম, অতি ভোরে। হাঁটতে হাঁটতে সকাল ১১টা নাগাদ গিয়ে পৌছলাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বন-জঙ্গল ও গাছ-পালায় ঘেরা একটা ছোট্ট গ্রাম। তারই মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে এই ক্যাম্প। বাড়িটার চারদিকে এক মাইলের মধ্যে নেই আর কোনও বাড়িঘর। তবে এলাকাটা এমন জনমানবহীন সব সময় ছিল না। সোনার বাংলাকে দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণে যারা শ্মশানে পরিণত করেছে, তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া খুনী সৈন্যরা গত এপ্রিল মাসে সমগ্র এলাকাটিকে উজাড় করে দিয়েছে। বহু লোককে ওরা গুলি করে মেরেছে, প্রায় সমস্ত বাড়িঘর ওরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই এসবের পরও যারা বেঁচে ছিল তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ক্যাম্পের কাছে যেতেই কে একজন 'হল্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ডানে তাকিয়ে দেখি রাইফেল হাতে একজন তরুণ। সম্ভবত কয়েক মাস আগে সে কোনও কলেজে পড়ত। কাছে এসেই জিজ্ঞেস করল, আমি কে এবং কি জন্য ওখানে গিয়েছি। বললাম, আপনাদের কমান্ডার সাহেবের সাথে দেখা করব, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে।

সৈনিক আমাকে দাঁড়িয়ে রেখে আরেকজনকে ডেকে আনতে গেল, কয়েক কদম আগে। মধ্য-বয়সের দ্বিতীয় লোকটি কাছে এসে অতি বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন আমার পরিচয় এবং কমান্ডার সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের কি প্রয়োজন। তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দানের পর তিনি আমাকে একটা গাছের গোড়ায় বাঁশের চটায় তৈরি একটা বেঞ্চিতে বসতে বলে ভেতরে গেলেন। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে কম্যান্ডার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

র‍্যাঙ্ক তার ক্যাপ্টেন বটে, কিন্তু তিনিই হলেন ঐ ক্যাম্পের সর্বাধিনায়ক। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধ করছেন তারই নির্দেশে। সারাদিন সারারাত বসে বসে তিনি খবরাখবর নেন শত্রুর গতিবিধির। তারপর স্ট্রাটেজি ঠিক করে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠান এ্যাকশনে, মাঝে মাঝে তিনি নিজেও এ্যাকশনে যান, তবে তা নির্ভর করে এ্যাকশনের গুরুত্বের উপর।

দোহারা চেহারার লোক এই ক্যাপ্টেন বা কমান্ডার। তাকে আগে কোথায় দেখেছি বলে আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। তবে তিনি আমাকে দেখেই বলে ফেললেন। বললেন, রহমতের খবর কি? বললাম, ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তার খবর জানতাম। বিজলীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে সে সময় রহমত ঢাকায় ছিল। তারপর আর কিছু জানি না। সাথে সাথে মনে পড়ল এ ক্যাপ্টেনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে দেখেছি। তখন তিনি ছাত্রলীগ করতেন। দেখেছি প্রতিটি আন্দোলনে, প্রতিটি মিছিলের পুরোভাগে। তাছাড়া, তাকে দেখেছি সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের টেবিলে। কলেজ ছাত্র সংসদের খবর নিয়ে তিনি যেতেন রিপোর্টারদের কাছে।

বললাম, আপনি ত ডাক্তার হয়েছেন, শুনেছি আর্মি মেডিক্যাল কোরে গিয়েছেন। আর এখন দেখছি কমান্ডারগিরি করছেন। হেসে বললেন, 'এখন দরকার এ্যাকশনের, যুদ্ধের। তাই জল্লাদের আর্মি মেডিক্যাল কোর থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে নেমেছি।' ...

মার্চ-এপ্রিলের মতো আজ আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আনাড়ী যোদ্ধা নয়। তারা আজ পুরাপুরি ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তারা আজ মেশিনগান চালাতে পারে, মর্টার চালাতে পারে এবং গ্রেনেড ও ডিনামাইট ব্যবহার করতে পারে। প্রয়োজনীয় অস্ত্র হাতে থাকলে এদের দশজন অন্তত একশো-দুশো শত্রুসেনাকে ঘায়েল করতে পারে।

ক্যাপ্টেন ও তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে দেখলাম ওরা নির্ভয়, মৃত্যুকে ওরা আজ পরোয়া করে না। মৃত্যুর সাথে ওরা আজ পাঞ্জা লড়তে সদা প্রস্তুত। কথাটা ক্যাপ্টেন নিজেও আমাকে এক পর্যায়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওদের নিয়ে আমাকে অসুবিধায়ও পড়তে হয় অনেক। বাঘ যেমন নরমাংসের গন্ধ পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ওরাও কোনোস্থানে শত্রুপক্ষের উপস্থিতির খবর পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শত্রুর কাছে কি অস্ত্র আছে আর ওদের কাছে কি আছে তার বাছবিচার ওরা করতে চায় না।'

ক্যাম্প থেকে ফিরে আসছি, এমন সময় অতি পরিচিত একজন মুক্তিযোদ্ধা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মতিন ভাই, আমাদের মুজিব ভাই কি বেঁচে আছেন? ওনাকে কি ফিরে পাব?'

এ প্রশ্নে নতুনত্বের কিছু ছিল না। এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিন অসংখ্যবার। তবু তাকে বললাম, 'তিনি তো বলে গেছেন, তিনি হুকুম দিতে না পারলেও যেন আমরা নিজ নিজ কর্তব্য করে যাই। সুতরাং বর্তমান সময় ওসব বিচার না করে তিনি যা চেয়েছিলেন তা সমাধা করায় আত্মনিয়োগ করাই কি শ্রেয় নয়?'

তিনি বললেন, 'তা তো ঠিক। আমরা তাই করছি এবং করে যাব। প্রয়োজন-বোধে প্রাণ দেব। কিন্তু মুজিব ভাইকে ছাড়া যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই চিন্তা করতে পারি না।

জানেন, আমার বাবা ও দুই ভাইকে ঘাতকরা হত্যা করেছে। তবু বেঁচে আছি। কিন্তু মুজিব ভাইকে হারালে যে বাঁচতে পারব না।'

## দুই

.... সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ক্যাম্পে কিছু সময় কাটানোর পর ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে একজন সুবেদার মেজরের হাওলা করে দিয়ে বললেন : 'ওনার সাথে কথা বলুন, আমরা শিকারে যাচ্ছি।'

সুবেদার মেজর ৩৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক। কয়েক বছর আগে বাঙালির গৌরব বেঙ্গল রেজিমেন্টে ঢুকেছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন যশোর ক্যান্টমেন্টে। তার পর থেকে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন দখলদার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি জানেন না, তাঁর পরিবারের কে আজ বেঁচে আছে আর কে বেঁচে নেই। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "পরাধীন জাতি হিসাবে বাঙালিদের বেঁচে থেকেই বা লাভ কি! পশ্চিমারা যেভাবে জাতি হিসাবে আমাদের অপমান করেছে, সর্বনাশ করেছে—তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আর সব কথার সেরা কথা বাংলাদেশকে শত্রুকবলমুক্ত করতেই হবে। তারপর বাপ-ভাই-এর অভাব হবে না বাংলাদেশে।"

অবাক হয়ে ভাবলাম এই আধাশিক্ষিত লোকটির কথা। কি অসীম দৃঢ়তা। কি গভীর আত্মপ্রত্যয় বিরাজ করছে তার মাঝে! বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বাঙালির অপমানের প্রতিশোধই আজ তার কাছে বড়। নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রদের বেঁচে থাকা না থাকার প্রশ্নটি আজ তার কাছে গৌণ।

এতদিন পরে বুঝতে পারলাম কি করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে মাত্র দুই কোম্পানি বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অন্তত ৫/৭ গুণ শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও যুদ্ধ করতে করতে পথ করে নিতে পেরেছিলেন। সেদিন তাদের পাঞ্জাবি-অধিকর্তা লে. কর্নেল বেঈমানী করেছিল। ষড়যন্ত্র করে সন্ধ্যার সময় অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু এরা বাঙালির জাতশত্রুদের হুকুম মোতাবেক আত্মসমর্পণ করেনি। অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করেছে। একজনের প্রাণের বদলে ১০ জনের প্রাণ নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুবেদার মেজরের কাছে শুনলাম ক্যাপ্টেনের পশু-শিকারে যাওয়ার কাহিনী। তিনি বললেন, 'একটু আগেই খবর এসেছে ৪০/৫০ জন খানসেনা এসে আস্তানা গেড়েছে। গত রাতেও তারা নাকি ওখানে ছিল। আজ রাতে ওদেরকে দলবলে খতম করতে হবে। স্থানটাও এখান থেকে বেশ দূরে। তাই ক্যাপ্টেন জন পনেরো মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে এখনই রওয়ানা হতে যাচ্ছেন।'

বললাম, '৪০/৫০ জন সুদক্ষ শত্রুসৈন্যের মোকাবেলায় আমাদের ত আরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা যাওয়া দরকার।'

তিনি হেসে দিয়ে বললেন, 'না, না, তা মোটেই নয়। আমাদের ১৫ জনই ওদের ৫০ জনের মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট। ইনশাল্লাহ, ঐ ১৫ জনের হাতেই ওদের অন্তত ৩০ জন খতম হবে এবং অন্যরা কুকুরের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে।'

কথা প্রসঙ্গে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম উভয় পক্ষের হতাহতের তুলনামূলক হার। তিনি একটা রেকর্ড বের করে বললেন : হতাহতের হার হচ্ছে ১ঃ৫০—অর্থাৎ গড়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার বদলে ৫০ জন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আমি বললাম, 'এমনটা কি করে সম্ভব? যুদ্ধে দু'পক্ষের হতাহতের এমনতর অনুপাতের কথা ত কোনোদিন শুনিনি!'

জবাবে তিনি বললেন : 'আমরাও আগে শুনিনি। কিন্তু এখন নিজের চোখে দেখছি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ওদের খতম করা। আর ওদের একমাত্র লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণে বাঁচা। তাই, প্রাণের বাঁচার তাগিদে ওরা এখন আর আমাদের সাথে যুদ্ধই করতে পারছে না, আর কোনদিন পারবেও না।" ...

সুবেদার মেজরের সাথে কথা বলার সময় সেখানে এসে হাজির হলেন একজন তরুণ পূর্বতন সি. এস. পি অফিসার। কয়েক মাস আগেও তিনি ছিলেন কোনও এক মহকুমার প্রশাসক।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফশার্ট, পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যান্ডেল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ অবস্থা কেন? জবাবে জানালেন, 'এর চেয়ে বেশি কাপড়-চোপড় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করা যায় না। তাছাড়া, বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি যোগাড় করাও সম্ভব নয়। তদুপরি, আমার সহমুক্তিযোদ্ধারা যেখানে এক-কাপড়, এক-জামায় দিন কাটাচ্ছেন সেখানে কারো পক্ষে কি বিলাসিতা শোভা পায়?'

ভদ্রলোক চলে গেলে সুবেদার মেজরের কাছে সব শুনতে পেলাম। সাবেক মহকুমা প্রশাসক আজ একজন মুক্তিসেনা হিসাবে কাজ করছেন। আর দশজন যেভাবে থাকেন, যা খান—তিনিও সেভাবে থাকেন খান।

এসব শুনে ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। সুবেদার মেজর কিছুক্ষণ পর বললেন : এত কি ভাবছেন? সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, ভাবছিলাম ওই ভদ্রলোকের কথা।

একটি মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন তিনি মাত্র সেদিনও। আমরা যারা যুদ্ধ করি, সাংবাদিকতা করি অথবা যারা রাজনীতি করেন তারা ত বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়েই ওসব পেশা গ্রহণ করেছিলাম। শেখ সাহেবের যে বিচার প্রহসন হতে পারে তা তিনি নিজেও জানতেন। কিন্তু এরা? এরা ত ছিলেন পাকিস্তান সরকারের সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত কর্মচারী। রাজনীতি ছিল এদের জন্য নিষিদ্ধ। এরা ইচ্ছে করলে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে পারতেন। কিন্তু এরা নিজেদের আলাদাভাবে ভাবতে পারেননি। ভেবেছেন জাতির একজন হিসাবে। তাই জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুক্তিসংগ্রামে। সত্য বলতে কি, এই দায়িত্ববোধের আদর্শই বর্তমান মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

## তিন

**২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে বের হয়ে পড়লাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। বেলা তখন সাড়ে ১২টা। পথ রয়েছে ১২ মাইল। অথচ সোজাপথে গেলে এ দূরত্ব অর্ধেকে হ্রাস করা সম্ভব ছিল।

যাত্রার সময় সুবেদার মেজর আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সামনের কতিপয় এলাকা সম্পর্কে। কেননা ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও শত্রুপক্ষ তখন সক্রিয় ছিল। তবে তিনি আমার সাথে একজন গাইডও দিয়েছিলেন যাতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়।

মাঠ-ঘাট পেরিয়ে মাইল তিনেক যাওয়ার পর আমরা একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। চারদিকে তাকিয়ে আমি জঙ্গল আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। মাত্র মিনিট তিনেক সময়ের ব্যবধান। তারপরই ১৮-১৯ বছরের এক যুবককে সাথে নিয়ে এলেন। আমাকে নিয়ে রওনা হলো সেই তরুণ সঙ্গী।

আমরা দুজন চলছি। তরুণ চললো আগে আগে, আমি তার পেছনে। তরুণকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র। এখন মুক্তিবাহিনীতে কাজ করছে। যশোর জেলায় তার বাড়ি। বহু আগেই বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে ছিল বিধবা মা আর ভাইবোন। গত এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সৈন্যেরা তার কলেজে পড়া বোনকে ধরে নিয়ে যায়। ছোটভাই তাতে বাধা দিলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। অবশ্য পরে ছোট বোনটিকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, বাড়ি থেকে দূরে। এই খবর পেয়ে সে যখন বাড়ি গিয়েছিল তার শোকাহতা মা নাকি তাকে বলেছিলেন : বাবা তুই যদি আমার সন্তান হোস, তাহলে এই ঘৃণ্য অপরাধের যোগ্য প্রতিশোধ তুই নিবি। যা, এক্ষুণি বের হয়ে পড়—মা-বোনদের অপমানের প্রতিশোধ তোকে নিতেই হবে।

মায়ের দোয়া মাথায় নিয়ে সেই যে তরুণ ছাত্রটি বেরিয়ে এসেছে, আর ঘরে ফেরেনি। এরপর মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ছোট ভাইবোনের হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে। নিজের হাতে হত্যা করেছে পাঁচজন খান সেনাকে। তবু তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। যেদিন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মুক্ত হবে, বাংলাদেশে শহরে-বন্দরে-গ্রামে উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় পতাকা, সেদিনই হবে তার সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া।

মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই বীর সৈনিকের নিষ্ঠা ও অবিচলতার প্রমাণ তার কথা থেকেই। অমিততেজ বাঙালি তরুণ আমাকে বললো : দেখুন, যারা আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিল, আমিও পেয়েছিলাম তাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করার সুযোগ; কিন্তু তা আমি করিনি। তা আমি করতে পারি না। সহকর্মীদেরও এমন অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম—কেননা আমরা যে পাশবিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছি। ওরা পশু, ওরাই পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মানবিক মূল্যবোধকে পদদলিত করতে—আমরা তা করতে পারি না।

আমরা একটা বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঠের এখানে সেখানে লোকজন কাজ করছে। কেউ ধান কাটছে, কেউ ঘাস তুলছে ক্ষেত থেকে। একটা পাটক্ষেতের

আড়ালে একজন ক্ষেতচাষি ধানক্ষেত থেকে ঘাস তুলছে। তাদের দিকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ আমাকে বললো, ওরা আমাদেরই লোক। আরো বললো—বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা এমনি করে ছড়িয়ে আছে গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার মাঠে-ঘাটে সর্বত্র। ঐ যে সামনে নদীটা দেখছেন তার ওপারেই রয়েছে একটা বাজার। বাজারে আগে পাকিস্তানি সৈন্যের ঘাঁটি ছিল। তাদের সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বেশিরভাগ খানসেনা মারা পড়েছে। আর যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই প্রাণ নিয়ে কোনোমতে পালিয়েছে। তারপর বহুদিন এদিক আর ওরা আসেনি। কিন্তু গতকাল নাকি একটা দল এসেছিল। শুনেছি আজও আবার আসতে পারে। তাই আমাদের মুক্তিসেনারা পশুদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খানিকটা সামনেই ছিল নদী পারাপারের খেয়া। খেয়াঘাটে গিয়ে পাটনীর সাথে কিছু কথা বলে তরুণ বিদায় নিলো। অপর তীরে গিয়ে আমি নেমে পড়লাম। পাটনীও আমার পেছনে পেছনে নেমে পড়লো। সে আমাকে নির্দিষ্ট একটা রাস্তা এড়িয়ে যেতে বললো। আমি যখন সেই বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, আনন্দে তখন আমার বুকটা ভরে উঠলো। সেখানে সবগুলো দোকানেই উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। নিজের মনেই খানিক দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখানে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল। বললাম : সালাম, আমার স্বাধীন বাংলার বিজয় পতাকা, তোমাকে সালাম।

আরো মাইল তিনেক এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিকতার চিহ্ন। চারিদিকে ধ্বংসের ছাপ লেগে আছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড, আগুনে জ্বালিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, লণ্ডভণ্ড করেছে কতো সুখের সংসার। খুব পিপাসা পেয়েছিল। বারান্দায় এক বৃদ্ধাকে দেখে এগিয়ে গেলাম। বললাম, বুড়িমা, পানি খাবো। বৃদ্ধার বয়স ৭০/৭৫ হবে। একটা ছেলেকে পানি আনতে বলে তার দুঃখের কথা শুরু করলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে আসছি। বললাম, মুজিবনগর থেকে। বাড়ি যাবো।

'বাড়ি যাবো' এক কথাটা শুনেই বৃদ্ধা আঁৎকে উঠলেন, বললেন—বাড়ি যেয়ো না, পাঞ্জাবিরা মেরে ফেলবে, ওরা মানুষ নয়, ওরা পশু। দেখছো না, আমার ঘর খালি। আমার সোনার ছেলেদের ওরা হত্যা করেছে। আমার আর কেউ নেই বাবা। তবু আমি কেন যে বেঁচে রইলাম! বলতে বলতে বৃদ্ধা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললাম—বুড়িমা কাঁদবেন না। আপনার ছেলে গেছে, আমরা রয়েছি তো আপনার সন্তান—আপনার আরো কতো সোনার ছেলে দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে, তাদের দোয়া করুন।

পানি খেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধা বললেন—আচ্ছা বাবা বল তো, ঐ যে আমরা ভোট দিয়েছিলাম, সেই মুজিবর ভালো আছে তো? সে বেঁচে থাকলে এর শোধ নেবেই।

দেখলাম গ্রামের সাধারণ বৃদ্ধাও বঙ্গবন্ধুর খবর রাখে—তার হৃদয়ে রয়েছে তার জন্যে অফুরন্ত দরদ। আরো অবাক হলাম এ ভেবে, যে দেশে এমন বৃদ্ধা রয়েছে সে দেশের ছেলেরা বীর সৈনিক না হয়েই পারে না।

এরপর যেখানে গেলাম সেটি যশোরের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মশিউর রহমানের নির্বাচনী এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব।

কোথাও কোনো মানুষ দেখা গেল না। এই জনশূন্য পথে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার উপর একটি লোকের সাথে দেখা। ২৭/২৮ বছরের লোকটির মুখে দাড়ি। পরনে পাঞ্জাবি। দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে লোকটি সম্ভবত জামাতপন্থী কেউ হবেন। দু'জন পাশাপাশি চলেছি, কারো মুখে কোনো কথা নেই। আরো কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে নিতান্ত কৌতূহল ও উদ্বেগ বশেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, মশিউর রহমান সাহেবের খবর কি? প্রশ্ন করেই নিজের মনেই শংকিত হলাম কি জানি কি হয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনে লোকটি আমার দিকে এমন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলের যে তাকে দেখে মনে হবে তিনি যেন কোন ভাবনার সাগরে ডুবে আছেন। সারা চোখ-মুখে তার উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হয়তো এক্ষুণি দু'চোখ বেয়ে নামবে অশ্রুর বন্যা।

ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এমন বিচলিত হলেন কেন তাকিয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা সেই অপরিচিত লোকটির চোখ বেয়ে তখন অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে আমাকে বললেন : দেখুন, শেখ সাহেব কিংবা মশিউর রহমানের কথা তো কেউ এমন প্রকাশ্যে বলাবলি করতে সাহস করে না। তাই আপনার কথা শুনে আমার অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আপনি বোধ হয় এ এলাকায় নতুন এসেছেন?

পরে আলাপে জানতে পারলাম লোকটি স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্যে প্রাণপণ খেটেছেন। মাইল খানেক একসাথে গিয়ে তিনি ভিন্ন রাস্তায় চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন যেন প্রকাশ্যে এমন কথা আর কাউকে আমি জিজ্ঞেস না করি।

মশিউর রহমানের পৈত্রিক গ্রাম সিংহঝুলি। সেখানে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো একটা উপশহর। তার উপর দিয়ে চলে গেছে যশোর-চৌগাছা সি এণ্ড বি রোড। রোড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে আছি। সি এণ্ড বি রোড পার হবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে এল একটি লোক। বললো, বসে পড়ুন সাহেব, বসে পড়ুন। ঐ যে মিলিটারির গাড়ি আসছে যশোরের দিক থেকে। লোকটি এরকম জোর করে আমাকে রাস্তার একপাশে বসিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য বোঝাই তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাজারের ওপর। গাড়ির গতি থামলো মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে। চারদিকে এক-বার নজর কর ভোঁ করে চৌগাছার দিকে ছুটে চললো তারা।

লোকটির কাছেই শুনলাম, ঐ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর হাতে বারবার প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা আজকাল এদিকে বড়ো একটা এগুতে সাহস করে না। যদিও বা আসে একদণ্ড অপেক্ষা করার ভরসা পায় না।

মিলিটারির গাড়িগুলো চলে যাওয়ার সংগে সংগে আমি তাড়াতাড়ি সি এণ্ড বি সড়ক পাড়ি দিলাম। যাবার সময় দু'পাশে তাকিয়ে দেখলাম ধ্বংসস্তূপের সীমাহীন চিহ্নরাশি। সারা বাজারের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়িই হার্মাদ দস্যুরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর জনাব মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ি তো ছিল এই দস্যুদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। সুতরাং সে বাড়ির যে কিছুই অক্ষত থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

রাত তখন সাড়ে আটটার মতো হবে। কোথায় রাত কাটাবো ঠিক করে উঠতে পারছি না। একজনকে রাত কাটানোর অনুরোধ জানালে দেখিয়ে দিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন

কাউন্সিল সদস্যের বাড়ি। তবে একথাও শুনলাম ঐ সদস্য আগে জামাতে ইসলামীর লোক ছিলেন। সোজা গেলাম তার বাড়িতে। ডেকে বললাম, আমি আপনার এখানে রাত কাটাতে চাই, আমাকে থাকতে দিতে হবে। আর যদি আমাকে মিলিটারির বা রাজাকারের হাতে তুলে দিতে চান, তাও করতে পারেন। তবে তার আগে খেতে দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন বড়ো বেশি ক্ষুধার্ত।

ভদ্রলোক ছোটভাইকে ডেকে আমার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি আগে জামাতপন্থী ছিলাম। কিন্তু গতকাল থেকে আমি বাঙালি এবং এখন এটাই আমার একমাত্র পরিচয়। জানেন, গতকাল মিলিটারি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি এসে তাকে ২০টি যুবক ও কয়েকটা মেয়ে সংগ্রহ করে দিতে বলে। তিনি দুইদিনের সময় চেয়েছিলেন মাত্র। তারপর সৈন্যরা তার বাড়িতে ঢুকে চেয়ারম্যান সাহেবের পুত্রবধূ ও যুবতী মেয়েকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বুঝতেই পারছেন। বলতে বলতে মুহূর্তে ভদ্রলোকের মুখ-চোখের লক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। দেখলাম, তার সারা মুখে ঘৃণা ও গ্লানির চিহ্ন পরিস্ফুট। বাঙালি কি আর ভাইয়ের অপমান সইতে পারে?

## চার

**৩ অক্টোবর, ১৯৭১**

মেম্বার সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল। তথাকথিত ইসলাম-দরদীদের বর্বর মানবতাবিরোধী কাজই যে জামাতপন্থী এ মানুষটিকে সত্যিকারের বাঙালিতে পরিণত করেছে তার কথাবার্তায় তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষটির কথাবার্তা থেকে আরো বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিটি গুলি, প্রতিটি অত্যাচার বাঙালি ঐক্যকে দিন দিন সুদৃঢ় করে তুলছে।

কথাবার্তা শেষ করে যখন শুয়ে পড়লাম তখন রাত প্রায় ১টা। চোখে তন্দ্রার ভাব এলেও পুরোপুরি ঘুম বলতে যা বুঝায় তা তখনও আসেনি। এমনি সময়ে গগনবিদারী একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চমকে উঠলাম। এটা যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের কাজ তা বুঝতে বাকী থাকল না। তবে কোথায় তারা এ বিস্ফোরণ দ্বারা কি নষ্ট করেছে তা তখনও জানতে পারলাম না। এরই কয়েক মিনিট পরে রেললাইনের দিকে আরেকটি প্রচণ্ড শব্দ হলো। পরের দিন ভোরে জানতে পারলাম গেরিলারা সিংহঝুলির কাছে জোড়া পুলটি উড়িয়ে দিয়েছে। যশোর থেকে চৌগাছায় সৈন্য আনা-নেওয়ার জন্য এ পুলটির গুরুত্ব ছিল অনেক। আর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানা গেল যে তা দিয়ে গেরিলারা একটি মালগাড়িসহ রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে। মালগাড়ির পাহারাদার কয়েকজন রাজাকার প্রাণ হারিয়েছে।

সকাল তখন প্রায় ৮টা। আমি মেম্বার সাহেবের বাড়ি ছেড়ে নিজের পথে বের হয়ে পড়বো ঠিক এ সময়ে ঐখান থেকে মাইল চারেক দূরে শুরু হলো মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ। গোলা বর্ষণ চলছে তো চলছেই। থামার কোনও লক্ষণ শোনা গেল না।

তাই ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত মেম্বার সাহেব আমাকে ঘরের বাইরে পা দিতে নিষেধ করলেন। ইত্যবসরে একটা সাহসী তরুণকে পাঠান হলো ব্যাপারটা জেনে আসতে। ঘন্টা দু'এক পরে তরুণ এসে যা জানাল তা হচ্ছে : প্রত্যুষের দিকে কে বা কারা যশোর-ঝিনাইদহ রাস্তার এক জায়গায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে গেছে। স্থানীয় রাজকাররা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে খবর দিলে তারা পতাকা থেকে মাইল তিনকে দূরে এসে অবস্থান নেয় এবং সেখান থেকে অবিরাম গোলা বর্ষণ শুরু করে। পতাকা যেখানে উড়ান হয়েছে তার আশেপাশে কোথাও হয়তো মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে—এ ভয়েই পাঞ্জাবি সৈন্যরা ঘটনাস্থলের তিন মাইল দূর থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করে।

যাহোক, সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তারা অবিরাম গোলা বর্ষণ করে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশে। তারপর রাস্তার দু'পাশে ও সামনে গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এল ঘটনাস্থলে। এতে প্রায় আরও ১ ঘন্টা সময়। পতাকাটা তখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে থেকে পত্‌পত্‌ করে মুক্তির গান গাইছিল। কিন্তু মানবতার দুশমন পাঞ্জাবি সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও মুক্তিসেনাকে জীবন্ত বা মৃত খুঁজে পেল না। কিন্তু তবুও ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে যে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী ঢাকায় নিয়াজীর কাছে পাঠাতে হবে—তাই তারা কয়েকজন নিরীহ্‌ গ্রামবাসীকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে।

সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা সময়ে শুধুমাত্র কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যে কত হাজার রাউন্ড গোলা-গুলির অপচয় করেছে এবং তার মূল্যই বা কত হাজার বা লাখ টাকা তা কেবল সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে তা হলো নিজেদের টাকায় কিনতে হলে অথবা অন্যের কাছ থেকে না পেলে কি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এমনভাবে গোলাগুলির অপচয় করতে পারত?

জবাবও আমি নিজের কাছ থেকেই পেয়েছি। নিশ্চয়ই তারা এমনটা পারত না।

আমি আরো ভেবে দেখেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক জান্তা এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছে। বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে দু'দিন আগে বা পরে তল্পিতল্পা গুটিয়ে যেতেই হবে। সেদিন হয়ত বর্তমান জান্তা ক্ষমতায় থাকবে না— যেমন নাই আইয়ুব-ভুট্টোর চক্র। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে যে এ টাকা সুদে-আসলেই শোধ করতে হবে। বাংলাদেশের সোনালী-সূত্র পাট বেচা টাকা ছাড়া যে এ কাজ কত দুঃসাধ্য হবে তা আমরা যেমন জানি, তারাও তেমনি জানে। তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে। যুদ্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সামরিক জান্তাকে সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ব্যাপারে নিজেদের অপারগতার কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। নতুন ঋণের জন্য নাকে খৎ দিতে হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধর্না দিতে হয়েছে রাজধানীতে রাজধানীতে। সুতরাং যুদ্ধ বেশি দিন স্থায়ী হলে তাদের পক্ষে নিজেদের সগৌরবে দেউলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ....

(মতিন আহমদ চৌধুরী রচিত)

# মুক্তিযুদ্ধ কোন্ পথে

**৪ অক্টোবর, ১৯৭১**

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ছ'মাস পূর্তি হয়েছে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই ছ'মাসে মুক্তিযুদ্ধ কতটা এগিয়েছে তার খতিয়ান নিতে গেলে দেখা যাবে আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বরং বাংলাদেশের বর্ষণমুক্ত শারদ আকাশের মতোই বাংলার মুক্তিযুদ্ধও এক সফল ও প্রসন্ন প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথ আমাদের দুর্গম। যাত্রাপথও বিপদসঙ্কুল। তবু এই যাত্রাশেষে স্বাধীনতা ও মুক্তির সোনালী উষা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এই দৃঢ়বিশ্বাসে আজ আমাদের বুক ভরে উঠছে গত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, তখন আরো দেব—কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো....... ইনশাআল্লাহ্।" বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। সেই যে মার্চ মাস থেকে রক্তদান শুরু, বাংলার মানুষ এখনো জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য রক্ত দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই রক্ত ও প্রাণদান এখন আর একতরফা নয়। বাঙালির হাতে এখন অস্ত্র। বাংলাদেশের যুবশক্তি এখন মুক্তিবাহিনীতে রূপান্তরিত। তাদের হাতে রোজ খতম হচ্ছে শত শত হানাদার সেনা। তাই গভীর প্রত্যয়ে বুক বেঁধে আজ আমরাও বলতে পারি—"রক্ত দিয়েছি, আরো দেব। ইনশাআল্লাহ্, গোটা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের কবলমুক্ত করে ছাড়বো।"

গত ছ'মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তিনটি ফ্রন্টে বিস্তৃত হয়েছে। যুদ্ধ এখন আর একটি ফ্রন্টে সীমাবদ্ধ নয়। এই তিনটি ফ্রন্ট হচ্ছে—এক, রণাঙ্গনে সম্মুখযুদ্ধ এবং দখলকৃত এলাকায় ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা। দুই, অর্থনৈতিক ফ্রন্টে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা। তিন, বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি এবং ইসলামাবাদের জঙ্গী ফ্যাসিস্ট চক্রের উপর ক্রমাগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি।

হানদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের সাফল্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তিনদিনের যুদ্ধের কথা। এই তিনদিনের যুদ্ধে ১১৯ জন খানসেনা নিহত হচ্ছে। ঢাকা শহরের অদূরে ইছামতী নদীতে হয়েছে আরো চমকপ্রদ যুদ্ধ। কয়েকটি লঞ্চযোগে সশস্ত্র হানাদার সৈন্যেরা যখন নদী অতিক্রমের চেষ্টা করছিল, তখন নদীর উভয় তীর থেকে মুক্তিবাহিনী মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দলে দলে গ্রামবাসী। ফলে বহু হানাদার সৈন্য নিহত হয়। পাঁচজন আহত সৈন্যকে গ্রামবাসী পিটিয়ে মেরে ফেলে। অবশিষ্ট লঞ্চগুলো দ্রুত পলায়ন করে। পদ্মা ও ইছামতী নদীতে এ পর্যন্ত হানাদার সৈন্য বোঝাই একুশটি লঞ্চ ও অন্যান্য যান হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও হানাদার সৈন্যদের জন্য খুব ভীতিপ্রদ। শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বাঁশ ও লোহার ডাণ্ডা দিয়ে রোড ব্লক করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। রাতে গেরিলাদের চলাচলে বাধা দেয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রাতে গেরিলারা যখন সত্য সত্যই অপারেশনে বের হন, তখন তাদের ভয়ে বীরপুঙ্গব খানসেনারা আর ঢাকার রাস্তায় থাকেন না। তারা ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নেন। অবাঙালি রাজাকারদের বাধ্য করা হয় এই রোডব্লক পাহারা দিতে।

এটা গেল সম্মুখযুদ্ধ ও গেরিলা তৎপরতার কথা। এবার অর্থনৈতিক ফ্রন্টের যুদ্ধের খবর শুনুন। বাংলাদেশে কোনও বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য কিনছে না। ফলে হাহাকার উঠেছে বাইশ পরিবার ও অবাঙালি ব্যবসায়ী মহলে। বাংলার চাষি পাট বুনছে না, ধান বুনছে—ফলে কারখানায় বাঙালি মজুর উৎপাদন চালাচ্ছে না। ফলে কি দাঁড়িয়েছে, তারই একটা হিসাব দিয়েছেন 'ইকোনমিক টাইম্‌স্' পত্রিকার রিসার্চ ব্যুরো। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। শিল্পোৎপাদন, কৃষি উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় পাকিস্তান এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানি শতকরা ৮০ ভাগ কমে গেছে। পাকিস্তানের সমগ্র বিদেশী মুদ্রার শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগই আসে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি করে। এছাড়া আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যে ২৫০ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। একদিকে এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি, অন্যদিকে বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্টচক্রের মাসে খরচ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে যেখানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে ছিল ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। গত দু'মাসে এই তহবিল আরো শূন্য হয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং ও আমদানীর ওভার-ইনভয়েসিং এর দরুন বিদেশে পাকিস্তানের মূলধন দেদার চলে যাচ্ছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পাকিস্তানে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ওদিকে আবার খবর প্রচারিত হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্ক কনসর্টিয়াম ইয়াহিয়া চক্রকে আবারো জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনও সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বে জনমত সৃষ্টি ও রাজনৈতিক চাপের ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া-চক্রের অবস্থা আরো খারাপ। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্ত ইস্তাহারে এই প্রথমবারের মতো 'পূর্ব পাকিস্তান্' শব্দটি বাতিল করা হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মানুষের 'অনপহরণীয়' অধিকার রক্ষার দৃঢ়সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ্ব শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, আফ্রো-এশীয় কমিটি, সাংবাদিক সমিতি একবাক্যে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের বর্বরতার নিন্দা করেছেন এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করেছেন। 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। আরব রাজ্য কাতারের প্রধান শাসক বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তায় তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে উল্লেখ করে কার্যত বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। সিংহলের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য মি. গুণবর্ধন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তিদাবীতে সিংহলের পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছেন। এছাড়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ককালে ভারত বাংলাদেশ সমস্যার যে রাজনৈতিক সমাধান দাবী করেছে, তার প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইডেন, ইকুয়েডর ও নরওয়ে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে। উগান্ডা, জাম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডস এবং চিলিও বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত সমাধান দাবী করেছে।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান আবার মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ঢাকায় নতুন মীরজাফর ডা. মালিক ওরফে মল্লিকের নেতৃত্বে যে অসামরিক সরকার বসানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্বের কোনও যোগ্যতা তাদের নেই। কয়েকজন অখ্যাত ও অপরিচিত লোক নিয়ে এই তাঁবেদার সরকার গঠন করা হয়েছে। করাচী, পেশোয়ার, তুরঘামের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে 'জঙ্গীশাহী নিপাত যাক্'। লাহোরের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। ফলে ইয়াহিয়া-চক্র বেসামাল হয়ে পড়েছেন। চারদিকের অবস্থা দেখে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এদের ভরাডুবির আর দেরী নেই। তাই সাহসে বুক বেঁধে আজ আমরা বলতে পারি—

পূর্ব দিগন্তে রক্ত সূর্য শিশু রোদের জন্ম দিচ্ছে—
মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, কীর্তনখোলায় তার প্রতিভাস
আমরা মুক্তি সৈনিক, আমাদের জয় অনিবার্য,
আমাদের হাতের মুঠোয় স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা।

(আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত)

# মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে

... অক্টোবর, ১৯৭১

সেদিন একটা মুক্তিফৌজ-এর ক্যাম্পে গিয়েছিলাম রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু মনের মধ্যে আরো একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। সেটা হলো বাংলাদেশের সেই সমস্ত কিশোরদের দেখা, তাদের কথা শোনা, যাঁরা মা-বাবা আত্মীয়-পরিজন সবার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্বার শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর। সত্যি বলতে কি এটা আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। তাই যখন রিপোর্ট সংগ্রহের ছুতো করে সেই সুযোগটা অকস্মাৎ এসে গেল তখন আর এক মুহূর্ত দেরী না করে ক্যাম্পে যাবার আয়োজন আরম্ভ করলাম।

ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে তিনটা। চারদিকে সারি সারি টেন্ট খাটানো। প্রায় আধমাইল দূরে কোলাহলমুখর বসতি। আমরা এতদূর থেকেও আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম প্রতিটি ঘরের চালে ও গাছের ডালে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। ক্যাম্পে দেখলাম এক জায়গায় কতকগুলি ছেলে তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ তাদের জুতোর কাদা ধুয়ে ফিতে পরাচ্ছে, আবার এক জায়গায় কয়েকজন মিলে জয়বাংলা পত্রিকা পড়ছে। সবার চোখেমুখে যেন একটি ভাষাই সোচ্চার, সবার মনেপ্রাণে একই দৃঢ়তা ও প্রত্যয়। দেখে মনে হলো এরা সবাই যেন এখনই জীবনার্ণবের অমৃত উৎসে অবগাহন করে উঠেছে। হঠাৎ দেখলাম পাশের একটা টেন্ট থেকে একটা কিশোর চপল হরিণের মতো চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এল। ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ওর গভীর অতল চোখগুলো দেখে মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে সেগুলো জ্বলে উঠতে পারে নির্মম দহনে। ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভালো লাগল যে আমি আলাপ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "তোমার নামটা কি?" প্রথমে কোনো উত্তর করল না। তার চোখের স্পর্শ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। মনে হলো ও যেন আমার কপালের ত্রিবলী আর মুখের বিভিন্ন রেখার মাঝে কী এক পাঠ্য খুঁজে পেয়েছে। আর তাই পড়ে নিচ্ছে নিঃশব্দে। কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হয়ে বলল—'নাম?' আবার একটু থেমে বলল, "আমার নাম জানেন না? আমরা তো আমাদের সবার নাম জানি। আমাদের সবার নামই তো এক—বাঙালি।" চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম ওর কথায়। ও বলল, "আপনি তো রিপোর্টার।" আমি বললাম, "হ্যাঁ। শুনলাম মুক্তিবাহিনীর মাত্র তেরজন গেরিলা আড়াইশ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যকে কাল খতম করেছে। সেই ব্যাপারটাই বিস্তারিত জানতে এসেছিলাম, কিন্তু ওদের কাউকেই পাচ্ছি না। তুমি কী আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পার?" সে বলল, "হ্যাঁ, মাত্র তেরজন গেরিলা আড়াইশ সৈন্য মেরেছিল। এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমার থেকেও সব ব্যাপার জানতে পারেন।"

---

• [মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথমে 'মুক্তিফৌজ' নামে ডাকা হতো : সংকলক-সম্পাদক।]

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত বড় সাহসিকতার যে সেও একজন ভাগীদার তাতে তাঁর কোনও বিকার নেই। এগুলি যেন এখন তাদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। আমি আরো ঘন হয়ে ঘাসের উপর বসলাম। সে বলতে লাগল : গত পরশু দিন আমাদের মেজর এসে খবর দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েক ব্যাটেলিয়ন নিয়ে আড়াইশ জনের মতো সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের অদূরে অধিকৃত এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। একথা শোনার পর আমরা সবাই তাদের খতম করতে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মেজর আমাদের তেরজনকে বেছে তৈরি হতে বললেন। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা খবর পেয়েছিল হানাদার বাহিনীর সাথে এল.এম.জি. এইচ.এম.জি প্রভৃতি ছাড়াও তিন ইঞ্চি মর্টার আছে। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা দিলাম শত্রুর ঘাটির দিকে। যখন সেই জায়গাটায় পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জায়গাটা একটু উঁচুনিচু ও টিলাবহুল। কিছুটা দূরে কী এক বড় নদীর এক ক্ষীণ শাখা প্রবাহিত। বহু দূরে দেখা যাচ্ছিল শত্রুর ক্যাম্পের নিষ্প্রভ ও কম্পিত শিখা। জানেন, সেদিকে চোখ পড়তে আমাদের রক্ত এত চঞ্চল হয়ে উঠল, শত্রুহননের জিঘাংসা এত প্রবল হয়ে উঠল তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ তো ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়, জন্তু হত্যা করায় এত আনন্দও আছে! কিন্তু আমাদের সে অধৈর্য কমান্ডরের আদেশের প্রশমিত করতে হলো। ঠিক হলো রাত সাড়ে এগারটার দিকে আমরা আক্রমণ চালাব। কমান্ডার আমাদের দলের দুজনকে নিয়ে শত্রু ক্যাম্পের জায়গাটা পরিদর্শন করতে গেলেন।

প্রায় আধঘন্টা পরে তারা ফিরে এসে আমাদের জানালেন পরিস্থিতি আমাদেরই অনুকূল এবং আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে, A.B.C. এই তিন পদ্ধতিতে। তখন রাত সাড়ে আটটা। আরো তিনঘন্টা, ১৮০ মিনিট, কত সহস্র সেকেণ্ড! উফ্, ভাবতেও অসহ্য লাগল। এত সময় কীভাবে কাটাব, ঐ নোংরা পাপী পশুগুলি আরো দুঘন্টা বাংলাদেশের নির্মল পবিত্র বাতাসে নিশ্বাস টানবে! ভাবতেও গা রী-রী করে জ্বলে উঠল। কিন্তু কমান্ডারের আদেশ। একচুলও এদিক-ওদিক করার জো নেই। বসে রইলাম দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে। সদ্য পানিতে ফেলা এ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের মতো চাঁদটা ঝুরো ঝুরো লঘু মেঘের ভেতর ঢুকে গলে যাচ্ছে, আধো আধো হয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। নাকে ভেসে আসছিল অদূরের ঝোপ থেকে কোন বনফুলের গন্ধ। হঠাৎ কার হাতের রূঢ় নাড়ায় তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। চকিতে তাকিয়ে দেখলাম কমান্ডার। ইশারায় জানাল সময় হয়ে গ্যাছে। খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। জন্তু বধ করার সময় হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম—কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পায়ের আঙ্গুল ভর দিয়ে নিঃশব্দে, কখনো খর পায়ে। শত্রুক্যাম্পের থেকে একটু দূরে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে আমরা A.B.C. পদ্ধতিতে ভাগ হয়ে দাঁড়ালাম। A ও B এই দুই দল L.M.G. H.M.G. S.M.G. সাধারণ রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল দুই টিলার আড়ালে। এখান থেকে শত্রুক্যাম্প মাত্র চারশ গজের মতো দূরত্ব। আর C দলের দুইজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে আমাদের উল্টো দিকে শত্রুক্যাম্পকে আমাদের উভয়ের মধ্যে রেখে প্রস্তুত হয়ে রইল। ঠিক সাড়ে এগারটা বাজতে সে দল বাদে আমাদের সবার অস্ত্র গর্জন করে উঠল। হঠাৎ-আক্রমণে শত্রুসৈন্যগুলি কিছু বুঝতে না পেরে ক্যাম্পে ভিতরেই চুপ করে

বসে রইল। বাইরে যে কয়জন ক্যাম্প গার্ড দেয়ার জন্য ছিল, তারা সে আবছা আলোতেও দেখলাম মৃত্যুযন্ত্রণায় দাপড়াচ্ছে। ক্যাম্পের ভিতরের সৈন্যগুলোর কোনও সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম তারা কিছু একটা ফন্দি বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। চারিদিক নীরব। আমাদের অস্ত্রগুলিও তখন নীরব। কারণ আমাদের উপরে কড়া নির্দেশ অযথা গুলি নষ্ট করা যাবে না। হঠাৎ ওদিকে যারা বসে ছিল তাদের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল ও একসঙ্গে বহু মর্মান্তিক আর্তরব সেই ভয়াল নীরবতাকে খান খান করে তুলল, আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষেরও আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শোনা গেল। আমরা বুঝতে পারলাম প্রথমে আমাদের হঠাৎ আক্রমণের সময় তারা কিছুক্ষণ নীরব থেকে এই ফন্দি বের করেছিল যে যেহেতু আমরা সামনে দিয়ে আক্রমণ করছি, তাই তারা নিঃশব্দে ক্যাম্পের পিছন দিক দিয়ে আমাদের অস্ত্রের রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে ও সেখান থেকে দূরপাল্লার রকেট ও মর্টারের সাহায্যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে তারা যেদিকে পিছন ফিরে সবে আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে সেখানেই আমাদের দলের দুজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে বসে আছে। তাই যখন তারা আমাদের সেই দুজনের রকেট লাঞ্চারের রেঞ্জে এসে পড়ল অমনি আমাদের পক্ষের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগারজন ছত্রভঙ্গ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় শত্রুসৈন্যের উপর এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কোণঠাসা করে আনলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের কমান্ডারের আদেশে শত্রুসৈন্যরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করল। গুণে দেখলাম চল্লিশজন। মৃতদের সংখ্যা ২১০ জন হয় নাকি আর গুনিনি বলে একটু হেসে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু লক্ষ করে দেখলাম সেই হাসিতে কী এক বিষন্নতার ছাপ, যেন একটু ভিজে ভিজে। পরে একটু থেমে আবার বলল, "না গুণে ভালোই করেছিলাম। কারণ মৃতের সংখ্যা একটু বেশিই ছিল। আমার দুজন বন্ধুও কাল গাজী হয়েছে। তার ছলছলে চোখ দুটো দেখে আমার চোখ ভিজে এল। দেখলাম চারদিকে গোধূলি থমথমে হয়ে উঠেছে। তাকে আর সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কাল প্রথম সূর্যোদয়ে সে আবার হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন রণাঙ্গনে। জিঘাংসার মদমত্ততায়ই হয়ত তার কেটে যাবে প্রতিটি সূর্যোদয়, প্রতিটি সূর্যাস্ত। এই সময়টুকু যদি দিনান্তের বিধুরতায় সে আত্মবিশ্লেষণে বসে, প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় তার চোখ ভরে আসে তবে মন্দ কী!

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

# দুর্জয় বাংলা

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলা চিরদুর্জয়—চির দুঃসাহসী তার দুরন্ত সন্তান। বাংলাদেশের গা বেয়ে ঝরছে রক্ত আর রক্ত, বাংলার মা-বোনের বুকে দুঃসহ কান্না আর কান্না। রক্তের বদলে রক্ত নিয়ে, মার অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে লাঞ্ছনা ঘুচিয়ে দিতে বাংলার দুরন্ত দুলাল আজ বজ্রমুষ্টি। কণ্টকপথে বিরামহীন যাত্রায় শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন তার ব্রত। শপথের গান উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত—

বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণদল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল
সূর্যসেন তিতুমীরের বীর্যগরিমা
রবিঠাকুর নজরুলের ছন্দভঙ্গিমা

* * *

সংগীতের মূর্ছনা শেষ হয় না ভাবাবেগের আবেশ গড়িয়ে। কারণ কঠিন বাস্তব রক্তাক্ত সংগ্রামের পথের রক্ত পথিক বাংলাদেশের লৌহদৃঢ় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় সাহস আর রণকৌশলের সাহায্যে পাক-হানাদার, তার পদলেহী কুকুর রাজাকারের দল ভীতসন্ত্রস্ত। বাংলাদেশের সুদূর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের রক্তস্বাক্ষর খোদিত।

কিছুদিন আগেই রাজশাহীর আরানী ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে মুক্তিফৌজ কেবল বীরত্বের পরিচয় দেয়নি—দিয়েছে অসীম সাহসিকতা ও রণকৌশলের পরিচয়। টহলদার পুলিশ ও রাজাকাররা অগ্রসরমান বীর সেনাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেলেও অধিকতর ক্ষিপ্রতার সাথে পুলিশদের কাবু করে ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে গেরিলা যোদ্ধারা সক্ষম হন। তারা কয়েকজন পুলিশকে গ্রেফতারও করেছেন, সেই সাথে কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রও হয়েছে হস্তগত। 'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন'। সচিত্র বিবরণই তার প্রমাণ।

পাহাড়পুর—পবিত্র বৌদ্ধ বিহার ভূমি— যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধধর্মের অহিংসার মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হতো। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, পর্যটনেচ্ছু পথিক, ইতিহাসের তথ্যাভিলাষী শিক্ষক-ছাত্র যেখানে পদচারণা করেছে সবিস্ময়ে, সংগ্রহ করেছে নানা তথ্য— সেই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। হিংসার অনল জ্বালিয়েছে পাক হানাদাররা অহিংসার পাদপীঠে। ধর্মদ্বেষী সেই পাক পশুদের দশজন খতম হয়েছে মুক্তিবাহিনীর হাতে।

দিনাজপুরের গোসাইনগঞ্জে, রংপুরের কারনাইতে হানাদার রাজাকাররা গেরিলাদের অব্যর্থ নিশানার লক্ষবস্তু হয়ে করেছে মৃত্যুবরণ। পেয়েছে পাপের চরম শাস্তি। সিলেট, ময়মনসিংহের রণাঙ্গন থেকেও আসছে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের খবর। কুমিল্লার শান্তধীর গোমতীর তীর মুক্তিসংগ্রামের রণঝনঝনায় ঝংকৃত। ময়নামতির গুহাবাসী দানবের দল শালদা নদী অধিকার করতে এসে পেয়ে গেছে ইহলোক ত্যাগ করার ছাড়পত্র। পৃথিবীর

আলো-বাতাস ভোগের অধিকার তারা চিরদিনের জন্য হারালো। কায়েমপুরের ক'জন পাকসেনার ভাগ্যে ঘটেছে একই পরিণতি।

খবর! খবর! নিঃশব্দ শব্দেরা কাগজের পাতায় আর নিরুপদ্রব নির্জীব খবর নয়—তাজা জীবন্ত জ্বলন্ত শব্দের স্ফুলিঙ্গ আজকের খবর। কামানের গোলা, মেশিনগানের গুলি, মর্টারের ভয়ংকর শব্দ আর তারই মোকাবেলায় মুক্তিবাহিনীর তরুণ গেরিলার হাতের গ্রেনেডের সশব্দ বিস্ফোরণ, এল.এম.জি'র ঘন ঘন অগ্ন্যুদগার, মুমূর্ষু পাকসেনার রাজাকারের অসহায় আর্তনাদ, জয় আর সাফল্যের উন্মাদনায় দুরন্ত দামাল তরুণ দলের উল্লাসধ্বনি কাঁপাচ্ছে বাংলার দিগদিগন্ত। এই প্রচণ্ড সশব্দ সংবাদ শত্রুবুকে সৃষ্টি করেছে হৃদকম্প। তাই পাক-সরকার আর সেনাবাহিনীতে লোক পাচ্ছে না নতুন করে। মুহুর্মুহু গ্রেনেড বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আর পদার্পণ করতে নারাজ। তারা জানে বাংলার নদী অরণ্য, পাহাড়, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুছোবল। হাতে অটোমেটিক রাইফেলই থাক আর মেশিনগান থাক—একা কিংবা দশজনই হোক—প্রতিহিংসায় গর্জমান ভয়ংকর সর্পের বিষমুখে ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ যম বাংলার গেরিলা। তথাকথিত 'কাফের মারা'র জেহাদী জোশ্ আজ মারের চোটে অর্ন্তহিত। তাই আত্মসমালোচনার আর্তস্বরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষতবিক্ষত—২৫শে মার্চের হামলার কী প্রয়োজন ছিল? বেলুচ-পাঠান-সিন্ধীরা গালে হাত দিয়ে ভাবছে বাংলার মানুষের কী দোষ? তারা চেয়েছিল স্বাধিকার। তারা চেয়েছিল দেশের বেশিরভাগ লোকের মঙ্গল। সে মঙ্গলের আলো ছড়াতো সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত সিন্ধী-পাঠান-বেলুচদের ঘরে ঘরে। একদিন বেলুচরা মাথা নোয়ায়নি বলে তাদের জীবনেও নেমেছিল টিক্কা খানের পাশব অত্যাচার। ৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঈদের জামাতে পাক-বাহিনী ফেলেছে বোমা। বাংলার মুক্তিবাহিনীর সাফল্যই ঘরে-বাইরে পাক হানাদারদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। দুর্জয় বাংলার দুর্জয় প্রাণের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(বদরুল হাসান রচিত)

# মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম

**৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এই মুহূর্তে একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রতি প্রহরে মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা নতুন নতুন এলাকায় তাদের বিজয় ধ্বনিত করে তুলছে। তাদের বিজয়দৃপ্ত পদচারণা মানুষের মুক্তি এবং মানবিকতার শাশ্বত বাণীকে চিরন্তন এবং মহিমান্বিত করে তুলছে। শত্রুরা হটছে, পিছু হটছে, মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলেছে, সামনে চলেছে। মানবিকতার শত্রু পাক-হানাদাররা মৃত্যুমুখী যাত্রাপথের শেষ-প্রান্তে এসে ঠেকেছে, বাঙালিরা মহিমাময় মুক্তিতোরণের দ্বারে এসে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা পায়ে পায়ে চলেছে, সামনে চলেছে, চলেছে মুক্তির মহাসঙ্গীত উৎসে। পাক হানাদাররা পায়ে পায়ে মরছে, আরো মরছে, মরছে ঘৃণা এবং গ্লানির অন্ধকারে। ওদের মৃত্যু সহজ, সম্ভব—তাই সত্য। আমাদের অমরত্ব ন্যায়ত্ব, সত্যত্ব তাই অবধারিত। ওরা লাঞ্ছিত সমগ্র মানুষের বিবেকের বিচারে। আমরা নন্দিত সমগ্র সভ্যতার সান্নিধ্যে। সভ্যতার বিনাশে ওদের পাশবিক তৃপ্তি। সেই সভ্যতার স্থায়িত্ব আমাদের একমাত্র মুক্তি।

সভ্যতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যে যুদ্ধ বাংলাদেশের সীমানায় বন্দি ছিল, হানাদার হায়েনারা সে যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরো বৃহত্তর পৃথিবীতে। পাকিস্তানিরা সমগ্র মানুষের রক্তে স্নাত হতে চাইছে। চাইছে পৃথিবী জুড়ে তাদের বর্বর মৃত্যু, হত্যাযজ্ঞ নিবিচারে শুরু করতে।

এদের থামতে হবে। এদের থামাতে হবে। এদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে হবে। এদের বিনাশ করতে হবে। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানুষকে বাঁচাতে হবে।

আজ মানুষকে বাঁচাবার লড়াই। বিস্তারিত মুক্তাঞ্চলে অন্তত তারই বিরামহীন প্রচেষ্টা চলেছে। ওরা সবকিছু ধসিয়ে, পুড়িয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে পিছু হটছে—আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলার শ্রমে জড় হচ্ছেন। ইতোমধ্যে বাংলার বহু অঞ্চল মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলোর অনেক স্থানই এখন জ্বলছে। পশ্চিমারা পিছু হটার প্রাক্কালে অনুসরণ করছে পোড়ামাটি নীতি। জ্বালিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম। কয়েকদিন আগে এই অঞ্চলে পাক-হানাদারদের সাথে প্রচণ্ডভাবে লড়াইয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী খুলনার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করেছেন। এই এলাকা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল শাহাজান মাস্টারের সাথে। তিনি দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। আজ তিনি কলম ছেড়ে স্টেনগান হাতে নিয়েছেন। শিক্ষকের চেয়ার ছেড়ে সৈনিকের বাঙ্কারে বসেছেন। দশমাস আগেও যিনি ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসে বসতেন, আজ তাদেরকে নিয়েই তিনি বৈরীদের মুখোমুখি লড়াই করতে বসেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন : কি লাভ, কি হবে স্কুলে যদি ভবিষ্যতের ছাত্রদের না বাঁচানো যায়!

একটা আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং সাহস ভদ্রলোককে আজ এতখানি দুর্বার করে তুলেছে যে অন্তত একটা রাত দেখলেন না ঘুমিয়ে–মুক্তিবাহিনীর সরবরাহ কর্মে কাটিয়ে দিলেন।

আমার মনে হলো শিক্ষকরা মহান, কিন্তু ক্যাপ্টেন শাজাহানের মতো নিরলস শিক্ষকরা? নিশ্চয় ভবিষ্যৎ জবাব দেবে।

শাজাহান মাষ্টার সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন শরীফপুর গ্রামে। গ্রামটি খুবই ভালো। অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ করলাম গ্রামে একটা বাড়িও নেই। আমার চোখকেই যেন ক্ষণমুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনো কোনো পোড়া ঘর থেকে তখনও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। গ্রামের অস্তিত্বটাই যেন হরণ করেছে কোনও এক পাষাণ দানব। ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেন : হাঁ–এই গ্রামের এগার হাজার লোকের বাসযোগ্য গৃহাদি ছিল। কিন্তু এখন আপনি দেখছেন–তার একটাও নেই। আমি মাষ্টার সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন : দীর্ঘ বাইশ ঘন্টা তীব্র সংঘর্ষের পর পাক-হানাদাররা পিছু হটবার সময় সব বাড়িতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয় দেয়। আমরা মাত্র চার ঘন্টা আগে আগে এই গ্রাম দখল করেছি। এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে তিনি বললেন : এঁর নাম রতন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এলেন। চোখে তাঁর অশ্রুধারা। ঠোঁট দুটো একটু নড়লো। কোনও শব্দ উচ্চারিত হলো না। আবার ফিরে গেলেন। মাষ্টার সাহেব জানালেন, বৃদ্ধার পেশা ছিল দুধ বিক্রী করা। চারটে গাই গরুই ছিল তার সম্বল। এবারে আসুন আমার সাথে। শাজাহান সাহেব আমাকে যে গোয়ালঘরের কাছে নিয়ে এলেন সেখানে সে কি বীভৎসতা, কি দুর্গন্ধ—চারটে গরুর বিকৃত পোড়া দেহ পড়ে আছে। চার ধারের মাটিতে পোড়া চর্বির তেল গড়িয়ে গড়িয়ে ভিজিয়ে তুলছে। নাকে কাপড় চেপে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমি বললাম, ক্যাপ্টেন সাহেব আমার বড় খারাপ লাগছে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

ভাঙ্গা ধরা গলায় ক্যাপ্টেন শাহাজান কথা বললেন। আমি চমকে উঠলাম। তিনি বললেন : ও, আপনি আমার এক ছাত্রের বৃদ্ধা অচল মাকে ওরা ঘরে পুড়িয়ে মেরেছে তা দেখবেন না? তারপর বললেন : আর কটাই বা দেখবেন? ওরা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সর্বত্র গ্রাম, ধানের গাদা, গরুর গোয়াল, পাটের ঘর, সাঁকো, পুল সবই তো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা শরীফপুর গ্রামই না—এমন বহু শরীফপুর ওরা প্রতিদিন তৈরি করছে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আমরা আবার গড়ে তুলবো পোড়া ঘর ভাঙা ভিটেগুলোকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখ চলে গেল বড় একটা ভিটের ওপর, যেখানে ঘরের চারকোণের চারটে পোড়া ফাটা কাঠই অবশিষ্ট আছে—আর সব ফাঁকা। আমার মনে হলো এই ফাঁকা ঘরকে এরা একদিন ভরাট করবে, এই পোড়া নির্জনতার বুক চিরে এরা তুলে আনবে জীবনের স্পন্দন, নির্মাণ করবে পুনরায় সেই শান্তির নীড়— ছোট ছেলে-মেয়েদের কলকাকলিতে আবার ভরে উঠবে ঘরের আনাচ-কানাচ, সোনার বাংলায় আবার জেগে উঠবে সোনার গ্রাম। সেই সাধনায় এরা রত—রত শিক্ষক, রত ছাত্র, রত গ্রামের কৃষক-শ্রমিক।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ভাবছিলাম এবার আমাকে ফিরতে হবে। এমন সময় সাইকেলে একজন লোক এল। হাতে তার একটা ভাঙ্গা সাইকেল। ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানালেন : আমাকে মাফ করবেন, এক্ষুণি আমাকে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যেতে হচ্ছে। যে ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখিয়ে বললেন : ওর নাম মৃণাল কান্তি মুখার্জি। ও আমার অত্যন্ত

আমার মনে হলো শিক্ষকরা মহান, কিন্তু ক্যাপ্টেন শাজাহানের মতো নিরলস শিক্ষকরা? নিশ্চয় ভবিষ্যৎ জবাব দেবে।

শাজাহান মাষ্টার সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন শরীফপুর গ্রামে। গ্রামটি খুবই ভালো। অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ করলাম গ্রামে একটা বাড়িও নেই। আমার চোখকেই যেন ক্ষণমুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনো কোনো পোড়া ঘর থেকে তখনও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। গ্রামের অস্তিত্বটাই যেন হরণ করেছে কোনও এক পাষাণ দানব। ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেন : হাঁ–এই গ্রামের এগার হাজার লোকের বাসযোগ্য গৃহাদি ছিল। কিন্তু এখন আপনি দেখছেন–তার একটাও নেই। আমি মাষ্টার সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন : দীর্ঘ বাইশ ঘন্টা তীব্র সংঘর্ষের পর পাক-হানাদাররা পিছু হটবার সময় সব বাড়িতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয় দেয়। আমরা মাত্র চার ঘন্টা আগে আগে এই গ্রাম দখল করেছি। এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে তিনি বললেন : এঁর নাম রতন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এলেন। চোখে তাঁর অশ্রুধারা। ঠোঁট দুটো একটু নড়লো। কোনও শব্দ উচ্চারিত হলো না। আবার ফিরে গেলেন। মাষ্টার সাহেব জানালেন, বৃদ্ধার পেশা ছিল দুধ বিক্রী করা। চারটে গাই গরুই ছিল তার সম্বল। এবারে আসুন আমার সাথে। শাজাহান সাহেব আমাকে যে গোয়ালঘরের কাছে নিয়ে এলেন সেখানে সে কি বীভৎসতা, কি দুর্গন্ধ—চারটে গরুর বিকৃত পোড়া দেহ পড়ে আছে। চার ধারের মাটিতে পোড়া চর্বির তেল গড়িয়ে গড়িয়ে ভিজিয়ে তুলছে। নাকে কাপড় চেপে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমি বললাম, ক্যাপ্টেন সাহেব আমার বড় খারাপ লাগছে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

ভাঙ্গা ধরা গলায় ক্যাপ্টেন শাহাজান কথা বললেন। আমি চমকে উঠলাম। তিনি বললেন : ও, আপনি আমার এক ছাত্রের বৃদ্ধা অচল মাকে ওরা ঘরে পুড়িয়ে মেরেছে তা দেখবেন না? তারপর বললেন : আর কটাই বা দেখবেন? ওরা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সর্বত্র গ্রাম, ধানের গাদা, গরুর গোয়াল, পাটের ঘর, সাঁকো, পুল সবই তো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা শরীফপুর গ্রামই না—এমন বহু শরীফপুর ওরা প্রতিদিন তৈরি করছে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আমরা আবার গড়ে তুলবো পোড়া ঘর ভাঙা ভিটেগুলোকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখ চলে গেল বড় একটা ভিটের ওপর, যেখানে ঘরের চারকোণের চারটে পোড়া ফাটা কাঠই অবশিষ্ট আছে—আর সব ফাঁকা। আমার মনে হলো এই ফাঁকা ঘরকে এরা একদিন ভরাট করবে, এই পোড়া নির্জনতার বুক চিরে এরা তুলে আনবে জীবনের স্পন্দন, নির্মাণ করবে পুনরায় সেই শান্তির নীড়— ছোট ছেলে-মেয়েদের কলকাকলিতে আবার ভরে উঠবে ঘরের আনাচ-কানাচ, সোনার বাংলায় আবার জেগে উঠবে সোনার গ্রাম। সেই সাধনায় এরা রত—রত শিক্ষক, রত ছাত্র, রত গ্রামের কৃষক-শ্রমিক।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ভাবছিলাম এবার আমাকে ফিরতে হবে। এমন সময় সাইকেলে একজন লোক এল। হাতে তার একটা ভাঙ্গা সাইকেল। ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানালেন : আমাকে মাফ করবেন, এক্ষুণি আমাকে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যেতে হচ্ছে। যে ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখিয়ে বললেন : ওর নাম মৃণাল কান্তি মুখার্জি। ও আমার অত্যন্ত

স্নেহের ছাত্র ছিল। এখন ও একজন মুক্তি সৈনিক। ও খুব সাহসী যোদ্ধা। একবার দেবহাটা থানায় ও এগারজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ২০০ জন পাকবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। ১৮ জনকে হত্যা করেছিল। লে. মৃণাল বাবু আমার দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর সাথে পরিচয় হলো। তাঁর ডান আর বা হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। বললাম, এ কেন? তুচ্ছভাবেই জবাব দিলো যোদ্ধা মৃণাল : কয়েকদিন আগে দুই হাতে হারামীদের ব্রাশ লেগেছিল। ও কিছু না, শত্রুদের খতম না করা অবধি আমরা ক্ষান্ত হবো না। তাঁর দৃঢ় জীবন্ত শব্দগুলো আমার বিস্ময় এনে দিল।

তারপর ওঁরা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সাইকেলে চেপে। হাত নেড়ে ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেন : দানবের সাথে সংগ্রামের তরে'—। আমি হাত নেড়ে বললাম : জয় বাংলা।

(মুসা সাদেক রচিত)

# ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনেক ঝড়ঝাপ্টার পরেও—দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও সহজ স্বাভাবিক সবুজ শ্যামলিমা সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। গ্রামবাংলার সেই চিরন্তন দৃশ্যই দেখছিলাম। দু'চোখ ভরে, আর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিলাম সামনের দিকে। পথে ছোট একটি খাল পড়ল। এটি পার হয়ে যেতে হবে। দেখলাম খালের পুলটি ভেঙ্গে পড়ে আছে আর তার পাশ দিয়েই নতুন একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হচ্ছে। হানাদার বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামবাসীরা পুলটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। এখন আবার তারাই নতুন করে সাঁকো তৈরি করেছে।

খালের ওপারে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে বিধ্বস্ত একটি বাড়ি। না, কোন ঝড়ের তাণ্ডবে ওটি বিধ্বস্ত হয়নি। ইতিহাসের কলঙ্ক ইয়াহিয়ার উন্মত্ত জানোয়ারগুলো বাড়িটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এগিয়ে গেলাম বাড়িটির ভিতরে। কোনও মানুষ নেই, আছে শুধু চাপ চাপ রক্ত। বাঁধানো উঠোনের এক প্রান্তে একটি কুকুরের লাশ পড়ে আছে। ওটির গায়ে গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম, পশুগুলোর হিংস্রতার কাছে কুকুরটিও রেহাই পায়নি।

হ্যাঁ, বলছিলাম খুলনা জেলার একটি মুক্তাঞ্চলের কথা। ওই ফ্রন্টের মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দলের অধিনায়ক আমার বন্ধু আনোয়ার। গত পরশুদিন গিয়েছিলাম ওর ক্যাম্পে। পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'যে বাড়িটি দেখলেন ওটি স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি। পশুগুলো তাকে এবং তার দুই পুত্রকে হত্যা করেছে এবং তার একমাত্র মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।' সবচেয়ে মর্মান্তিক যা শুনলাম তা হলো, মাস্টার সাহেবের এক বছরের শিশুপুত্রটির পা ধরে একটি জানোয়ার সিমেন্ট বাঁধানো উঠানে সজোরে নিক্ষেপ করে শিশুটির মাথাটিকে চৌচির করে ফেলেছে। তখন আর একটি জানোয়ার পাকিস্তানি পতাকা একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাগিয়ে শিশুটির মাথার ভিতরে পুতে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চিৎকার করে উঠেছিল।

এ ধরনের শত শত জল্লাদী তাণ্ডবের কথা শুনতে শুনতে উপস্থিত হলাম স্থানীয় বাজারে। সেখানে দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। বাজারে বেশ লোক সমাগম হয়েছে। কেনাকাটার মাঝে আলাপ হচ্ছে। কোন্ কোন্ এলাকা মুক্ত হলো, কটা জানোয়ার খতম হলো ইত্যাদি হরেক রকমের কথা। প্রতিটি মানুষের দৃঢ় মনোবল দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বীর প্রসবিনী বাংলার আজ এক অভূতপূর্ব সাজ।

বাজার থেকে অল্প দূরেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। সেখানে গিয়ে শুনলাম আনোয়ার ক্যাম্পে নেই, রণাঙ্গনে। তার দলের একজন যোদ্ধা আহত হয়ে ক্যাম্পে শুয়ে আছেন। তার কাছে গিয়ে বসলাম, চারিদিক থেকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ হচ্ছিল। এক-একটি প্রচণ্ড শব্দের সাথে আহত তরুণটি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। আমাকে দুঃখ করে বললেন,

সামান্য আঘাতের জন্য তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে। এতক্ষণ রণাঙ্গনে থাকলে নিশ্চয়ই সে কয়েকটি হায়েনার জীবন নিতে পারতো। ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। কিন্তু সে বিশ্রাম চায় না। তার ইচ্ছা কালই সে যুদ্ধে যাবে। কিন্তু আমি দেখেছি তার আঘাত বেশ গুরুতর। কম করে আর ৩/৪ দিন তাকে বিশ্রাম নিতে হবে। সত্যি, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য অনুসারী আজ এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই আগুনের দুর্জয় শক্তির স্পর্শে শত্রুর সকল প্রতিরোধ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। মৃত্যু তাদের কাছে আজ খেলা মাত্র। আহত যোদ্ধাটির উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল।

ক্যাম্প থেকে আর একজন তরুণের সাথে এগিয়ে গেলাম রণাঙ্গনের দিকে। কানে আসছিল শুধু শব্দ আর শব্দ। যাবার পথে গ্রামবাসীদের দেখলাম কেউ চাষ করছেন, কেউবা মাছ ধরছেন, আবার কিছু লোককে দেখলাম তাদের বিধ্বস্তবাড়ি মেরামত করতে। ওদের চোখ-মুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মুক্তিবাহিনীর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে বিনা দ্বিধায় তারা দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন। মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার ডালকুত্তা বাহিনীর আক্রমণে যারা আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে, নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা এক একে ফিরে আসছেন। কবরের নিস্তব্ধতার মাঝে আবার গড়ে উঠেছে জনবসতি।

যেতে যেতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে পরিখা খনন করে তার ভিতর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান তৈরি হয়ে আছেন যে-কোনও বিপদের মোকাবিলা করার জন্য। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিজয়ের গর্বে তারা প্রত্যেকে গর্বিত! স্বাধীনতার পবিত্র আলোকে ওদের মুখ-চোখ উদ্ভাসিত। তারা জানালেন হানাদার বিতাড়িত হওয়ার পর মুক্ত এলাকা রক্ষার ভার তাদের উপর পড়েছে। এবং তারা দৃঢ়তার সাথে সে দায়িত্ব পালন করছেন। আর ওদের সহযোদ্ধারা প্রচণ্ডতম আক্রমণে কচুকাটা করে চলছেন পররাজ্যলোভী ডালকুত্তাদের। তাদের এই আক্রমণে মনোবলহীন ভাড়াটিয়া হায়েনার দল পরাজয়ের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পিছু হটছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহী এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা বাংলার দশদিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজয়ের বার্তা। চূড়ান্ত আঘাত হেনে শেষ হানাদারটিকে খতম করার দুর্জয় সংকল্পে অটল বঙ্গশার্দুল এই বীরবাহিনী সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জানিয়ে দিচ্ছে—তাদের সম্পূর্ণ মুক্তির দিন সমাগত।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলাম তার দুই মাইলের ভিতরেই তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। কাজেই আর সামনে যাওয়া যাবে না। এবার ফিরতে হবে। ফিরে এলাম ক্যাম্পে। একটু আগেই আনোয়ার ফিরে এসেছে। শুয়ে আছে ওর ক্যাম্প-খাটে। কিন্তু ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ব্যান্ডেজ বাঁধা। শুনলাম যুদ্ধ করার সময় ওর পায়ে হঠাৎ গুলি লাগে। কিন্তু ও কাউকে না বলে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন হানাদারেরা পিছু হটে গিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের এগিয়ে যাবার পালা তখন আনোয়ার ওর দুজন সহযোদ্ধাকে বলেছিল ওকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারা ওকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদেরকে দেখলাম তখনও তারা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি-গেঞ্জি, কাঁধে স্টেনগান আর চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। ওরা চলে গেল ওদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।

আনোয়ারের কাছে যুদ্ধের খবর শুনলাম। ওই দিনই আরও তিনটি থানা শত্রুমুক্ত হয়েছে। আর ও নিজেই ৪টি হানাদারকে খতম করেছে। পশ্চিমারা এখন আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় বেশি তৎপর। কাজেই পালানোর সময় অধিকাংশই মারা পড়ে। রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। 'বজ্রকণ্ঠ' অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর বাণী শোনা যেতেই আনোয়ার কঠিন হয়ে উঠল। ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম ওর চোখেমুখে এক কঠিন শপথের ছায়া। 'বজ্রকণ্ঠ' শেষ হয়ে যেতেই আমাকে বললো, বঙ্গবন্ধু আজ শত্রুর হাতে বন্দি। কিন্তু সবসময় মনে হয় তিনি আমাদের সাথেই আছেন, নির্দেশ দিয়ে চলছেন সামনে এগিয়ে যাবার, জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচন করার। তিনি যতই দূরে থাকুন আর যেখানেই থাকুন না কেন, আশীর্বাদই আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে মৃত্যুভয়কে হরণ করে সামনে এগিয়ে যাবার। এমনি অনেক কথা বলতে বলতে আনোয়ার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ গুম গুম করে প্রচণ্ড দুটো শব্দ হলো একেবারে কাছেই। আমাকে বিস্মিত করে ওর খাটের পাশে রাখা রাইফেলটা নিয়ে ও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই পায়ের যন্ত্রণায় কুকিয়ে উঠল। ততক্ষণে আমি ওকে ধরে ফেলেছি। আমি ধরতেই ও সম্বিত ফিরে পেল। আমাকে বলল, মনে ছিল না আমি আহত। ওই শব্দ শুনলে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। আবার ওকে শুইয়ে দিলাম।

মনে পড়ল আনোয়ারকে এক বছর আগেও কেমন দেখেছি। আমরা কলেজ হোস্টেলের একরুমেই ছিলাম। ও বড্ড ভীতু ছিল। সব রকম ঝামেলা এড়িয়ে চলত। কিন্তু আজ সেই শান্তশিষ্ট ছেলেটি দেশমাতৃকার ডাকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বাংলার এমনি লাখ লাখ শান্ত-সুবোধ ছেলেমেয়েরা পশ্চিমা সেনা শূয়ারের দলকে নিশ্চিহ্ন করে এক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পবিত্র বাসনায় আজ এমনি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।...

(তপন ভট্টাচার্য রচিত)

# রণাঙ্গন ঘুরে এলাম

**১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

বাংলার স্বাধীনতা এখন অবধারিত সাফল্যের পথে যাত্রা করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে এখন পশ্চিমী হানাদার বাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে হরদম মার খাচ্ছে। এবং পিছু হটছে। অচিরেই তারা লক্ষ করবে পিছু হটার পরিণামে তারা বঙ্গোপসাগরের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসার এবং ফিরে যাওয়ার দুটো রাস্তাই বন্ধ। শেষের সেদিন কি ভয়ংকর আর মাত্র কয়েক দিনেই তারা হাড়ে-মাংসে টের পাবে। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা এখন এগিয়ে, শুধু এগিয়ে চলেছে। শত্রু এখন ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। খুলনা, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মুক্তিবাহিনীর কবজার মধ্যে প্রায় এসে গেছে। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা এ মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর দখলে এবং এসব এলাকার কয়েক কোটি মানুষ এখন স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে শান্তিতে জীবনযাপন শুরু করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গন এখন মুক্তিবাহিনীর উল্লাস-ধ্বনিতে মুখরিত—'জয় বাংলা' নিনাদে প্রকম্পিত। খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালির যুদ্ধরত মুক্তিফৌজ ভাইদের সাথে আলাপ করে এবং এইসব রণাঙ্গন সফর করে আমার যেন বরাবর মনে হয়েছে—এ কি সেই বিধ্বস্ত বাংলা, না জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির ঢাকা? এই বছরের প্রথম দিকে সমগ্র ঢাকার আকাশ-বাতাস নগর বন্দর যে নামে যে ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠতো—বরিশাল খুলনার রণাঙ্গনগুলোর জয়ধ্বনি তার সাথে কত আশ্চর্যভাবে একাত্ম! যশোর, খুলনা, বাগেরহাট সাতক্ষীরার রণাঙ্গনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে 'জয় বাংলা' 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তা যেন বরিশাল-পটুয়াখালি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকেও শোনা যায়। বাংলার সব রণাঙ্গনের রঙ আজ এক, সব রণাঙ্গনের ধ্বনি আজ এক, সব রণাঙ্গনের চিত্র আজ এক। মুক্তিবাহিনী সর্বত্র জিতছে, শুধু জিতছে। রণাঙ্গন এবং সেই সাথে বাংলার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা শেখ মুজিব ও জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত, নিনাদিত। সব রণাঙ্গনেই একই রব : যাত্রা করো—যাত্রা করো—এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো। বাগেরহাট রণাঙ্গনে এসে মনে হলো সেই ইতিহাসের গ্রিকবাহিনীর বিজয় যাত্রার ছবি আমার সামনে। মনে হলো : বীর আলেকজান্ডারের গ্রিকবাহিনী যে বিজয়যাত্রার দৃপ্ত পদধ্বনিতে সাফল্যকে অতিক্রম করেছিল এখন সেই বাহিনীরই আরেক রূপ। এদের যাত্রা যেন শুধু সফলতার ইঙ্গিতকেই চেনে। শুধু বিজয়ের যাত্রাকেই স্বীকার করে। একেকটা বাহিনী একেকটি এলাকা থেকে এসে একটু থেমে আবার যাত্রা করছে। শত্রুর সাথে ওরা কেউ হয়তো বারো ঘণ্টা যুঝেছে, কেউ তিরিশ ঘণ্টা। তারপর সে জিতেছে—শত্রুকে হারিয়েছে, বিবেকের সম্মান আদায় করেছে। সবাই এসে মিলিত হয়েছে। এতক্ষণ ওরা লড়েছে। কিন্তু কেউ বিশ্রাম চায় না। তাই আবার ওদের যাত্রা শুরু। অকস্মাৎ একটি রবে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ওরা যাত্রা করছে কোথায়? ওদের ধ্বনিতে ওরা জানায় : চলো চলো, ঢাকা চলো। কুর্মিটোলা ভাঙো ভাঙো শত্রুদের হানো হানো। এখানে দীর্ঘ সতের ঘণ্টা পশ্চিমী হানাদাররা লড়ছে। অতঃপর তারা মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা মুক্তিবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এখন ওদের তাড়া খাওয়ার পালা।

এখন ওদের পরাজয়ের পালা। রণবিধ্বস্ত বাগেরহাটের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে আলাপ হলো নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলের সাথে। তিনি দেখলাম দারুণ ব্যস্ত। মাথায় একটা সবুজ ক্যাপ, পায়ে বুট, এক হাতে একটা দূরবীন এবং অন্য হাতে একটি স্টিক। আমাকে দেখে স্টিক উঠিয়ে বললেন : জয় বাংলা। আমি তাঁর কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম : শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ? ছোট্ট জবাবে বললেন : বহু। তারপর বামহাত দিয়ে স্টিক তুলে হাত বিশেক দূরে নির্দেশ করলেন : দেখুন। একটা মিলিটারি জিপ বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে তিনটে রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ হানাদার, একজনের মাথাটা আছে কি নেই বোঝা মুস্কিল— দেখা শেষ না হতেই কমান্ডার জলিল সাহেব স্টিকটা আরেকটু ডাইনে সরিয়ে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : ঐ বাঙ্কারে ওদের কমপক্ষে বিশটা লাশ পড়ে আছে। একটু সামনে ডাইনে সরে গিয়ে দেখলাম : হানাদারদের সেই দুর্ভেদ্য বাঙ্কারের মধ্যে থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে—আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের শেল এসে বাঙ্কারটা দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। নবম সেক্টরের কমান্ডার জলিল সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : এবার আপনি বলুন ক্ষয়ক্ষতি। কমান্ডার সাহেব এরপর কয়েকটি গ্রুপকে সামনের অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যাত্রা করবার জন্য আদেশ দিয়ে আমাকে বললেন, এখানে আমরা শত্রুদের কারো ফিরে যেতে দেইনি। আমাদের আরো দ্রুত সম্মুখপানে যেতে হবে। ওদের কারো ফিরতে দেয়া হবে না। সুতরাং বাংলার এই মুক্তিবাহিনীর এই প্রতিরোধ্য গতিকে না থামিয়ে সামনে চলার গতিকে আরো দ্রুতময় করে তুলবো আমরা। হেসে আমাকে বললেন : চলি, জয় বাংলা।

বাংলাদেশের পতাকা হাতে ট্রুপ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, পশ্চাতে উড়ছে ধূলি, তার পাশ দিয়ে কমান্ডারের গাড়ি এগিয়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর পশ্চাতে বিকেলের শেষ সূর্যের বিদায়ী রঙ কাত হয়ে পড়েছে—তারা চলে গেল —দূরে, অনেক দূরে—একসময় চোখের নিশানার ওপারে—এখানে তখনও শত্রুদের বাঙ্কার থেকে কালো ধোঁয়ার রেশ উঠছে, চারদিকে শত্রুদের মৃতদেহ পড়ে, পড়ে বিধ্বস্ত সামরিক যান, তার ওপর চার-চারটি হানাদারের নিষ্প্রাণ দেহ। আরো ওপাশে হানাদার বাহিনীর একটি তাঁবুর ভগ্নাংশ, তারও ওপাশে পশ্চিমা দস্যুর একটা ভগ্নকামান, দুটো বিক্ষত ট্রাক, ট্রাকের ওপর দিয়ে তখনও রাবারপোড়া ধোঁয়া উঠছে। এখানে হানাদাররা ছিল। এখন হটছে তারা। চোখ তার ওপারে এক বৃদ্ধার এবং গ্রামের আরো কতকগুলো পুরুষ-রমণীর দিকে ফিরে গেল। তারা এতসময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন কর্মে সহযোগিতা করছিল। এবার তারা সবাই সমস্বরে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের দিকে ফিরছে। আমি এগিয়ে গেলাম। সবাই গ্রামের দিকে ফিরছে, কিন্তু এক বৃদ্ধা, সাদা একমাথা চুল, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ততক্ষণে। বৃদ্ধার দৃষ্টি তখনও সেই পথপ্রান্তে— যেদিক দিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ভায়েরা এগিয়ে গেছে। বৃদ্ধার মুখের ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম, তাঁর চোখে অশ্রুধারা। জিজ্ঞেস করলাম : কি মা, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বৃদ্ধাটি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন : 'আমার মণি গেছে যুদ্ধে। খানদের খতম করে ও শহরে ফিরবে।' তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর আর আমি শুনতে পেলাম না—অথচ লক্ষ করলাম যে, তাঁর ঠোঁট দুটো তখনও নড়ছে। আমার যেন মনে হলো বৃদ্ধা মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হাজার মণিদের মাথায় বর্ষিত হচ্ছে, মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত নির্মিত হচ্ছে।

(মুসা সাদেক রচিত)

# মুক্তাঞ্চলে

**১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

বাংলাদেশে! আমার বাংলাদেশ!! বাংলাদেশ আজ স্বীকৃত সত্য! বাংলাদেশ আজ প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের আর্তি, বাংলাদেশ আজ সকলের হৃদপিণ্ডের শব্দ হয়ে বাজবে। আমাদের প্রাত্যহিক কাজে, চিন্তায়, স্বপ্নে, জাগরণের, সুষুপ্তিতে বাংলাদেশ অবিশ্রাম ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের ভালোবাসায়, বাঙালির প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগ-চিন্তা-অনুরাগে, পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সহানুভূতিতে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে।

কিন্তু শত্রু এখনো বাংলাদেশে আছে। শত শত শত্রু আত্মসমর্পণ করছে, অনেকে আবার আত্মসমর্পণ না করে পালাতে গিয়ে মরছে—মৃত্যু তাদের জন্য নির্ধারিত। এতদিনের অত্যাচার আজ সমাহিত হওয়ার কালে, অস্ত্র তাদের দিকে উদ্যত হয়েছে, ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম। তাই শত্রুসৈন্যের পরাজয় এত দ্রুত, এত করুণ। কিন্তু পলায়নের পর কি চিহ্ন আমরা পাচ্ছি অতীতের বাংলাদেশের? ছোট-বড় শতেকের মতো শহরে, ৬০ হাজার গ্রামে তারা কি স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে? মিত্রশক্তির সহায়তায় মুক্তিবাহিনী একের পর এক গ্রাম ও শহর দখল করে এগিয়ে চলেছে এবং যেখানেই তারা যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন শুধু ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস। যেন মানবসভ্যতার শত্রু চেঙ্গিশ খাঁর দলিত জনপদ ও গ্রাম, যেন নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারে বিক্ষত কোন গ্রাম বা শহরের ওপর দিয়ে পথ চলা—যেন এক অচেনা জগতের পথে, কোনও ঝঞ্ঝাহত গ্রামের ওপর দিয়ে। বাংলার চিরপরিচিত গ্রাম, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, যেদিকে চোখ ফেরাই শুধু ধূ ধূ করে হাওয়া। পরিচিত যশোহরের সেই ছোট ছোট ঘর আর জনবহুল রাস্তা আজ ম্রিয়মাণ। তবু মুক্তিবাহিনীর আর মিত্র বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে যে কি উল্লাস! তারা আবার সেই হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে। দুহাত বাড়িয়ে তারা জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। বুকের থেকে একটি বিরাট পাথরের বোঝা নেমে গিয়ে তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ যেখানে সেখানে পথে পথে ধ্বংসের ছবি লাফিয়ে উঠছে। শত্রুর অত্যাচারের কাহিনী। লজ্জা ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে স্থানীয় জনগণের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বুক, স্বজন-পরিজন হারানোর ব্যথা, সম্পদ হারানোর দুঃখ, গৃহহীন মানুষের অসহায় কান্না—কিন্তু মুক্তির নিশ্বাস টেনে, দুচোখ মেলে বলছে আর গান গাইছে—সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের জয়।

কোথাও পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ছে। পাগল একটি মানুষ। খবর নিয়ে জানা গেল কিছুদিন আগেও সে ছিল একজন বেসরকারি অফিসের অধস্তন চাকুরে। শত্রুসৈন্যরা তার পিতা-মাতা সকলকে হত্যা করেছে এবং সে হয়ে গেছে পাগল। মুক্তিবাহিনী থেকে খবর জানতে চাইলো তার, কিন্তু হায়, তার আর পূর্বের সেই সুখের বা দুঃখে স্মৃতি স্মরণে নেই। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু বেয়ে পড়লো, মিত্র বাহিনীর জওয়ানরা সহানুভূতি জানালো। তারা এগিয়ে চললো। তাদের হাতে অনেক কাজ। আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে। পেছনে যারা প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে আসছে তাদের কর্তব্য সকলের দেখাশোনা করা।

তারা দেখবে জনগণের সমস্যা, দুঃখ আর বেদনা। দুঃখের প্রতিকার করবে অসামরিক প্রশাসনের কর্মচারিবৃন্দ এবং সেই কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি শত্রুমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা, জনগণের মনে পূর্বের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং সুখের সন্ধান দেবার দায়িত্ব তাদেরই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে সাধারণ মানুষ। সরকার আর জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ সত্যিকার সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

আরো কিছুদূর যেতে যেতে একটি ছোটো-খাটো যুদ্ধ হলো শত্রুদের সঙ্গে, শত্রু-সৈন্য মরলো, আত্মসমর্পণ করলো বহু। কিছুদূরে গিয়ে চোখে পড়লো একজন আহত মানুষ। তার হাতে একটি স্টেনগান তখনো দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ এবং সে তখনো জীবিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা তার মুখে জল দিয়ে ডাকলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা, নাম। তবু নিরুত্তর সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা তরুণটি। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ তাকে রাজাকার বলে সন্দেহ করলো, অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করলো। কেউ কেউ বললো : কেড়ে নাও অস্ত্র, বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত সাজা হয়েছে, পথের ধারে তাকে ফেলে রাখো, ধুকে ধুকে মরুক। কিন্তু অনেকেই জানতে চাইলো প্রকৃত ঘটনাটি। সহসা ক্যাপ্টেন এল, আহতের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে গ্লাস থেকে আরেকটু জল মমতা-মাখা হাতে তুলে দিলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা। আহত জবাব দিলো, আস্তে আস্তে— যেন মধ্যাহ্নের সূর্য ধীরে ধীরে গ্রাস করছে কালবোশেখীর কালো মেঘ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় সে বললো তার মনের কথা :

ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করবো না অভিমান?

* * *

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে

* * *

আমার হদিস জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।

*　　　　*　　　　*

বন্ধু, আজকে বিদায়!
　　　　দেখেছো! উঠলো যে হাওয়া ঝড়ো,
ঠিকানা রইলো,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো।
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো ॥

বলতে বলতে আহত অনামা সৈনিক মুর্ছিত হয়ে পড়লো। সকলের মনে প্রশ্ন জাগলো— কে এই অজানা বীর! হয়তো সে একা একা শত্রুকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেছিল, হয়তো মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল সে। কিংবা সে একজন গেরিলা বাহিনীর সদস্য।

তাকে তাড়াতাড়ি সামরিক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে আবার পথ চলা শুরু। তখনো মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেনের বার বার মনে পড়তে লাগলো এবং বিড় বিড় আবৃত্তি করতে লাগলো :

আমার হদিস জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।

*　　　　*　　　　*

(বিপ্লব বড়ুয়া রচিত)

[বিপ্রদাশ বড়ুয়া ঐ নামেও লিখতেন : সংকলক-সম্পাদক]

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান থেকে।
সূত্র : 'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। তারিখ : আগস্ট, ১৯৭১।

# একটি উর্দু কথিকা

১৪ আগস্ট, ১৯৭১

আজ ১৪ই আগস্ট—মৃত পাকিস্তানের জন্মদিন। এই মৃত শব্দটি শুনে চমকে উঠবার কোনও কারণ নেই। গত ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং নিয়াজী সমবেতভাবে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে। ২৫ বছরের ভরা যৌবনে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটল। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশকে কেন্দ্র করে এই দেশেরই বিশেষ এক অঞ্চলে কি ধরনের শোষণ-অত্যাচার-চক্রান্ত চালান হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে বলছি।

গত ২৪ বছরের ইতিহাস অত্যাচার এবং বর্বরতার ইতিহাস। ফ্যাসিজমের একটা জীবন্ত চিত্র। এই চব্বিশ বছরে এদেশের শাসক এবং শোষক গোষ্ঠী গণতন্ত্রের সমস্ত শর্ত এবং দাবীকে পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করেছে। মনুষ্যত্ববোধ এবং মানবিকতাকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছে। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ— শোষক এই ভয়ে ভীত হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এর সমস্ত সুফল বাঙালিদের জীবনে বিরাট কল্যাণ ডেকে আনবে। তাই গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার চক্রান্ত চালিয়ে যেতে লাগল। এবং ধর্ম ও সংহতির নামে গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করা হলো। শোষকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল বাঙালিরা ধর্মভীরু। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে নেবে। ইসলামের নামে অর্থনৈতিক শোষণ এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ শুরু করল। এই শোষণ থেকে বেলুচিস্তান এমনকি সিন্ধুকেও মুক্তি দেয়া হলো না। সিন্ধুর জনগণের কবি শেখ আয়াজকে তারা কারারুদ্ধ করল।

সীমান্ত প্রদেশের জনগণের কবি ফারেগ বোখারীকে জেলে পুরে নির্যাতন চালাল। উপমহাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খান আবদুল গফ্ফার খানকে মানবতামুখী কার্যকলাপের দোষে তাঁর মাতৃভুমি থেকে বিতাড়িত করল। এমনকি নির্যাতিত বেলুচিদের মৌলিক দাবীগুলোকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ঈদের জামাতে অমানুষিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা উল্লেখ করছি। প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৬০% ভাগ দিত বাংলাদেশ এবং মাত্র ৪০% ভাগ দিত পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান শাসকচক্র সুস্পষ্টভাবে জানত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর তাই বাংলাদেশে যুদ্ধের আগুন আরো প্রচণ্ডভাবে জ্বালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে—যাতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা এইসব সৈন্যের ব্যয়ভার আর তাদের বহন করতে না হয়। একবার ভেবে দেখুন, যে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের পরিচিত, যে দেশের জলবায়ুতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অভ্যস্ত নয় সে দেশে ১৫শ মাইল দূর থেকে এসে এই নদীমাতৃক সমতল ভূমিতে তারা কি পেতে পারে—একমাত্র অসহায় মৃত্যু ছাড়া?

নাট্যকার খুনী ইয়াহিয়া এই রক্তাক্ত নাটকের পরিকল্পনা অনেক পূর্বেই করেছিল। এই নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর চরিত্র টিক্কা খাঁ'কে সে একবার প্রশ্ন করেছিল, "বল, তুমি ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আয়ত্তে আনতে পারবে কিনা?"

টিক্কা বিনা দ্বিধায় চট্ করে উত্তর দিয়েছিল, "হুজুর ৭২ ঘন্টা নয়, বলুন ২৪ ঘন্টার ভেতরে আমি বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। শুধু দশ-বিশ লাখ বাঙালির রক্তের প্রয়োজন।"

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নাট্যকার ঘাতক ইয়াহিয়া 'আহম্মকের স্বর্গ' ইসলামাবাদে চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে সেই রক্তাক্ত নাটকের মঞ্চ বাংলাদেশ।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতে নরঘাতক টিক্কা তার সশস্ত্র বর্বর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র, নিরীহ বাংলাদেশের মানুষের উপর। কামানের কুটিল গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়বাংলা' ধ্বনি আরও প্রচণ্ড রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে-বাতাসে। টিক্কা খান এতে হতভম্ব হয়ে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার আদেশ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর পশুরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সমস্ত বাংলা জুড়ে চালাল হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম তারা পুড়িয়ে দিল। বাংলার মাটিতে শুধু রক্ত আর রক্ত। একদিকে এইসব অত্যাচার অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও মনোবল দিন দিন বেড়েই চলল। বাংলার জনতা এক হয়ে একটা ইস্পাতের দেয়াল হয়ে গেল। রক্তলোলুপ হায়েনারা জানত না এরা বাংলার সন্তান, এরা সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর বাঘের সাথে খেলে, প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং মৃত্যুর চোখের উপর চোখ রেখে হাসে।

গত ২৫শে মার্চের পরে টিক্কা খাঁর ২৪ ঘন্টা—ঘন্টা থেকে দিনে, দিন থেকে মাসে অতিক্রম করল। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫ মাস। অর্থাৎ শত্রুকবলিত বেতার থেকে প্রত্যহ তারা প্রচারণা চালাচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক বলে। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অফিসের দরজায় দরজায় তালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, কারখানার চাকা নিস্তব্ধ, মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে বর্বর সৈন্যরা পালাবার পথ খুঁজছে, সত্তর জন সামরিক পদস্থ অফিসার প্রাণভয়ে আকাশ পথে পাড়ি জমিয়েছে। এইসব অফিসাররা তো আকাশপথে পাড়ি জমাবেই, বিপদ আসবে শুধু সাধারণ সৈন্যদের উপর। কেনই বা আসবে না? তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াই তো শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। সামরিক পদস্থ কোনও অফিসার যুদ্ধে মারা গেলে তাদের মৃতদেহ কাঠের তৈরি কফিনে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সাধারণ সৈন্য মারা গেলে তাদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে মাটিচাপা দিয়ে দায়সারা কাজ সারে। এটাই তো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ।

মিথ্যের সম্রাট ইয়াহিয়া খান ইরানে গিয়ে বলেছে, হিন্দুদের ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। চমৎকার! মিথ্যের সম্রাট চমৎকার! তোমার ওষ্ঠদ্বয়ই শুধু চওড়া নয়, মিথ্যে বলায় তোমার জিভের দৌরাত্ম্যও অসীম! নিজের ঘৃণিত কার্যকলাপকে ঢেকে ফেলার জন্য আর কত মিথ্যে তুমি বলবে? শোন এহিয়া খাঁ, কান খুলে শোন, বাংলাদেশ

স্বাধীন এবং এটা ধ্রুবতারার মতো জীবন্ত সত্য। তোমাদের তথাকথিত পাকিস্তান মৃত। তার গলিত শবদেহকে সত্বর কবরস্থ কর, নইলে পচন ধরা দেহের দুর্গন্ধ বাতাস বিষাক্ত করে তুলবে, মারাত্মক বীজাণু ছড়াবে বাতাসে বাতাসে। ইরানের সেই নোংরা বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুমি শাস্তি দেবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয় যার স্পন্দনে স্পন্দিত, তাকে তুমি শাস্তি দেবে কি করে? শেখ মুজিব শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, তার ব্যক্তিত্ব সমস্ত বাঙালির জন্য একটা আলোকস্তম্ভ— যে আলো পথনির্দেশ করবে একটা শোষণহীন জাতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। জেনে রেখো, আমরা যারা বাঙালি তারা তোমাদের মতো শোষকদের এদেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করব। বাংলাদেশের নব-ইতিহাস সূচিত হবে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে রবীন্দ্র-নজরুলের সঙ্গীত মুখরিত করে তুলবে। বিশ্বের ইতিহাসে ফেরাউন, নমরুদ, ইয়াজিদ, চেঙ্গিস, হালাকুর নামের সাথে আর একটা নাম কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। সে নাম তোর, নরঘাতক হায়েনা ইয়াহিয়া, সে নাম তোর।

(উর্দুতে মূল রচনা : জাহিদ সিদ্দিকী। অনুবাদ : আশরাফুল আলম)

# বাইবেল পাঠ ও আলোচনা

**.... নভেম্বর, ১৯৭১**

আজ আমরা আলোচনা করব যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু সম্পর্কে। প্রথমেই পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র থেকে কটি অংশ পাঠ করে নিই।

... "প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যিশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পিলাতের নিকটে সমর্পণ করিল।"

"তখন পিলাত যিশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল,... তখন পিলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমি ইহার কোনোই দোষ পাইতেছি না। ... তখন যিশুকে দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকেরা চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও। ... পিলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই। তখন তিনি যিশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।"

একথা বললে ভুল হবে না যে, জগতে যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব ছিল ঈশ্বর-নিরূপিত। যিশু জগতে এসেছিলেন মানুষকে তার পাপের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোক-সরণীতে পৌঁছে দিতে। তিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য—মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে আমিই পথ, সত্য ও জীবন—আমাতেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। বলেছিলেন : সৎ হও, পবিত্র জীবনযাপন কর; কারণ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর পবিত্র। আহ্বান জানিয়েছিলেন, ' হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দেব।' তাঁর সমস্ত বক্তব্য ছিল মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে। জীবনভর তিনি অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই সামাজিক প্রভুত্বের ক্ষমতালোভী যাজক-পুরোহিত ও গোঁড়াদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা প্রতিবাদ করেছেন। কারণ, এই সমস্ত ভণ্ড ধর্মগুরুরাই কখন মানুষকে এক মহাভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থে। এরাই নিজেদের কুটিল চক্রান্তে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে বসাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মানুষ তখনকার দিনে সরাসরি ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পারতো না। আসতো ঐসব যাজকদের কাছে।

কিন্তু খ্রিস্ট এসে মানুষকে দেখালেন প্রকৃত সত্যকে। কারণ, পাপী মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম সমমর্মিতা। মানুষকে ভালোবেসে তাই তিনি স্বর্গ ছেড়ে মাটিতে এসেছিলেন মানুষের অতি কাছে। এর ফলে পুরোহিত সম্প্রদায় ভিন্ন সকলের কাছে তিনি শুধু আপন হয়েই ওঠেননি—সকলের হৃদয়ে তাঁর জন্য পাতা হয়েছিল শ্রদ্ধার আসন। সকলেই তাঁর ধর্ম উপদেশ শুনতে ভালোবাসত। সকলেই তাঁকে প্রকৃত ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্র সেদিন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা তখন সর্বদাই যিশুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে। তাঁর দোষ ধরতে চেষ্টা করেছে, তাঁকে জনসমাজে অপদস্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তারা যিশুর প্রাণনাশের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। আজও যেমন সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই, সেদিনও অভাব হয়নি। যিশুর বারোজন শিষ্যের একজন এসে যোগ দিল এই ষড়যন্ত্রে—শুধুমাত্র অর্থের প্রলোভনে।

এই বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের সাহায্যে চক্রান্তকারীরা লোকচক্ষুর আড়ালে রাতের অন্ধকারে গেৎশিমানী বাগান থেকে যিশুকে বন্দি করল। ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষ পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার জন্য নিভৃতে নির্জন স্থানে শিষ্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে হাজির করা হয়েছিল বিচারকের কাছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো—এ ব্যক্তি ঈশ্বর-নিন্দুক, কারণ এ নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে। আরও অভিযোগ করা হলো, এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, কারণ এ নিজেকে য়িহূদিদের ইব্রিয়দের রাজা বলে ঘোষণা করছে। বলা বাহুল্য, সে সময় সমগ্র প্যালেস্টাইন দেশ রোম-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যাহোক, যিশুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল তার জন্য পুরোহিত-তন্ত্র হাজির করেছিল বহু মিথ্যা সাক্ষীকে। রোম সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন দেশাধ্যক্ষ পিলাত। তার সামনে চলল এক বিচারের প্রহসন। তিনিও বুঝলেন যাজকরা হিংসার বশে যিশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। বুঝলেন, ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে এনেছে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ—যাকে অবজ্ঞা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যুগে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল বিস্তৃত। তারা পীলাতকে ভয় দেখাল যে, যদি পিলাত যিশুর বিচার না করে তবে তিনি রোম সম্রাটের প্রকৃত বন্ধু নন।

পরিশেষে পিলাত নিজের ভালো দেখলেন। চাইলেন তার বিরুদ্ধে যেন সম্রাটের কাছে কোনও নালিশ না যায়। তাই তার বিচার প্রহসনে দাঁড়িয়ে গেল। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিচার বিচার খেলাটা শেষ হয়ে গেল। প্রকাশ করা হলো রায়—ঐ ব্যক্তিকে চরম দণ্ড দেওয়া হলো। না, ফাঁসী নয়—আরও নির্মম, নৃশংস ও লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ—ক্রুশিয় মৃত্যু। হাতে, পায়ে পেরেক গেঁথে ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে যিশুকে হত্যা করা হলো—যিনি ছিলেন নিরপরাধ, নিষ্কলংক, নিষ্পাপ ব্যক্তি। যিনি এসেছিলেন মানুষের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের শুচিতা, শুভ্রতা ফিরিয়ে আনতে। যিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করে অনন্ত, অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর মৃত্যুতেই কি সব শেষ হয়ে গেল? তিনি কি হেরে গেলেন পাপী প্রতিক্রিয়াশীল পুরোহিত-তন্ত্রের কাছে, তাঁর মৃত্যু কি তার সাথে মানুষের চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল? না। এর উত্তরে অসংকোচে বলা যাবে, তা নয়। অন্ধকারের পরে আসে আলো—এটা বিতর্কিত নয় কিন্তু প্রাকৃতিক সত্য। যিশু প্রমাণ করলেন মৃত্যুর পরে তেমনি আসে পুনরুত্থান। মৃত্যুর তিনদিন পর কবর থেকে অমোঘ মৃত্যুকে পরাজিত করে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। তাঁর পুনরুত্থান তার প্রতি বিশ্বাসী মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিল। মানুষকে বললেন, আমাকে বিশ্বাস কর। বললেন : ভয় নেই আমি আছি,

আমি তোমাদের শক্তি দেব। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর—পরাজিত হবে না। আমার মতো বিজয়ী হবে। পাপের সাথে যুদ্ধ কর—অবশ্যই তোমরা পাপকে জয় করতে পারবে। কারণ, আমি তোমাদের পরিত্রাণ কর্তা— তোমাদের শক্তিদাতা। মৃত্যুকেও তোমরা জয় করবে, আমার মতো মৃত্যুঞ্জয়ী হবে—ঈশ্বরের রাজ্যে, অনন্ত জীবনের দেশে তোমরা পৌঁছাতে পারবে। তখন অনায়াসেই বলতে পারবে—মৃত্যু, তুমি নাই।

কবির ভাষায় :

'মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।'

(ডেভিড দাস রচিত)

শিরোনাম : ১২। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান।

সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : ২০ নভেম্বর, ১৯৭১

(অফুরন্ত আনন্দের বন্যা নিয়ে ঈদ আসে আমাদের দ্বারপ্রান্তে। রমজানের শেষে এবারও এসেছে ঈদ-উল-ফিতর। কিন্তু এবারের ঈদ বয়ে আনেনি সেই আনন্দবন্যা।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলার মাটি বাংলার আকাশ আজ রক্তরাঙা। এবারের ঈদ তাই আমাদের জীবনকে অগ্নিশপথের আলোকে বিচার করার দিন। এগিয়ে চলার মুহূর্ত। এখন শুনবেন "রমজানের ওই রোজার শেষে"—একটি স্মৃতি আলেখ্য।—স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা।)

# রমজানের ওই রোজার শেষে

Ist Voice (Male)

বাংলার আকাশে আবার শওয়ালের চাঁদ উদিত। অঘ্রাণের কুয়াশামাখা দিগন্তে এক ফালি খণ্ড চাঁদে কত আলো আর আনন্দের প্রত্যাশা! কিন্তু সেই আলো আর আনন্দ আজ এমনভাবে নিভে গেল কেন? আকাশে যেন চাঁদ নয়, চাঁদের করোটি। ঈদের আহত চাঁদের গা বেয়ে যেন ঝরছে চাপ চাপ রক্ত। বাংলার আকাশ আজ লাল, মাটি আজ লাল। হেমন্তের পাখি গান গায় না। নবান্নের ধান কুমারী মেয়ের মতো বাতাসের প্রথম সোহাগে আর আন্দোলিত হয় না বাংলাদেশের সবুজ ক্ষেতে। শওয়ালের চাঁদ, তবু তুমি এসেছো মৃত্যুদীর্ণ বাংলার আকাশে। আলো আর আনন্দের সব পশরা দূরে রেখে। এসেছো রক্তাক্ত দেহে। এসেছো নিহত শিশুর আর নারীর লাশের ছবি বুকে গেঁথে—

2nd Vocie (Female)

"ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্,
এনেছে এজিদ বাংলার বুকে মোহাররমের চাঁদ।
এসেছে কাসেম এসেছে সখিনা সারা দেহে হায় তপ্ত খুন
আজ নয় ঈদ, আজ কোটি মুখে ইন্নালিল্লা .......... রাজেউন।
ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্
এনেছে এজিদ আবার এদেশে মোহাররমের চাঁদ।"

1st Voice (Male)

শওয়ালের চাঁদ নয়, মোহাররমের চাঁদ। না, তা কি করে হয়? রমজানের পর কি মোহাররম না শওয়াল?

2nd Voice (Female)

শওয়াল। কিন্তু বাংলার আকাশে এখন রমজানের পর মোহাররম। শওয়ালের চাঁদ পথ ভুলে গেছে। এজিদের তরবারির ভয়ে, বর্বরতার ভয়ে বঙ্গোপসাগরে উঁকি মারতে এসে সে পালিয়ে যায় তার সব আলো আর আনন্দ নিয়ে দূর আরবের মরু বিয়াবানে। এবার দামেস্কে নয়, ঢাকায় হয়েছে এজিদের অভ্যুদয়। তার সীমার সোনারা ঘুরছে বাংলার পথে পথে। লুঠ করছে নারীর ইজ্জত, হত্যা করছে রোজাদার বাঙালিকে। এজিদের বাবা যেমন একদিন বর্শার আগায় পবিত্র কোরান বেঁধে বিভ্রান্ত করেছিল আরবের মুসলমানদের, এ যুগের এজিদ ইয়াহিয়াও তেমনি ইসলাম আর কোরানের দোহাই পেড়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বাংলার মুসলমানকে। সে যুগের এজিদ ছিল মুসলমান। এ যুগের ইয়াহিয়াও মুসলমান। এজিদ কারবালায় হত্যা করেছে দশ হাজার মুসলমানকে। আর ইয়াহিয়া বাংলাদেশে হত্যা করেছে কয়েক লাখ মুসলমানকে

1st Voice (Male)

ঠিক। ঠিক। এজিদ বলেছিল, আরবের মুসলমানকে খেলাফৎ দেব না। আমি চাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ইয়াহিয়া বলছে, বাংলার মুসলমানকে আমি গণতন্ত্র ও স্বাধিকার দেব না। আমি চাই মিলিটারি ফ্যাসিজম কায়েম রাখতে। আলোচনার নামে এজিদের বন্ধু কুফার বিশ্বাসঘাতক মুসলমানেরা মহানবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কারবালায়। তার পিপাসার্ত স্ত্রী, পুত্র, শিশুকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি খেতে। এ যুগের ইয়াহিয়া আলোচনার নামে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করেছে। আর তিনি কোথায় কেউ জানে না। কেউ জানে না।

(নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে)

তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব
বাংলাদেশের প্রাণে গানে চিরঞ্জীব
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব ॥

2nd Voice (Female)

বঙ্গবন্ধু আছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বুকে। ইয়াহিয়া বা টিক্কার মতো নরপশুদের সাধ্য নেই এই নামটি বাঙালির বুক থেকে মুছে দেয়।

1st Voice (Male)

নবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন মুসলমান। বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলার কয়েকজন কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মুসলমান। নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, কাসেম, সোলায়মান, খাজা খায়রুদ্দিন, গোলাম আজম, মাহমুদ আলী গয়রহ। এদের চরম শাস্তির দিন আজ সমাগত। বাংলার বুক থেকে এই নামগুলোর অপবিত্র অস্তিত্ব মুছে দিতে হবে।

2nd Vocie (Female)

এবার নিয়ে দু'বার—দু'বছর মোহাররমের চাঁদ এল আকাশে শওয়ালের চাঁদের পরিবর্তে। গত বছর ঠিক রোজার ঈদের আগে বারোই নভেম্বরের কাল্-রাত্রিতে বিশ লাখ বাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রচণ্ড ঝড়ে। সেদিনও ইয়াহিয়া পিণ্ডির শাদ্দাদী বালাখানায় বসে হেসেছে। বাংলার মানুষকে বাঁচাতে, বিপন্ন মানবতার ত্রাণে নেমে আসেনি এই মনুষ্যদেহধারী জানোয়ার গোষ্ঠী।

1st Voice (Male)

গত ঈদেও সারা বাংলা কেঁদেছে। কেউ গায়নি প্রাণভরে—ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ— গেয়েছে মোহাররমের মর্সিয়া, ঈদের জামাত হয়েছে—জানাজার জামাত।

2nd Voice (Female)

বাংলার মানুষের কণ্ঠে শুনেছি তারই আর্ত ক্ষোভ—

“বাঁচতে চাইলে বাঁচবে এমন কথা তো নেই
প্রমাণ পেলে তো হাতে হাতে
বিশ লাখ শিশু নারী ও যুবক আজকে নেই
মরে গেছে তারা এক রাতে
বাঁচতে গেলেই বাঁচবে এমন কথা তো নেই ॥

প্রভু, তুমি এই পুণ্যির মাসে ধন্যি,
ঝড়ে নেভায়েছো লক্ষ প্রাণের বহ্নি
সাগরে ডুবেছে আমার স্বপ্ন-শিশুরা
তোমার ধ্যানেতে নিরত এখনো যিশুরা
আর যারা আছে, তারা প্রাণ দেবে নীরবে—
নাহলে তোমার পুণ্যিমাসের কি রবে?

কাফনে জড়ানো চাঁদের শরীর গলিত লাশ
দ্বীপাঞ্চলের বাতাস এখন দীর্ঘশ্বাস
গোলাপের মতো কত ফোটা ফুল লুণ্ঠিত
মৃত্যু মলিন ঠোঁটে চাপা ক্ষোভ কুণ্ঠিত।

1st Voice (Male)

গেলবার প্রকৃতির হাতে মারা পড়েছে লাখো লাখো মানুষ। সেই মৃত্যুদীর্ণ বাংলার বুকে আবার আঘাত হানতে দ্বিধা করেনি। রক্তপাগল নরপশু ইয়াহিয়া। এ বছর মরেছে দশ লাখ। ১ কোটি মানুষকে হতে হয়েছে দেশছাড়া। বাংলার ঘরে ঘরে আজ হাজার

সখিনার শরীরের শ্বেতবাস। কাসেমের লাশে ভরে গেছে বাংলার প্রান্তর। শওয়ালের চাঁদের ছদ্মবেশ ধরে আবার বাংলার আকাশে উঠেছে মোহাররমের চাঁদ।

2nd Voice (Female)

আবার শয়তান সীমারের ছুরি উদ্যত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীর বুকে। পবিত্র রমজান মাসে কারফিউ জারি করা হয়েছে ঢাকা শহরে। ঘরে ঘরে চলছে সার্চ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, শওয়ালের চাঁদ, তুমি মুখ ঢাকো। তোমার আলোয় যারা মোনাজাতের হাত তুলবে পশ্চিমমুখো হয়ে পবিত্র কাবাঘরকে সাক্ষী রেখে, যারা জামাতে শামিল হয়ে করবে এবাদত, তারা আজ কোথায়? তাদের কঙ্কালের স্তূপে, তুমি কিসের আলো ছড়াবে—আনন্দের, না শোকাশ্রুর?

[নেপথ্যে গান]

ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দিবি শোন আসমানি তাগিদ ॥

1st Voice (Male)

না শোকাশ্রুর নয়, সংকল্পের। এবারের শওয়ালের চাঁদ বাঁকা খঞ্জর হয়ে বাংলার মানুষকে পথ দেখিয়েছে। উঠুক মোহাররমের চাঁদ বাংলার আকাশে। আমরা কাঁদবো না। অশ্রু ফেলবো না। বাংলার তরুণের হাতে আজ অস্ত্র। ঈদের চাঁদের বাঁকা শরীরের মতো বাঁকা তলোয়ার। শত্রুনিপাতের সঙ্কল্পে আজ ঐক্যবদ্ধ লক্ষ বাঙালি তরুণ। ওই দ্যাখো, সীমারের চোখে আজ ভয়। এজিদের চোখে ঘনায়মান পরাজয়ের আতঙ্ক।

[আবার গান]

রমজানের ওই রোজার শেষে ...

2nd Voice (Female)

রমজানের রোজার শেষে এবারের ঈদ খুশির ঈদ নয়, সঙ্কল্পের ঈদ। সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়ার খুশির ঈদ। শত্রুবধের খুশির ঈদ। দেশ ও মাতৃভূমির জন্য নিজেকের বিলিয়ে দেওয়ার খুশির ঈদ। আত্মোৎসর্গের ঈদ। শহীদি দরজা খুলে দেওয়ার ঈদ। গাজী হওয়ার—বিজয়ী হওয়ার আনন্দের ঈদ।

[আবার গান]

রমজানের ওই রোজার শেষে ...

1st Voice (Male)

হেমন্তের আর্দ্র কুয়াশামাখা চাঁদের কি সজল মিনতি—বাংলার যুবশক্তি রুখে দাঁড়াও। বাংলার আকাশে বজ্রে ও বিদ্যুতে কি গভীর কানাকানি—বাংলার মানুষ, বজ্র-কঠিন শক্তিতে আঘাত হানো। ঈদের জামাতে শামিল হয়ে যে হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে মোনাজাতের জন্য, সে হাত দৃঢ়মুষ্টিতে পরিণত করে শেষ আঘাত হানো হানাদার

দস্যুদের উপর। বাংলার বাতাস থেকে মোহাররমের মর্সিয়া মুছে দাও, বাংলার আকাশ থেকে মোহাররমের চাঁদের বিদায় দাও। আসুক পুণ্য বিজয়ের ঈদ, শওয়ালের চাঁদ। চূড়ান্ত বিজয়ের চাঁদ আলো আর আনন্দ ছড়াক শত্রুমুক্ত বাংলার আকাশে। রমজানের রোজা, ত্যাগ কৃচ্ছতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে সত্যি সত্যি আসুক প্রকৃত খুশির ঈদ। গানের গানে ঝঙ্কৃত হোক কোটি বাঙালির হৃদয়, আর সেই দৃঢ় প্রত্যাশায় বুক বেঁধে বলি— মোবারক হো ঈদ, ঈদ মোবারক।

[গান—রমজানের ওই রোজার শেষে ............ ॥]

(রচনা : আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রযোজনা : মেসবাহ আহমেদ)

# রক্তে রাঙা ঈদ

শরীফ—দেখছিস ঐ ভাঙা বাড়িটার দেয়ালের ওপর দিয়ে, পোড়া গাছপালার মাথা ছুঁয়ে ঈদের চাঁদ উঠেছে—একফালি সরু চাঁদ!

কবীর—হ্যাঁ, অসংখ্য শহীদের বুকের পাঁজরার হাড় যেন চাঁদ হয়ে ফুটে উঠেছে আকাশের গায়ে। পড়িসনি নজরুলের 'কৃষকের ঈদ?'

শরীফ—নিশ্চয়ই পড়েছি। বাংলার নিঃস্ব শোষিত জনগণের মর্মকথাকে নজরুল প্রাণস্পর্শী ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করেছেন—

জীবনে যাদের হররোজ রোজা
ক্ষুধায় আসে না নিদ
ক্ষুধাতুর সেই কৃষকের ঘরে
এসেছে কি আজ ঈদ?

কবীর—আমারও প্রশ্ন তাই রে—লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ বুকে নিয়ে সারা বাংলা যখন গোরস্থান—নির্যাতিত শিশু, নারী বৃদ্ধার কান্নায় বাংলা যখন ক্রন্দসী, মজলুম মানুষের ফরিয়াদে বিশ্বের বাতাস ভারাক্রান্ত তখন ঈদকে খুশির ঈদ বলে মোবারকবাদ জানাতে পাচ্ছি না।

শরীফ—তবু তো প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না— রোজই সূর্য উঠ্ছে ভোরকে রাত্রির কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে। আবার সে সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যে আসে ছায়াভীরু পদক্ষেপে—

কবীর—কিন্তু আমরা কী আগের মতো—সেই ভয়ংকর রাক্ষুসে রাত ২৫শে'র পূর্বে, যেমন করে সকালের সূর্যের আলোয় নেয়ে উঠতাম—তেমনটা কি এখন পারি? সন্ধ্যা মায়াময় গন্ধ ছড়ায় না। একটা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ অন্ধকারে গা ঢেকেই পাক হানাদাররা আমাদের আক্রমণ করেছিল—আজও করছে—দিনেরাতে আমরা সবসময়ই মৃত্যুর মুখোমুখি—শয়তানের সম্মুখীন।

শরীফ—জানি কবীর, আমরা তাই গতানুগতিকভাবে ঈদকে মোবারকবাদ জানাতে পারবো না, তেমন করে খুশির ঢেউয়ে গা ভাসাতে পারবো না—কিন্তু তাই বলে ঈদ-উল-ফিতর তো ফিরে যাবে না আমাদের দ্বার থেকে।

কবীর—না, ফিরিয়েও দেবো না আমরা—আমরা নতুনভাবে ঈদকে স্বাগত জানাবো। (নেপথ্যে মেশিনগানের শব্দ) ঐ শোন-গুলির শব্দ—সংঘর্ষ চলছে হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর—(একটু হেসে) ঢাকায় ঈদের চাঁদ দেখলে ছোট ছেলেরা পট্‌কা ফুটাতো উল্লাসে—আজকের পট্‌কা ঐ গুলির আওয়াজ, বোমার আওয়াজ।

শরীফ— বেশ তো আজকের ঈদকে আমরা সম্বর্ধনা জানালাম বন্ধুকের গুলি ছুঁড়ে, শপথ নিয়ে কসম খেয়ে—বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে ঈদের প্রকৃত তাৎপর্যে খুনীর বন্যা বইয়ে দেবো ঘরে ঘরে। আমাদের জীবনের ঈদকে যারা চির ম্লান করে দিতে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে তাদের পশুহস্তকে চূর্ণ করেই পালন করবো 'ঈদোৎসব'।

মা— হ্যাঁ বাবা শরীফ, তোরা কি কেবল গল্প করবি? একটু কিছু মুখে দিবি না? ইফতার করেছিস দু'টুকরো রুটি খেয়ে—

শরীফ—দেবো মা—একমাসের সিয়াম আমাদের চরিত্রে এনেছে দৃঢ়তা, হৃদয়ে দিয়েছে বল, অনুভূতিকে করেছে তীক্ষ্ণ, বাহুতে দিয়েছে লড়াই-এর শক্তি—

কবীর—সেই শক্তিকে আমরা নিয়োগ করব শত্রুবিতাড়নের সংগ্রামে।

নার্গিস—ভাইয়া শুনেছ, পাক বেতার কি জঘন্য প্রচার চালাচ্ছে!

শরীফ—কীরে?

নার্গিস—ওরা বলছে ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী ঈদের জামাতে আক্রমণ করবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে—

কবীর—ওরা প্রচারপত্রও ছেড়েছে ঢাকা শহরে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে।

নার্গিস—কী জঘন্য। আমরা ইসলাম ধর্মের শত্রু—এই কথাটাই প্রচার করতে চায় তারা, অথচ মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে ইসলামের কি নাম তারা করলো?

শরীফ—যারা মানবতার শত্রু, তারা ইসলামসহ সকল ধর্মের শত্রু।

কবীর—তাছাড়া মসজিদের উপর গোলাবর্ষণ করে ভেঙে চুরমার করেছে খোদার ঘর! কারা নামাজরত মুসুল্লীদের হত্যা করে রক্তে ভাসিয়েছে মসজিদের পবিত্র অঙ্গন? আমরা, না পাক হানাদাররা?

শরীফ—আজ বিশ্বের সকলেই জানে ওদের ঐ ধর্মবিরোধী বর্বরতার ইতিহাস—তবু তাদের মিথা ভাষণের বিরাম নাই।

কবীর—আসল মতলব কি জানিস! '৪৮ সালে পেশোয়ারের সীমান্ত এলাকায় ঈদের জামাতে বোমাবর্ষণ করে কাইউম-লীগ সরকার হাজার হাজার পাঠানদের হত্যা করেছিল—৫৮ সালে আয়ুবী আমলে এই নররাক্ষস টিক্কাখান বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতে বোমা ফেলেছিল—এবারে বাংলাদেশে একই পৈশাচিকতার পুনরাবৃত্তি করতে চায় ওরা।

নার্গিস—আর তাই করে দোষ চাপাতে চায় বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের উপর।

শরীফ—কিন্তু ওদের সে পরিকল্পনা সফল হবে না। আজকের বাঙালি অনেক বিচক্ষণ—আঘাতে আঘাতে তারা গন্‌গনে লোহার মতো সুকঠিন হয়েছে, হয়েছে ধারালো।

কবীর—ঈদের ময়দানকে যদি ওরা জঙ্গের ময়দান করে তুলতে চায়, তবে পাবে তার চরম শাস্তি। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। লানৎ নেমে আসবে ওদের মাথায়।

শরীফ—শহীদ-ই-ঈদগাহে আজ জমায়েত ভারী—আমাদের দুঃখকে আমরা ভুলেছি শহীদের আত্মদানের শিক্ষায়, বীর সেনাদের বীরত্বের গৌরবে, শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণায়। রক্তে রাঙা ঈদের চাঁদ শত্রুমুক্ত শোষণমুক্ত বাংলার পতাকায় ছড়াবে নতুন আলো।

(বদরুল হাসান রচিত জীবন্তিকা)

# রক্তরাঙা ঈদুল ফিতর

(১) মাহে রমজান—ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক অপূর্ব প্রতীক। সংযত চরিত্রের মানুষের জন্য এ মাস এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু আজ বাংলার মাটিতে যে দাবানল জ্বলে উঠেছে তাও এবারের রমজান এবং ঈদুল ফিতর পেয়েছে নতুন অর্থ। এবং তারই আলোকে উজ্বল হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষ। ক্ষতবিক্ষত বাংলা। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। নতুন শপথে ভাস্বর এবারের ঈদুল ফিতর। আনন্দ নয়, সংগ্রামী প্রত্যয়ে দৃঢ় তাই বাংলার মানুষ।

আজ নয় নয়, নয় কোন আভরণ
রক্তে রক্তে বাজে দুন্দুভি শপথ নেয়ার দিন
আজকে প্রাণের মহফিলে বাজে
রুদ্র রৌদ্র বীণ ॥

সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকে
হানে যারা খঞ্জর
নয় ক্ষমা নয় হানো হানো তারে
দুর্জয় দুর্বার
উদ্যত মুঠি করো না শিথিল
মুক্তি সেনানী বীর ॥

আজকে তিমির পল্ললে শোন
জীবনের মহাগান
জয় সংগ্রামী সাড়ে সাত কোটি
জয় জয় মহীয়ান।
রক্ত রঙিন বাংলার বুকে
অতন্দ্র প্রহরায়
জাগে নির্ভীক লাখো সৈনিক
নাই ভয়, ভয় নাই
বঞ্চিত আজি জাগ্রত ওই
এসেছে মুক্তিদিন ॥

(২) দুর্জয় সাহস, দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিরোধ করছে শত্রুর হামলা। প্রতিদিন এই বাংলার মানুষ নতুন এক সম্ভাবনায় হয়ে উঠছে উজ্জীবিত। অপূর্ব এই মহাজাগরণ। বাংলার মাঠি, বাংলার মানুষ আজ ধন্য। পূর্ণতর এক জীবনের সন্ধানে আজ দেখছে নতুন স্বপন। নতুন সূর্যদিন ডাকছে ওদের হাতছানি দিয়ে। এক দিগন্ত থেকে অন্য আরেক দিগন্তে আজ তাই চলেছে প্রাণের উল্লাসে।

এগিয়ে চলো
দিগন্ত থেকে দিগন্তে আজ
এগিয়ে চলো ॥ এগিয়ে চলো ॥ এগিয়ে চলো ॥

হিংস্র শ্বাপদ ওই হানাদার
নিঃশেষে নাম মুছে ফেলো তার

বাঙালির তরে বাংলার মাটি
নিঃশঙ্ক আজ বলো ॥

মায়ের বোনের ভাইয়ের রক্তে
ভিজে গেছে এই মাটি
প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম তাই
এ মাটি অনেক খাঁটি ॥

এ মাটির বুকে কোন অনাচার
সইবো না কেউ সইবো না আর
হাতে হাতিয়ার নির্ভয় প্রাণ
জ্বেলে দাও সব আলো ॥

(৩) আজ নয় হিসেব-নিকেশের দিন, আজ নয় আনন্দ-উৎসবের দিন—আজ শুধু সংগ্রাম, ঘরে-বাইরে দুঃসহ দারুণ সংগ্রাম। কাপুরুষ হানাদারদের নিঃশেষে খতম করে তবেই আমরা হবো নিশ্চিন্ত। আজ এই দিনে আমরা তাই শপথ নিই—দেহের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা অর্জন করবো আমাদের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আমাদের জীবনের চেয়ে মহান।

বাংলার নামে আজ শপথ নিলাম
মুজিবের নামে আজ শপথ নিলাম
বাংলাকে করবোই মুক্ত
শত্রুর বিষদাঁত ভাঙবোই ভাঙবোই
আজ আর নয় কোন শর্ত ॥

কৃষক শ্রমিক চায় মুক্তি মুক্তি
ছাত্র মজুর চায় মুক্তি মুক্তি
সাড়ে সাত কোটি এই জনতার ইচ্ছা
মুক্তির জন্যে হয় হোক মৃত্যু ॥

বাংলার বুকে যারা জ্বেলে দিল দাবানল
তারে আজ ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়
লেলিহান অগ্নির দুঃসহ প্রান্তে
দুশমন পুড়ে আজ হোক ছাই ॥

শহর নগর চায় মুক্তি মুক্তি
বাংলার গ্রাম চায় মুক্তি মুক্তি
ত্রাসের কাঁপন লাগে শত্রুর বক্ষে
বাংলার বুকে ওরা একেবারে রিক্ত ॥

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত সঙ্গীতালেখ্য)

শিরোনাম : ১৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠান থেকে।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : .......... ১৯৭১।

# বিপন্ন যখন

**... অক্টোবর, ১৯৭১**

এই অন্ধকার, নিটোল নিশ্চিন্দ্র অন্ধকার, অন্তহীন হোক—সে প্রার্থনা করল মনে মনে। আর সেই সুতীব্র অন্ধকারের কামনার সাথে অসাড় হয়ে যাওয়া চেতনা ফিরে আসে নিঃশব্দে এবং, এখন নিজেকে সে আবিষ্কার করল কচুরিপানায় ভরা জলাশয়টির এক প্রান্তে। একগলা জলের মধ্যে মাথায় কচুরিপানা চাপিয়ে কতক্ষণ লুকিয়ে রয়েছে তার নিজেরই মনে নেই। আমার মা, বউ, চার বছর বয়সের ফুটফুটে ছেলেটি— কেউ বেঁচে নেই, নৈঃশব্দের হু-হু ধূসর পটভূমিতে এইসব কথা মনে এল এখন। ছোট ছোট মাছ অথবা জলের পোকা ক্রমাগত তার শরীরের অনাবৃত অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটি তীব্র অনুভূতি, সে ঠিক জানে না তা কি, তার সমস্ত শরীরে ওঠানামা করছে। আস্তে করে কচুরিপানা সরিয়ে সে মাথা তুলল, এবং একটি আহত জন্তুর মতো ভীত দৃষ্টিতে তাকাল চারিপাশে। কিছুই চোখে পড়ছে না। অন্ধকার, তার চারিপাশে এখন মৃত্যুর মতো শীতল অন্ধকার।

এবার উঠি, সে ভাবল এবং অশক্ত পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। যেহেতু ক্লান্তিতে এখন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, তার পদক্ষেপ সংক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো।

জলাশয় পেরিয়ে মাঠ, তারপর আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। তারপর, কি আশ্চর্য, তেঁতুল গাছের পেছনে উঁকি মারে মৃত্যুশয্যার বিবর্ণ ম্লান চাঁদ। দু'এক পা এগোতে এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারল অসহ্য ক্ষিধে পেয়েছে তার, এক্ষুণি কিছু খেতে না পেলে সে বোধ হয় মরে যাবে। সতর্ক চোখে তাকায় চারিদিকে, কোনও বাসগৃহ চোখে পড়ে না— কোনও নিকানো আঙিনা বা অস্পষ্ট কোনও আলোর রেখা। এ গাঁয়ে বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই। আখের ক্ষেতের আশেপাশে লুকিয়ে নেই কোনও সতর্ক প্রহরা। সে ভাবল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফলন্ত ক্ষেতের কিনারে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কয়েকটি আখ ভেঙ্গে নিয়ে একটিতে কামড় বসাল।

এখন সে একটার পর একটা আখ চিবিয়ে চলেছে। শক্ত খোসায় লেগে গালের একপাশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। আখের খোসা ছাড়ান খণ্ডগুলো দাঁতে পিষতে অল্প মিষ্টি অথচ নোনতা তরল পদার্থে মুখের ভেতরটা ভরে উঠছে। এখনো পাকেনি, পাক ধরতে সেই আশ্বিন মাস, পূজোর সময়। আর বোধহয় আমার ক্ষিধে নেই, সে ভাবল এবং আখ চিবানো বন্ধ করল। মাথা ঝিমঝিম করছে, সমস্ত শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, এবং ক্রমশ ভারী হয়ে আসা চোখের পাতার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে অজস্র দৃশ্যাবলী। না, ঘুম আসবে না। এখন—কারণ সেই বীভৎস দৃশ্যটি এখনো তার চেতনায় অনির্বাণ। ঘাসের ওপর শরীরটা ছেড়ে দিতেই স্মৃতিরা ফিরে এল দ্রুত লয়ে, প্রপাতের মতো—তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সেই নির্দয় মুহূর্তটির নৈকট্যে।

আমার নাম জীবন, জীবন দাস—তার মনে পড়ল। মনে পড়ল বিধবা মাকে, জোয়ান বউ সরমাকে, আর চার বছরের ফুটফুটে বাবুকে। গত পরশু সকালে ওরা বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। অথচ, কি আশ্চর্য, ওরা এখন কেউ বেঁচে নেই। হিংস্র জানোয়ারগুলো নিরস্ত্র নিষ্পাপদের গুলি করে মেরেছে। আর আমি, উনত্রিশ বছরের ক্লীব, অক্ষম যুবক আমি, মা-ছেলে-বউকে ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি নিজের মহামূল্য প্রাণটি বাঁচাতে—এই কথা ভাবতে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল তার সামনের দৃশ্যাবলী।

এখন, এই বিষণ্ন রাতে, তার মনে পড়ল কয়দিন আগের একটি অনিশ্চয় রাত্রিকে।

আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। অন্তরঙ্গ শয্যায় সরমা বলেছিল তাকে।

তা ভাবনা হবারই কথা। যদিও শহর থেকে যাত্রী বোঝাই লঞ্চের আসা-যাওয়া হঠাৎ করে বন্ধ হয়েছে বেশ ক'দিন আগে থেকে। বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক মন-কেমন-করা গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল দক্ষিণ খুলনার সুদূর নিস্তরঙ্গ এই গ্রামটিতেও। একটা প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে নাকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মিলিটারি আর বাংলাদেশের শহর-গঞ্জে বাস করা মানুষগুলোর মধ্যে। কারণটা কি, ওরা সঠিক জানে না কেউ—কেবল গ্রামের একমাত্র কলেজে পড়া ছেলে রফিকের কথাবার্তা থেকে একটা ধোঁয়াটে উপলব্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে ওরা। হাতে টাকা নেই, মাঠে ফসল ফলে না, অনাবৃষ্টি বন্যা অনাহার, দুঃস্বপ্নের অনাবাদী বছরে নিষ্ঠুর দারিদ্র দাওয়ায় উঠে বসে পাওনাদারের মতো—এ সবকিছুই নাকি পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাদের ষড়যন্ত্রের ফল। যে বিপুল ষড়যন্ত্রে বিরান হয়ে যায় উর্বর, বর্ধিষ্ণু জনপদ—ফলবতী হয়ে ওঠে আজন্মের অনুর্বর মরুভূমিও। বছরের পর বছর অত্যাচার, অনাচার আর শোষণের অবসান ঘটাতে এই জীবনান্ত যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে আমরা, বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ জিতবই—রফিকের কণ্ঠে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ঝলমল করে।

আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে। সরমা আবার পুনরাবৃত্তি করে।

ভাবনা আবার কিসের? সরমাকে নয়, যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে জীবন। শহরে নাকি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে। ক্ষ্যাপা কুকুরীর মতো হয়ে গেছে মিলিটারি। মানুষ পেলেই গুলি। কোনও বাছবিচার নেই। সরমার গলায় উদ্বেগ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

তা শহরে যাই হোক গাঁয়ে তার কী? আমাদের এখেনে ত আর যুদ্ধ হচ্ছে না। জীবন সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে।

কিন্তু যদি হয়?

পাগল! এই অজ পাড়াগাঁয়ে মিলিটারি আসপে মরতি? আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এখেনে?

সব আশঙ্কাকে জোর করে সরিয়ে পাল্টা এক প্রত্যয়ের প্রশ্নকে বউয়ের দিকে ছুড়ে দিয়েছে জীবন। চুপ করে গেছে সরমা।

গত পরশুর ভয়ঙ্কর সকালের কথা তার মনে পড়ল এখন। যথারীতি সূর্য উঠেছিল, নদী থেকে এলোমেলো হাওয়া উঠে এসে গ্রামের গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রশান্ত সকালে আকাশে অনেক সঞ্চরণশীল মেঘ চোখে পড়েছিল, এবং স্পষ্ট মনে আছে জীবনের, বাড়ির পাশের গাছপালা থেকে যথারীতি পাখিদের ডাকাডাকি শুনেছিল ঘুম থেকে উঠেই।

মুখ-হাত ধুয়ে, দু'মুঠো পান্তা খেয়ে, রোজকারের মতো রফিকদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। এই আসাটা প্রায় একটি অভ্যেসে পরিণত হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুদিন থেকেই—কার্যত শহরে গণ্ডগোল শুরু হবার পর থেকেই। কেবল জীবন নয়, গ্রামের অনেকেই রফিকদের বাড়িতে ভিড় করত রেডিয়োর খবর শুনতে।

রফিকদের বাড়িতে পৌঁছে জীবন শুনতে পেল রেডিয়োতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর হচ্ছে এবং তার চারপাশে ছোটখাট একটি উৎসুক জনতা। খান সেনারা মার খাচ্ছে। ক্রমাগত জিতে চলেছে মুক্তিবাহিনী, এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে। শীগগীর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে, রফিকের দৃপ্ত ঘোষণা ভোর বেলাকার এক মিষ্টি স্বপ্নের আমেজ বয়ে আনে যেনবা।

বেলা একটু বাড়তে দূর থেকে অবিরত এক যান্ত্রিক আওয়াজ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। লঞ্চের শব্দ অথবা কোনও স্টীমারের। প্রত্যাশায় ব্যগ্র গ্রামবাসীরা ভাবে। অনেকগুলো জিজ্ঞাসা পাক খায় : যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেল তবে? হেরে গেছে খান সেনাদের দল? সেই শুভ ঘোষণা করতে আসছে বিজয়ী মুক্তিসেনারা?

দুপুরের দিকে তারা এল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে থাকা পাখির মতো অসহায় গ্রামটির ওপর। গানবোট থেকে দূরপাল্লার কামানের শব্দ জেগে উঠতেই আগন্তুকের পরিচয় গোপন থাকেনি। গ্রামবাসী প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এরকম একটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা ওদের কল্পনাতেও অনুপস্থিত ছিল। এখন, এই নির্দয় দুপুরে, অকস্মাৎ তাকে শরীরী হয়ে উঠতে দেখে বৃষ্টির মতো আতঙ্ক নামে এবং তা গিয়ে গড়িয়ে যায় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

গানবোটের কামানের শব্দ শুনেই দৌড়ে বাড়ি ফিরেছে জীবন। ওদের বাঁচাতে হবে—আমার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর সন্তানকে। এই একটিমাত্র চিন্তায় সে একাগ্র এখন।

দাওয়ায় বসে মা চীৎকার করে কাঁদছে, সরমার মুখ মৃতের মতো ফ্যাকাসে, ছোট্ট বাবু অবাক হয়ে চেয়ে আছে—বাড়িতে পা দিতে তার সামনের দৃশ্যপটটি ছিল এই রকম।

—চল, পালাতি হবে। মিলিটারি।

কথা নয়, যেন কাঁদছে জীবন।

—না মা, কিছুছু নিতে হবে না। খালি হাতে চল। শীগগীর।

মা বউ ছেলেকে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। জীবন। এখন, এই অভাবনীয় সংকটকালে, মৃত্যু যখন একটু ওপাশে হাঁ করে দাঁড়িয়ে, একটি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন।

অথচ সেই নিশ্চিন্ততার আশ্রয় ওদের জোটেনি। রাস্তার মোড়ে সৈন্যের পোশাক পরে মৃত্যু ওদের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে ছিল। যমদূতগুলোর মুখোমুখি হতে আর্ত চীৎকার করে উঠেছে মা, গলা ছেড়ে কেঁদে উঠেছে সরমা, আর সেই সাথে ওদের হাতের মেশিনগানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে লুটিয়ে পড়েছে মা, সরমা আর বাবু। অথচ, কি আশ্চর্য, জীবনের চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় এক ঝাঁক গুলি এবং সেই সাথে রাস্তার পাশের আগাছা ভর্তি খানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। দ্রুত ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে শুনতে পেল বাবুর গোঙানি, ভারী ভারী

বুটের আওয়াজ, বিজাতীয় ভাষার বীভৎস উল্লাসধ্বনি, সহসা কোনও নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উচ্চগ্রামে উঠে হারিয়ে যায় নিঃশব্দে। গুলির শব্দ থেমে যেতে এবং বুটের আওয়াজ ক্রমশ অপসৃয়মান মনে হতে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসেছে জীবন। রাস্তায় তার চোখের সামনে পাশাপাশি এলোমেলো শুয়ে তার জননী, তার জায়া, তার একমাত্র সন্তান। ওরা মরে গেছে—এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধির পরও চোখে জল এল না তার।

অনেকক্ষণ বিরতির পর আবার খুব কাছাকাছি শোনা গেল গুলির আওয়াজ এবং আর্ত চীৎকার। জীবন আর দেরী করেনি। ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আবার মড়ার মতো পড়ে রয়েছে। এই মৃত্যুপুরী থেকে, এই নরককুণ্ড থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই, তার লুপ্তপ্রায় চেতনায় তখন একটিমাত্র সিদ্ধান্ত।

দূর গাঁয়ের এই পরিত্যক্ত জলাশয়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাটা দিন এবং সমস্ত সন্ধ্যে। কারণ, গানবোটের আওয়াজ মনে হয়েছে কখনো দূরে, আবার কখনও খুব কাছে। রাইফেল, মেশিনগানের আওয়াজ ভেসে এসেছে অনেকবার।

এখন, এই বিবর্ণ শেষরাতে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে মানুষটি, যার নাম জীবন, আর যার জীবন এক অন্তহীন অর্থহীন যন্ত্রণার উপাখ্যানে পরিণত। সব হারিয়েও আমি এক অন্ধকারের জন্তুর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আমার বিষে নীল হয়ে যাওয়া পদ্মপাতার জীবনকে বাঁচাতে এ কি এক হাস্যকর প্রহসন, এলোমেলো ভাবনারা ঘুরেফিরে আসে।

এই মুহূর্তে, নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ হতে লোকটি আবিষ্কার করে—আজন্মের অন্তরঙ্গ মৃত্যুভয় অকস্মাৎ অপসারিত। তার এখন মরতে কোনও ভয় নেই, ভয় নেই সেই সব হিংস্র ঘাতকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, সারা শরীরে মাখতে চাই আমার সন্তান-হন্তার রক্ত, একটি অমোঘ প্রতিজ্ঞা ক্রমশ ওকে জড়িয়ে ধরছে নিবিড় করে। অতএব, আমি ফিরে যাব। একটি আশ্চর্য সিদ্ধান্তে নিজেই অবাক হলো জীবন।

এখন, ভোররাতের আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে, একটিমাত্র কামনা করে হঠাৎ ঋজু হয়ে বসা মানুষটি—অস্ত্র চাই, একটি অমোঘ শাণিত অস্ত্র, যা দিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে পারি আমার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হার্মাদদের ওপর। হঠাৎ জীবনের স্মৃতিতে তার ফেলে আসা বাড়িটি একটি ছায়াছবির দৃশ্য হয়ে ভেসে ওঠে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন। তারপর ধানের গোলার নিচে এসে থমকে দাঁড়ায় যেন ক্যামেরার চোখ। ওই তো স্পষ্ট চোখে পড়ছে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটিকে, বিকেলের সূর্যালোক তার অবয়বে প্রতিফলিত।

ফেলে আসা বাড়িটি এক দুর্বার আকর্ষণে ডাকছে জীবনকে। চুম্বকের মতো আক র্ণ করছে গোলার নিচে কাঠপাতার তলে লুকিয়ে রাখা হঠাৎ বিপদের অবলম্বন সেই চকমকে ফলার বর্শাটি।

আমি এখন বাড়ি যাব। শেষরাতের হালকা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাব—বিড় বিড় করে নিজেকে শোনায় জীবন। আর তখন সে স্পষ্ট শুনতে পেল—একটি চার বছরের কচি ছেলে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, শোধ নেবে না বাবা?

উঠে দাঁড়ায় জীবন। শোধ নেবে সে।

সব মৃত্যুর প্রতিশোধ।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)

# আজকের বাংলায়

**১৬ অক্টোবর ১৯৭১**

ঘাট থেকে ফিরে এল গোলাপজান। তার কোলের বাচ্চাটার নোংরা কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে। উঠোনে সেগুলো একটা বাঁশের ওপর মেলে দিতে দিতে সে লক্ষ করলো— কলিমুদ্দিন তার ফেরিতে যাবার সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে। গোলাপজান ত্রস্তে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। মেঝেতে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে তার বছর পাঁচেকের ছেলেটা। ওকে নিয়েই ঠিক এই মুহূর্তে গোলাপজানের এতো ভীতি। গতকাল রাতে যখন ওর সামনে একটা আধপোড়া শুকনো রুটি ও খেতে দিয়েছিল, তখন ছেলেটা কিছুতেই তা গিলতে চায়নি। ওর একমাত্র জেদ, ভাতই খাবে আর কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত গোলাপজান সকালেই ভাত রেঁধে দেবে বলে বহু সাধ্যসাধনা করে রুটিটা খাইয়েছিল। এখন, যদি ও উঠেই জেদ ধরে এই আশংকায় যতক্ষণ কলিমুদ্দিন ঘরের ভেতর ছিল, গোলাপজান ওর সাথে কথা বলেনি। বারান্দায় আসতেই ও স্বামীর উদ্দেশে বলে উঠল—

'আইজ তুমার ফেরিত যাওনের কাম নাইক্যা।'

'ক্যান, কি অইছে, ঘরেত চাউল নাই, খাওনের কিছু নাই, এড়ডা পয়সাও নাই, হে খেয়াল আছে? এম্‌তেই আইজ দশদিন বাইর অই নাই, প্যাটেত খাওন লাগবো না?'

'থাউকগা অবাব, তুমারে বাড়িত থাকন লাগবো, আমারে ডর করতাছে।'

'ডর! কি তামাসা করতাছস্, ডর কিয়ের লাইগ্যা?'

' হেই কতাই ত কইত্যাছি, গাটেত ত্যানাবানি ধুইয়্যা, গোসল কইর‍্যা উঠতাছিলাম, দেহী নাকি, দুইডা মেলেটারি, আমারে দেইখ্যা খাড়াই গ্যালো, আর চিকখোর পাইড়্যা, এশারা কইরা কি য্যান কইব্যার লাইগলো, তারপর আমারে ছটপটাইয়া বাড়িত যাওন দেইক্যা তাগোর কি হাসি। হাচা কইতাছিগো, ডর লাগতাছে, তুমি যাইও না।'

' তোক তাগোর মনে লাগছেরে সোন্দরী, আর আমগো বাবনা কিরে, তোর কপালটা ফিরাাই গ্যাল। আচ্ছা থাউক, আমি যাইগ্যা।'

গোলাপজানের উদ্দেশে রসিকতার কথা কয়টি বলে কলিমুদ্দিন তার অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িপাতিলগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে রাস্তায় নামলো।

শহরে এমনই মানুষজন কম। মিলিটারিদের সাথে শেখ সাহেবের দলের কি একটা গোলমালে মিলিটারিরা সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে তাদের সমস্ত সম্পত্তি। ভালো ভালো ঘরের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। রাস্তাঘাটে অনেক ধর্ষিতা রক্তাক্ত তরুণীর লাশ অথবা অচৈতন্য দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। শহরের প্রতিটি নর্দমা ভরে আছে গলিত মৃতদেহে। একটা ভ্যাপসা পচা কটুগন্ধে ওর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। শহর জনশূন্য। কুচিৎ-কদাচিৎ কোনো বাড়িতে দেখা যায় বুড়ো অথবা আধবুড়ো দাড়িটুপিওলা এক-আধজন মুরুব্বী চেহারার লোক। শহরের সব লোক পালিয়ে গেছে গ্রামে। পথচলতি দু'একটা লোকের মুখে কলিমুদ্দিন এ খবরও পেয়েছে, শহরের লোক গ্রামে চলে যাওয়ায় এখন মিলিটারিদের লক্ষ গিয়ে পড়েছে গ্রামে। তারা শহরে যে সমস্ত অত্যাচার চালিয়েছে,

এখন ব্যাপক হারে তা চালাচ্ছে গ্রামে। হঠাৎ এসব কথা ভাবতে ভাবতে কলিমুদ্দিনের ভীষণ হাসি পেলো। বোধ হয় একটু জোরেই হেসে উঠলো ও। আরে কি বোকা সে। যেখানে শহরে মানুষ নাই বললেই চলে, যা এক-আধজন আছে, তারাও আতঙ্কে খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, দোকানপাট-হাটবাজার সব ভস্মীভূত—ধ্বংস-প্রায়, আর এরমধ্যে সে কিনা বের হচ্ছে হাঁড়িপাতিল বেচতে।

আবার মাইল চারেক হেঁটে শহরতলীর বস্তিবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই তার যেন ক্লান্তিতে সারা দেহ অবসন্ন হয়ে পড়লো। কি করবে সে এখন? একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটবে? কিন্তু, অন্তত কিছু চাল না নিয়ে সে বাড়ির দিকেই বা যাবে কি করে? হঠাৎ এই মূহর্তে তার ভীষণ রাগ হলো মিলিটারিদের উপর। সত্যিই, কি অন্যায় গোটা দেশটাকে ওরা একেবারে ছারখার করে দিল। এতো সুন্দর সাজানো শহর, মানুষজন, বাড়িগাড়ি, সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কলকাকলিতে ভরা এতো বড়ো শহরটা, এখন যেন মৃতের শহর। কোথাও প্রাণের কোনও কিছু নাই। পথেঘাটে কুকুরেরা লুটোপুটি করে খাচ্ছে মানুষের গলিত অর্ধগলিত শবদেহগুলি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে তার মনে পড়লো গোলাপজানের কথা, তার মুখে শোনা আজ সকালের ঘটনাটা। আঁৎকে উঠলো সে। অজান্তেই ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে। তার সাজানো সংসার আজও যেখানে অন্ধ স্যাঁতসেঁতে বস্তিবাড়িতে মোটামুটি সম্ভ্রমের সাথেই টিকে আছে—গতকাল পর্যন্ত যেখানে শকুনীর দৃষ্টি পড়েনি—এতক্ষণ সেখানে যে কি তাণ্ডবলীলা চলেছে কে জানে! আচ্ছা, মিলিটারিরা কি গোলাপজানকে ধরে নিয়ে গেছে? তাই যদি হয়—সলিম, তার বড়ো ছেলেটা, সে কি করছে? নাকি সঙ্গীনের এক খোঁচায় তাকে... তার পা যেন আর উঠছে না মাটি থেকে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে সে বসে পড়লো রাস্তার পাশের বাবলা গাছটার নিচে, ঘাড় হতে তার ফেরির বোঝাটা নামিয়ে। এক সময় তার মনে হলো আর বাড়ি গিয়ে কোনও লাভ নাই, এতক্ষণে সব শেষ। এখন বাড়ি গিয়ে যে দৃশ্য সে দেখবে, তা সে দেখতে চায় না। তা সে সহ্য করতে পারবে না।

নাঃ, সে, সে যাবেই না আর ওদিকে। বরং, বরং সে কামালের সাথে দেখা করবে। উকিলপাড়ার চৌধুরীদের বড়ো ছেলে কামাল, তাদের কামাল ভাই। কামালদের বাড়িটা যেখানে ছিল, সেখানে তখন ইট-সুরকির একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ পাকসেনাবাহিনীর বাহাদুরীর সাক্ষ্য হয়ে জমে আছে। যখন এ ঘটনা ঘটে তখন কামাল বাড়িতে ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্য হতে কামালের ছোটবোন আই-এ ক্লাশে পড়া কুমকুমকে ওরা শুধু জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেছে। আর সবাইকে...যাক্‌গে, এখন সেকথা ভেবে তার কি লাভ। কামাল কোথায় আছে তা সে জানে। বোঝাটা ঘাড়ে নিয়ে সেদিকে পা চালালো কলিম।

এরপর—বিকেলের কিছু আগে কলিমুদ্দিনের দেখা গেল, দুই ফুট চওড়া গ্রেটার রোডে। কোর্ট হতে মাইল দু'য়েক যে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলে হাতের ডানদিকে চোখে পড়ে তীর চিহ্ন দেওয়া একটা কালো কাষ্ঠফলক, ইংরেজীতে যার গায়ে লেখা—Sector Headquarter-B, Prohibited Area—সেদিকে। এ লেখা অবশ্য সে পড়তে পারে না, তবে একথা সে জানে ওখানে অনেক মিলিটারি থাকে। এই ভরবেলায় ওই

রাস্তায় কলিম কেন যে বোঝাটা নিয়ে চলছে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার দু'পাশে যে সমস্ত বাড়িঘর, সেগুলো জনশূন্যই, তবু দেখা গেল, দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইতে চাইতে আর হাঁকতে হাঁকতে কলিমুদ্দিন সে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে এসে পৌছল সে কাষ্ঠফলকের সামনে। ওখান হতে সোজা ভিতর দিকে চলে গেছে মিলিটারির ছাউনীটায় যাবার রাস্তা, জঙ্গলে ঘেরা। একটা গেটের মতো তৈরি করা আছে। আর তার কাছে গোটা পাঁচেক মিলিটারি প্রহরী— কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে সিগারেট ফুকছে আর হাসাহাসি করছে।

ওদের দেখেই কলিমুদ্দিন একটা লম্বা-চওড়া সালাম ঠুকে দিল, কোনও জবাব এল না। তাজ্জব বনে গেল মিলিটারিগুলো। যেখানে ওদের দেখলেই সবাই পালায়, সেখানে এ ব্যাটা নিঃসংশয়মুখে ওদের সামনে দিয়ে শুধু যাচ্ছেই না, সালামও দিচ্ছে! একজন মিলিটারি ওকে ধমক দিয়ে উঠল—'আবে ভাগ্, ইঁহা তেরা হাণ্ডি কোন্ খরিদেগা?'—'অহনই যাইত্যাছি সাব, খুব পেরেসান অইছি, পসীনা মুছ্যা লই।' বলে কলিমুদ্দিন মাথার গামছাটা খুলে ঘাম মুছল। মিলিটারিগুলো অবাক বিস্ময়ে ওর ভীতিহীনতা লক্ষ করছে। ঘামটাম মোছা শেষ হলে কলিমুদ্দিন ওর টুকরি হতে বের করলো এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট। ম্যাচ দিয়ে ফস্ করে সিগারেটটা জ্বেলে প্যাকেটটা আর ম্যাচটা রেখে দিল টুকরির মধ্যে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে টুকরির মধ্য হতে কি যেন একটা বের করল। তারপর—ক্ষিপ্রগতিতে সে জিনিসটা ছুঁড়ে দিল মিলিটারিদের দিকে।

ততধিক ক্ষিপ্রতায় একটা মিলিটারিও তার দিকে হাল্কা মেশিনগান হতে গুলি ছুঁড়লো—অব্যর্থ লক্ষ্য—দুটো বুলেটই কলিমুদ্দিনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। লুটিয়ে পড়েছে সে রাস্তায়। ছটফট করছে সে, আর দমকে দমকে তার বুকের রক্ত রাস্তায় লাল লাল ছোপ এঁকে যাচ্ছে।

আর ওদিকে গ্রেনেডের বিকট শব্দে যখন ছাউনী হতে সৈন্যরা উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল, তারা দেখলো, তাদের প্রহরী পাঁচজন শতটুকরোয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিকে-সেদিক ছড়িয়ে আছে। গেটের মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত, তখনও চারপাশে ধুঁয়ো উড়ছে, কাপড় আর পোড়া মাংসের কটু গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মিলিটারিগুলো তার দিকে এগিয়ে গেল—দেখলো, তার দেহটা আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। একটা প্রশান্তির তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত সে মুখে যন্ত্রণার চিহ্নও নাই।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

# সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে

২ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেরণার আলোয় যে হৃদয় দীপ্ত, সে হৃদয় প্রকাশের উন্মাদনায় উন্মুখ। এই প্রেরণা জীবনের প্রেরণা। এই আলো মেঘের পরে মেঘ জমা আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো আলো নয়। অনেক অনেক আলো।

জীবনকে সুখের ঐশ্বর্যে শান্তির পরশ বুলিয়ে আপন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পেতে চাই। এই ঐশ্বর্য বা শান্তিই প্রেরণার উৎস।

প্রেরণার দীপশিখা যে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, সে হৃদয় অনির্বাণ—কেননা এই দীপশিখা দেহকে একদিনে উত্তপ্ত করেনি। সময়, হ্যাঁ প্রচুর কালহননের পর বিবেক-তাড়িত মন একটি বিশেষ মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হৃদয় তখন প্রকাশের প্রতীক্ষায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আমরা প্রেরণা পাই। আলো জ্বলে, আলো নেভে না। তথাপি ঝড় ওঠে। বাতাস ছোটে। দীপশিখায় কাঁপন জাগে। কখনো মৃদু, কখনো ভয়ঙ্কর। তাই বলে কি নিভিয়ে দেবে প্রেরণার আলো! নীরব অন্ধকার ঠেলে দেবে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? না, দিতে পারে না। কস্মিন কালেও না।

প্রেরণার আলো অন্তরে জ্বলেছে। জেনেছি প্রেরণার উৎস কোথায়। শুধু পাইনি ফসলটুকু। কিন্তু শুনেছি তো কবির কণ্ঠ, "সেদিনও এমনি ফসল বিলাসী হাওয়া মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।"

পাকা ধান আর রূপসীর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ। মনে হলে কেমন যেন আবেশ জাগে। উত্তাপও। অথচ না পাওয়ার একটা জলার্ত বেদনা।

না না না, এ হতে পারে না। পেতেই হবে। আলোর রশ্মিটা দিব্যদর্শন করেছি। আর বেশি দূরে নয়। তিমির রাত্রির অবসান হবে। ভোর হবে। পাখি ডাকবে। আবার জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাত-সূর্যোদয় প্রাণভরে উপভোগ করবো। হঠাৎ চমকে উঠবো, একি সন্ধ্যা তুমি, এমনি অকালে।

—হ্যাঁ, আমি চমকে উঠলে যে বড়! এই নাও, মালাটা রাখ।

সন্ধ্যার চোখে-মুখে দুষ্টুমি হাসি। হাতে বকুলমালা। শয্যা থেকে ওঠা সন্ধ্যার শিথিল বৈশিষ্ট্য দৃকপাত করতে অজান্তেই কেমন যেন শৈথিল্য আসে। অন্যমনস্ক হতে হয়। কিন্তু শুধুই কয়েকটি মুহূর্ত। অন্যমনস্ক চিত্ত আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে একটি কথায়—এমন করে আমাকে দেখছ কি? আকাশের দিকে চোখ মেলে দেখ।

ও তাইতো। আমাকে আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে। আমার দৃষ্টি হবে প্রসারিত। আকাশ। মাটি। স্বদেশ। ভালোবাসা।

সন্ধ্যা আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই আমার দৃষ্টিপথ সৃষ্টি করে দিলো একটি সরল সংলাপে। আমি হাত বাড়িয়ে মালাটি নিয়ে নিলাম। নিমেষে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যা।

'বকুল' ও 'সন্ধ্যা'। এই দুটোর মধ্যে কেমন যেন দূর অস্তিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। 'বকুল'-'সন্ধ্যা' না হয়ে 'মালতী'-'সন্ধ্যা' হতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যা মালতী নিয়ে এল না। এল বকুল নিয়ে। প্রভাতসূর্যোদয় মুহূর্তে। একটি বকুলমালাও জীবনের মহৎ প্রেরণা।

এমনি মহৎ প্রেরণার উৎস খুঁজে বেড়াবো। স্বদেশের লাখো লাখো সন্ধ্যা প্রভাতসঙ্গীতের সুর নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করবে। আবার চিনতে পারবো নিজেকে। উপলব্ধি করতে পারবো।

সন্ধ্যা, এই মুহূর্তে আমি তোমার স্মৃতিচারণ করছি। তোমার সরল সংলাপ আমার মনে পড়ছে। পঁচিশে মার্চের কয়েকদিন আগে বলেছিলে, তুমি ভয়ানক ঘরকুণো। একদিন মিছিলেও যোগ দিলে না। এত ঘরকুণো আমার ভালো লাগে না—তোমার কথায় সেদিন লজ্জা পেয়েছিলাম। এ লজ্জা যে আমার দীনতা তাও বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে ঠিক সেই মুহূর্তে পরাজয়টা স্বীকার করে নিতে পারিনি। কঠিন জবাব দিয়েছিলাম—যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না, সন্ধ্যা। হাউকাউ করে, মিছিলে ঘুরে স্বাধিকার পাওয়া যায় না।

রূঢ় জবাবে তোমাকে সাময়িক স্তব্ধ করতে পেরেছিলাম হয়তো কিন্তু বিবেককে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। পরক্ষণেই ভীরু হৃদয় আমার সংকুচিত হয়েছিল। সন্ধ্যা, তুমি জানতে না এসব শ্লোগান মিছিল সভা শোভাযাত্রা আমার বড্ড ভয় করতো! কিন্তু আজ? তুমি জান না কেমন করে আমি জনতার মিছিলে লিখেছি আমার নাম। আমি এখন মিছিলের ভিড়ে। ছিন্নমূল মানুষের মাঝে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কেমন করে লাখো লাখো ছিন্নমূল প্রাণ জীবনের জয়গান করে। কেমন করে মরিয়া হয়ে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার সংগ্রামে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো তুমিও এতক্ষণে তস্করদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ।

জান, বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে কেমন যেন করে। তোমার মুখখানি মনে পড়লে একটা অজানিত আশংকায় কেঁপে উঠি। না জানি তুমি কোথায় কেমন করে আছো! অবশ্যি আমি একটি শক্তিও অর্জন করে ফেলেছি। আত্মসান্ত্বনার বিপুল শক্তি। আগে তো সপ্তাহ খানেক না দেখলে কেমন ভেঙ্গে পড়তাম। কই, এখন তো আর তেমন হয় না। বলতে পার কোথায় পেয়েছি এই সান্ত্বনা। এই সংযমশক্তি। আমার মনে হয় কি জানো, এর পেছনে প্রেরণা আছে। তোমার ভালোবাসাই এই প্রেরণার উৎস।

সন্ধ্যা, আমার অনেক আশা। হয়তো তুমি এক মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিতা। ঘরের বাইরে। ঝড় কেটে গেলে তুমিও একদিন সুন্দর একটি ঘরের মানুষ হবে। বাংলার লাখো লাখো সন্ধ্যা তোমার মতো সংলাপী হবে। তারা আমার সহোদরা। একদিন বধূ হবে। মা হবে। বীর সন্তানের জননী। তোমার মধ্যে আমি কোথায় আমার মায়ের আদল খুঁজে পাই। আমার মাও যে এমনি করেই কথা বলে। বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে আমি তোমার অস্তিত্ব খুঁজি। দিনমণি বিদায় নিলে আমরা অন্ধকারে জলে স্থলে, কখনোবা কালো পাহাড়ের গায়ে মিলে যাই, অতন্দ্র রাত জাগি, হানাদার শত্রুশিবির নিশ্চিহ্ন করে অন্যমনে পরিপূর্ণ ভিন্নজগতে—তখন সত্যি ভুলে যাই তোমার কথা। ভুলে যেতে হয়। সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরি, তখন নিশুতি রাতে অসহায় ছিন্নমূল মানুষের কান্নার শব্দ ভেসে আসে। রাতজাগা দু'-একটি পাখি পাখা ঝাপটায়। আমি বাতাসে তোমার ঘন ঘন নিশ্বাস শুনতে পাই। অনুভব করি। তুমিও বুঝি এতক্ষণে কোনও ক্যাম্পে ফিরছ।

সূর্য ওঠার এখনও দেরী। বাকি রাতটুকু আমাদের পাড়ি দিতে হবে। জমাট-বাঁধা অন্ধকার ব্যারিকেড় সবল বাহুতে উপড়ে ফেলে আবার প্রভাতসঙ্গীতের সুর শুনব। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাত সূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবো। তুমি আবার বকুলমালা হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ হাসবে।

(মেসবাহ আহমেদ রচিত)

# রণশিবিরের একটি প্রত্যক্ষচিত্র

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

ছেলেটার কর্মক্ষিপ্রতা এবং কর্মপটুতা আমার প্রথম নজরে পড়ে। অথচ ও আমাকে দেখেনি—এতখানি একান্তচিত্তে সে হাতের যুদ্ধাস্ত্রগুলো নাড়ছিল। রবিনবাবুর কাছে তার এলাকার কথা শুনতে শুনতে আমি যে বার-তের বছরের ছেলেটার দিকে বেশ মনোযোগী হয়ে পড়েছি তা তিনি লক্ষ করে বললেন : হ্যাঁ, ও ছেলেটার নাম আলো। ওর বাবা হালিম মাস্টার আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। ওর আর এক ভাই ছিল। এখন তারা কেউ নেই। ও একা।

আমি আগেই শুনেছিলাম, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের এই গ্রামটার ওপর হানাদার পাক বাহিনীর জওয়ানরা দুবার হামলা করে। এবং শেষে এসে গ্রামের কাঁচাবাড়িগুলো পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবশ্য মুক্তিসেনা ভায়েরা তার মাশুলও আদায় করেছে এদের কাছ থেকে। তবু হানাদারদের অত্যাচারের পরিচয়টা সরেজমিনে জানতে আমি দীর্ঘ এগার-বার মাইল কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার সময়ে সেখানে পৌঁছে যাই। গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আমার পরিচয় জানার পর দলপতি রবিনবাবুর কাছে নিয়ে যায়। রবিনবাবু আমাকে জানালেন : আপনার কোনও সিকিউরিটির অভাব হবে না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে রাতে গ্রামের ধ্বংসচিত্র দেখানো যাবে না—প্রধানত আমাদের গ্রামের সবাইকে কড়া ডিফেন্স দিতে হচ্ছে। রাতের আঁধারে দেখলাম গ্রামের খানা, ডোবা, নালা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের এক-একটা মজবুত বাঙ্কার—সবাই অস্ত্র হাতে অতন্দ্র প্রহরী।

সকালের রবিনাবুর সাথে বিধ্বস্ত গ্রামের পোড়া বাড়ি, ভাঙ্গা ঘর, শূন্য উঠোন দেখে মনটা খা খা করে উঠলো। অথচ বাংলার এই গ্রাম একদিন নবান্নের ধানে গানে, ছেলেমেয়েদের কলকাকলিতে মুখর ছিল। তাদের অনেকে আজ হানাদারদের হাতে বলি হয়েছে। অনেকে চলে গেছে অন্যত্র নিরাপত্তার সন্ধানে। একটা আশ্চর্য নির্জনতার কালো গ্রামটাকে বিষাদে যেন ঘিরে রেখেছে। তবু, তবু দেখলাম—যারা আছে, যারা এখনো বাপদাদার ভিটে না ছেড়ে সাহসে নির্ভর করে আছে—তারা সেই নির্জনতার বুকে জীবন জাগিয়ে তোলার সাধনায় রত। ধীরে ধীরে তারা সকল প্রতিকূলতার মুখেও তাদের অধিকার রক্ষার সাহসে প্রত্যয় গড়ে তুলেছে মনের ভিতরে, বাইরে।

গ্রামের সবদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ রবিনবাবুর সাথে মুক্তিসেনা বন্ধুদের গ্রামের অফিসে ফিরলাম। টিনের ছাউনি দেয়া একটু ছোট ঘর, দুটো তক্তপোষ, একটা টেবিল, একটা চেয়ার—এই ওদের অফিস। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রবিনবাবুর কথা শুনছিলাম। কর্মরত ধবধবে ফরসা ছেলেটার দিক থেকে চোখ তুলে রবিনাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম : কিন্তু ও একা কেন? রবিনবাবুর মুখের ওপর একটা কষ্টের ছাপ দেখলাম। রবিনবাবু একবার ছেলেটার দিকে এক নজর দেখলেন—তারপর ম্লান কণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, ও একা। ওর ভাই মনি ক্লাস নাইনে পড়তো। সে আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রথম গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। মনির ছিল আশ্চর্য সাহস। পাকসেনারা

প্রথমবার এসে গ্রামের মোড়ল হাজীসাহেবের বাড়িতে আগুন দেয়। মনি আগুন নেভাতে গিয়ে পুড়ে মারা যায়। মনির মা কয়দিন পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আলো মুক্তিসেনাদের সাথে আসতে চাইতো। কিন্তু ওর মা ওকে বুকে জড়িয়ে রাখতো সর্বদা। কিন্তু এমনটা ঐটুকু ছেলে ভাগ্যে আছে, কে বলবে বলুন? শেষবার যখন পাকসেনারা সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিল, তখন একপ্রান্তে ওদের সাথে আমাদের ফাইট চলছে, অন্যদিকে গ্রামের নিরীহ নারীপুরুষ উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে ব্যস্ত। হালিম মাস্টারের স্ত্রী, হালিম মাস্টার ও আলো ইতস্তত দৌড়ানোর প্রাক্কালে অকস্মাৎ এক মিলিটারি ট্রাকের সামনে পড়ে যায় বেঈমান পাকবাহিনীর লোকেরা হালিম মাস্টারের ফর্সা সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করে ট্রাকে তুলে নেয়। বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবার অপরাধে হালিম মাস্টারকে গুলি করে মেরে ফেলে। আলো ভয়ে ত্রাসে মা-মা-মা করে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে—দস্যু ট্রাকটি ঘরঘর শব্দ করে আলোর জলভরা চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

রবীনবাবু এখানে থামলেন।

আমি বল্লাম : তারপর?

রবীনবাবু বললেন : বহুকষ্টে আগুন আমরা নেভালাম—কিন্তু আপনি তো দেখেছেন এতবড় গ্রামে মাত্র গোটা ছয়-সাত বাড়ি রক্ষা হয়েছে।

আমি আলোর দিকে তাকালাম। রবীনবাবু বললেন : আর ঐ আলো—তারপর দিন এল আমাদের কাছে—বললে : আমি মুক্তিসেনা। তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাবো।

রবীনবাবু অল্প থেমে বললেন : আমার মনে হয়েছিল ওকে ফিরিয়ে দিই। গ্রামের কারো কাছে ও থাক—কেননা ও যে ওর পরিবারের শেষচিহ্ন! কিন্তু ওকে ফিরাতে পারিনি। ওর চোখের জলভরা প্রতিবাদ আমাকে জয় করলো। তারপর থেকে আলো আমাদের সাথে—ওই শিবিরের প্রাণ ও। ও গুলি ছুঁড়তে চায় বার বার। কিন্তু ও যে একেবারে বার বছরের শিশু। ওকে আশ্বাস দিয়েছি আর কিছুদিন পরেই ও গুলি চালাবে। মুক্তিসেনা ভায়েরা সারারাত টহল দিয়ে সকালে প্রত্যেকের অস্ত্র আলোর জিম্মায় জমা দিয়ে যায়। এরপর সারাদিন অস্ত্রের সাথে আলোর খেলা। সে প্রত্যেকটা রাইফেল-স্টেনগান খুলবে, পরিষ্কার করবে, তেল দেবে। ওর হাতে অস্ত্রগুলো যেন শাণ পেয়ে চিক চিক করে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় ওই আলোই আবার প্রত্যেকের হাতে জীবন্ত অস্ত্রগুলো তুলে দেয়—এই ওর কাজ। এই কাজে ও এত পটু যে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। আলোর দিকে চোখ ফিরে গেল দুজনেরই। আলো আশ্চর্য একাগ্রতায় তখনও কর্মরত। একঝাঁকড়া কালো চুল মাথায়—একটি কচি ফর্সা মুখ, ডগমগে দুটি চোখ—নরম নরম দুটি হাতে কি ভীষণ ব্যস্ততা আলোর। আলো কার মতো দেখতে? হয়ত ওর বাবার মতো, নয়তো ওর মায়ের মতো—কিন্তু তারা যে আজ কেউ নেই। এমন অসম্ভব একটি দুঃস্বপ্ন ঐটুকু আলোর জীবনে ঘটেছে, ভাবলে বড় পাষণ্ডের ও বোধ করি কষ্ট লাগে।

আলোর কাছে গেলাম।

মিষ্টি করে বললাম : তোমার নাম বুঝি আলো? স্টেনগানের খুলে ফেলা অংশগুলি আঙ্গুলের নরম কারসাজিতে এক মিনিটে ঠকাঠক শব্দে লাগিয়ে নিয়ে মুখ তুলে ছোট

শ্রমিকরা প্রতিবাদ না করে এই ব্যবস্থা মেনে নেয়।

ভরা বসন্ত তখন বাংলাদেশে। চৈত্র পবনে বাতাস উতলা। ঝুমকো লতার চাওয়া মনের বেদন উদাস হয়ে দেখা দেয়। মুকুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। এমন এক বসন্ত রাতে অকস্মাৎ সেই ঝড়টা চূড়ান্ত রূপে এসে গেল। পঁচিশে মার্চের রাতে।

ঘুমন্ত দশ লক্ষ লোক খুন করে বিশ্বের দরবারের সাহসিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখানোর সুযোগ ইয়াহিয়ার নেকড়েগুলো ছাড়েনি।

এক মাস কেটে গেছে ছাপাখানার কোনো কর্মীর দেখা নেই। শহীদ সাহেব আর তালা খোলেন না। কি হবে খুলে? ব্যবসা, টাকা-পয়সার কথা চিন্তা হলেই বুকের কাছটা কেমন করে ওঠে তার, মাথা ঘুরে যায়।

কয়েকদিন পর শহীদ সাহেব ছাপাখানা খোলেন, সরকারি চিঠি এসেছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব খুলে রাখার হুকুম।

ধুলো ঝেড়ে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবছেন, এমন সময় প্রতিবেশী রসুল সাহেব উঁকি দেন।

বলেন, কি ভাই, অফিস খুলেছেন, বহুত আচ্ছা।

ভদ্রলোক অবাঙালি।

খাতির করে ডেকে বসান শহীদ সাহেব।

দু'চারটে কথা বলে রসুল সাহেব বেশ হৃষ্ট মনে চলে যান। আর শহীদ সাহেব গালে হাত দিয়ে ভাবেন এক মাস আগেও এই রসুল সাহেব যেতে-আসতে সালাম দিয়ে যেতেন, গায়ে পড়ে করতেন আলাপ, আর আজ? এই রসুল সাহেবের দয়ার উপরেই নির্ভর করছে এ-পাড়ার লোকগুলোর জীবন-মরণ।

প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। ছাপাখানা তেমনি অচল। তবে প্রতিরোধের কাজ দিন দিন জোরদার হচ্ছে। শুধু বোমা নয়, ঢাকা শহরে রীতিমতো সামনাসামনিও লড়াই হচ্ছে। চোরাগুপ্তা সংগঠনের সাথে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা দুটো পত্রিকা চলছে, গোপনে একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে চলে যায়—লিফলেট-হ্যান্ডবিলও বিলি চলছে।

দু'দিন গভীর রাতে রসুল সাহেব লক্ষ করেন শহীদ সাহেবের ছাপাখানায় আলো—আর ট্রেডল মেশিনটাও চলছে। ভাবেন, এত রাতে কি কাজ! বলেন ত কোন কাজও নেই!

রোজকার মতো শহীদ সাহেব অফিস খুলে বসেন, ঝিরঝিরিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, ভিজে বাতাসে ঘুম ঘুম ভাব। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন চোখের পাতা তার জড়িয়ে গেছে। এক সময় দেখতে পান তার অফিসটা কখন তিনতালা বাড়ি হয়ে গেছে, নিচতলায় চলছে অফসেট মেশিন, লাইনোটাইপে কম্পোজ হচ্ছে! তার দৈনিক পত্রিকা ' দৈনিক বাংলাদেশ', কাগজের শেষ পাতায় নিচের দিকে কোণায় তার নাম লেখা, সম্পাদক : শহীদ আহমদ।

এই সময় ভীষণ ঘরঘর শব্দে তার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখে একটা মিলিটারি জিপ সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ঘাড় কাৎ করে শহীদ সাহেব দেখেন জিপটা রসুল সাহেবের

বাসার সামনে থেমে গেল। জিপ থেকে নামেন রসুল সাহেব, কি যেন বলেন, তারপর আঙুল বাড়িয়ে এদিকেই কি দেখান।

জিপটা মুখ না ফিরিয়ে ব্যাক করে ছাপাখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। লাফ দিয়ে নামে সশস্ত্র দু'জন পশ্চিমা সেনা।

একজন সেনা পরিষ্কার বাংলায় বলে, শহীদ আহমদ কার নাম?

আমার নাম। কি দরকার বলুন! ভাবেন রসুল সাহেব হয়ত কোনও সরকারি কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন।

কোনও জবাব না দিয়ে সৈনিক বুক-পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে শহীদ সাহেবের মুখের সামনে তুলে ধরে।

একটা হ্যান্ডবিল, বড় বড় হরফে লেখা—মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করুন। কিন্তু অত বড় অক্ষরগুলো কেমন চিনে উঠতে পারেন না শহীদ সাহেব, সব কেমন গুলিয়ে যেতে থাকে। তা অবশ্য মুহূর্তের জন্যে।

পর মুহূর্তে শহীদ সাহেব সহজ গলায় বলেন : ও, হ্যান্ডবিলটা তো, ওটা আমার প্রেসেই ছাপা হয়েছে।

(বুলবন ওসমান রচিত গল্প)

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও বাংলা কবিতা।
সূত্র : .... তারিখ : জুন-ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৮ জুন, ১৯৭১

# শব্দের তারতম্যে

## শিকদার ইবনে নুর

শব্দকে আমার বড় ভয় ছিল
পৃথিবীর নানা রকম শব্দকে
বিশেষ বয়সে এসে অতর্কিত
বাবার পায়ের শব্দ, সেকেলে
খড়ম পরা মায়ের চলার শব্দ,
প্রিয়তমার কাঁকণ নিক্কণ; ট্রেনের
চাকার শব্দ, মোটরের বিস্ফোরণ,
প্রাচীন ইটের স্তূপে টায়ারের
আর্তনাদ—অকারণ ট্রাফিক হুইসিল,
এবং বিদগ্ধ দিনে রাজপথে
রোদ্রের বিলাপ—ইত্যাদি অনেক শব্দে
শব্দময় পৃথিবীকে আমার ভীষণ ভয় ছিল।
অথচ অবাক হই, ইদানীং
আমি এক অত্যাশ্চর্য শব্দের মিছিল।
আমার আত্মায় শব্দ, শব্দ নাচে
প্রতি লোমকূপে, ধমনীতে, ফেনায়িত
রক্তের কণায়, জাগরণে, বিলম্বিত
ঘুমের সত্তায়।
শব্দ বাজে— সোনামুখি ধানের
শীষের মতো, চতুর্দশী কৃষাণী
মেয়ের চুলে রক্ত লাল
শাপলার খোপার মতো;
আমার সমস্ত দেহে, হৃৎপিণ্ডের
রক্তের ধারায়—শব্দ বাজে।
বাংলার শ্যামল মাঠে, আঙ্গিনায়
পৈশাচিক পদশব্দ, নিসর্গের
বুক চিরে কামান গোলার শব্দ
বিধ্বস্ত মায়ের চোখে দুগ্ধপোষ্য
শিশুদের কচিকণ্ঠে শব্দের আগুন,
আমার পৃথিবী জুড়ে শব্দ শব্দ শব্দ শুধু;
কাজেই, এখন আর শব্দকে, ভয় নেই,
আমিও নিজেই এক অত্যাশ্চর্য
শব্দের মিছিল।

('শব্দ সৈনিক'—ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

জুন, ১৯৭১ প্রচারিত

# উন্মেষ

## আবুল কাশেম সন্দ্বীপ

বিকেল বিষণ্ন তানে। ছাব্বিশে মার্চের বিকেল
বন্দর ধোঁয়াটে তখন চারদিকে ব্যারিকেড। অসংখ্য
সারি সারি ট্রাক। আগ্রাবাদ রাজপথে স্তূপীকৃত
পাথর আর ইট কাঠ—রাবিশের স্তূপ। বন্দরে
আটক তখন স্টিমার বাবর—জল্লাদে-ভরতি।
তখনো অবরুদ্ধ সব দস্যুর দল—তিন দিকে
মুক্তিযোদ্ধা—মাঝখানে হাটহাজারী ক্যান্টনমেন্ট।
প্রবর্তক সংঘ আর সি. আর. বি. মুক্তিযোদ্ধার
দুর্জয় ঘাঁটি। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ক্রমে।
শব্দের হুঙ্কারে আতঙ্কিত সমস্ত হৃদয়। সব
মনে আন্দোলিত ভীতির সঞ্চার—সমস্ত দেশে
বন্ধ সব যোগাযোগ। দাউ দাউ আগুন জ্বলে
সব বস্তীতে। জনপদে স্তূপীকৃত নারী, শিশু, বৃদ্ধ
আর ছাত্রের লাশ।

তখন রক্তাপ্লুত বাংলাদেশে
সূর্য প্রস্তুত রাত্রির গভীরে নতুন উদয়ের।
জ্যোতিষ্ক নির্মিত হলো নতুন আলোর। নবতর
উন্মোষ ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষার সাত কোটি স্বাধীন
সূর্য-মন। বাংলাদেশে জীবনের এলো জাগরণ।
সমস্ত জীবন। স্বাধীনতা বাঙালির জীবনের পণ।
দুঃসহ আমাদের কাছে অসংখ্য মৃত্যুর খবর।
দুঃসহ আমাদের কাছে মৃত্যুর খবর।
আমাদের দুঃখ ও বেদনার বিক্ষোভ প্রকাশ—
শান্তির পথ নয় মুক্তির পথ : জনতার মুখে
বলিষ্ঠ শপথ বিজয়ের উল্লাসে মৃত্যুকে ভুলবো।
যুদ্ধই বাঙালির মুক্তির সনদ। হাতে হাতে অস্ত্রের
কঠিন প্রতিজ্ঞাগুলো মুক্তির উল্লাসে বিস্ময়কর।
দিগন্তে সূর্য লালে আকাঙ্ক্ষিত আলোকের ঝড়।

[সূত্র 'একাত্তরের রণাঙ্গন : শামসুল হুদা চৌধুরী : প্রথম সংস্করণ ১৯৮২ পৃষ্ঠা ৩৪৩ ; সঙ্কলক-সম্পাদক

# আবার দেখবো

আবার দেখবো বাংলার পথে-ঘাটে
কৃষাণের লাঙ্গল জোয়াল—
সোনালী ধানের ক্ষেতে শালিকের আনাগোনা—
পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ে ঝড় তোলা পানসী-নৌকা দেখবো।
দেখবো মাঠ থেকে ফেরা ষোড়শীর সোনালী মুখ
ভিজে দেহ, হিজল-বট-আমের বনে
দোয়েল শালিকের মেলা। দেখবো ডানপিঠে ছেলের
দুরন্তপনা। বাড়াভাত নিয়ে বসে থাকা মায়ের
উদ্বিগ্ন মুখ আবার দেখবো।

আবার দেখবো রমনার কৃষ্ণচূড়ায়
থোকা থোকা লাল ফুল।
পল্টনের বাতাসে অনেক শপথী কণ্ঠ।
দেয়ালে দেয়ালে চোখ মেলে চেয়ে থাকা
সবুজ ইচ্ছে দেখবো। দেখবো—
ভার্সিটির চত্বরে অনেক উন্মুখ স্বপ্নের
চঞ্চলতা, শহীদ মিনারে নতুন শপথের
বজ্রমুষ্টি আবার দেখবো—

রেসকোর্সে মুজিবরে দৃপ্ত কণ্ঠ। ক্লান্ত দুপুরে
বৈরাগীর সুরেলা কণ্ঠ—সন্ধ্যায় ঘরফেরা।
মানুষের তালহীন কণ্ঠস্বর অবিশ্রান্ত শুনে যাবো—
আবার। আবার দেখবো—আমার চিরপরিচিতা
রূপসী বাংলাকে।

---

* স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত। লেখকের নাম জানা যায়নি।

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

## অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জ আমি

নেওয়াজিস হোসেন

রক্তে আখরে লেখা
পঁচিশের মর্মন্তুদ রাত্রির
ভয়াল পরিধি—নীল-স্বপ্নের
সাতকোটি রজনী-জলের
সমুদ্র কান্না শব্দ তরঙ্গ শিহরিত।
বাংলাদেশ—
কুচক্রী শক্তিসমূহের লালসার
পাদপীঠ কখনো নয়;
এ নির্ভুল শাশ্বত সত্য যোজনার জবাব
প্রস্তুত রণাঙ্গনে—
সাড়ে সাতকোটি সুদৃঢ় বজ্রমুষ্ঠি।
ক্ষমার অযোগ্য পশুশক্তির
নির্মম শাস্তি দিচ্ছি :
নিঃস্নেহে জীবনের শত্রুকে আহ্বান করে
মৃত্যুর খোলা দরজা।

শব্দ দেয় উৎফুল্ল উপহার আমায়
বিপুল বিপ্লবী সাড়া।
স্বজন হারানোর বেদন বিক্ষোভের সবটুকু বহ্নি
আজ প্রাণ মনে উত্থিত।
নির্মেঘ আকাশে অযথা মেঘাবির্ভাবকারীর
কখনো যদি পুনরাবির্ভার হয়,
তাহলে চ্যালেঞ্জের জন্যে প্রস্তুত :
অগ্নিমূর্তি এক আমি সত্তা।

('শব্দসৈনিক'—ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

# কমান্ডার

## নাসিম চৌধুরী

কমান্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান, মর্টার, গানে, রকেটে, গোলায়
যুদ্ধের কড়া সাজে,
বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি।
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা—
দাও অর্ডার
কমান্ডার।

দেখ, চারিদিকে প্রস্তুতির আয়োজন শেষ
কী ভয়াল সুন্দর অন্ধকার ঘনিয়েছে চারিদিকে
এতক্ষণ যে মুমূর্ষু আলো ছড়াচ্ছিল।
কৃষ্ণপক্ষের অসুস্থ চাঁদ,
সেটাও টুপ করে খসে গ্যাছে কোন রহস্যালোকে
এখন শুধু অন্ধকার—
কি বিশ্বাসী বন্ধুর মতো ঘিরে আছে চারিদিক

আর দেখ কী লোমহর্ষক নীরবতা!
কুলায় ফিরে গ্যাছে সর্বশেষ পাখি
শুধু একটানা ঝিল্লীর ঝংকার।
এটাইতো শত্রু নিশ্চিহ্নের মাহেন্দ্রক্ষণ
কমান্ডার
আর দেরী নয়, শুধু অর্ডার।

কমান্ডার
শুধু তোমার একটি অর্ডার
দেখবে কী দুর্জয় করে তোলে আমাদের।
কী প্রচণ্ড সাড়া জেগে ওঠে রক্তের ধারায়
কী প্রখর জ্বলে ওঠে চোখের তারা
কী অট্টশব্দে গর্জন করে ওঠে প্রতিটি অস্ত্র
আর তার সাথে কী সুন্দর মেলাবে

শত্রুর আর্তরব।
কমান্ডার, এবার শুধু অর্ডার করো, অর্ডার
তোমার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে
ছুটে যাব আম্‌রা
ঐ দূরে যেখানে শত্রুরা ফেলেছে ক্যাম্প
যেখানে প্রতিটি বাঙ্কারে শুয়ে আছে
হিংস্র ঘাতকের দল
আর পেন্টাগনের জেনারেলদের মত
কুটিল বক্র ট্রেঞ্চগুলি লুকিয়ে রেখেছে যে
হিংস্র হায়েনাদের
সেখানে ছুটে যাব কী তুমুল প্রাণের আবেগে
গর্জে উঠবে আমাদের মুষ্টিচ্যুত গ্রেনেড
সেই ধ্বংস উৎসবের আশায় বসে আছি
কমান্ডার
শুধু আদেশ দাও এবার।

কমান্ডার
আমরা প্রস্তুত।
কামান মর্টার গানে, রকেটে গোলায়
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা
দাও অর্ডার
কমান্ডার।

কমান্ডার
এখনো কী সময় হয়নি তোমার?
এখনো কী দৃষ্টি রাখবে ঘড়ির কাঁটায়?
উৎকর্ণ হবে ঘাসের প্রতিটি শিহরে?
দায়িত্ব কী পালন করবে তুমি
সংসারী কৃষাণীর মত
ভেবে-দেখে, কম্পনে-ত্রাসে?

দায়িত্ব গ্রহণ কী তবে বৃদ্ধত্ব গ্রহণেরই নামান্তর শুধু!
নইলে হিসাবের প্রয়োজন কী
ঘড়ি আর আঁধারের গাঢ়তা নিয়ে?

জানি তা আনবে আরো সুচারু সফলতা
কিন্তু আমাদের কাম্য তা নয়।

আমরা চাই বিশৃঙ্খল বেঠিকের মাঝে
ভয়াল বিজয়।

আমাদের যাত্রা হবে হঠাৎ আচম্বিতে
মনের তাড়ায়।
নিমেষে উগরাবো যতগুলি জ্বালা আছে মনে
চকিতে ছুঁড়ে দেবো যতগুলি গোলা পাবো চোখে
হিসাবের জের আর টানবো না ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে
আনবো না বিজ্ঞান অংকের মাপ
শুধু যাবার আবেগে চলে যাব।

কমান্ডার
যদি ঐ বিদেশী পদবীটার সাথে জড়তা ওতপ্রোত থাকে
তবে তা ছুঁড়ে ফেলো বিষাক্ত ঘৃণায়
ভুলে যাও সময়ের নির্দিষ্টতা
চলো একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
শত্রুগুলোর ওপর
তাদের নিশ্চিহ্ন করে দি
আমাদের বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতায়।
তারপর ক্ষতি হয়ে পড়ে থাকি
বে-নিয়ম পৃথিবীর পরে।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

৫ অক্টোবর, ১৯৭১



# রিপোর্ট ১৯৭১

আসাদ চৌধুরী

প্রাচ্যের গানের মতো শোকাহত, কম্পিত, চঞ্চল
বেগবতী তটিনীর মতো স্নিগ্ধ, মনোরম
আমাদের নারীদের কথা বলি, শোনো।
এ-সব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে
বৃক্ষের আড়ালে স'রে যায়—
বেড়ার ফোঁকর দিয়ে নিজের রন্ধনে
তৃপ্ত অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে
শুধু মুখ টিপে হাসে।
প্রথম পোয়াতী লজ্জায় অনন্ত হ'য়ে
কোঁচড়ে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা—
সূর্যকেও পর্দা করে এ-সব রমণী।
অথচ যোহরা ছিল নির্মম শিকার
সকৃতজ্ঞ লম্পটেরা
সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গ্যাছে—
আমি তার সুরকার—তার রক্তে স্বরলিপি লিখি।
মরিয়ম, যিশুর জননী নয় অবুঝ কিশোরী
গরিবের চৌমুহীন বেথেলহেম নয়
মগরেবের নামাজের শেষে মায়ে-ঝিয়ে
খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিল,
অস্ফুট গোলাপ-কলি লহুতে রঞ্জিত হ'লে
কার কী বা আসে যায়।
বিপন্ন বিস্ময়ে কোরানের বাঁকা-বাঁকা পবিত্র হরফ
বোবা হ'য়ে চেয়ে দ্যাখে লম্পটের ক্ষুধা,
মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।
পোষা বেড়ালের বাচ্চা চেয়ে-চেয়ে নিবিড় আদর
সারারাত কেঁদেছিল তাহাদের লাশের ওপর।
    এদেশের যে ঈশ্বর আছেন তিনি নাকি
    অন্ধ আর বোবা
এই ব'লে তিন কোটি মহিলারা বেচারাকে গালাগালি করে।
জনাব ফ্রয়েড,
এমন কি খোয়াবেও প্রেমিকারা আসে না সহজ পায়ে চপল চরণে।

জনাব ফ্রয়েড,
মহিলারা
কামুকের, প্রেমিকের, শৃঙ্গারের সংজ্ঞা ভুলে গ্যাছে।
রকেটের প্রেমে পড়ে ঝ'রে গ্যাছে
ভিক্টোরিয়া পার্কের গির্জার ঘড়ি,
মুসল্লীর সেজদায় আনত মাথা
নিরপেক্ষ বুলেটের অন্তিম আজানে স্থবির হয়েছে।
বুদ্ধের ক্ষমার মূর্তি ভাঁড়ের মতন
ভ্যাবাচেকা খেয়ে প'ড়ে আছে, তাঁর
মাথার ওপরে
এক ডজন শকুন মৈত্রী মৈত্রী ক'রে
হয়তো বা উঠেছিল কেঁদে।
র‍্যাবো, পাউন্ড চোরের মতন
পা-টিপে পা-টিপে জ্যোতির্ময়
স্যারের কেলাস থেকে চ'লে গ্যালো।
কাচের গ্লাসের মতো ভেঙ্গে গ্যালো ছাত্রাবাস।
পৃথিবীর সব চিন্তা কাগজের চেয়েও দ্রুত পুড়ে গ্যালো,
বারুদের গন্ধে ধন্য গ্রন্থাগার ব্যান্ডেজে সুন্দর।
জনাব উ থান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া ক'রে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশুর গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ, আমাকে কণ্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি—পড়, পাঠ কর।
কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে
      ঘৃণাকে জেনেছি—পড়, পাঠ কর।
চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে
      জুলুমের সবক নিয়েছি—পড়, পাঠ কর।
দুঃখের স্মৃতিতে ডোবা আশি লক্ষ শরণার্থী
শিখিয়েছে দীর্ঘশ্বাসে কতোটুকু ক্রোধ লেখা থাকে।
কোলকাতার কবির মতো কে পারে শোনাতে
      'আমি তোর জন্ম সহোদর?'
অনাহূত বিবেকের ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী প্রতিনিধি হ'য়ে
ক্লান্তিহীন, বিশ্রামবিহীন আমি ছুটে যাই শান্তির সভায়

কখনো দিল্লীতে, মস্কো, লন্ডন, প্যারীর
জনাকীর্ণ সমাবেশে আমি খুঁজি একজন রাসেলের মুখ,
প্রেমের লিপিকা পড়ি জেনেভার জুরিদের কাছে—
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো রেখে
চ'লে আসি ক্যানাডার বিশাল মিছিলে শ্লোগান শোনাতে।
মানুষের জয় হোক, নিপীড়িত জনগণ জয়ী হোক অন্তিম সমরে।
অসত্যের অন্যায়ের পরাজয়ে খুশি হোক বিশ্বের বিবেক,
পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে আহত বাংলার ঘরে ঘরে।

('শব্দসৈনিক'— ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

# কোন এক নিবেদিতাকে

## টি.এইচ. শিকদার

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
দেখেছি পথের ভিড়ে, একুশের
সুকান্ত মিছিলে।
এবং কখনো কোন জলসায়
ভার্সিটির তর্কের আসরে, পাঠাগারে
মেটেরিয়া মেডিকার স্তূপীকৃত
জ্ঞানের সমুদ্রে।

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
বঙ্গোপসাগর তীরে, কিংবা কোন সবুজাভ
হিলট্র্যাক্ট জুড়ে সাঁওতালী ছেলের হাতে,
মুক্তোময়ী ঝিনুকের খোলের ভেতরে।

তখনো তোমার চুল ভার্জিনিয়া
তামাকের দেশে, মূর্ছিত নেশার মত
তীব্রতর সুবাস ছড়ায়;
তোমার ভুরুতে আঁকা সমুদ্র-কাজল
বৃষ্টির নূপুর হয়ে সঙ্গীত শোনায়।

সুচরিতা,
আজকে তোমাকে আমি দেখেছি আবার—
রক্তাক্ত বাংলাদেশে, খুলনা, কুমিল্লা, ঢাকা,
রংপুর, সিলেট আর কুষ্টিয়ার বিষণ্ণ সেক্টরে;—
আহত আত্মার পাশে, ট্যাংকের
ভয়াল-চোখ গর্জনের মুখে,
প্রসন্ন ফুলের মতো উৎসর্গের তরে।

কি আশ্চর্য! এখন তোমার মন
অন্যভাবে, অনন্য ইচ্ছায়
নিবেদিত, সাত কোটি রক্তের সত্তায় :
সহস্র ধ্বংসের বাজ, মেশিনগান, মর্টারের স্তূপে
অক্টোপাশ-ডানা দেখি অনির্বাণ ভিসুভিয়সের;
এবং তোমাকে দেখে, সমর্পিতা,
যদি আমি হতে পারি অন্য এক নিবেদিত প্রাণ ॥

('বেতার বাংলা'—মার্চ ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি।)

# নামফলক

## অনু ইসলাম

মহান শহীদানের স্মরণের লেখা
প্রস্তর ফলকে বন্ধু তোমাদের নাম।

আমি হাঁটছি ২৫শে মার্চ থেকে
আমি হাঁটছি কালো-লাল এবং
সবুজ থেকে ঝলসানো স্বাধীনতা
পর্যন্ত।

এখন বন্ধুরা
স্থির হয়ে তাকিয়ে দ্যাখো
কেমন করে ঢেকে রেখেছি
তোমাদের স্মৃতিগাঁথা আমার বুকের মর্মরে।

জানো এখন আমার চোখ থেকে
সব আলো ফুরিয়ে গ্যাছে।
দ্যাখো আমার চোখ দুটি কেমন করে
ঢেকে রেখেছি
রাশ রাশ জানা অজানা নামে।

আমি তবুও পড়তে পারি
(শিশু শিক্ষায় যেমন পড়তাম)
মানুষের হৃদয়ের পটে পটে
লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম।
(ওরা মানুষ নয় বীর)

সালাম
বরকত,
মুক্তিযোদ্ধা
এবং শেখ
যেন একটি মানচিত্র!

আমার বুকের নিচে
রক্তের ঝরণা—
ঝরণার গানে গানে
শুধু শুনি লক্ষ নাম—
সালাম
রফিক
মুক্তিযোদ্ধা।

('শব্দসৈনিক'— ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি।)

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

# হে স্বদেশ হে আমার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিক

তোমার দেহের মতো খর-কৃপাণের মতো
দীর্ঘ ও উদাত্ত ঋজু
সারি সারি
শাল-তরু শ্রেণী
দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পাশে;
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চুমু খেলে
বয়ে ও বিহ্বলতায়
যেমন কম্পন জাগে
তোমার দু'গালে ঠোঁটে, আজকে রাত্রেও তেমনি
উদগ্রীব অপেক্ষার
রুদ্ধ শিহরণ সাড়া
শাখে শাখে, শকুনের ডানার ঝাপটে যেন
ঢেউ ওটে ভয়াল সাগরে;

তোমার ত্বকের রং যেন
তপ্ত কাঞ্চনের মতো
লেগে আছে সড়কের প্রতি ধূলিকণা সাথে,
চোখের মণির মতো সজল নিবিড় কালো
জমছে খণ্ড খণ্ড মেঘ
সারাটা আকাশময়
হয়তো নামবে বৃষ্টি একটু পরে,
যেমন শোণিত চুঁয়ে চুঁয়ে
পড়ছে তোমার পথে পথে
তাল ও তমাল শাখে,
শত্রুর সৈন্যের বেয়নেটে
তোমার প্রাণের মতো
উষ্ণ লাল রক্ত
যেমন ঝরছে
মাঠে মাঠে গঞ্জে বাটে;

ক'জন চলেছি আমরা
সড়কের 'পর দিয়ে এই

একটি ট্রাকে ঠাসাঠাসি
উঁচিয়ে সঙ্গীন দৃপ্ত
আমরা চলেছি এই
নীরন্ধ্র রাতের মাঝামাঝি
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত ঋণ
রক্ত দিয়ে শোধ করে দিতে;

শুধু আলো হাওয়া চাঁদ
বা সূর্যকিরণ নয়
তোমার শরীরে মাগো
বিকট দুর্গন্ধ আছে,
ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন সব
কচি কচি যোদ্ধাদের
ঘামে ভেজা ছেঁড়া গেঞ্জি
ময়লা বিছানা হ'তে
বিবমিষা ছুটে আসে;

তোমার দেহের সাথে
এ-দুর্গন্ধে মাগো
আমাদের ভবিষ্যৎ যেন
নবজাতকের মতো
হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে খেলা করছে;

শুধু খালে বিলে মাঠে
নদীতে নালায় জলে
বা সীতাকুণ্ডুর
পর্বতমালায় নয়,
এইসব বৃষ্টিভেজা
কাদামাখা তাঁবুতে তাঁবুতে যেন

তোমার মানচিত্রখানি
কতগুলি
ছোট ছোট জারুল চারার মতো
উষ্ণ তাজা
হৃদয়ের সাথে লেপ্টে আছে।

বিভিন্ন টিলায় ট্রেঞ্চে
রাইফেলে ট্রিগারে হাত চেপে
দেখছি প্রতিদিন

হাজার হাজার জীর্ণ অবসন্ন ধর্ষিতা নারীও
পুরুষের সাথে
শত্রুর সন্ত্রাস গুলি বেয়নেট বেড়াজাল
কি করে এড়িয়ে মা আমার
হেঁটে চলছে দল থেকে দলে
দৃপ্ত পায়ে

কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে
ভেঙেপড়া
প্রথম সূর্যের ক্ষীণ
আলোর রেখার মতো
কম্পমান সম্ভাবনার দিকে!

বহু পরে
অনেক রাতের শেষে
আঁধারের আস্তরণ ভেঙে
নির্দয় নিশ্চিত সূর্য
জরাজীর্ণ
দেয়াল ফাটলে বট
বৃক্ষের চারার মতো
যখন বেরিয়ে আসবে
ফেটে পড়বে

বহু প্রতীক্ষিত
সেই আনন্দিত ক্ষণে
হয়তো দেখবে
তোমার ঘরের পাশে
উজ্জ্বল পৈঠার 'পর
দু' একটি ফোঁটা
পুরনো মলিন রক্ত
লেগে আছে,

তখন কি
মনে পড়বে
প্রিয়তমা
আমরা ক'জন মিলে
অবিচল প্রত্যাশায়
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত-ঋণ
সহস্র সহস্র কোটি
হায়েনার চীৎকারের মতো
সেই এক
পৈশাচিক অন্ধকার রাতে
চলে গেছি
রক্ত দিয়ে
শোধ করে!

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

# আমার স্বর্গের নামে

## মযহারুল ইসলাম

(এক)

সব কথা সব অনুভূতি যেন কোন এক বিষণ্ণ উদ্বেগে
হতবাক হয়ে আসে, ক্ষোভাচ্ছন্ন চেতনার উদ্দাম আবেগে
বাংলার মাঠে ঘাটে শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে
রক্তঝরা মুহূর্তের তিমিরাঞ্চল-ছায়া নামে
শ্মশানের ভস্মে আর দুর্দিনের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
আমাদের কাল শুধু বেদনায় ম্লান হয়ে আসে।

(দুই)

বাংলা দেখেছে তার সন্তানের মৃতদেহে
কেমন ভরেছে মাঠ নদী
বাংলা দেখেছে তার সন্তানের রক্তে রক্তে
হিমসিক্ত স্রোতের প্রবাহ
বাংলা জেনেছে তার অপমানে লাঞ্ছনায়
অন্ধকার নামে নিরবধি
বাংলা বুঝেছে তার নির্যাতন নিপীড়নে
কি দুঃসহ যাতনা-প্রদাহ।

ইতিহাস তবু কথা বলে
মুক্তির সোনাসূর্য প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে পূর্বাচলে।

(তিন)

চারিদিকে শুধু সংগ্রাম আর যুদ্ধ
হাতিয়ার হাতে চলে মহা জয় যাত্রী
বাংলার গ্রাম প্রান্তর ঘাট প্রতিরোধে বিক্ষুব্ধ
পূর্ব গগনে কাটে অভিশাপ-রাত্রি।

অযুত মৃত্যু, অনেক রক্ত সীমাহীন নিগ্রহ
পেরিয়ে এসেছে আজকের দিন অগ্নিশপথে স্নাত
দিকে দিকে জাগে মহা অভিযান বিপ্লব বিদ্রোহ
বিজয়ের দিন মুক্তির দিন সম্মুখে প্রতিভাত।

(চার)

বাংলা আমার, স্বদেশ আমার, আমার বাংলাদেশ
রূপে রূপময়ী চিরমধুময়ী স্বর্গ আমার বিশ্বে
সুজলা তটিনী সুনীল আকাশ চেয়ে দেখি অনিমেষ
সবুজে শ্যামলে নৃত্যে ও গানে নবীনা দৃশ্যে দৃশ্যে।

বিশ্বে আমার স্বর্গ বাংলাদেশ
জাগ্রত আমি সেই স্বর্গের নামে
তার প্রেমে নব-চেতনার উন্মেষ
তারই অনুরাগে নামি মহাসংগ্রামে ॥

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

# বাংলাদেশ
## মিজানুর রহমান চৌধুরী

গুরুদেব,
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।
ফাগুনের আমের বনে
মুকুলের গন্ধ আজ আর নেই
বারুদের গন্ধে ভরেছে ফাগুনের বাতাস।
অবারিত মাঠ গগন ললাট
আজ উত্তপ্ত।
দস্যুদের সেলের আঘাতে
বাংলার শ্যামল রূপ বিপর্যস্ত।
মেশিন গান, মর্টার আর বোমার আঘাতে
বাংলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে।
হে রবীন্দ্রনাথ
তোমার সোনার বাংলার আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।

হে বিদ্রোহী
ওরা সাত কোটির মুখের গ্রাস
কেড়ে নিতে চায়।
ওরা বুলেটের আঘাতে বাঙালিকে
নিশ্চিহ্ন করতে চায়।
ওই শোনো আকাশে বাতাসে
নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন রোল
ওই দেখ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
রক্তের হোলি খেলায় মেতে গেছে।

এস বন্ধু সেই শমসের নিয়ে
আর একবার পদ্মার জলে.মোরা
লালে লাল হয়ে মরি।
বাংলার পথ-প্রান্তর রক্তলেখায় পূর্ণ
এস বন্ধু আজ মোদের রক্তলেখায়
ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিই।

জীবনানন্দ
তুমি দেখেছিলে রূপসী বাংলার
রূপ মনোহর।
পাখির নীড়ের মত চোখ দেখেছিলে—
নাটোরের বনলতা সেনের।
বাংলার ভাঁটফুল কদম্বের ডালে
ধানসিঁড়ি নদীটির পারে
ফিরে আসতে চেয়েছিলে
এই বাংলায়।
কিন্তু বন্ধু
রূপসী বাংলার রূপ আজ বিবর্ণ
পশ্চিমা হানাদারের নির্মমতায়
বাংলার মাঠে ঘাটে হাহাকার ধ্বনি
প্রিয়া আজ দানবের হাতে বন্দিনী
ধর্ষিতা তরুণীর দিগন্ত বিদারী কান্না
আজ বাতাসে কেঁদে মরছে।
আশীর্বাদ করো বন্ধু
প্রিয়ার দৃষ্টির অগ্নিশিখায় যেন
শত্রুর মুখ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুকান্ত নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার করে বলেছিলে—
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে
কিন্তু নরদানবের পৈশাচিকতায়
অসংখ্য শিশু আজ অধিকার হারা।
বুভুক্ষু জনতার অসহায় ক্রন্দন
লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের ম্লান মুখ
গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
এসো আজ সিগারেটের মতো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতো মুখে বারুদ নিয়ে।
এসো এই সংগ্রাম মাঝে
নতুন আলোর মন্ত্র নিয়ে।
ঠিকানা তোমার পেয়েছি বন্ধু
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভ, কম্বোডিয়া নয়
আলজিরিয়া, কোরিয়া ভিয়েতনাম নয়
স্নেহ মায়া মাখা, মমতা ঘেরা
এই বাংলায়॥

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

# অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল

## মুসা সাদেক

মহামান্য বিচারকমণ্ডলী :

এখন থেকে দুই দশক পূর্বে
পবিত্র ধর্ম এবং আইনের দোহাই সাজিয়ে
বিশ্ববিবেক, বিশ্বমানবতার ধ্বজা উচিয়ে
আপনাদের আদালতে যাঁদের বিচার করেছিলেন
আদালতে শেষতম শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন
ঈশ্বর-দত্ত-প্রাণ রক্ষার অধিকার কেড়েছিলেন
তারা প্রত্যেকেই নিরপরাধী এবং প্রত্যেকেই পুণ্যবান
এবং পবিত্র আইনের শ্লীলতাহানির অভিযোগে
মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে আপনারা অভিযুক্ত।
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না—দুই দশক বিলম্বে
আসামীর কাঠগড়ায় আপনারা দাঁড়িয়ে
তার খাসা একখানা প্রমাণ নির্মাণ করলেন অন্তত।

বিশ্ববিবেকের যেসব মহানতম ব্যক্তিত্বকে
আপনারা সেদিন মানব সত্তা এবং সভ্যতা হন্তা হিসেবে
চিহ্নিত করেছেন, তার জন্য আমাদের দারুণ বিলাপ
এবং বিশ্বব্যাপী শোক সভার ঘটা অচিরেই শুরু হবে।

মহামান্য আদালত :

আমি অবশ্য কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের
জনক ফুয়েরারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছি
আমি অবশ্যই ফুয়েরার দোসর বেনিটো মুসোলিনীর কথা ভাবছি
আমি অবশ্যই কূটনীতিক হের হেস, প্রচারবিদ গোয়েবলস, সমরবিদ তেজো
প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদের নামও উপস্থাপন করছি :
যাঁদেরকে আপনারা অবৈধ আইনের সত্তা অনুসরণ করে
ধর্মের দোহাই পেড়ে পাপাত্মা বলে চরম দণ্ড দিয়েছেন।
এইসব মহাপ্রাণদের ন্যুরেমবার্গ-ট্রায়াল-প্রহসনের মাধ্যমে দণ্ড দিয়ে
সমগ্র বিশ্ব সভ্যতার যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনারা করেছেন।

আজ তার হিসাব হবে, আজ তার বিচার হবে
না হলে মানব সভ্যতার বুকে মহা অভিশাপ ধার্য হবে।

হে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকমণ্ডলী :

ঈশ্বরের অসীম করুণা যে সত্য, ন্যায় ধর্ম এবং বিচার
অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে—তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছো
অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের তোমরা আসামী
ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের আসামীদের উত্তরসুরীরা আজ বিচারপতির আসনে।
ভিয়েতনামের লক্ষ লক্ষ হত্যাযজ্ঞের পুরোহিত মহাত্মা রিচার্ড নিক্সন
বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যার যোগ্য জনক, পুণ্যাত্মা এহিয়া
এবং অসংখ্য মাইলাই—ঐতিহ্যধারী পুণ্যাত্মারা।
আজকের মহামান্য আদালতের মহিমান্বিত বিচারকমণ্ডলী।
আজকে বিচার হবে অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকদের
আজকে বিচার হবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ অপরাধে হোচিমিনের
আজকে বিচার হবে বাংলাদেশ অপরাধে শেখ মুজিবের!!

('শব্দসৈনিক'—ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

# লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা

রফিক নওশাদ

বন্ধু, তোমার শহীদ মিনার রক্তে আমার রাঙিয়ে দেবো
স্বাধীনতার জয় পতাকা এই মিনারেই উড়িয়ে যাবো।

বাংলার বুকে বেদনার ছায়া—হাসে না বাংলা সহজ গানে
হিংস্র শ্বাপদ তীক্ষ্ণ নখরে সবুজ কুঁড়ির মৃত্যু আনে।
ঘন কালো রাত কালো শৃঙ্খল দুর্গম আজ পথের রেখা
তবুও রক্তে বান ডাকে জানি মুক্তি পথের মিলবে দেখা।

যুদ্ধক্লান্ত বন্ধু আমার, ঘুমাও শহীদ—মুক্তি সেনা—
তোমার রক্তে শপথ নিলাম শত্রুকে আজ হয়েছে চেনা।
গণ-শত্রুর কলজে ছিঁড়ে পিষবো পায়ে কসম ভাই—
আমার ভায়ের রক্তের ঋণ শুধতে হবে আপোস নাই।
সব শোষণের হিম কারাগার পদাঘাতে জানি গড়বে ধসে
গণ-যুদ্ধের রক্ত-ফসল তুলবো এবার যুদ্ধশেষে।

এদেশ আমার, কোটি জনতার—পরাধীনতার লগ্নশেষ
কৃষ্ণচূড়ার লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা—হাসে স্বদেশ।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

# অন্বিষ্ট রাজ্য : আমার বাংলা
## প্রণব চৌধুরী

আমি পেয়েছি খুঁজে এক বাস্তবিত মানোরম রাজ্য।
এ রাজ্যের কোথাও নির্ধারিত কোন সামরিক শাসনের নেই।
কড়া বিধি, খাঁচাবন্ধের ভয়।
এখানে সবার নির্বিকার বাধাহীন চলাফেরা,
মা'র কোলে দোল খাওয়া নিগূঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম
নিরপরাধ আঁচলে মাথা ঝুঁকানো স্বামীর সোহাগ
পুত্তলি ....

এ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো কথা, মূলত,
এখানে চিরায়ত নিয়মের সব পথঘাট, প্রান্তর, জলাশয় নদী
ছায়ান্ধ অন্ধকারে কতোকাল ঢেকেছিল ভয়াবহ জঙ্গল।
অতঃপর একদিন এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধ হাত বুলিয়ে গভীর প্রেম,
একে একে সব আঁধারের পাষাণ পাহাড়, সারি সারি
সভয় জঙ্গল কেটে ভয়াল বাঘের চামড়ায়
শুতে দিল আজীবন ভীরু হরিণী;
মায়ের অনিঃশেষ স্নেহের মতো বাড়ালো সূর্য মুখ
এ সূর্য আর ডুবলো না কোনদিন,
ডুবে আবার প্রাত্যহিক বিশাল কালো নদীতে
মাথা ভাসানোর বুক ফুলালো না,
এ রাজ্যে সেই থেকে অন্ধকার নেই, প্রতি মূহূর্ত সূর্য,
সূর্য আর ডোবে না প্রত্যহ
শুধু 'আলোয় ভুবন ভরা', 'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি' ॥*

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

# দিন এলো

## আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

রাত্রির শেষ—তমসার শেষ—পূর্ব দিগন্ত লাল
বন্দরে শুনি গর্জন আর সমুদ্র উত্তাল
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে—শংকার রাত শেষ
ধ্বংসের স্তূপে শিহরণ জাগে—জীবন্ত উদ্দাম।
গর্জন-ভীতি শংকিত বুকে দুর্জয় সংগ্রাম
নবতর আজ চেতনার ধ্বনি—জীবনের ধ্বনি
কাল শেষ হয়ে গেল—রাত্রির শেষ—দিগন্ত আজ লাল।

বেদনার দিন, শোষণের দিন, জালিমের কাল শেষ
শাদ্দাদ কাঁপে ভীত-শংকিত। সব নমরুদ মুহ্যমান।
দুর্গের দ্বারা ভেঙেছি ওদের কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞায়—
আমাদের আজ দুর্বার গতি—দুর্জয় হলো বাংলাদেশ
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল—শংকার রাত হয়েছে শেষ।

দিন এল আজ বিজয়ের দিন-উল্লাস-ধ্বনি দেশে।
বেদনার কথা মিলনের বাণী বিরহ বিধুর মন
সচেতন সব বঞ্চিতগণ—বিবেকের জাগরণ।
নব উত্থান—নতুন জাতির হৃদয়ে সূর্যোদয়
চঞ্চল চোখে উদ্দাম আশা মৃত্যুর পরাজয়।

('শব্দসৈনিক'— ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সংকলিত)

শিরোনাম : ১৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা' থেকে। সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : ...ডিসেম্বর, ১৯৭১।

# এহিয়া বধ কাব্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারী : কহ বীর ত্বরা করি কীবা সমাচার?
কিভাবে দলিছে মিত্রসেনা রণাঙ্গনে
এহিয়া চমুরে? ভূপাতিত ইয়াহিয়া
গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে?

পুরুষ : গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ-শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; শত শত মিত্রসেনা বলী
তেমনি ধায় যশোর শক্রদুর্গ পানে
চূর্ণিয়া বিচূর্ণ হত করিতে তাহারে।
যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, পাক-চমুর পলাইল রণে
হেরি যমাকৃতি মুক্তিসেনা রথীদলে।
হুঙ্কারে, বিষম ঘাতে ব্যথিত কুমতি
পলাইলা, পলাইলা সত্রাসে চৌদিকে।
মহারোষে যমসম মুক্তি মিত্র সেনা
ঘেরিলা, ঘেরিলা অবরুদ্ধ খান সৈন্য
বেড়াজাল মাঝে যথা ক্ষীণপ্রাণ মীন।
সমর্পিল অস্ত্র যত দীন করজোড়ে
মাগিল জীবন ভিক্ষা নরাধম কূল।
যশোহর দুর্গশিরে বিজয় কেতন
বাঙ্গালার মুক্তিসেনা উড়ায় গৌরবে।

নারী : যশোহর দুর্গ তবে হয়েছে পতন?
কহ বীর ত্বরা আর আর রণাঙ্গনে
কিভাবে যুঝিছে মিত্র অক্ষৌহিণী সেনা?

পুরুষ : সিলেট কুমিল্লা টাংগাইল নোয়াখালী
জিনি হেলাভরে, আন্দোলিয়া নীলাকাশে
ঘোর রবে গরজিয়া ভীষণ সরবে
চলিয়াছে মিত্রসেনা ঢাকা অভিমুখে
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করীযুথ যথা।

# দিন এলো

## আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

রাত্রির শেষ—তমসার শেষ—পূর্ব দিগন্ত লাল
বন্দরে শুনি গর্জন আর সমুদ্র উত্তাল
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে—শংকার রাত শেষ
ধ্বংসের স্তূপে শিহরণ জাগে—জীবন্ত উদ্দাম।
গর্জন-ভীতি শংকিত বুকে দুর্জয় সংগ্রাম
নবতর আজ চেতনার ধ্বনি—জীবনের ধ্বনি
কাল শেষ হয়ে গেল—রাত্রির শেষ—দিগন্ত আজ লাল।

বেদনার দিন, শোষণের দিন, জালিমের কাল শেষ
শাদ্দাদ কাঁপে ভীত-শংকিত। সব নমরুদ মুহ্যমান।
দুর্গের দ্বারা ভেঙেছি ওদের কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞায়—
আমাদের আজ দুর্বার গতি—দুর্জয় হলো বাংলাদেশ
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল—শংকার রাত হয়েছে শেষ।

দিন এল আজ বিজয়ের দিন-উল্লাস-ধ্বনি দেশে।
বেদনার কথা মিলনের বাণী বিরহ বিধুর মন
সচেতন সব বঞ্চিতগণ—বিবেকের জাগরণ।
নব উত্থান—নতুন জাতির হৃদয়ে সূর্যোদয়
চঞ্চল চোখে উদ্দাম আশা মৃত্যুর পরাজয়।

('শব্দসৈনিক'— ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সংকলিত)

শিরোনাম : ১৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা' থেকে। সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : ...ডিসেম্বর, ১৯৭১।

# এহিয়া বধ কাব্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারী : কহ বীর ত্বরা করি কীবা সমাচার?
কিভাবে দলিছে মিত্রসেনা রণাঙ্গনে
এহিয়া চমুরে? ভূপাতিত ইয়াহিয়া
গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে?

পুরুষ : গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ-শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; শত শত মিত্রসেনা বলী
তেমনি ধায় যশোর শক্রদুর্গ পানে
চূর্ণিয়া বিচূর্ণ হত করিতে তাহারে।
যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, পাক-চমুর পলাইল রণে
হেরি যমাকৃতি মুক্তিসেনা রথীদলে।
হুঙ্কারে, বিষম ঘাতে ব্যথিত কুমতি
পলাইলা, পলাইলা সত্রাসে চৌদিকে।
মহারোষে যমসম মুক্তি মিত্র সেনা
ঘেরিলা, ঘেরিলা অবরুদ্ধ খান সৈন্য
বেড়াজাল মাঝে যথা ক্ষীণপ্রাণ মীন।
সমর্পিল অস্ত্র যত দীন করজোড়ে
মাগিল জীবন ভিক্ষা নরাধম কূল।
যশোহর দুর্গশিরে বিজয় কেতন
বাঙ্গালার মুক্তিসেনা উড়ায় গৌরবে।

নারী : যশোহর দুর্গ তবে হয়েছে পতন?
কহ বীর ত্বরা আর আর রণাঙ্গনে
কিভাবে যুঝিছে মিত্র অক্ষৌহিণী সেনা?

পুরুষ : সিলেট কুমিল্লা টাংগাইল নোয়াখালী
জিনি হেলাভরে, আন্দোলিয়া নীলাকাশে
ঘোর রবে গরজিয়া ভীষণ সরবে
চলিয়াছে মিত্রসেনা ঢাকা অভিমুখে
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করীযুথ যথা।

অগ্নিময় আকাশ পুড়িছে কোলাহলে
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নিস্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে শক্র উঠিছে কাঁপিয়া
কাঁপিছে মালিক বিভীষণ প্রাণভয়ে
থরথরি পিণ্ডিনাথ কাঁপে সিংহাসনে।
অলংঘ্য সাগর সম মিত্র অক্ষৌহিণী
বেড়িছে তাহারে। রক্ষা নাহি এবে তার।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, সবশেষে
নাশে বৃক্ষে; মহারথী মিত্র অক্ষৌহিণী
তেমতি দুর্বল করে এহিয়া পামরে
নিরন্তর। অবিলম্বে সমূলে নির্মূল
হইবে কুমতি। রক্ষিবে না কভু তারে
চীন আমেরিকা; রক্ষিবে না খান সেনা
আপনার জন। তুরঙ্গে কুরঙ্গে যেবা
মৃগেন্দ্র কেশরী নখে ছিন্নভিন্ন করি
নাশে প্রাণ, শৃগালেরে পদতলে চাপি
পিষ্ঠ করি সংহারে ক্রোধান্ধ ঐরাবত
তেমতি নাশিবে প্রভঞ্জন-সেনা সম
মিত্রসেনা ঘোর রণে এহিয়া পামরে।

নারী : ধর্ম-নাম লয়ে যেবা ধর্ম নাশিয়াছে,
ধর্ম তারে করিবে না ক্ষমা। ধর্ম কভু
ক্ষমিবে না ঘোর অধর্মীরে। নরহন্তা
পাশব শ্বাপদ লভিবে না প্রাণভিক্ষা।

পুরুষ : পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি ছত্র ধরি
তারে রক্ষিবারে চাহে, বজ্রাঘাত হতে
রক্ষা নাহি তার। লুকালে জলধিতলে
মিত্রসেনা জল সেচি অতল সলিল
আনিবে ধরিয়া তারে মৃত্যুদণ্ড লাগি।
অধর্মের পরাজয় জানো সুনিশ্চয়।

নারী : জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়

উভয় কণ্ঠ : জয় মুক্তিবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় জীবনের জয়, জয় বাংলার জয়।

পুরুষ : দুরাত্মা দানব দল মদমত্ত হয়ে
হানিয়াছে বঙ্গবক্ষে নিষ্ঠুর আঘাত
কাপুরুষ সম। সদা রুধিরাক্ত দেহে
কাঁদিছে জননী। হিংস্র হায়েনারা সবে
প্রমত্ত উল্লাসে ফেরে রাতের আঁধারে
প্রসারিয়া লোলজিহ্বা প্রেতের মতো।
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্তূপ মৃতদেহ,
ধর্ষিতা নারীর দেহে রাখি পদ ভার
বিধাতার জয়গান গাহিছে দানব।
পাকিস্তানের গলিত শব কাঁধে বহি
ইসলাম বাঁচাইতে করিছে বাসনা
পামর এহিয়া

নারী : ইসলাম কি বাঁচিবে তাহে?
মানবতা হত্যাকারী জল্লাদের
হাতে ধর্ম কভু লভিবে কি প্রাণসুধা?

পুরুষ : ধর্ম কহে না কভু নিষ্পাপ শিশুদেহে
করিতে আঘাত। ধর্ম কভু কহে নাই
নারীদেহ পশুসম করিতে দলন।
ধর্ম কভু কহে নাই সুতীক্ষ্ণ শাণিত
অস্ত্রে নারীদেহ খণ্ডবিখণ্ডিত করি
রক্তমাখা মুখে গাহিতে ধর্মের গান।
যদি কেহ অস্ত্রাঘাতে শিশুহত্যা করে
যদি কেহ মদমত্ত পাশব ক্ষুধায়
নারীদেহ করিবে দলন তার লাগি
রহিয়াছে অনির্বাণ অনন্ত নরকে।

নারী : ইয়াহিয়া পাকসেনা মুখে ভাই বলি
ভ্রাতৃবক্ষে হানিয়াছে পাশব আঘাত
নারীরক্তে করিয়াছে ক্ষমাহীন পাপ
বাংলার বুকে।

পুরুষ : তারি লাগি দৃঢ়পদে
চলিয়াছে মুক্তিসেনা ক্ষমাহীন ক্রোধে
বিধাতার বজ্রসম করিতে সংহার
পাক পশু সেনা। ক্ষিপ্ত কেশরী যেমতি
বনভূমি প্রকম্পিয়া প্রচণ্ড গর্জনে পশুদেহ
ছিন্ন ভিন্ন করি তপ্তরক্তে করে

তৃষ্ণা নিবারণ, মদমত্ত করি
যথা শঠ শৃগালেরে পদতলে দলি
প্রতিহিংসার আগুন যত করে প্রশমন
তেমতি দুরন্ত ক্রোধে বীর মুক্তিসেনা
সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহারে জর্জরিত করি
পাক সেনা যত, প্রতিশোধ বহ্নি করে
নির্বাপণ। শত্রুরক্তে করি স্নান সদা
নিভাইছ প্রতিহিংসার প্রজ্বলিত চিতা।
ক্রুদ্ধ সিংহসম মুক্তিসেনা আগমনে
দানবের দল ভীত শ্বাপদের মতো
পুচ্ছ নামাইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়াছে
আত্মরক্ষা লাগি। দিকে দিকে ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠে বাংলার জয়,

নারী : জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়—

উভয় কণ্ঠ : জয় মুক্তিবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় জীবনের জয়, জয় মানবতার জয়।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারী : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মাঝে
কিবা খেলা চলিয়াছে কহ সমাচার!

পুরুষ : নিরাপত্তা পরিষদে চীন আমেরিকা
স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে কুকীর্তি স্থাপিল
ধরা মাঝে। স্বর্ণ বঙ্গে দুরাত্মা এহিয়া
কনক কমল বনে ঐরাবত যথা
লণ্ড ভণ্ড করে সব বিস্মারিল তাহা।
বিস্মারিল দানবের প্রচণ্ড ক্ষুধায়
জ্বলিতেছে এবে বাংলার জনপদ।
স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি তোষণ করিছে
দুরাত্মা দানবে। ভারত আগ্রাসী কহি
মুক্তিযুদ্ধ দংশিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে
উঠিয়াছে মাতি, আনিয়াছে পরিষদে
প্রগলভ প্রস্তাব ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
মহান ভারত! অস্ত্র করো সংবরণ।

নারী : অতঃপর কি করিল মহান রাশিয়া?

পুরুষ : গর্জিয়া উঠিল রাশিয়ার প্রতিনিধি
ধূর্ত শৃগালেরে দেখি সঘনে গর্জিয়া

যেমতি কেশরী ধায় বিদ্যুৎ গতিতে
ধরিতে তাহারে, পাপিষ্ঠ ভ্রমিছে দেখি
যেমতি গর্জিয়া ওঠে সুর সুরপতি,
হানে বজ্র পাপিষ্ঠের শির লক্ষ করি
রাশিয়ার প্রতিনিধি তেমনি গর্জিয়া
হানিল বজ্রের প্রচণ্ড আঘাত। ভেটো দিয়া
কহিল অশনি স্বরে, পাপী পাকিস্তান
কোটি লোক করিয়াছে নিজ গৃহ হারা,
দশ লক্ষ মানুষের রক্ত মাখি হাতে
মহাপাপ করিয়াছে পামর এহিয়া
শৃগাল হইয়া সিংহে করিছে আঘাত
ভারত সীমান্ত দেশ করি আক্রমণ।
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে হিংস্র হয়ে
ছিন্ন ভিন্ন করেছিল বাংলার দেহ?
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে ক্রুর লালসায়
আহুতি দিছিল ভোগে লক্ষ লক্ষ নারী?
মানবতা বিসর্জিয়া আসিয়াছ এবে
পশু লাগি করিতে ক্রন্দন, দানবেরে
রক্ষা করিবারে? কিন্তু হীন ইচ্ছা তব
হবে না সাধিত। যতদিন পাক সেনা
না ছাড়িবে বাংলার মাটি যতদিন
গলবস্ত্রে পামর এহিয়া চাহিবে না।
ক্ষমা ভারতের পায়ে, অস্ত্র ততদিন
কোষবদ্ধ করিবে না ভারত কেশরী।

নারী : ভেটো লভি দিশাহারা হইয়াছে তারা
কলংক জর্জর মুখে কথা নাহি আর।
হীনতার পরিচয় সর্ব অঙ্গে মাখি
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যাচে
দস্যুর জীবন ভিক্ষা। লজ্জা নাহি পায়
নিক্সন সরকার। নির্লজ্জ হয়েছে
চীন প্রগলভ কুমতি। এতদিন ধরি
গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলি ভিয়েতনামে
লক্ষ লক্ষ লোকে হত্যা করি আমেরিকা
বাংলার গণতন্ত্র হত্যা অনুষ্ঠান

করিবার ষড়যন্ত্রে রত। বিসর্জিয়া
মানবতা, সাম্যবাদ বুলি প্রকাশিছে
চীন আপনার ক্রুর গূঢ় অভিলাষ
ভারত বিদ্বেষ। মানবতা নিয়াছে সে
বলি আপনার হীন স্বার্থ বেদীমূলে
রক্ষা কি পাইবে তাহে পামর এহিয়া?
পুরুষ : পৃথিবীর শক্তি যদি ছত্র ধরি থাকে
এহিয়ার শিরের উপর রক্ষা নাহি
রক্ষা নাহি তার। লুকাইয়া থাকে যদি
সমুদ্রে পর্বতে কিম্বা মরুভূমি মাঝে
রক্ষা নাহি পাবে, রক্ষা নাহি পাবে
কভু এহিয়া চামার। যশোহর জিনিয়াছে,
জিনিয়াছে মিত্রসেনা সিলেট সমর
চলিয়াছে বীর সেনা বীর পদ ভারে
করিতে হেলায় জয় ঢাকার অঙ্গন,
ব্যূহ ভাঙ্গি পলায়িত এহিয়া চামার
ত্রস্তভীত শ্বাপদ যথা মহা শংকায়
সন্দর্শিয়া বীরেন্দ্র কেশরী প্রাণভয়ে
উর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন। সূর্যকর
মুক্ত এবে রাহুগ্রাস হতে, ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠ, বাংলার জয়—
নারী : জয় ন্যায়ের জয়, জয় ধর্মের জয়
উভয় কণ্ঠ : জয় মিত্রবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় বাঙালির জয়, জয় সত্যের জয়।

(রচনা : গাজিউল হক। আবৃত্তি : উম্মে কুলসুম* ও আশফাকুর রহমান।)

[ * উম্মে কুলসুমের পূর্ণনাম : উম্মে কুলসুম মুশতারি শফি সঙ্কলক ও সম্পাদক। ]

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত একটি রূপক অনুষ্ঠান—'জল্লাদের দরবার' (অংশ)। সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : .......১৯৭১

# জল্লাদের দরবার

১১ জুলাই, ১৯৭১

নকীব : (চিৎকার করে হাঁকছে) জনাব সদরে-মুলুক, খান-এ-তালুক, প্যায়ারে মোহাম্মদ কেল্লা ফতে খান বাহাদুর—

ফতে : সিপাহসালার টিটিয়া খান, যুদ্ধের খবর কি?

সিপাহ : যুদ্ধ শেষ। আমাদের সেনারা এখন ক্যাম্পে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে। আর ঘুমুচ্ছে।

দুর্মুখ খান : জনাব সদরে মুলুক, গোস্তাকি মাপ। আমি দুর্মুখ খান। মাঝে মাঝে অতীব সত্য কথা না বললে কেমন যেন অম্বলের মতো বুক জ্বলে যায়।

ফতে : তোমার কি বক্তব্য, বলে ফেল দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ : আমাদের সিপাহাসালার বুড়ো হলেও মনটা জোয়ানই আছে। উনি এইমাত্র বললেন আমাদের সেনারা নাকি যুদ্ধ শেষ করে এখন ক্যাণ্টনমেণ্টে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে।

ফতে : তুমি কি বলতে চাও?

দুর্মুখ : হুজুরে আলা, আপনি তো তিন মাস হ'ল হার্ট আর মাথা ঘুরানি ব্যামোতে আপনার "মসরকী বাঙ্গালে" পা রাখতে পারেননি। যদি মেহেরবানী করে একবার "বাংলাদেশে" যান তাহলে দেখতে পাবেন, ওইসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদী মানে মুক্তিবাহিনী প্রতিদিন আপনার প্যায়ারে সেনাদলকে এ্যায়সান ধোপা পাটকান পাটকাচ্ছে যে, সেইসব আমাদের সেনারা তুন্দুরী রুটি খাবার বদলে হাসপাতালের বেডে খাবি খাচ্ছে। ওরা ঘুমুচ্ছে ঠিকই—তবে সে ঘুম সহজে ভাঙবার নয়। উঃ কি মার হুজুর—একেবারে বদন বিগড়ে দিয়েছে।

ফতে : খামোশ নালায়েক। মুক্তিবাহিনী—মুক্তিবাহিনী—মুক্তিবাহিনী! আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

দুর্মুখ : গোস্তাকি মাফ জনাব। ভুলে গিয়েছিলাম, ওদের মুক্তিবাহিনী বলা চলবে না। মানে ঐসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

ফতে : দুর্মুখ খানের একথা কি সত্য টিটিয়া খান?

সিপাহ : জনাব, মারতে গেলে মার খেতে হয়—এইটাই আমাদের যুদ্ধকৌশল।

ফতে : তাহলে ওইসব দেশদ্রোহীদের হাতে আমার সাধের সেনাদল এখনও মার খাচ্ছে।

দুর্মুখ : খাচ্ছে মানে? এ মার এমন মার যে হজম করা মুস্কিল। মেরে একেবারে তক্তা করে দিচ্ছে। আহা!

ফতে : দুর্মুখ খান, তোমার এই কথা শুনে আমার মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। পানি।

সিপাহ : জনাব, আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের বীর সেনাবাহিনী জান দিয়েও দেশ রক্ষা করবে।

দুর্মুখ : দেশ রক্ষা নয়—বলুন তারা এখন পেট রক্ষায় ব্যস্ত।

ফতে : তার মানে? বেশ খোলাসা করে বলো দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ : তার মানে বুঝলেন না জনাব? আপনার সেনাদল বাংলাদেশের বুকে অভিযান চালাবার নামে নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করেছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুটতরাজ করেছে, ব্যাঙ্ক লুটেছে। এইসব লুটের টাকায় আপনার এক-একজন গরিব সেনা রাতারাতি ক্রোড়পতি বন গিয়া।

ফতে : এ তো আনন্দের বিষয়। খোশ খবর।

দুর্মুখ : কিন্তু নিরানন্দে আপনি তাদের ভাসালেন জনাব আচমকা একশো আর পাঁচশো টাকার নোটগুলোকে কাগজ করে দিয়ে আপনার ওইসব ক্রোড়পতি সেনাদের আপনি একেবারে পথে বসালেন। তারা বলছে, কেল্লা ফতে খান আমাদের পথে বসালেন।

ফতে : সিপাহসালার, এ কথা কি সত্য? এই দেখো মাথাটা আবার—

সিপাহ : আংশিক সত্য জনাব। লুটের টাকা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা পুরো মাইনে না পাওয়াতে মানে ডিফেন্স সারটিফিকেটে মাইনে দেওয়াতে দিলে বড়ই দুঃখ পেয়েছে।

ফতে : কি আর করা যাবে সিপাহসালার। যুদ্ধের ব্যয়, খয়রাতি সাহায্য বন্ধ, ব্যবসা অচল। এই সবে মিলে কোষাগার প্রায় শূন্য। উঃ, মাথাটা কেমন যেন—

সিপাহ : ভাববেন না জনাব। আমাদের সেনারা মাইনে না পেলেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

দুর্মুখ : হ্যাঁ-হ্যাঁ কুছ পরওয়া নাহি হ্যায়। পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় আমাদের স্বনামধন্য লারকানার নবাব নন্দন বলেছিলেন, যদি আমাদের ঘাস খেয়ে বাঁচতে হয় তবু হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। ভাগ্যিস সতেরো দিনে যুদ্ধ থেমেছিল।

সিপাহ : তুমি পরিহাস করছো দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ : এ পরিহাস নয় সিপাহসালার। বাস্তব আর মুখের বজ্র-ঠাণ্ডা বুলি এক নয়। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, আমাদের কিছু সেনা নাকি আর বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ খুন করতে রাজী নয়।

ফতে : ওফ্! মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল!

সিপাহ : বিচলিত হবেন না জনাব। এ নিতান্ত কিছু সেনার মুখের কথা—মনের কথা নয়।

দুর্মুখ : আমাদের বৃদ্ধ সিপাহসালার আজকাল কি তাঁর প্রতিটি সেনার অন্তরের গভীরতম তলদেশ অন্বেষণ করে এ কথা বলছেন? আপনার বীর বেলুচ সেনারা যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা নাকি এখন বলছে, কাফের হত্যার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা যাদের খুন করছি তারা নিরীহ মানুষ, তারা মুসলমান, তারা আমার ভাই।

ফতে : ওফ্—মাথাটা আবার—

সিপাহ : জনাব, আপনার মাথাটাকে অতো ঘোরাবেন না। আপনার প্রেসার আবার বেড়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখুন। সব ঠিক করে দেবো।

ফতে : কি করে আস্থা রাখি টিটিয়া খান! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে বলেছিলেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমিও বিশ্বকে বুক ঠুকে বলেছিলাম, দেখে যান বিশ্ববাসী, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব স্বাভাবিক করে ফেলেছি। কিন্তু কতকগুলো বিদেশী মানুষ এদেশে এসে আপনার জারি-জুরি সব ফাঁস করে দিল। আমার মুখ হাসালেন।

দুর্মুখ : শুধু মুখ হাসালেন না, চোখের জলে লোমশ বুক ভাসালেন। আচ্ছা জনাব, যুদ্ধটা বন্ধ করে দিলে হয় না?

ফতে : কি বললে?

দুর্মুখ : একটু ভেবে দেখুন, আপনার জন্মদাতাও অবশেষে যুদ্ধে ক্ষ্যান্ত দিয়ে নিরালায় বসে আত্মজীবনী লিখছেন আর দিলখুশবাগে পায়চারী করছেন। আপনিও না হয় সব কিছুতে ইস্তফা দিয়ে সাকী আর সুরা নিয়ে খোশ-মহলায় বাকি জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেবেন। কি দরকার এসব ঝুট ঝামেলা!

ফতে : দুর্মুখ খান, তোমার এই ঔদ্ধত্য স্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। রসনা সংযত করো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বহিষ্কার করতে পারি।

দুর্মুখ : পারেন না জনাব। কারণ আমি আপনার হৃদয়ের গভীরে বাস করি। সেখান থেকে আমাকে বিতাড়িত করবেন কি করে!

সিপাহ : জনাব আমি তাহলে এখন চলি।

ফতে : আসুন। তবে হ্যাঁ, স্মরণ রাখবেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চরমভাবে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম আমাদের হারাম।

সিপাহ : আমি আবার বলছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর ক'দিন পর ওদের আমরা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো জনাব।

দুর্মুখ : (হেসে) দেখবেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মিলিত নিঃশ্বাসে আপনারা শেষে উড়ে না যান! নিজেদের গোড়া শক্ত করে রাখবেন।

সিপাহ : এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি চললাম জনাব। খোদা হাফেজ।

ফতে : খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ : জনাব, আমাদের সিপাহসালারের ভীমরতি ধরেছে। ওকে অবসর দিন।

ফতে : আমিও তাই ভাবছি।

নকীব : জনাবে আলা, লারকানার নবাবজাদা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

ফতে : উঃ, লোকটা আবার ঝামেলা করতে আসছে।

দুর্মুখ : সে কি জনাব, বাদশাজাদা আপনার প্যায়ারের দোস্ত। সেই দোস্তকে এখন বরদাস্ত না করার কারণ?

ফতে : যখন প্রয়োজন ছিল দোস্তি করেছি।

দুর্মুখ : আর এখন প্রয়োজন শেষে ছোবড়ার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন এইতো!

ফতে : এইটাই আমাদের নীতি। যাও, নবাবজাদাকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব : জো হুকুম জনাব।

দুর্মুখ : আমি কি চলে যাবো জনাব?

ফতে : না-না-থাক। বুঝলে দুর্মুখ খাঁ, এক এক সময় তোমাকে সহ্য করতে পারি না সত্য, আবার তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে পারি না। আসুন, নবাবজাদা, আসন গ্রহণ করুন। তারপর কি সংবাদ?

নবাব : আমার পক্ষে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা দুঃসাধ্য খাঁ সাহেব। কোনও রকমে ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলছি।

ফতে : কেন?

নবাব : আমার দলের সদস্যরা আজকাল কাবলে তাগাদা শুরু করেছে। তারা বলছে, আমরা এতো তক্‌লিফ করে সদস্য হলাম, আর এখন পর্যন্ত ক্ষুদে উজির হওয়া তো দূরের কথা, মাইনেটা পর্যন্ত পেলাম না!

ফতে : (হেসে) নবাবজাদা বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই ঘোলাটে।

দুর্মুখ : নবাবজাদা সেটা জানেন হুজুর, কারণ ওঁর হাত দিয়েই তো ঘোল ঢালিয়েছেন।

ফতে : দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ : গোস্তাফি মাফ করবেন।

নবাব : খাঁ সাহেব, আপনি আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঠাণ্ডা করেই ক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করবেন।

দুর্মুখ : লাগ ভেল্কি লাগ, চোখে মুখে লাগ।

ফতে : নবাবজাদা, আমার ওয়াদার পূর্বে আপনি আপনার দেশবাসীর কাছে ওয়াদা করেছিলেন, যে আপনার কতো একর জমি যেন গরিবদের মধ্যে দান করবেন। আপনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন?

নবাব : সেটা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ফতে : আর এটাও আমার কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বৈ কি! কারণ—

দুর্মুখ : কারণ, এই দেশ হুজুরের বাপ-দাদার খাশ তালুক না হলেও গোটা মালুকের একচ্ছত্র মালিক উনি।

ফতে : স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান।

নবাব : আমি এসেছি এইজন্যে যে, আজ আপনার কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাবো খাঁ সাহেব।

ফতে : প্রতীক্ষায় থাকুন—ব্যবস্থা হবে।

নবাব : তাতো বুঝলাম। কিন্তু কবে!

দুর্মুখ : ঠিকই তো। এ কথা তো ছিল না!

ফতে : দুর্মুখ খান—

দুর্মুখ : গোস্তাফি মাপ করা হোক জনাব।

ফতে : আর চার মাস অপেক্ষা করুন নবাবজাদা। যদি দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারি, যদি পৃথিবীর মানচিত্রে এ রাজ্যের অস্তিত্ব থাকে—তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সম্পূর্ণ বিমুখ করবো না।

দুর্মুখ : হুজুর পাঠানের বাচ্চা—এক কথার লোক। পাঠান জীবন থাকতে ওয়াদা খেলাপ করে না।

ফতে : নিশ্চয়ই।

দুর্মুখ : অবশ্য নেহাৎ বেকায়দায় পড়ে দু'চারবার বাধ্য হয়ে জনাবকে কথার বরখেলাপ করতে হয়েছে। তবে পৃথিবীর গ্রেটম্যানরা ওসব করেই থাকেন।

ফতে : দুর্মুখ, তোমাকে আমি কোতল করবো। তুমি গাধার বাচ্চা।

দুর্মুখ : হুজুর আমার মা-বাপ। যা বলবেন তাই সত্যি।

নবাব : আমি চলি। আবার আসবো। খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ : লারকানার নবাব নন্দন একটু চটে গেছেন।

ফতে : কুছ পরওয়া নাহি। এই দেখো, আবার মাথাটা ঘুরে উঠল। বাতাস দাও—পানি খাওয়াও।

১৬ জুলাই, ১৯৭১

সিপাহ : কি ব্যাপার দুর্মুখ খান? তুমি একাকী দরবারে বসে যে?

দুর্মুখ : এসেছি একা, যাইবো একা। দোসর নাহিকো আর।

সিপাহ : কাব্য করতেও জানো নাকি?

দুর্মুখ : বাংলায় কিছুদিন ছিলাম। তাই শ্যামল মাঠভরা ধানের বাতাসে হৃদয়ে একটু কাব্য সঞ্চার হয়েছিল সিপাহসালার।

সিপাহ : বাংলাকে তুমি ভালোবাসো?

দুর্মুখ : অমন সোনার বাংলাকে কে না ভালোবাসে জনাব। বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, সোনাঝরা রোদ্দুর প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগায়।

সিপাহ : কই আমার মনে তো কোনও স্পন্দন জাগে না!

দুর্মুখ : সিপাহসালার জীবনে আপনি কোনোদিন হেসেছেন?

সিপাহ : না।

দুর্মুখ : কোনোদিন কেঁদেছেন?

সিপাহ : না।

দুর্মুখ : তবে কি করে আপনার হৃদয়ে স্পন্দন জাগবে? আপনি যে মৃত নক্ষত্রের মতো। হৃদয়টাকে হত্যা করেছেন আপনি।

সিপাহ : না। আমি উল্কার মতো আকাশের বুকে অশুভের বার্তা নিয়ে দেখা দিই। তাইতো আমার ছায়া দেখলে লোকে শিউরে ওঠে।

দুর্মুখ : আমার মনে হয় সিপাহসালার, শৈশবে, কৈশোরে আপনি কারও স্নেহ-ভালোবাসা পাননি। তাই আপনার হৃদয় থেকে স্নেহ, ভালোবাসা শুকিয়ে গেছে। অন্তর বিদ্রোহ করেছে। আচ্ছা সিপাহসালার, আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার এতোটুকু স্নেহ-ভালোবাসা নেই?

সিপাহ : প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ : নিজের স্ত্রীকেও কি কোনোদিন একটু ভালোবেসে—

সিপাহ : দুর্মুখ খান! বেয়াদপি আমি পছন্দ করি না। ভালোবাসা! স্নেহ! মমতা! ওসব হচ্ছে ন্যাকামি, ভাঁড়ামি। আমি ঘৃণা করি ওসবকে। ওই মোহে যারা আচ্ছন্ন তারা বেয়াকুব।

দুর্মুখ : আচ্ছা, আপনি তাহলে কি ভালোবাসেন, সিপাহসালার?

সিপাহ : মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি। রক্ত! মুঠো-মুঠো রক্ত হাতে নিলে আমি আনন্দ পাই—আমার বুকজোড়া তৃষ্ণা নিবারণ হয়—হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগে—স্পন্দন, শিহরণ জাগে।

দুর্মুখ : (হেসে) ইতিহাসের এক নতুন চরিত্র! বিশ্বের বিস্ময়!

সিপাহ : জানো দুর্মুখ, যুদ্ধে মানুষ খুন করলে কোন গুনাহ হয় না। তবে জানি না আমার কিসমৎ আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে।

দুর্মুখ : জাহান্নামে জনাব।

সিপাহ : কি বললে দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ : না, মানে ইয়ে বলছিলাম কি, জনাবের বয়স অনেক হয়েছে, তাই জাহান্নামে যাবার পাসপোর্ট পেতে দেরী নয়! তবে হুজুর, বেহেস্তে যাবেন না। ওখানে আপনি শান্তি পাবেন না। কারণ সেখানে যতসব মহাত্মন ব্যক্তিরা খোদার ধ্যানে মগ্ন। ওসব ন্যাকামিপনা দেখলে আপনার গা খিসমিস করবে—হাত চুলকাবে। তার চাইতে আপনি দোজখবাসী হবেন। সেখানে আপনার অনেক বাপ, দাদা, চাচা, মামুর সাক্ষাৎ পাবেন। আপনি সেখানে গেলে একেবারে দোজখ গুলজার

হবে। কবে যাবেন জাঁহাপনা? আগে থেকে জানাবেন যাতে ঢাকেশ্বরী মিলের ফাইন কাফনের কাপড় আপনার হাতে দিতে পারি। আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে।

সিপাহ : খামোশ কমবক্‌ত্‌।

দুর্মুখ : এইতো আবার চটে যাচ্ছেন। যত বুড়ো হচ্ছেন ততই মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে। শিশুহত্যা, নারীহত্যা করে আপনি যেরকম নাম করেছেন—তাতে মেজাজের মুখে লাগাম না দিলে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবেন।

সিপাহ : আমাকে মারবার সাধ্য কারও নেই।

দুর্মুখ : আছে জনাব—আছে—ওই মাথার ওপরে যিনি বসে আছেন তার মার আপনি রকেট-বোমা দিয়েও ঠেকাতে পারবেন না। সেই মার দুনিয়ার বার।

সিপাহ : আমি কাউকে পরোয়া করি না দুর্মুখ।

দুর্মুখ : আপনি খোদাকে মানেন?

সিপাহ : যাকে দেখি না তাকে মানি না।

দুর্মুখ : তাহলে ইসলাম রক্ষার জন্য বাংলার বুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেন কেন?

সিপাহ : মসনদ, ক্ষমতা রক্ষাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দুর্মুখ : ও! "ইসলাম বিপন্ন—ইসলাম রক্ষা সাচ্চা মুসলমানের ফরজ" ইত্যাদি বজ্রবুলি তাহলে বাষ্প? আসলে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

সিপাহ : বাঁচাতে পারছি কই?

দুর্মুখ : কি বললেন!

সিপাহ : না—কই কিছু না! যাক, ওসব রাজনীতি নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

দুর্মুখ : ২৩ বছর পর এবার সব বুঝেছি। চোখ খুলে গেছে। সূর্যের আলোর মতো সব ঘোর কেটে গেছে।

সিপাহ : তুমি বড় চালাক দুর্মুখ খান। তোমার বুদ্ধির প্রখরতায় এক এক সময়—যাক, চলো জাঁহাপনার মন্ত্রণা কক্ষে যাওয়া যাক।

দুর্মুখ : সে কি জনাব, আমাকে আপনি সহ্য করতে পারেন না অথচ আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে জাঁহাপনার সামনে হাজির হতে চান? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তো সিপাহসালার!

সিপাহ : না মানে, তুমি দরবারে না থাকলে দরবার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

দুর্মুখ : যাক, তাহলে এতদিন পরে আমার অস্তিত্বটুকুকে স্বীকার করলেন। সত্যিই আমি যে কি আনন্দিত সিপাহসালার যে, এই মুহূর্তে আপনার মৃত্যু হলে এতো আনন্দিত হয়তো হতে পারতাম না।

সিপাহ : দুর্মুখ খান! বেয়াদপ— বেতমিজ—

দুর্মুখ : ক্ষ্যাপা কুকুরটা বিদায় হলো তাহলে। খোদা, তোমার দুনিয়া থেকে এই আবর্জনাগুলোকে তুমি সরিয়ে নাও। নইলে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত

মানুষ তোমাকে অভিশাপ দেবে। তোমার আরশ কেঁপে উঠবে। এ্যায় পরওয়ার-দিগার, তুমি রহমানুর রাহিম। রহম করো—নিরীহ, নিষ্পাপ বঙ্গসন্তানদের প্রতি তুমি রহম কর। ওরা সত্য, ন্যায়ের পূজারী। ওরাই তোমার সৃষ্টির গর্ব। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরাত্মা যেখানে অত্যাচারিত নির্যাতিত, সেখানে কেন তুমি নিশ্চুপ।

নবাব : দুর্মুখ খান—

দুর্মুখ : এই যে আসুন নবাবজাদা!

নবাব : জাঁহাপনা কোথায়?

দুর্মুখ : মন্ত্রণা কক্ষে।

নবাব : কেউ কি মন্ত্রণা কক্ষে গেছে?

দুর্মুখ : জী হ্যাঁ। ত্রিরত্নের এক রত্ন এইমাত্র অন্দরে গেলেন, এবার আপনি গেলেই ত্র্যহস্পর্শ।

নবাব : কোন গোপন শলাপরামর্শ হচ্ছে নাকি?

দুর্মুখ : (হেসে) আজ তেইশ বছর ধরেই তো এই দরবারের মন্ত্রণা কক্ষে কতো চক্রান্তের জাল জন্ম নিল—আবার ভাঙলো—আবার গড়লো। মাকড়শার মতো এই দরবার জালে ছেয়ে গেছে। তাইতো নিজেদের জালে নিজেরা ফেঁসে গিয়ে এখন আর পালাবার পথ পাচ্ছে না।

নবাব : তুমি বড় বাজে কথা বলো।

দুর্মুখ : মাঝে মাঝে একটু চরম সত্যি কথা না বললে মুখটা কেমন যেন তেতো তেতো লাগে।

নবাব : আমার হাতে ক্ষমতা আসলে আমি তোমাকে একটা মন্ত্রিত্ব দেবো। দু পয়সা পাবার লাইন ধরিয়ে দেবো।

দুর্মুখ : সাবাস নবাবজাদা—সাবাস! গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে নিজের পেট বাঁচান নবাবজাদা।

নবাব : আমি অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি দুমুর্খ খাঁ।

দুর্মুখ : ওসব ধাতু ছাতু হয়ে যাবে নবাবজাদা। সত্যিই, আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করলে আমার মরা কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করে।

নবাব : কেন? কেন? কাঁদার কি আছে!

দুর্মুখ : কাঁদবো না! জাঁহাপনা আপনার গলার দড়ি ধরে ডুগডুগি বাজালেন। দর্শকের সামনে আপনি লেজ নেড়ে নাচলেন, ডিগবাজী খেলেন, খেল্ দেখালেন। তারপর ভাঙ্গা থালা হাতে করে দর্শকের পায়ে হাত দিয়ে পয়সা নিয়ে জাঁহাপনাকে দিলেন। জাঁহাপনা মুচকি হেসে পকেটে সব পয়সা পুরলেন—আর আপনি বসে বসে এখন গায়ের উকুন বাছছেন—আর এক টুকরো কলার জন্যে জাঁহাপনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। এদিকে লোকে আপনার পেছনে কাঠির খোঁচা দিয়ে মজা লুটছে—আর আপনি দাঁত খিচুচ্ছেন। এইতো পরিণাম!

নবাব : খামোশ বেয়াদপ। তোমাকে— তোমাকে আমি—

দুর্মুখ : আহা—আপনার এ্যালকোহলি চেহারা লাল হয়ে গেল। রাগ করবেন না নবাবজাদা, একটু ঠাট্টা করলাম মাত্র।

নবাব : তুমিই কি এই মন্ত্রণা কক্ষের দ্বাররক্ষী?

দুর্মুখ : না জনাব, আমি হৃদয়ের দ্বাররক্ষী! হৃদয়ের বদ্ধ দরজা আমি খুলে দিয়েছি।

নবাব : উন্মাদ! যতোসব উন্মাদ—

দুর্মুখ : নবাবজাদাও মন্ত্রণা কক্ষে চলে গেলেন। আমি উন্মাদ! কিন্তু তোরা—তোরা কি? তোরা জল্লাদ। তাই এ জল্লাদের দরবার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। (Change Over)

॥ মন্ত্রণা কক্ষ ॥

ফতে : শুনুন সিপাহসালার টিটিয়া খান, শুনুন লারকানার নবাবজাদা, পিন্ডির মসনদ আজ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে চলেছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহীরা আমাদের লক্ষ করে একের পর এক তীর ছুঁড়ছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহের না—যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে আমার কোষাগারে। আপনারাই বলুন, এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

দুর্মুখ : (স্বাগত) আহত মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র শেয়াল আর বেড়ালের কাছে যুক্তি চাইছে। হাসি পায়।

সিপাহ : আমাদের আহাম্মুখ খান, চিটজাদা কি উপদেশ দিচ্ছেন?

ফতে : ও ব্যাটাদের মাথায় কিছু আছে নাকি! বাঁদরের বাচ্চারা আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়ে এখন জিব চাটছে।

দুর্মুখ : না জনাব। ওদের গোঁফ-দাড়িতে এখন কাঁঠালের আঠা জড়িয়ে গেছে। তাই এখন ঘরের কোণে বসে কাঁঠালের আঠা ছাড়াচ্ছে।

নবাব : অনেকটা সত্য। ওদেরই জন্যে রাজ্যের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে ভেঙ্গে পড়েছে।

ফতে : সিপাহসালার বাংলাদেশে খাজনা-কর আদায় কেমন হচ্ছে?

সিপাহ : আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি জনাব।

দুর্মুখ : কিন্তু কোনোই ফয়দা হচ্ছে না। কারণ বাংলার দামাল ছেলেরা সব তহসিল অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। কার বাপের সাধ্য যে বোমা খাবার জন্যে খাজনা আদায় করতে যাবে!

সিপাহ : দুর্মুখ খান, অবান্তর কথা বলে জাঁহাপনাকে অসুস্থ করে তুল না।

দুর্মুখ : কবে কখন জাঁহাপনা সুস্থ, প্রকৃতিস্থ থাকেন সিপাহসালার!

ফতে : খামোশ দুর্মুখ খান। এটা মন্ত্রণা কক্ষ।

দুর্মুখ : এই মন্ত্রণা নিয়েই তো আপনার যত যন্ত্রণা।
ফতে : সিপাহসালার মাশরেকী বাঙ্গাল থেকে পাট বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা করলেন?
দুর্মুখ : পাট সব লোপাট জনাব।
ফতে : তার মানে?
দুর্মুখ : জনাব, বাংলার ওই বিদ্রোহী নেকড়েগুলো আপনার পাটের গুদামগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে—কারণ, আপনারা যাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে অস্ত্র কিনতে না পারেন। তাছাড়া বাংলার মুক্ত অঞ্চলের যাবতীয় পাট বাংলাদেশ সরকার ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানী করছেন। ওই পাট দিয়েই আপনাদের সাট করার ব্যবস্থা হচ্ছে।
ফতে : দুর্মুখ খান! উঃ মাথাটা আবার ঘুরে উঠল।
সিপাহ : দুর্মুখের কথায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন না জনাব। এবার মাশরেকি বাঙ্গালে পাট খুব কম পয়দা হয়েছে।
ফতে : নসীব—সবই বদনসীব সিপাহসালার। বিপদ যখন আসে তখন চারিদিক দিয়ে আসে।
দুর্মুখ : আলবৎ। খোদা যখন দেন তখন একেবারে ছাপ্পর ফাড়কে দেন। আর যখন মারেন, তখন পানি খাবারও সময় দেন না।
ফতে : উঃ, পাঁচ ডিভিশন সৈন্য দিয়েও আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না সিপাহসালার! অথচ বোমাবাজ টিটিয়া খানের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল।
দুর্মুখ : বোমাবাজ, খড়িবাজ যাকেই পাঠান—বাংলা মুলুকে গিয়ে সবাই ডিগবাজী খাবেন। কারণ আল্লাহ খোদ মদত করছেন বাঙালিদের। তাইতো বীর প্রসবিনী বাংলা আজ ধন্যা।
ফতে : ওফ্—বাংলা—বাংলা—বাংলা! সিপাহসালার বাংলাকে আপনি পোড়ামাটি করে দিন। মৃতদেহের ভাগাড়ে পরিণত করুন মাশরেকি বাংলাকে। কুকুর-শেয়ালের সামনে বাঙালিদের লাশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন।
দুর্মুখ : চমৎকার।
সিপাহ : অবশেষে তাই করবো আলমপনা। আমি টিটিয়া খান—আমার রোষানলে সব ভস্মীভূত হবে। পুড়িয়ে দেবো বাংলার মাটি, জ্বালিয়ে দেবো ক্ষেত-খামার। বাংলার মাটিকে আমি বন্ধ্যা করে দেবো।
দুর্মুখ : আপনার মাথার ওপর শকুন উড়ছে সিপাহসালার!
সিপাহ : দুর্মুখ খান।
নবাব : দুর্মুখ ঠিকই বলেছে সিপাহসালার। বিদ্রোহ শুধু বাংলার মানুষের মধ্যে নয়—বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে।
ফতে : আপনি আমার সৈন্যদের ভেতরের খবরও রাখেন নাকি নবাবজাদা!

নবাব : নিশ্চয়ই। চোখ-কান আমার সদা সজাগ। খাঁ সাহেব হয়তো জানেন না যে, ইতিমধ্যে আমাদের "ম্যাসাকার বাহিনী" বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে পালাচ্ছে—আত্মসমর্পণ করছে—আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে।

ফতে : তারপর—তারপর নবাবজাদা?

নবাব : শুধু তাই নয়, আমাদের বেলুচ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এমন কি আমাদের সৈন্যদলের কিছু অধিনায়ক তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছেন খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ : তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কিত্ কিত্ খেলা শুরু করবো। আগেই বলেছি, কাকের মাংস কাকে খায়। তাইতো বলছি আলমপনা, আপনাদের মাথার ওপর শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা সাবধান!

ফতে : এদিকে ভারত আমাদের সামনে বিরাট মহীরুহ। যুদ্ধের হুমকি দিয়েও ফয়দা হ'ল না। এই জাতশত্রুকে খতম করতে না পারলে—

দুর্মুখ : ভারত অস্ত্র শানিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবার জন্যে বসে আছে। মার আমরা খাবো ঠিকই—তবে তারা মলম লাগিয়ে দেবে বলেছে।

ফতে : অসহ্য—অসহ্য! সিপাহসালার, অবিলম্বে ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করুন। যুদ্ধের দামামা বাজান। যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই। হয় উত্থান—না হয় পতন। হয় ইতিহাসের মানচিত্রে আমরা টিকে থাকবো—না হয় মুছে যাবো। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সিপাহ : কিন্তু জাঁহাপনা—

ফতে : এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। বাঁচা কিম্বা মরা, দুটোর একটা বেছে নিন। মাশরেকি বাঙ্গালকে কব্জায় আনতে হলে, ভারত আক্রমণ ছাড়া অন্য উপায় আর নেই সিপাহসালার। এ কি আপনার মুখটা অমন ছাইয়ের মতো, অমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন! যান, মুখে পানির ছিটে দিয়ে বিছমিল্লাহ বলে অগ্রসর হোন। আর নবাবজাদা, আপনিও বিদায় গ্রহণ করুন।

সিপাহ : খোদা হাফেজ।

ফতে : খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ : উফ্! দুই রাহু বিদায় হলো। আলমপনা, আপনি একটা অষ্টধাতুর মাদুলী গলায় বাঁধুন। যে ভাবে শনির দল আপনাকে ঘিরে ধরেছে—

ফতে : দুর্মুখ! তোমার ওসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগছে না। যক্ষ্মার বীজাণুর মতো কে যেন সর্বদা আমার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সারা শরীরে যেন শক্তি পাচ্ছি না। একটা দাহ, বুঝলে দুর্মুখ, কিসের যেন একটা দাহ আমাকে সর্বদা পুড়িয়ে মারছে। জ্বলে যায়—আমার সর্বশরীর জ্বলে যায়।

দুর্মুখ : কিসের দাহ জানেন না? শিশুহত্যা, নারীহত্যার গুনাহ। ওদের অভিশাপের দাহ আপনাকে দগ্ধ করছে। এর কোনও দাওয়াই নেই জনাব। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

ফতে : শিশুহত্যা—নারীহত্যা। হ্যাঁ—মানুষের বাচ্চাগুলোকে আমি খুন করেছি—নারীর ইজ্জত লুটেছি—হত্যা করেছি। আমি খুনী—আমি জল্লাদ—আমি বেঈমান। দেখে যাও— দেখে যাও বিশ্ববাসী। আমি নিরীহ বাঙ্গালির লহুতে রক্তস্নান করেছি—বাঙালিদের লাখো লাশের ওপর বসে আমি মসনদী করছি। আমি বিশ্বের বিস্মরণ—আমি মহাত্রাস—আমি জল্লাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জল্লাদ—আমি খুনী—আমি কশাই। হা-হা-হা-আরও রক্ত চাই—আরও রক্ত চাই—আমি রক্তবীজ—আমি রাক্ষস—হা-হা-হা-হা...

দুর্মুখ : নাটক জমে উঠেছে যবনিকার আর দেরী নেই। তারপর নতুন পালা শুরু।

. আগস্ট, ১৯৭১

॥ বাদশা কেল্লা ফতে খান হাসছেন ॥

দুর্মুখ : আলমপনা, সকাল থেকে আপনি শুধু হাসছেন। এ এক আশ্চর্য পরিবর্তন।

ফতে : কেন হাসছি বল তো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ : অনেক রকম হাসি আছে জনাব। আনন্দের হাসি, দুঃখের হাসি, শয়তানের হাসি—

ফতে : আমার হাসি শুনে কি মনে হচ্ছে তোমার?

দুর্মুখ : ইথারের বুকে কান পাতলে এমনি অনেক অট্টহাস্য শুনতে পাই। সুলতান মামুদ, নাদির শা, চেঙ্গিস, হিটলার সকলে বোধ করি এইভাবেই হাসতেন।

ফতে : রাজা-বাদশারা এইভাবেই হাসে মুর্খ।

দুর্মুখ : কিন্তু জাঁহাপনা, কোনোদিন কি মায়ের হাসি দেখেছেন? যখন মায়ের কোলে শিশুর মধুর হাসিমুখ দেখে বুক ভরে যায়? কোনোদিন কি রাস্তার ওই উলঙ্গ ছেলেটার মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখেছেন? দেখেছেন কি গ্রাম-বাংলার কৃষকের প্রাণের খোলা হাসি? না, দেখেননি। কারণ সেইসব হাসি আপনি কেড়ে নিয়েছেন।

ফতে : বাংলা—মাশরেকি বাঙ্গাল। শোন দুর্মুখ খান, বাংলার মানুষের মুখের হাসির চাইতে সেখানকার জমিন আমার কাছে—

দুর্মুখ : জানি জনাব, বাংলাদেশটা আপনাদের কাছে সোনার থালা, আর বাঙালিদের কাছে বাংলা ওদের মা। সেই মাকে কোনোদিন কি আপনি ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন?

ফতে : দুর্মুখ, বাদশা কেল্লা ফতে খান যেখানে থাবা চালায় সেখান থেকে খালি মুঠি কোনোদিন ফিরিয়ে আনেন না। আর খোদা না খাস্তা যদি বাংলাদেশ আমার হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে গোটা বাংলাদেশটাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত করবো। এই আমার কসম।

দুর্মুখ : জনাব, শুনি নাকি ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই নতুনের ভিত্তি রচিত হয়। আশ্চর্য সাহস ওই বাংলার দামাল ছেলেগুলোর—এখনও সিংহের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

ফতে : ওই বিদ্রোহীরা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমার নিদ হারাম করেছে। কিন্তু কম্‌বক্‌ত্‌রা জানে না বাদশা কেল্লা ফতে খান জিন্দেগীর চলার পথের কোন কাঁটাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি—বরঞ্চ দু'পায়ে দলে গেছে!

দুর্মুখ : জনাব, শুনি নাকি বাংলাদেশের পথে কাঁটার চাইতে কাদা বেশি। সেই হাতি এবার কাদায় পড়েছে জাঁহাপনা।

ফতে : তার অর্থ?

দুর্মুখ : আলমপনা, দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হতে চললো, আপনার জবরদস্ত বীর জোয়ানরা স্বাধীনতাকামী ছেলেগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারল না। এদিকে ওই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আরও শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ হচ্ছে। আমাদের সৈনিকরা বুকে থাবা মেরে এগিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু পরক্ষণে মাজা ভেঙ্গে ছাউনীতে ফিরছে। কেউ আবার নাড়িভুড়ি এলিয়ে চিতোচ্ছে। আহা রে, আমাদের সোনার চাঁদ সেপাহীদের রক্তাক্ত দেহ দেখে—(কান্নার সুর কণ্ঠে)

ফতে : কেঁদো না— কোঁদো না দুর্মুখ খান। আমার মাথা ঘুরছে। এ্যাই-দাওয়াই কা বোতল লে আও।

দুর্মুখ : অতো দাওয়াই খাবেন না জনাব। এমনিতেই ভুল বক্‌ছেন—আবার ঘন ঘন দাওয়াই পেটে পড়লে, একেবারে ক্ষেপে যাবেন জনাব।

ফতে : খামোশ কমবক্‌ত্‌! তমিজ-সে বাত করো!

দুর্মুখ : বড় দুঃখে বলি জনাব। আমার বুকটা দুঃখে জার জার।

ফতে : বেচায়েন হয়ো না দুর্মুখ খান। যুদ্ধের সাফল্যের ওপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ক্রুর রাজনীতি আমার হাতিয়ার।

দুর্মুখ : মেহেরবানী করে বান্দাকে যদি একটু খুলে বলতেন—

ফতে : শোন দুর্মুখ— গোলা, বারুদ, সুরা নারী আমার জীবনের সবচে' পেয়ারা চিজ। মাগার পিন্ডির এই তক্তে তাউস আমাকে ছাড়ল না। উনসত্তরের বাংলা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল। সেই বাংলার জনতার জ্বলন্ত লাভা আছড়ে পড়ল পিন্ডির মসনদে। কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাঙ্গালিদের বঙ্গবন্ধু।

দুর্মুখ : জানি জনাব। এবং সঙ্গে সঙ্গে মসনদ চ্যুত হলেন আপনার ধর্ম-আব্বা হুজুর জনাব খানে খান বেকুব খান।

ফতে : উত্তাল তরঙ্গে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে এই তক্তে তাউস। আমি হাল ধরলাম। ছলনা আর মিষ্টি কথার অস্ত্র প্রয়োগ করে অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে ওই বঙ্গবন্ধু মানুষটার মধ্যে এতো আগুন আছে। আগে যদি জানতাম, তাহলে নির্বাচনের প্রহসন করতে গিয়ে—

দুর্মুখ : সং সেজে বুক চাপড়াতে হতো না।

ফতে : তবু আমি বঙ্গবন্ধুকে প্রলোভন দেখালাম—ছলে বলে বশ করার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আজ পর্যন্ত মানুষটাকে নীতিচ্যুত করতে পারলাম না। তাই চাঁদির জুতো ফেলে চামড়ার জুতো চালালাম। কিন্তু—

দুর্মুখ : কিন্তু সেই জুতো যে ফিরে এসে আপনার মুখে পড়বে তা কি আর ভেবেছিলাম জনাব!

ফতে : দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ : গোস্তাফি মাফ করবেন জনাব। আচ্ছা আলমপনা, এখন আপনার এই খাশ তালুক রক্ষার কি ব্যবস্থা করছেন?

ফতে : শোন, আমি নিজেই একটা আইন তৈরি করছি। আর সেই আইন মোতাবেক আমিই হবো এই তক্তে তাউসের একচ্ছত্র অধিপতি।

দুর্মুখ : একেই বলে রাজ-রাজড়ার মাথা!

ফতে : আরও শোন, আমার ওইসব পোষা কুকুর যারা একটুকরো মাংসের জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ সর্দার, বেঈমান হতে পারে—তাদের আমি নফর করবো। বিশ্ব দেখবে, আমার ছত্রচ্ছায়ায় গণপ্রতিনিধিরাই রাজ্যভার গ্রহণ করেছে।

দুর্মুখ : মারহাব্বা—মারহাব্বা, জনাব! আপনাকে যে মা গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি সত্যিই বিশ্বের বিস্ময়!

ফতে : কেমন লাগলো পরিকল্পনা?

দুর্মুখ : অদ্ভুত জনাব—অদ্ভুত! আমি শুধু ভাবছি, এতো বুদ্ধি নিয়ে আজও আপনি বেঁচে আছেন কি করে।

ফতে : (হেসে) সত্যিই তুমি রসিক পুরুষ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ : একটা ছোট্ট গল্প বলি জনাব। বিয়ে-পাগলা এক মূর্খব্যক্তি স্থির করল সে এক ধনীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবে। কিন্তু দুর্ভগ্য, এই মূর্খকে কোনো মেয়েই পছন্দ করল না। অবশেষে এই মুর্খ রাগে দুঃখে তার বুড়ি মাকে বললো—মাগো, আমার বিয়া আমি আর দেইখ্যা যাইতে পারুম না।

ফতে : (উচ্চৈস্বরে হাসলেন) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—[আচমকা হাসি বন্ধ করে ক্রোধে] অ্যাঁ! কি বললে, দুর্মুখ খান! বেহুদা বততামিজ, কমিনে- -নিকাল যাও—[গর্জে উঠলেন] উঃ মাথাটা আবার—

নবাব : বন্দেগী খাঁ সাহেব।

ফতে : আসুন লারকানা নবাবজাদা। কি সংবাদ?

নবাব : আমার কিছু বক্তব্য আছে খাঁ সাহেব।

ফতে : আমিও কিছু বলতে চাই নবাবজাদা। শুনছি, ইদানীং আপনি নাকি আমার কার্যের সমালোচনা করছেন?

নবাব : আমার দলের স্বার্থে—

ফতে : উফ—স্বার্থ—স্বার্থ! শুনুন নবাবজাদা, আমি এসব পছন্দ করি না।

নবাব : খাঁ সাহেব কি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন?

ফতে : না নবাবজাদা। কার ওপর ক্ষুব্ধ হবো? আপনারা যে আমার ভাই—অতি আপনার জন। আমার সততা, সারল্যকে—

দুর্মুখ : নবাবজাদা জনাবকে ভালোভাবেই চেনেন। আমাদের আলমপনা সারল্যে শিশু, মহসীনের ন্যায় দয়ার সাগর—সততায় ইয়ের মতো আর কি।

ফতে : নবাবজাদা—এই মসনদ, এই গুরুভার আমি বইতে পারছি না। আপনাদের বৃহত্তর স্বার্থে এই রাজদণ্ড আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সময় আসলে এই মসনদের সব আপনাদের হাতে অর্পণ করে—

দুর্মুখ : জনাব আবার রংমহলায় ফিরে যাবেন।

ফতে : না, আমি মক্কা শরীফে যাবো।

দুর্মুখ : (স্বগত) এই বারেই কানা মরেছে।

নবাব : কিন্তু আমার দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না খাঁ সাহেব।

ফতে : তাঁদের ইচ্ছার ওপর আমার রাজকার্য নির্ভর করে না।

নবাব : যদি তাঁরা বিদ্রোহ করে?

ফতে : তাহলে বাংলার মানুষের মতো তাদের কলিজাগুলো ছিঁড়ে আনা হবে।

দুর্মুখ : (স্বগত) একেই বলে কাকের মাংস কাকেই খায়।

নবাব : জাঁহাপনা, শক্তির আতিশয্যে আপনি ভুল পথে চলছেন।

ফতে : (হেসে) জীবনের পাশাখেলায় আমি কোনোদিন হারিনি নবাবনন্দন। পশ্চিম খণ্ডে যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে আপনি—না-না-আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা, ভরসা আছে নবাবজাদা। কারণ—

দুর্মুখ : কারণ কাকের বাসাতেই কোকিলের বাচ্চা মানুষ হয়ে কু-কু করে ডাকে।

নবাব : জাঁহাপনা, আমি একা কি করবো? বাংলার মাটিতে আগুনের লেলিহান শিখা, সিন্দুর আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, পাঞ্জাবের বাতাসে পুঞ্জীভূত অস্ফুষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনি—দারুণ অর্থসংকট, ব্যবসা, বাণিজ্য, কল-কারখানা সব বন্ধ। এতগুলো সমস্যা—

ফতে : উঃ সমস্যা—সমস্যা—সমস্যা। এতোগুলো সমস্যা সমাধান আমার এক চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্মুখ : ভাববেন না জনাব। মাথার ওপর আমাদের মামারা আছেন, দুর্যোগ কেটে যাবে। নাকের বদলে নরুন পাবো— সেই ভালো। নবাবজাদা তো এখন থেকেই "চীন-মার্কিন" ভাই ভাই বলে চেঁচাচ্ছেন।

ফতে : কি লাভ। আমি এতো করে আমার মার্কিন বন্ধুকে দিয়ে পূর্ববাংলার সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব করলাম, কিন্তু আমাদের শত্রু ভারত-সম্রাজ্ঞী অমনি কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করল।

দুর্মুখ : জনাব, আমি বলি কি, এতোসব ফন্দিফিকির না করে একেবারে চোখকান বুঁজে বিসমিল্লাহ্ বলে ভারত আক্রমণ করে ফেলুন।

নবাব : আমি তোমার সঙ্গে একমত দুর্মুখ খান।

সিপাহ : বন্দেগী জাঁহাপনা। আমিও একমত এদের সঙ্গে।

ফতে : কিন্তু সিপাহসালার কোথায় দাঁড়িয়ে, কিসের ভরসায়, কি নিয়ে যুদ্ধ করবেন? বাংলার জমিন, বাংলার মানুষ ওই হাজার হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের শত্রু। এদিকে— কোষাগার শূন্য, চার মাসের যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র সৈন্য আমরা হারিয়েছি। তাই ভেবে দেখুন, ঘরের শত্রুর পাশে দাঁড়িয়ে, ভুখা শরীরে, খালি হাতে ভারতের ন্যায় শক্তিশালী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বাতুলতা।

দুর্মুখ : যথার্থ বলেছেন জনাব। দীর্ঘ চার মাস ধরে আমাদের বীর সেনানীরা কতকগুলো ডানপিটে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার রাজধানী ঠেকাতে পারছে না। আর—

সিপাহ : তাহলে জাঁহাপনা, আপনি আপাতত ভারতকে একটা কড়া হুমকি দিন। তাতে দুটো সুফল হবে। এক, যদি বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে বাংলার কিছু জমি দখল করে, তাহলে আমরা বিশ্বকে জানাবো ভারত আমাদের ভূখণ্ড জোর করে দখল করেছে। আর দ্বিতীয়ত, ভারত-সম্রাজ্ঞী নারী। আপনার ন্যায় সিংহপুরুষের হুঙ্কারে অবশ্যই ভীত হবে।

দুর্মুখ : (হেসে) ভারত-সম্রাজ্ঞী জানেন যে, ফাঁকা কলসীর আওয়াজ বেশি।

ফতে : খামোশ বেয়াদপ। ঠিক আছে টিটিয়া খান, আপনার যুক্তিমতোই ভারতকে একটা হুমকি দিন। সেই সঙ্গে এটা জানিয়ে দিন, এবারের যুদ্ধে আমরা একা নই। হুঁসিয়ার।

দুর্মুখ : আপনার হুংকারে ভারত-সম্রাজ্ঞী একটু মিচকি হাসবে জনাব। বিশ্ব জানে আপনার ভীমরতি ধরেছে।

ফতে : দুর্মুখ খান! সিপাহসালার যুদ্ধের খবর বলুন।

সিপাহ : আমাদের বীর সৈন্যরা বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে জনাবে আলা।

দুর্মুখ : তা—ঠিক। তবে মাঝে মাঝে কমবক্ত বাঙালি ছেলে-ছোকরারা ঢাকার বুকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, গ্যাসঘাঁটি উড়িয়ে দিচ্ছে। শহর-গ্রামে রেললাইন সেতু, রাস্তাঘাট, সামরিক ছাউনী গুড় ম-ফটাস্ হয়ে যাচ্ছে। জনাবের ভুঁড়িয়াল সৈন্যরা, পোষ্যপুত্রেরা মাঝে মাঝে জিব বার করছে। সে এমন কিছুই নয়। সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ফতে : উফ! মাথাটা আবার ঘুরছে।

দুর্মুখ : ঘাবড়াবেন না জাঁহাপনা। আপনার নতুন চালানের সামান্য কিছু সৈনিক বিদ্রোহ করলেও—সব ঠাণ্ডা, সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে জনাব।

ফতে : সত্যই কি সব স্বাভাবিক টিটিয়া খান?

সিপাহ : আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন আলপনা। ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করতে পারলেই—

ফতে : কেন? ওদেশের ব্যবসাদাররা দোকান খুলছে না?

দুর্মুখ : সব ভাগল-বা জনাব।

সিপাহ : তবে আমি এক নয়া এলান জারি করেছি জনাব। এক সপ্তাহের মধ্যে কেউ যদি তার দোকান না খোলে তাহলে সেই দোকানে আমরা নিজেদের লোক বসাবো।

নবাব : নিজেদের লোক মানে?

দুর্মুখ : মানে জনাবের ওইসব জারজ সন্তানদের—মানে আর কি জনাবের খাস তালুকের খাস আদমীদের বসানো হবে।

নবাব : সে কি ভালো হবে টিটিয়া খান সাহেব?

সিপাহ : ভালো-মন্দের বিচার এখন রাখুন। বাঁচার কথা ভাবুন নবাব সাহেব। ওই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা না করা পর্যন্ত—

ফতে : হাঁ, বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। ভেবেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করলে বিদ্রোহের আগুন নিভে যাবে। কিন্তু আগুন আরও জ্বলো। এবার বাঙ্গালির দরদী বন্ধুকে খতম করতে হবে। জানিয়ে দিন বিশ্ববাসীকে—বঙ্গবন্ধুর বিচার করা হবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিতে হবে।

দুর্মুখ : জনাব, গোস্তাফি মাফ করবেন। বঙ্গবন্ধুকে খতম করলে বীর প্রসবিনী বাংলা বীরশূন্য হবে না। আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধু—প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা এক-একজন সিপাহসালার। কটা বঙ্গবন্ধুকে খতম করবেন জনাব? একটি মশাল থেকে আর একটি মশাল জ্বলে উঠেছে। হাজারো হাতের উদ্যত শাণিত তরবারী পিন্ডির মসনদ লক্ষ করে ছুটে আসছে। কি দিয়ে তাদের গতিরুদ্ধ করবেন?

ফতে : স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। এ কি? দরবার এতো অন্ধকার কেন? কিসের যেন আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। কারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। ঐ, ঐ—জনতার স্রোত, গলিত লাভা এদিকে ছুটে আসছে।

আগুন, আগুন! বন্ধ করো—সিংহদ্বার বন্ধ করো। আলো, আলো—আরও আলো জ্বেলে দাও। উঃ—

নবাব : জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—

ফতে : জাঁহাপনা মূর্ছা গেছেন। পিন্ডির মসনদ, তুমিও একদিন মুক্তিকামী জনতার পায়ের তলায় গুঁড়া হয়ে যাবে। মহাকাল, ইতিহাস—শুধু তোমরা সাক্ষী থেকো।

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

নবাব : পিন্ডির মসনদ, অপেক্ষা করো—আমি আসছি। তোমার কলঙ্কিত জীবনের হবে অবসান। আমার এতোদিনের প্রতীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত। অনাগত দিনে তুমি আমাকে পেয়ে প্রাণ পাবে—ধন্য হবে। যে করে যেমনভাবে হোক তোমাকে আমার চাই।

ঈমান : (ইকো) হা-হা-হা—হা-হা-হা—

নবাব : কে? কে?

ঈমান : সিন্ধুর কুলাঙ্গার—পাকজাঁহার বেঈমান লারকানার নবাবজাদা, সিংহাসনের পানে একদৃষ্টে চেয়ে কিসের সুখস্বপ্ন দেখছো?

নবাব : কে! কে তুমি অদৃশ্য পুরুষ?

ঈমান : (ইকো) আমি ঈমান। তুমি আমাকে চেনো না। কারণ বেঈমান, শয়তান তোমার দোস্ত। আমি ন্যায়, আমি সত্য, সুন্দর। আমি নিয়ম—আমি বিবেক—আমি মানবতা! কোনোদিন আমাকে চিনবার চেষ্টা করেছো কি?

নবাব : না। ওসব নিয়ে নির্লিপ্ত থাকার সময় আমার নেই। আমি আমার দেশের কথা ছাড়া—

ঈমান : (ইকো) দেশ! হা-হা-হা! সুন্দর শয়তান, মানুষ তোমাকে কতো রূপেই না দেখলো। দেশ! দেশের জন্য কি করেছো আর করছো তা একবার ভেবে দেখেছো কি! স্বার্থের নামী জুয়াড়ী তুমি। দেশকে জুয়ার বাজিতে এনেছো। দেশের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো! আসলে তুমি, পাকিস্তান সামরিক জান্তার এক উগ্রদলের হাতের পুতুল। মিলিটারি ব্যুরোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ভাড়াটে কণ্ঠ তুমি।

নবাব : না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—আমি গণতন্ত্র চাই।

ঈমান : (ইকো) মিথ্যা কথা। তুমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নও। ওটা তোমার পোশাকী কথা। তুমিই বলেছো, পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু। মানে পাঞ্জাবের সামরিক গোষ্ঠী। তুমি যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে—তাহলে বলতে পাকিস্তানের প্রাণ তার জনগণ। আর সেই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস বাংলায়। অতএব বাংলাদেশই হচ্ছে পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড।

নবাব : আমি স্বীকার করি না।

ঈমান : (ইকো) তা জানি। স্বীকার করার সৎসাহস তোমার নেই। কার এক অশুভ লগ্নে, রাজনীতিতে তোমার হাতেখড়ি। আর সেই থেকেই তোমার পিপলস পার্টি জন্ম থেকেই সামরিক জুন্তার শক্তিশালী অংশের তাঁবেদার। আর আজ যে পিন্ডির বাদশার মুখের পানে চেয়ে আছো—সেই বাদশাও সামরিক জুন্তার ভৃত্য মাত্র। আমি জানি, এই সামরিক গোষ্ঠীর অস্ত্র হিসাবে তুমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে ঝড় ডেকে আনলে—বাঙালি রক্ত নেবার জন্য পিন্ডির বাদশাকে সহযোগিতা করলে।

নবাব : না-না-এসব মিথ্যা! আমি কারো খেলার পুতুল নই। আমি যা কিছু করছি—আমার দেশের স্বার্থের জন্য। বাংলার মানুষের ঔদ্ধত্য আমি বরদাস্ত করিনি কোনোদিন—করবোও না।

ঈমান : (ইকো) ক্ষমতালিপ্সু, অন্ধ তুমি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো, ক্ষমতার স্বাদ কেমন তা বুঝতে পারলে না। কত রঙ্গই না দেখাচ্ছো। তুমি কি ভেবেছো, পিন্ডির এই মসনদ কেল্লা ফতে খান সাগ্রহে তোমার হাতে তুলে দেবেন?

নবাব : শাহানশা ওয়াদা করেছেন।

ঈমান : (ইকো) ওয়াদা! বিশ্বের সেরা নরঘাতী দানবের ওয়াদা! চমৎকার! তাই বুঝি পিন্ডির বাদশার পেয়াদা হয়ে পিকিং দৌড়েছিলে?

নবাব : অনেকটা তাই। কারণ বিশ্বের কোনও বৃহৎশক্তির সমর্থন না পেলে মসনদ বিপদমুক্ত হবে না।

ঈমান : কিন্তু কি পেলে? চীনের নীতির পটপরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছো নিশ্চয়ই? দেখলে তো চীন সরকার শুধুমাত্র তোমাদের দু'চারটি উপদেশ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তুমি ব্যর্থ হলে। এবার কি পিন্ডির বাদশা তোমার প্রতি খুশি হয়ে মসনদের ভাগ দেবেন? তুমি ইনাম পাবে না।

নবাব : তোমরা সবাই অনাগত দিনের দিকে চেয়ে থাকো। এই মসনদ আমার হাতে আসবে। আমিই হবো এদেশের ভাবী প্রধান উজির।

ঈমান : অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো লারকানার নবাবজাদা। সত্যিই তুমি যদি জননায়ক বলে দাবী করো, তাহলে কি ভেবেছো স্বৈরাচারী সামরিক গোষ্ঠী জননায়ককে পেয়ার করে? অসম্ভব। তুমি কি ভেবেছো, যে কেল্লা ফতে খান সামরিক গোষ্ঠীর প্রতীক সে মুখের কথায় মসনদ ত্যাগ করবে?

নবাব : যদি স্ব-ইচ্ছায় ওয়াদামতো কেল্লা ফতে খান মসনদ ত্যাগ না করে তাহলে আমি প্রতিহিংসার আগুনে গোটা পাক জাহান পুড়িয়ে দেবো।

ঈমান : জ্বালাময়ী ভাষা প্রয়োগ করতে ওস্তাদ লোক তুমি। কিছুদিন আগেই

তো বাদশার সঙ্গে তোমার তীব্র মতপার্থক্য শুরু হলো। তুমি প্রকাশ্যে অভিযোগ করলে—"জনগণের পরিষদ" আহ্বান করবে বলে বাদশাকে হুঁশিয়ার করে দিলে—আবার সেই তুমি পোষা কুত্তার মতো পিকিং দৌড়ালে।

নবাব : এর পশ্চাতে রহস্য আছে। প্রয়োজনে, দলীয় স্বার্থে, জনগণের জন্য নীতির কিছুটা রদবদল দরকার হয়। একে বলে রাজনীতি।

ঈমান : (ইকো) তোমাদের রাজনীতি বিচিত্র—বিশ্বের বিস্ময়। তোমাদের ২৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি রক্তে ভেজা। বিষাক্ত নিশ্বাসে ভরপুর তোমাদের অন্তর। তাই পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে তোমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশের রাজনীতি চরম সঙ্কটের সম্মুখীন—এদেশের রাজনীতি পথভ্রষ্ট। তাই কোনও বাদশা, কোনও প্রজা তোমাকে সহ্য করতে পারে না। তুমি যেন ধূমকেতু। তুমি এক অশুভ ব্যক্তি।

নবাব : খামোশ! আমাকে তোমরা সবাই মিলে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চাইছো। কিন্তু না—পারবে না। আমার এতদিনের আশা-পরিকল্পনাকে তোমরা ভেঙ্গে দিতে পারবে না।

ঈমান : (ইকো) পঙ্গু—পরাজিত নায়ক, তুমি এখন মাঝ-দরিয়ার পাঁকে পড়েছো। তুমি তলিয়ে যাবে। যদি বাঁচতে চাও—তাহলে সাচ্চাইয়ের হাত ধরো।

নবাব : আমাকে প্রলোভন দেখিও না।

ঈমান : (ইকো) বেয়াকুব, প্রলোভনের জন্যেই তো বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধিকার, গণতন্ত্রকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছো—বাংলায় রক্তগঙ্গা বইয়েছো— তোমার দেশের মানুষের জীবনকে নিয়ে স্বার্থের জুয়াখেলা শুরু করেছো। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার ধোঁকাবাজি তোমার দেশের জনগণও আর সহ্য করবে না। সেখানেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। সব স্বার্থ ভস্মীভূত হবে।

নবাব : আমাকে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান তুমি দিতে পারো?

ঈমান : (ইকো) একটিই পথ। সেটা হচ্ছে সত্য-সুন্দরের পথ। শান্তি-সংহতি-সৌভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রসর হয়ে মানুষের অন্তরের গভীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। গোটা বিশ্বের মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করো। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করো। তবেই তো মানব ইতিহাসের সাচ্চা দেশপ্রেমিক বলে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবে। গণ্ডিমুক্ত হও—একলা চলো।

নবাব : কিন্তু কি করে সর্ব বাঁধমুক্ত হবো আমি! আমি যে আমার গোটা সত্তাটাকে বন্ধক দিয়েছি! আমি মুক্ত হতে চাইলেও—সামরিক জুন্তা আমাকে মুক্তি দেবে না।

দুর্মুখ : আরে নবাবজাদা, মসনদের সামনে বসে কি ভাবছেন? ও— নবাবজাদা—

নবাব : কে! ও! দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ : হা— খোদা! আজকাল থেকে থেকে অন্য জগতে চলে যাচ্ছেন নাকি!

নবাব : আচ্ছা দুর্মুখ খান, তুমি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি। আচ্ছা বল তো দুর্মুখ খান, আমি যা কিছু করেছি ও করছি সবই কি স্বীয় স্বার্থের জন্যে?

দুর্মুখ : দুষ্ট লোকে অবশ্য তাই বলে। ওরা বলে আপনিই নাকি স্বচ্ছ পানি ঘোলা করেছেন। আবার অনেকে বলে—আপনি নাকি মুশকিল আসান। ভেবে দেখুন, ভেগে-পড়া, দিকহারা পিন্ডির বাদশা বেকুব খান আপনাকে মুশকিল আসান হিসাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পিকিং-এর সঙ্গে পাকিস্তানের দোস্তীর বন্ধনে আপনি বেঁধে দিয়েছেন। আবার বাংলাকে কোতল করবার পরামর্শ দিয়ে মিলিটারি জুন্তার মুশকিল আসানের পথ বাতলে দিলেন। কিন্তু আমি ভাবছি নবাবজাদা, আপনি তো সকলের মুশকিল আসান—কিন্তু আপনার মুশকিল আসান কে করবে?

নবাব : তুমিও কি আমাকে বিদ্রূপ করছো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ : তোবা— তোবা! আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ—এও কি সম্ভব!

নবাব : ধিক্কার—বিদ্রূপ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে পথটিকেই বেছে নিচ্ছি সেই পথই আমাকে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে! জানি না, অনাগত দিন আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, না আমাকে—

দুর্মুখ : ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করবে। গোস্তাফি মাপ করবেন, শেষের টুকু আমিই বলে দিলাম। এ কি, কোথায় চললেন নবাবজাদা?

নবাব : এখানে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাইরে থেকে আসি।

(Change over—Music)

॥ দরবার ॥

ফতে : একে একে সবাই আমাকে পরিত্যাগ করছে। সবাই আমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। সর্বনাশের যে আগুন আমি জ্বেলেছি মাশরেকি বাঙ্গালে, সেই আগুনের তাপ যেন পিন্ডির দরবারে বসে পাচ্ছি। কিন্তু কি করবো আমি? অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে আমাকে পৃথিবীর মানচিত্রের এক অংশে সুপরিকল্পিত উপায়ে আগুন জ্বালাতে হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি। উঃ ভাবতে পারছি না আর। এই— কোই হ্যায়?

দুর্মুখ : বান্দা হাজির জনাবে আলা। ফরমাইয়ে—

ফতে : দুর্মুখ খান! তুমি!

দুর্মুখ : আমিই হাজির হলাম জনাব। আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে কাউকে দেখলাম না।

ফতে : কমবক্ত্‌দের আমি বিতাড়িত করবো।

দুর্মুখ : এখন কে কার হুকুম তামিল করে জনাব। দরবার, হারেমের সকলের চোখেমুখে কেমন যেন হতাশা— কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক—

ফতে : আতঙ্ক! হতাশা! এই সব আতঙ্ক-হতাশাকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো। যার কণ্ঠে শুনবো আমি হতাশার বাণী, তার জিবটা আমি ছিড়ে নেবো।

দুর্মুখ : আপনার অন্তরের গোপনেও কি হতাশা নেই জনাব?

ফতে : না নেই। আমি পাঠান কা বাচ্চা।

দুর্মুখ : এই হুঙ্কার আপনার মুখের—মনের নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সমর্থন হারানোর জ্বালা আপনার হৃদয়কে দুর্গন্ধ করছে। আমেরিকা কর্তৃক অস্ত্র সাহায্য বন্ধ, চীনের পাল্টা সুর, মশরেকি বাঙ্গালের সেনাবাহিনীর হত মনোবল, মুক্তিবাহিনীর বিক্রম আপনাকে ধীরে ধীরে হতাশা-নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে।

ফতে : বন্ধুহীনতায় আমি কিছুটা দুর্বল হয়েছি সত্যি—নানারকম চাপ, হুমকির সম্মুখীন হয়ে আমি বিচলিত হয়েছি সত্য—আমার অগণিত সৈন্যদের মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করেছে সত্য—কিন্তু তাই বলে মাথা নিচু করে বিশ্বের দরবারে বিচারাধীন হতে আমি রাজী নই। এ পরাজয় আমার আত্মহত্যার শামিল।

দুর্মুখ : কিন্তু জনাব, এখনও কি ভেবেছেন, বাংলা মুলুকে আপনার রাজ কায়েম রাখতে পারবেন?

এতে : হ্যাঁ পারবো। প্রয়োজন হলে বাংলার প্রতিটি ঘরকে আমি ভস্মস্তূপে পরিণত করবো—বাংলার মানুষের লাশে ওদেশের নদীর বুক ভরে যাবে। তবু—তবু বাংলার জমিন আমি ছাড়বো না।

দুর্মুখ : হাসালেন—নিতান্তই হাসালেন। আপনি কি আর ছাড়বেন—ওরা ছাড়িয়ে নেবে।

ফতে : দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ : হ্যাঁ জনাব। পিন্ডিতে বসে বাংলার খবর কতোটুকু রাখেন? একবার যান না বাংলায়! আপনার সৈন্যদের মাঝে গিয়ে একবার দাঁড়ান। তাদের আশা দিন, ভরসা দিন।

ফতে : বাংলায় যাবার আমি প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ : বলুন বাংলায় যাবার সৌভাগ্য আর হবে না। ২৫শে মার্চে নিশ্চয় "হে বাংলা বিদায়—চিরবিদায়" বলে সেলাম জানিয়ে চলে এসেছেন?

ফতে : দুর্মুখ খান! তমিজ-সে বাত করো। বাংলায় যাবার সময় হলেই যাবো।

দুর্মুখ : সেই ভালো। কারণ খতরনাক স্থানে বুঝে-সুঝে সাবধানে যাওয়াই মঙ্গল। কোথায় মাইন পাতা আছে, ঘুপ-ঘাপ কোথায় বোমা পড়ছে বলা যায় না! এই দেখুন—খবরে প্রকাশ, আপনার ভাবী পুতুল

সরকারের একটা পুতুলকে মুক্তিবাহিনী বোমের ঘায়ে খতম করেছে। অশান্তি কমিটির কয়েকজন চামুণ্ডাও আচমকা মারে পটল তুলেছে। ত্রিপুরা-নোয়াখালীতে আপনার জেট বিমান দিয়েও বিদ্রোহীদের কাত করা যাচ্ছে না।

ফতে : মরুক—মরতে দাও ওদের। ওদের স্থানে আর একটি পুতুল খরিদ করতে আমার বেশি কষ্ট হবে না।

দুর্মুখ : আরও খবর আছে। চাঁদপুরে অস্ত্র বোঝাই একটা মার্কিন জাহাজ বাংলার নৌ-কমান্ডোরা ডুবিয়ে দিয়েছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া।

ফতে : তোমার এই কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে আমার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিচ্ছে! কতোগুলো অপদার্থের ওপর বাঙ্গাল মুলুকের দায়িত্ব দিয়েছি।

দুর্মুখ : সৈন্যদের আর অপরাধ কি? তারা লড়ছে—মরছে। আর আহত সৈনিকরা চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিচ্ছে। এই ধরুন না, মেহেরপুরে আমাদের সৈন্যদের উপর বিদ্রোহীরা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা কোন্ দিক সামলাবে, তাই যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। আরও চমকপ্রদ খবর আছে জনাব। আপনার পোষ্যপুত্র নবাবজাদা একটুর জন্যে রক্ষা পেয়েছেন।

নবাব : বন্দেগী খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ : আসুন নবাবজাদা, জাঁহাপনাকে একটু সান্ত্বনা দিন।

নবাব : আমি আর কি সান্ত্বনা দেবো—কি ভরসা দেবো দুর্মুখ? একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত। মার্কিনীরা অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করল। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা সকলেই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী করছে।

ফতে : দাবী! কিসের দাবী! কারও কোনও দাবী— কোনও আব্দার আমি বরদাস্ত করবো না। আমি জানি আমি বন্ধুহীন—আমি নিঃসঙ্গ। কিন্তু এর শেষ আমি দেখতে চাই।

নবাব : তবে খাঁ সাহেব, আমাদের চীনা বন্ধুরা—

ফতে : থামুন থামুন। চীনা বন্ধু! কি আশ্বাস নিয়ে এলেন আপনি চীনা দোস্তদের কাছ থেকে? নৈরাশ্য—কিছু উপদেশ আর কিছু সান্ত্বনা ছাড়া চীনা দোস্তরা কি দিয়েছে আপনাকে?

দুর্মুখ : চীন বলেছে বাংলাদেশের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করে নিতে। আরে বাবা, নবাবজাদা কত কাঠখড়ি পুড়িয়ে, পাক-জাঁহার ভাবী পেরধান মন্ত্রী হবার আশ্বাস নিয়ে চীনে গেলেন অস্ত্র আর মদত আনতে। চীনা সাহেবদের হৃদয়ে কি নবাজাদার জন্য এতটুকু করুণা—

নবাব : স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। খাঁ-সাহেব, চীন যে এভাবে আমাদের নিরাশ করবে তা ভাবতে পারিনি।

দুর্মুখ : কপালে যখন আগুন লাগে—তখন তুষের আগুনের মতোই জ্বলতে থাকে।

ফতে : হাঁ ঠিকই বলেছো দুর্মুখ খান! অথচ ক্ষমতা নেবার জন্য সকলের লোলুপ জিহ্বা মসনদটাকে গ্রাস করার জন্য ব্যস্ত।

নবাব : আপনার এই উক্তি কার প্রতি খাঁ-সাহেব?

ফতে : আপনাদের প্রতি নবাবজাদা। মসনদের ভাগ নেবার জন্য একদিকে শক্তিশালী সামরিক জুন্তা, অন্যদিকে আপনি, নূরুল আমিন, দৌলতানা, কায়ুম প্রভৃতি।

নবাব : চীন সফরের পূর্বে আপনি আমার নিকট কি ওয়াদা করেছেন আশা করি ভুলে যাননি।

ফতে : না-না—ভুলে যাইনি—যাবো না। আমি বিদায় নেবার পূর্বে মসনদটাকে টুকরো করে আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যাবো। আমি ষোল আনা বুঝে দিয়ে যাবো।

দুর্মুখ : কবে সেই দুর্দিন আসবে জনাব?

ফতে : জানি না। বুঝলেন নবাবজাদা, বড় আশা করেছিলাম আপনাদের নিয়ে—তাই আজ আমার এই পরিণতি। বড় আশা করেছিলাম টিটিয়া, পিয়াজী, দাঁন্দাল গভর্নরকে নিয়ে—বড় আশা করেছিলাম আমাদের দুর্দিনে একমাত্র দোস্ত চীন অন্তত নিঃসন্দেহে আমাদের সক্রিয় সমর্থন জানাবে। ব্যর্থ—আপনি ব্যর্থ নবাবজাদা!

নবাব : এখন থেকে আমাদের অন্য কারও ওপর ভরসা না করাই বাঞ্ছনীয়!

ফতে : চীনের প্রতি আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলেই আমি বড়মুখ করে বলেছিলাম—

দুর্মুখ : সে মুখ এভাবে ভোঁতা হবে তা কি জানতেন? চীনে নবাবজাদার প্রতি চীনা ছাত্রদের বিক্ষোভ রীতিমতো অপমানকর। যে দেশে বিক্ষোভ, প্রদর্শনী, মিছিলের জন্য সরকারি অনুমতি লাগে, সে দেশে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সরকারের সমর্থন ও অনুমতিতেই হয়েছে।

ফতে : চীনও শেষে কি দোস্তের প্রতি অবিচার করবে?

নবাব : খাঁ সাহেব, এখন থেকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে সংযত উক্তি করাই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখবেন আমরা ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হয়ে পড়ছি—নিন্দিত হচ্ছি।

ফতে : তবু আমি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চাই। বন্ধুহীন, অসহায়, রিক্ত আমি। তবু আমি মরণ-ছোবল দেবো। এ ছাড়া কোনও উপায়, কোনও পথ নেই নবাবজাদা। চরম অবস্থার সম্মুখীন আমি।

দুর্মুখ : সামনে অন্ধকার— পেছনে অতল গহ্বর। ইতিহাস তুমি লিখে যাও—মহাকাল তুমি দেখে যাও—বন্য পশু কিভাবে মরণ গহ্বরে তলিয়ে যায়। বিশ্বাসী তোমরা প্রত্যক্ষ করো, কেমনভাবে সত্যের অগ্নিতে মিথ্যার মৃত্যু ঘটে।

(রচনা : কল্যাণ মিত্র। অংশগ্রহণে : রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ (মিতা), নাজমুল হুদা মিঠু, প্রসেনজিৎ বোস, অমিতাভ বোস, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহলানবীশ, করুণা রায় প্রমুখ।

শিরোনাম : ১৭। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত জীবন্তিকা অনুষ্ঠান।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : .... ১৯৭১।

# মিরজাফরের রোজনামচা

১ নভেম্বর, ১৯৭১

ভাগ্নে : (ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে) মামা—মামাগো—

মামা : কেরে? কে?

ভাগ্নে : দরজা খোল মামা শীগ্‌গীর। আমি তোমার ভাগ্নে হাঁদু।

মামা : চিৎকার করিসনে—আসছি দাঁড়া। (দরজা খোলার শব্দ)

ভাগ্নে : মামা—মামাগো—(ক্রন্দন)

মামা : ওকি কাঁদছিস কেন? এই মলো, বলি কাঁদছিস কেন গবেট?

ভাগ্নে : মামাগো, চোখের সামনে খুন করল!

মামা : খুন! মিলিটারি কাকে মারল?

ভাগ্নে : না।

মামা : তবে মিলিটারিকে মুক্তিবাহিনী মারল?

ভাগ্নে : না।

মামা : তবে মুক্তিবাহিনী কি রাজাকারকে মারলো?

ভাগ্নে : বলছি না!

মামা : (রেগে) তবে কি তোর সাতগুষ্ঠির পিণ্ডি চটকালো?

ভাগ্নে : না।

মামা : তবে কে কাকে খুন করল?

ভাগ্নে : একজন বাঙালি রাজাকার আর একজন খান রাজাকারকে আমার চোখের সামনে ধরাম করে গুলি করে পেড়ে ফেলে দিল।

মামা : এই হতভাগা, শীগ্‌গির আমার টেবিল থেকে মিরজাফরের রোজনামচাটা আর পেনটা নিয়ে আয়।

ভাগ্নে : এই নাও।

মামা : এবার বল।

ভাগ্নে : আমি ওই মোড়ের ওপর দোকানে বসে চা খাচ্ছি। আমার পাশের টেবিলে একজন বাঙালি আর একজন খান রাজাকারের মধ্যে বেশ গরম গরম কথাবার্তা চলছিল।

মামা : কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোর কানে গিয়েছে!

ভাগ্নে : যাবে না মানে? থিয়েটারের অভিনেতাদের যেমন কান প্রম্‌টের দিকে থাকে, এদিকে অভিনয়ও করে যায়,—আমিও তেমনি চা খেতে খেতে ওদের দিকে কান খাড়া করে রেখেছিলাম।

মামা : ওরে বাবা হাঁদু, তোকে কতদিন বলেছি বাপ্—ইনট্রোডাকশন বাদ দিয়ে কথা বলবি। ইয়াহিয়া খানের মতো যত আজেবাজে কথার ঝুড়ি উপুড় করে দেবে। আসলে কি ঘটল তাই বল?

ভাগ্নে : বলছি। ওদের কথা শুনে বুঝলাম, রাজাকার দুটোর মধ্যে লুটের মালের বখরা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত।

মামা : তারপর?

ভাগ্নে : তারপর? মুখ ছেড়ে হাতাহাতি। খানটা বাঙালিকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। তারপর বাঙালিটা মুখের রক্ত মুছে নিজের রাইফেলটা হাতে নিয়েই খানের বুকে গুরুম করে গুলি চালালো। খান রাজাকার আল্লা বলে বুক ধরে পড়ে গেল—। তারপর—

মামা : তারপর খান পটল তুললো এইতো? একটা আপদ গেছে।

ভাগ্নে : কিন্তু মামা, যদি গুলিটা আমার বুকে লাগতো?

মামা : লাগেনি তো—তবে আর ভয় কি? এরকম ঘটনা তো রাজাকারদের মধ্যে আকছার ঘটছে। লুটের মাল নিয়ে খুনাখুনি, বন্দি রমণী নিয়ে রক্তারক্তি। ইয়াহিয়ার এ এক জ্বালা। ওদিকে দলে-দলে কাতারে-কাতারে বহু বাঙালি রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পা চেপে ধরে আত্মসমর্পণ করছে। রাজাকাররা নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গোপন খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্নে : তাই নাকি মামা?

মামা : দুনিয়ার কোনও খবরই রাখিসনে? শুধু মামার ভাত রেঁধেই মলি?

ভাগ্নে : তোমার মতো ঘোড়েল সাংবাদিক যার মামা তার চিন্তা কি? আচ্ছা মামা তুমি এসব সংবাদ সংগ্রহ করে সরবরাহ কর কোথায়?

মামা : কোথায় এ্যাঁ? হা-হা-হা— শোন, গোপনে এইসব সংবাদ সরবরাহ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, বেতার আর প্রচার দপ্তরের কাছে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিই। বাংলার মুক্ত অঞ্চল থেকে এসব খবর প্রচার করা হয় বিশ্বে।

ভাগ্নে : এ্যাঁ, বলো কি মামা!

মামা : গোপন কথা ফাঁস করে ভুল করলাম নাতো?

ভাগ্নে : জান যাবে—তবু কথা বেরুবে না—হ্যাঁ।

মামা : সাবাস ভাগ্নে।

ভাগ্নে : তাহলে বাংলাদেশ সরকার সব দপ্তরই একরকম খুলে ফেলেছেন।

মামা : আছিস কোথায় রে বেটা হাঁদু। বাংলাদেশ সরকার এমন কি কাস্টম ডিপার্টমেন্টও খুলে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। বাংলাদেশ কাস্টমকে সকলে নিয়মমতো শুল্ক দিচ্ছে।

ভাগ্নে : এসব কথা শুনলে, সত্যি বলছি মামা বুকটা খুশিতে ডগোমগো করে। আচ্ছা মামা শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার নাকি বিমান আর নৌবহর গড়েছেন?

মামা : গড়েছেন মানে? এইতো সেদিন বাংলাদেশ নৌবাহিনী চাটগাঁর কাছে পাক-সৈন্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। একটা পাকিস্তানি জাহাজ 'নাসিম' আর একটা গ্রিসের। নাম 'এলভোস'।

ভাগ্নে : আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে মামা।

মামা : এই খেয়েছে!

ভাগ্নে : আচ্ছা মামা শুনলাম, ইয়াহিয়া মামু নাকি ভারত আক্রমণ করার জন্যে লুঙ্গি ঝেড়ে ভালো করে গিট মেরে মালকোঁচা দিয়ে ভারতের সঙ্গে লড়বার জন্যে "ইয়া আলী" বলে ডন বৈঠক মারছে আর বুক চাপড়াচ্ছে?

মামা : হ্যাঁ। শেষে লুঙ্গি হারিয়ে ল্যাঙ্গট পরে "মাইয়া রে মাইয়া" বলে পিঠে হাত দিয়ে ব্যাক গিয়ারে দৌড়ুতে হবে। বুঝলি হাঁদু, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। গুণ্ডাধিপতি ইয়াহিয়ার পাখনা গজিয়েছে।

ভাগ্নে : হা-হা-হা—যথার্থ বলেছো মামা। আচ্ছা, লড়াই করে কি জিততে পারবে ইয়াহিয়া মামা?

মামা : অসম্ভব। ইয়াহিয়া এখন "কলকে ছোট—তামুক বড়" পান করছেন।

ভাগ্নে : সে আবার কি?

মামা : বুঝলিনে? মানে গেঁজা। গুলগুপ্তি মেরে হামবড়াই ভাব দেখাচ্ছে। ওর ছয় জেনারেল দিনরাত পাম্প দিচ্ছে ইয়াহিয়াকে। কারণ বাংলাদেশ আজ বাস্তব—জ্বলন্ত সত্য। বাংলাদেশে খান দস্যুসেনারা বাঙালিদের হাতে প্যাদানী খেয়ে মরছে—হাড়গোড় ভেঙ্গে বদন বিগড়ে পড়ে আছে।

ভাগ্নে : ইয়াহিয়া মামুজান জানে বাংলাদেশ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

মামা : শুধু কি তাই, খান সাহেবের ট্যাক শূন্য। ব্যবসা, বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী নেই। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো একে একে মৌলভী সাহেবের পেছন থেকে কেটে পড়ছে। কেউ আর খান সাহেবকে টাকা, অস্ত্র দিয়ে চোট খেতে রাজী নয়।

ভাগ্নে : তাছাড়া তো বাংলাদেশে জাহাজ, রেল, সেতু পোঁ-পাঁ করে চোখের নিমিষে উড়ে যাচ্ছে। পাট লোপাট হয়ে যাচ্ছে। চা-বাগানগুলো—

মামা : চা রপ্তানী করা ছেড়ে এখন আমদানী করতে হচ্ছে। ইয়াহিয়াকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বোমাবাজ ট্যাটোন খান, বাংলার মামদো ভূত মামুদ আলী, বোতল ট্রেড মার্কা ভুট্টো, কুপুত্তুর মালকে বেটা ও গুণ্ডা নিয়াজী, টেকো নূরুল চাচা কতো কেলেঙ্কারী—কতো কসরৎই না করলেন। কিন্তু কোন ফয়দা হ'ল?

ভাগ্নে : মোটেই না। বরঞ্চ আরও পানি ঘোলা হ'ল।

মামা : তাই ইয়াহিয়া এখন বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করছে। ইয়াহিয়া দেখছে, আমি যদি যাই তাহলে ভোগ করার জন্যে আমিও কাউকে রেখে যাবো না। মরি যদি সবাইকে নিয়েই মরবো। তাইতো ভাগ্যের জুয়াখেলা শুরু করেছেন। তাইতো বাঁচেগো ইয়া মরেগা বলে ভারত আক্রমণ করতে চাইছে।

ভাগ্নে : আচ্ছা মামা, ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণ করে কিভাবে বাঁচবার পথ পাবে?

মামা : এই পরিষ্কার ব্যাপারটা বুঝতে পারলিনি হাঁদু! ইয়াহিয়া এখন ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচাতে চায়। ইয়াহিয়া বেটা ভাবছে ভারতের সঙ্গে চুলকিয়ে ঘা করে যুদ্ধ বাধাতে পারলেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাদা পতাকা বাঁধা বাঁশ কাঁধে করে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলবে—"থাম বাপ্‌-সকল মারামারি করিসনে।" তারপর সিঝ ফায়ার! রাষ্ট্রসঙ্ঘের তখন পাক-ভারত মীমাংসার জন্যে মাথা ব্যথা শুরু হবে। আর মুখ্য বাংলাদেশ সমস্যা তখন ধামাচাপা পড়বে। ব্যাস্‌— খেল খতম!

ভাগ্নে : ইরি বাপ্‌! খানের মাথায় এতো বুদ্ধি!

মামা : শয়তানি বুদ্ধিতে খান সাহেবরা চিরদিনই ওস্তাদ ব্যক্তি। কিন্তু এসব বুদ্ধি লাস্‌টিং করে না বেশিদিন।

ভাগ্নে : হা-হা-হা—মামা একেবারে রসে টইটুম্বুর। বাংলার মানুষ আজ খান সেনার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু মামা ঠিক আছে।

মামা : ঠিক থাকবো না কেন রে ছোঁড়া? আমিও বিয়ে করিনি—তুইও বিয়ে করলিনে? আমাদের কিসের চিন্তা? প্রয়োজনে অস্ত্র ধরবো। দেশের জন্য যদি মরি তাহলে জানবি—আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষের পুণ্যের ফল।

(কল্যাণ মিত্র রচিত)



সৈয়দ আলী আহসান
(ইসলামের দৃষ্টিতে)



ডক্টর মাযহারুল ইসলাম
(দৃষ্টিপাত)



কামরুল হাসান
(সাংগঠনিক সভায়
অংশ নিতেন)



ফয়েজ আহমদ
(পর্যবেক্ষকের
দৃষ্টিতে)



কল্যাণ মিত্র
(জল্লাদের দরবার)



আবু তোয়াব খান
(পিণ্ডির প্রলাপ)



মুস্তাফিজুর রহমান
(কাঠগড়ার আসামী)



অসিত রায় চৌধুরী
(লেখক ও কবি)



মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্
(শেখ মুজিবের
বিচার প্রসঙ্গে)



অনু ইসলাম
(অনুষ্ঠান প্রযোজক,
জয়বাংলা পত্রিকার অন্যতম
সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন)



মুসা সাদেক
(অবৈধ নুরেমবার্গ
ট্রায়াল)



নাসিম চৌধুরী
(কমান্ডার, আমরা
প্রস্তুত)



সমর দাস
(সুরকার ও সঙ্গীত প্রযোজক,
পরবর্তীকালে সঙ্গীত পরিচালক)



আবদুল জব্বার
(সঙ্গীতশিল্পী ও
প্রযোজক)



অজিত রায়
(সঙ্গীতশিল্পী ও
প্রযোজক)



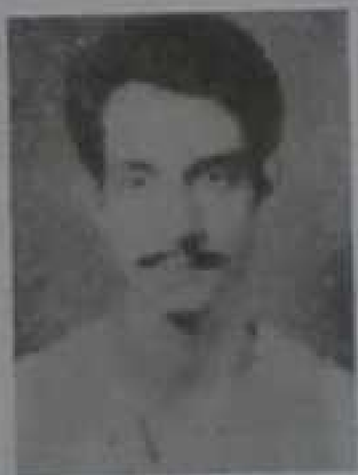
আপেল মাহমুদ
(সঙ্গীতশিল্পী ও
প্রযোজক)



রথীন্দ্রনাথ রায়
(সঙ্গীতশিল্পী ও
প্রযোজক)



মান্না হক
(সঙ্গীতশিল্পী ও
প্রযোজক)



রফিকুল আলম
(আধুনিক ও
রবীন্দ্র সঙ্গীত)



হরলাল রায়
(ভাওয়াইয়া)



মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালী
(পুঁথি পাঠ)



এস.এম. আবদুল গণি বোখারী
(পল্লীগীতি)



সর্দার আলাউদ্দিন
(পল্লীগীতি)



মোশাদ আলী
(পল্লীগীতি)



অনুপ কুমার ভট্টাচার্য্য
(রবীন্দ্র সংগীত)



এম.এ. মান্নান
(আধুনিক গান)



অরূপ রতন চৌধুরী
(আধুনিক গান)



ইন্দ্র মোহন রাজবংশী
(পল্লীগীতি)



কল্যাণী ঘোষ
(আধুনিক গান)



মনজুর আহমদ
(আধুনিক গান)



প্রবাল চৌধুরী
(আধুনিক গান)



মালা খান
(আধুনিক গান)



মনোরঞ্জন ঘোষাল
(আধুনিক গান)



মফিজ আঙ্গুর
(পল্লীগীতি)



খাজা সুজন
(গীতিকার)



তড়িৎ হোসেন খান
(যন্ত্রশিল্পী)



আবদুল জব্বার খান
(নাট্য-প্রযোজক)



রণেন কুশারী
(নাট্য-প্রযোজক)



রাজু আহমদ
(নাট্যশিল্পী,
জল্লাদের দরবার-এর
প্রধান চরিত্র ও প্রযোজক)



হাসান ইমাম
(নাট্যশিল্পী ও
প্রযোজক)



সিরাজুল ইসলাম
(নাট্যশিল্পী ও
প্রযোজক)



তোফাজ্জল হোসেন
(নাট্যশিল্পী ও
প্রযোজক)



সুভাষ দত্ত
(নাট্যশিল্পী)



মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
(নাট্যশিল্পী)



সৈয়দ মোহাম্মদ চান্দু
(নাট্যশিল্পী)



নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(নাট্যশিল্পী)



মাজহারুল ইসলাম
(নাট্যশিল্পী)



সৈয়দ দীপেন
(নাট্যশিল্পী)



আবু ইউনুস
(ঘোষক)



মোহসীন রেজা
(ঘোষক)



রঙ্গলাল দেব চৌধুরী
(অনুষ্ঠানের টেপ সংরক্ষক)



সাজ্জাদ হোসেন
(স্টুডিও নির্বাহী)



নওয়াব জামান চৌধুরী
(কপিস্ট)



আশরাফ উদ্দিন খান
(স্টেনোগ্রাফার)



মোতাহার হোসেন
(ঘোষক)



রাশেদুর রহমান প্রধান
(নাট্য শিল্পী)



গাজী মাযহারুল আনোয়ার
(জয় বাংলা, বাংলার জয়)



ফজল-এ-খোদা
(সালাম সালাম হাজার সালাম)



আব্দুল লতিফ
(সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা)

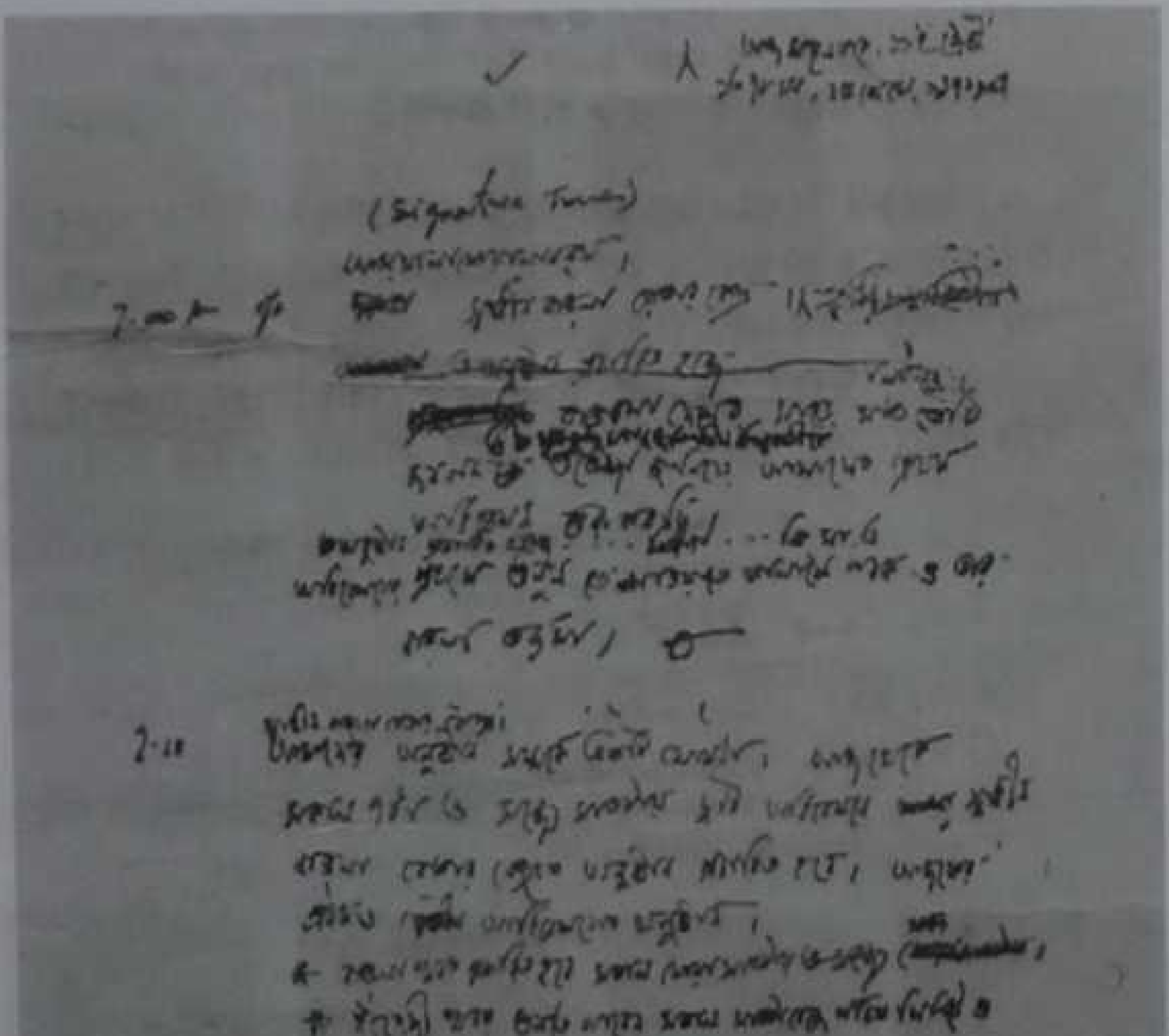


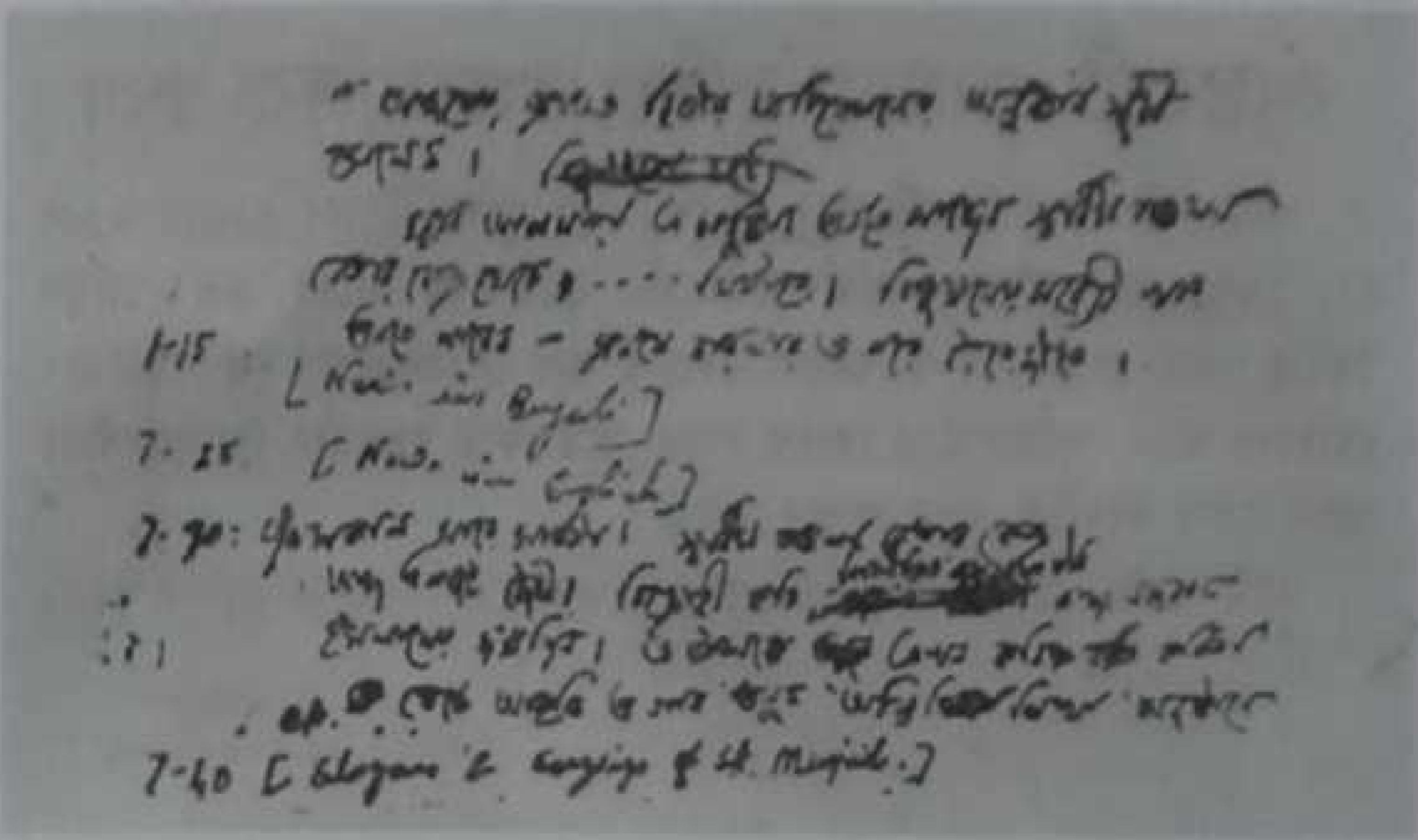
হাফিজুর রহমান
(আমার নেতা তোমার
নেতা শেখ মুজিব)

## কয়েকটি প্রামাণ্য দলিল ও প্রাসঙ্গিক কথা

পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মাধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ২৫ মে, ১৯৭১-এর সকালের অধিবেশনের শুভ উদ্বোধনের সাথেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ-সৈনিকগণের দৃপ্ত পথযাত্রা। সেদিনের প্রথম অধিবেশনের ঘোষণা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির (বাংলাদেশির) প্রাণে সঞ্চার করেছিল নতুন আশার আলো।

সেই প্রথম অধিবেশনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের প্রামাণ্য ঘোষণা পত্র।



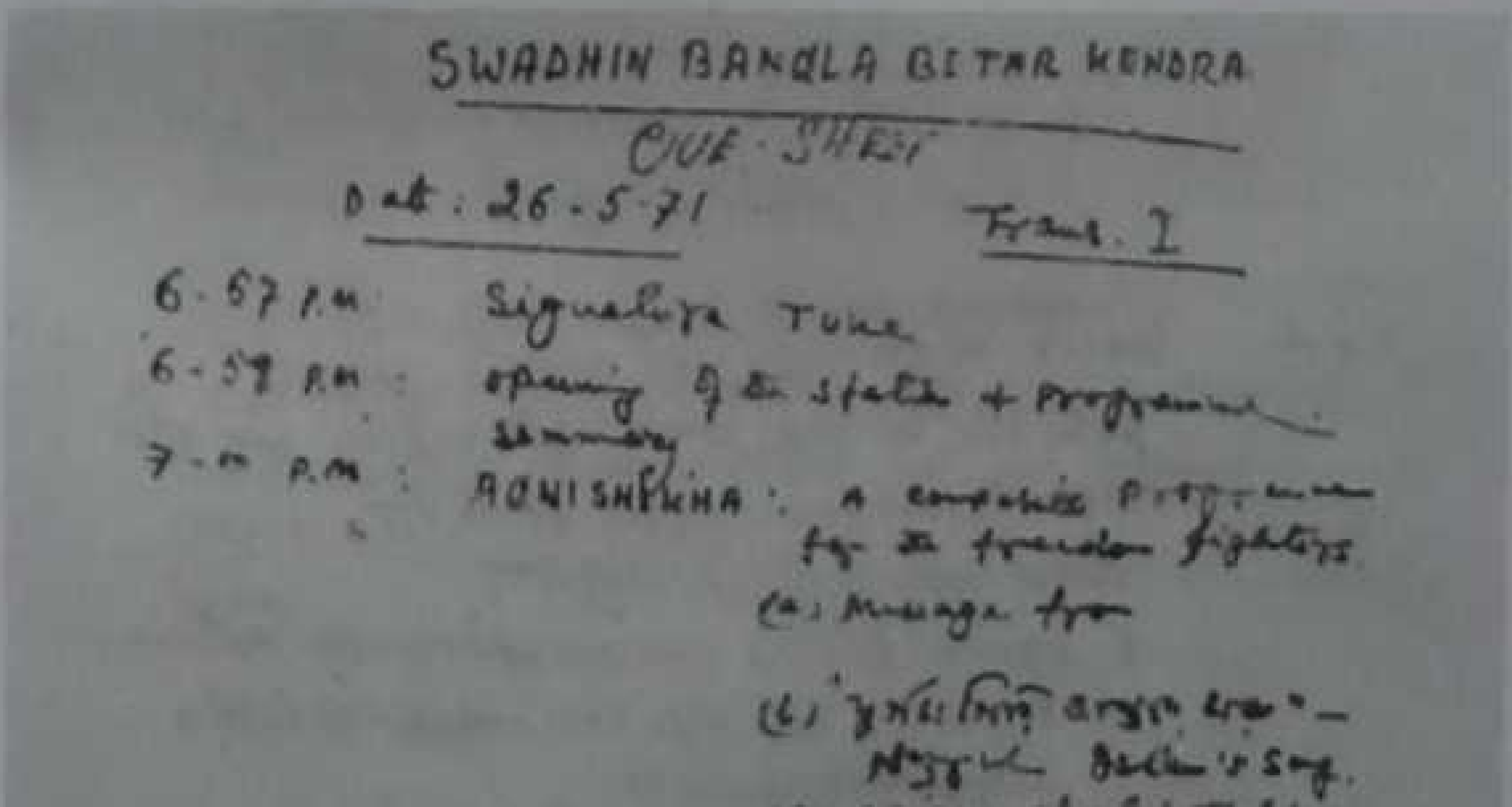


1.15 [News in Bengali]

7.25 [News in English]

7-40 [Slogans & songs of Sk. Mujib.]

হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অতি সন্তর্পণে ভিড় জমাতেন স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি আবালবৃদ্ধবণিতা। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচারিত হতো এসব অনুষ্ঠান। পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অনুষ্ঠান পত্র এমনি একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল।



SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA

CUE-SHEET

Date: 26-5-71 Trans. I

6.57 P.M. Signature Tune

6.59 P.M.: Opening of the station + Programme summary

7-00 P.M.: AGNISHIKHA: A composite programme for the freedom fighters

(a) Message from

(b) — Nazrul Islam's Song.

(c) Agiye chalo: talk on inspiration

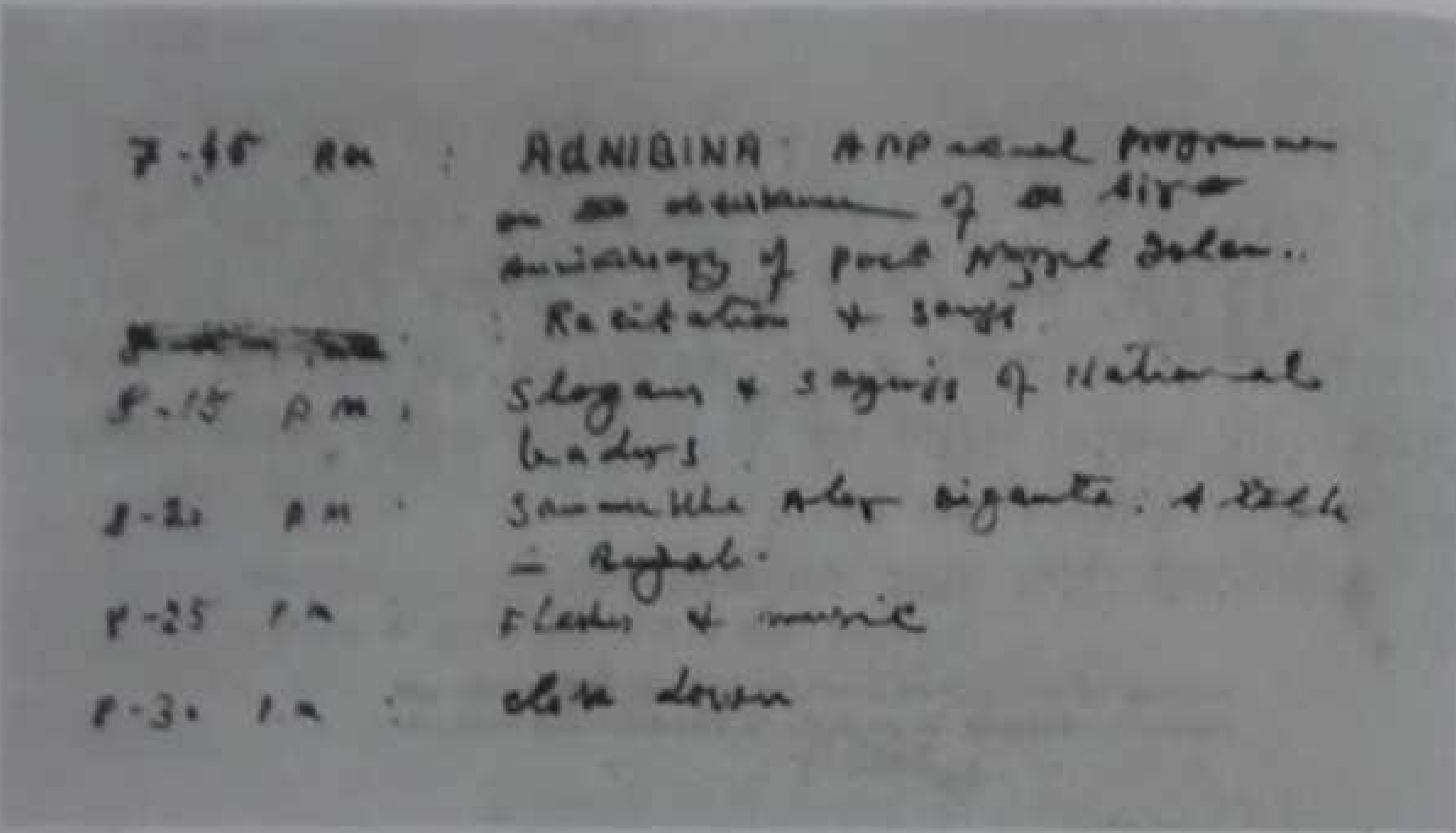
(d) Special News Bulletin

(e) Patriotic song

7-20 P.M.: CHARAM PATRA: Commentary Programme.

7-30 P.M.: News in Bengali

7-50 P.M.: News in English



7-45 pm : AGNIBINA : A special programme on the occasion of the Birth anniversary of poet Nazrul Islam..
Recitation + songs
8-15 pm : Slogans + sayings of National leaders
8-20 pm : Sammukhe ahar nigante : A talk in Bengali.
8-25 pm : Flashes + music
8-30 pm : close down

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিবেশিত সংবাদ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দিত এক মহা প্রেরণা। তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন শত্রুর ওপর নতুন নতুন আক্রমণের সংবাদ জানার জন্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিবেশিত এসব সংবাদের উৎস ছিল টেলিগ্রাম ও অন্যান্য বিশেষ মাধ্যম।

২০ নভেম্বর '৭১-এ প্রাপ্ত এমনি একটি টেলিগ্রামের প্রতিলিপি



SADHINBANGLA RADIO
37/8 BALIGANJ CIRCULAR ROAD CALCUTTA

I MOTAHAR HOSSAIN TALUKDER MNA MANKACHAR 18 P 1/1 CTF NOS ... 156

... BIG OPERATION LEADED BY RENOWNED ABDUL LATIF MIRZA OF SIRAJGONJ ON THE ELEVENTH AT TARASH THANA WHICH ENCOUNTERED BY PAK ARMY AND RAJAKARS AT 5 A M THEY OPENED FIRE AFTER LONG FOUR HOURS FIERCE BATTLE MUKTI BAHINI KILLED FORTY PAK ARMY THIRTY RAJAKARS WOUNDED MANSJ/(C) ARRESTED TENPAK ARMY (SQ) WITH A CAPTAIN NAMED SALIM SHAH (Q) CAPTURED ONE HEAVY MACHINEGUN FOUR SUBMACHINEGUN

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তরে সঞ্চার করতো দৃপ্ত আশা, বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের দিতো মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করার অমিত তেজ, আর হানাদার বাহিনীর মনোবলকে করতো নিষ্ক্রিয়। যুদ্ধকালীন এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার জোরদার এবং ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে রোজ সকালের অনুষ্ঠান সভা ছাড়াও সপ্তাহে অন্তত একদিন বিশেষ অনুষ্ঠান সভার আয়োজন করা হতো। এমনি একটি বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

Minutes of meeting on Co-ordination of Propaganda and Publicity efforts in support of War activity held on 10.10.71.

Members Present :-

1. A. Samad, Secretary, Ministry of Defence.
2. Dr. B. Hossain, Adviser.
3. Mr. Alamgir Kabir.
4. Mr. Shamsul Huda Chowdhury.
5. Mr. Kamal Ahmed. Lohani
6. Mr. A. Rahman.
7. Mr. B. Mahmood.

Progress of action on decisions taken in last meeting was discussed. Members from Radio Bangladesh assured that they are working on lines already decided upon and significant improvement will be noticeable from 15.10.71. onwards.

There was further discussion on measures which will contribute to improve the Radio Programme.

DECISIONS :

1. An office will be immediately set-up in the Radio Building and all staff work done there.
2. The method of news composition will be changed and text will be the same for English, Bengali and Urdu Bulletins. In view of [illegible] pressure of work Mr. A. Kabir will compose the night bulletin and Mr. K. Lohani will compose the morning and after-noon bulletins.
3. The Radio will be immediately provided with a type-writing machine, two portable tape-recorders and one Casette tape-recorder.
4. The Staff of the outside broadcast section will go out frequently to the field. They will be given T.A. as no conveyance can be arranged at present.
5. Dependence on patriotic songs should be reduced and in its place martial songs and music should be introduced.
6. Arrangement for bringing the microphone from Agartala should be immediately made.
7. Security checking will be made rigid from 15.10.71. In the meantime I.D. Cards should be issued where necessary.
8. Payments for script-writers and talkers should be regular.
9. The panel of Talents should be finalized immediately in consultation with Mr. A. Mannan, MNA-in-Charge.
10. Programme shall be drawn up for 7 days at a time sufficiently in advance (atleast 4 days). The responsibility of filling in the Programme shall lie with the respective programme Organiser/Section heads.
11. Arrangement shall be made by Secretary, Information for getting Pak News Papers for the counter-propaganda section.

Sd/- A. Samad
Secretary,
Ministry of Defence.

Memo. No. D-103/7619 Dated, 18.10.71

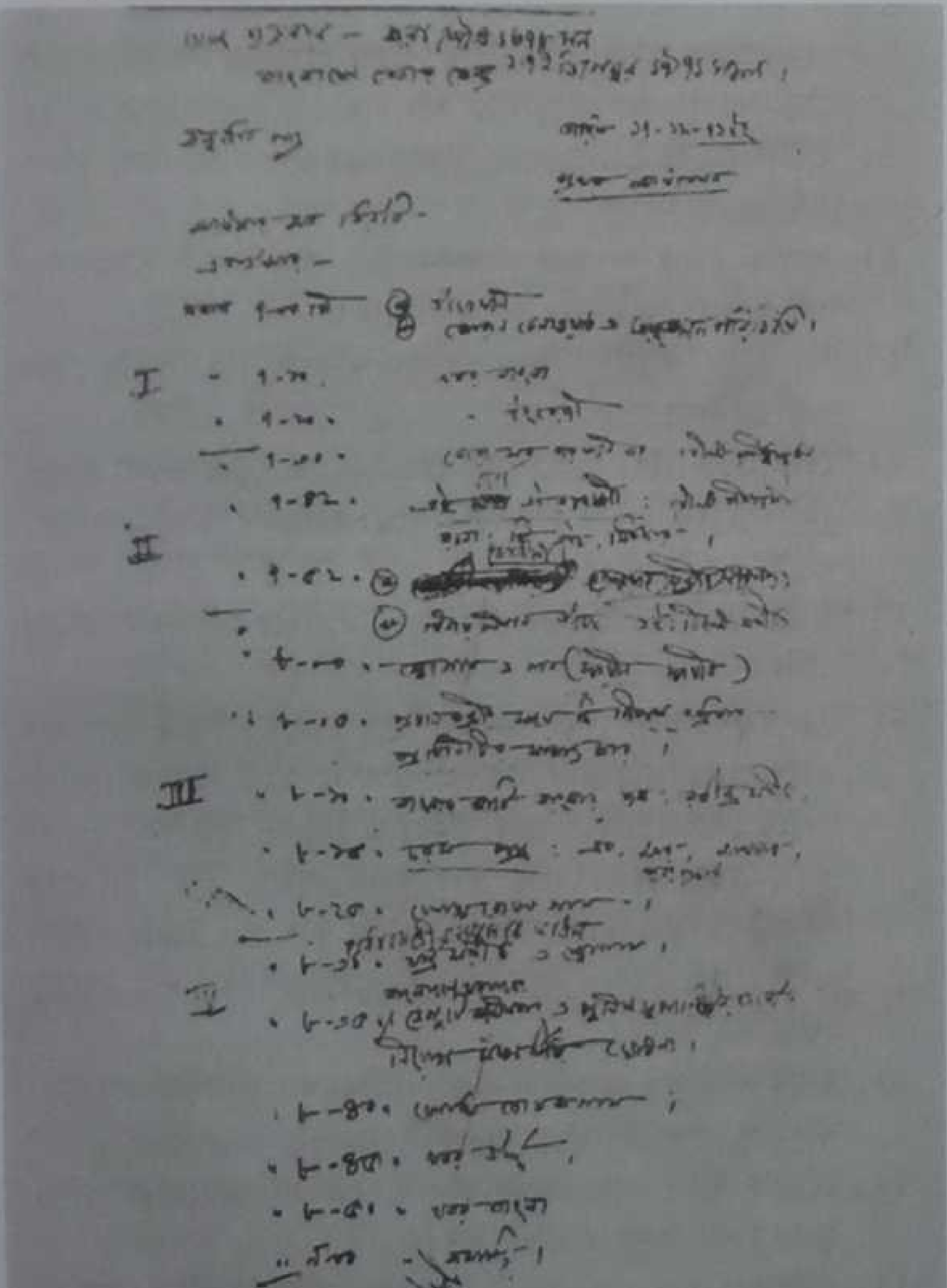
1) Copy forwarded to Mr. M.A. Mannan, MNA-in-Charge, Information & Broadcasting for information.

2) Mr. Shamsul Huda Chowdhury ............ for information.

Secretary.

চূড়ান্ত বিজয়ের পর ১৭ ডিসেম্বর '৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম সকালের অধিবেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অনেক। সে দিনের প্রথম সূর্যোদয়ে ন'মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাংলার জনগণ প্রথমবারের মতো মুক্তাকাশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে মহা উৎসাহে। সেদিন তাঁরা ছিলেন বিজয়ী, মুক্ত। আর শত্রু ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ।

সেই প্রথম সূর্যোদয়ের প্রথম অনুষ্ঠান পত্রের প্রামাণ্য প্রতিলিপি।





এই জানোয়ারদের নিশ্চিহ্ন করার মধ্যে ছিল বাঙালির মুক্তি। শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা।



মুক্তিবাহিনীর বিজয় উল্লাস



নয় মাস যুদ্ধ শেষে এল চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। হানাদার বাহিনী বাধ্য হলো অস্ত্র সমর্পণ করতে, ১৬ ডিসেম্বর '৭১ রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।



হানাদার বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করলেন লে. জেনারেল নিয়াজী (মধ্যে)। ডানে মিত্রবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা। আর এ সাথেই শেষ হলো নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির স্বাধীনতার যুদ্ধ।

# এই সেই আত্মসমর্পণ দলিল

## LIOUTEMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.



বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর ভাষণরত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম



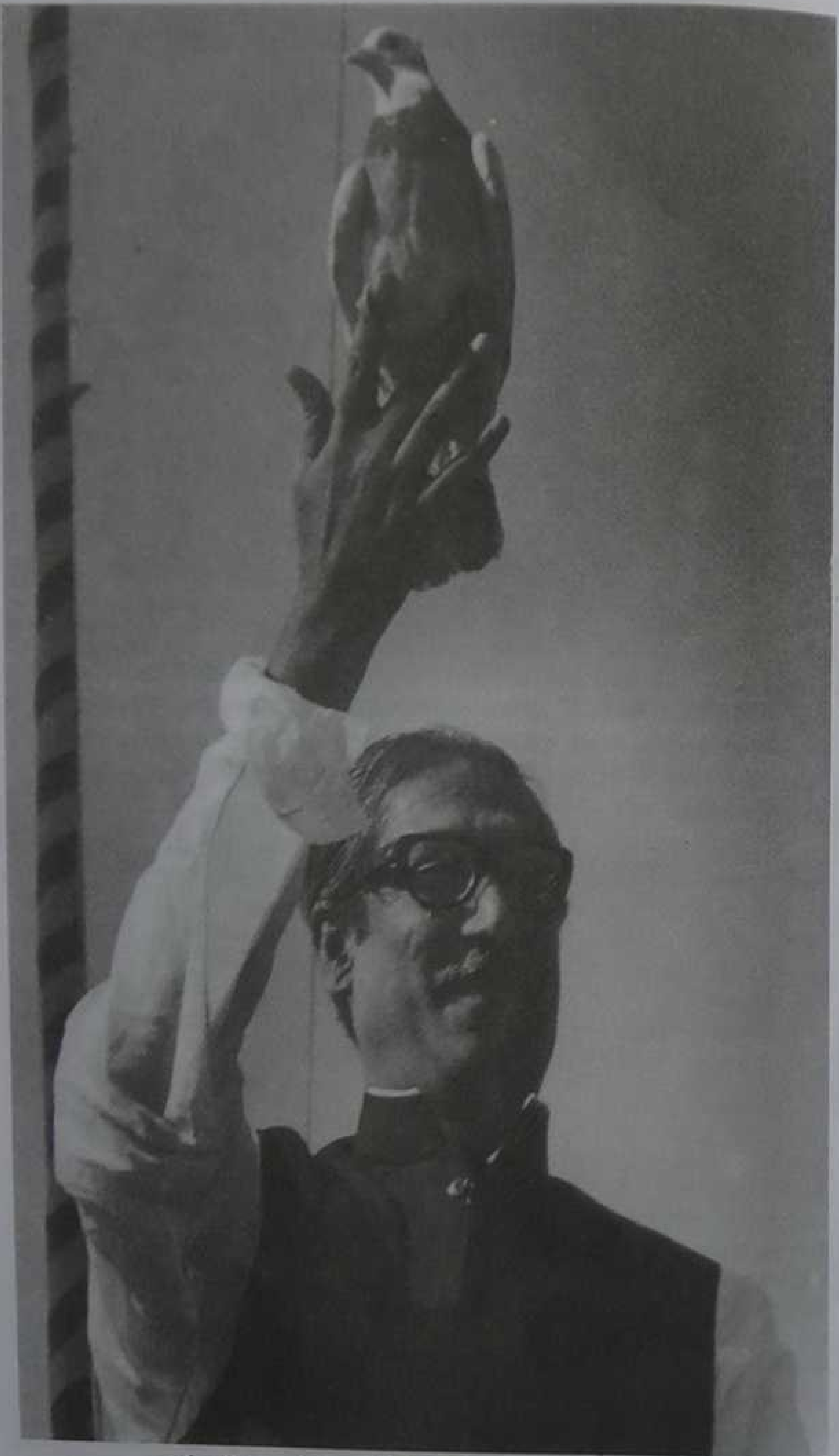
দেশি-বিদেশি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণরত প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ



১৭ মার্চ '৭২ বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক শুভেচ্ছা সফরে এলেন বাংলাদেশে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেজগাঁও বিমান বন্দরে সম্মানিতা অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগতম জানালেন। বাংলদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহানুভূতিশীল বিশ্বের সমর্থন লাভে। এই মহিয়সী মহিলার অবদান কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি স্মরণ রাখবে যুগ যুগ ধরে।



১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান করছেন বঙ্গবন্ধু।



জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# এ সত্য রুধিবে কে?

**২৫ নভেম্বর, ১৯৭১**

(একটি ঝোপের আড়ালে গভীর আঁধারে নারায়ণ পজিশন নিয়ে বসে আছে। দূরে মর্টার ও মেশিনগানের ক্রমাগত শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু কাছে সামান্য একটি শব্দ হলো—সঙ্গে সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ করে উঠলো)

নারায়ণ : হল্ট্! হু কাম্‌স্ দেয়ার?

মাইকেল : ফ্রেন্ড।

নারায়ণ : পাস্ ওয়ার্ড!

মাইকেল : বুলেট পিলেট মর্টার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ : ও. কে.

মাইকেল : তারপর এদিককার খবর কি নারায়ণ?

নারায়ণ : খুব চলছে অর্থাৎ খুব চালাচ্ছে। জানোই তো, খান-সেনারা এখন হাওয়ায় গুলি ছোঁড়ে, আমরা ছুঁড়ি হয়তো একটা, আর ওরা ছুঁড়বে এক ধামা।

মাইকেল : উদ্দেশ্য?

নারায়ণ : উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার, যেন আমরা আর কাছেই না যাই। তা না হলে কখনো শুনেছ কোন সেনাবাহিনী হাঁটু, কাঁপায় আর এলোপাতাড়ি আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়ে?

মাইকেল : না, তবে অপূর্ব চিজ এই খান বাবাজীদের কল্যাণে তাও এ জীবনে দেখে যেতে হলো। যাক সে কথা, শ্রীমতী বড়ুয়া কি ফিরেছে?

নারায়ণ : কে, শান্তি? না এখনও তো ফিরলো না। কথা ছিল ডক্টর সিদ্ধান্ত বড়ুয়ার কাছ থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সবুজ গ্রামে গিয়ে রহমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সেখান থেকে তো দুজনেরই ফেরার কথা। এদিকে তো রীতিমতো সুবিধে একেবারে তৈরি হয়েই আছে, খালি একবার ঘোড়া টানার অপেক্ষা।

মাইকেল : এতো ব্যস্ত হয়ো না। রহমান ভাই এখনই এসে পড়বেন। আসলে কি একটা জরুরি ব্যাপারেই নাকি তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণ : আমিও তাই শুনেছি। আমার মনে হয় চরম আঘাত হানার সময়—হল্ট্, হু কাম্‌স্ দেয়ার?

রহমান ও শান্তি : ফ্রেণ্ড।

নারায়ণ : পাস্ ওয়ার্ড!

রহমান ও শান্তি : বুলেট পিলেট মর্টার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ : ও. কে.

মাইকেল : কে, রহমান ভাই? তোমার দেরী দেখে আমরা ব্যস্ত হচ্ছিলাম। নাও চলো, যা দেখে এসেছি তাতে এখনই হানাদারদের আঘাত হানতে হবে। গোটা পঁচিশেক যা ফট্ ফট্ করছে তা এক-বারেই সাবাড় হয়ে যাবে।

রহমান : না মাইকেল, এখন আর পঁচিশ-পঞ্চাশের ব্যাপার নয়, এখন হাজারের ব্যাপার শুরু হয়েছে।

নারায়ণ : অর্থাৎ?

রহমান : অর্থাৎ, চরম মুহূর্ত এসে গেছে।

মাইকেল : হাঁ, চরম মুহূর্ত। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কাজ আমরা শেষ করে এনেছি। এবারে শত্রুর ওপর হানবো আমরা চরম আঘাত (নেপথ্যে ক্ষীণ ক্রমাগত গুলির শব্দ : সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে ......... ইত্যাদি)

নারায়ণ ও

মাইকেল : চালাও কিস্তি ডাঙ্গা দিয়ে! এই তো চাই।

রহমান : হাঁ, এবার কিস্তি ডাঙ্গা দিয়েই চলবে। এবার মানুষের শত্রু, সভ্যতার শত্রু জানবে কটা ধানে কটা চাল। এবার তারা জানবে অন্যায়ের দ্বারা, অত্যাচারের দ্বারা ন্যায়কে, সত্যকে, মানবতাকে হত্যা করা যায় না। শান্তি।

শান্তি : রহমান ভাই!

রহমান : তোমার ওপরে যে আদেশ এসেছে তা বুঝতে পেরেছ?

শান্তি : হ্যাঁ, রহমান ভাই।

রহমান : তুমি প্রস্তুত?

শান্তি : সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহমান ভাই ..... হল্ট্ হু কাম্‌স্ দেয়ার?

জনৈক : (কাঁপা গলায়) ফ্রেন্ড।

শান্তি : পাস্ ওয়ার্ড!

জনৈক : পিলেট বুলেট মর্টার, বুলেট বুলেট মর্টার! (সঙ্গে সঙ্গে শান্তির হাতের স্টেনগান গর্জে ওঠে, একটি আর্ত চীৎকার। সবাই ছুটে এগিয়ে যায়।)

মাইকেল : কে লোকটি রহমান ভাই?

রহমান : রাজাকার দেখছি। পকেটে পাওয়া কাগজই তার সাক্ষী। গোয়েন্দাবাজি করতে এসেছিল।

শান্তি : আহা, বেচারা গতকালকার পাস ওয়ার্ড সম্বল করে এসেছিল দালালী করতে, ও হয়তো জানতো না সত্যের প্রহরীরা সদা জাগ্রত।

রহমান : তোমায় ধন্যবাদ শান্তি, তুমি সময়মতো ধরে ফেলেছিলে। যাক্ যা বলছিলাম। চরম মুহূর্ত এসে গেছে। এতদিন আমরা কেবল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছি। সারা বাংলাদেশের রাস্তাঘাট অকেজো করে দিয়েছি, ব্রিজ উড়িয়েছি, রেললাইন ধ্বংস করেছি। এবং সুযোগ পেলেই শত্রুকে আঘাত করেছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখিয়ে দেওয়া যে খালি হাতে শুরু করলেও আমরা তাদের কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হবার পদার্থ নই, আমরা

এক মরে বহু হই। আমরা শত্রুর সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি, সে ইচ্ছা করলেই সামনে-পিছনে-ডাইনে বাঁয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে না! সর্বত্র আমাদের ঘাঁটি, সবখানে আমাদের দুর্গ। হানাদাররা এখন যশোরে, রংপুরে, সিলেটে, কুমিল্লায়, ঢাকায়, চট্টগ্রামে আলাদা হয়ে আছে, বন্দি হয়ে আছে। কথায় কথায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের আর যেতে হবে না; একখানে দাঁড়িয়েই তাদের দেখে যেতে হবে সত্য কিভাবে অসত্যের ওপর জয়লাভ করে।

নারায়ণ : তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কি?

রহমান : এখানেই বসে থাকা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মুক্তিবাহিনী এখান দিয়েই যাবে, এগিয়ে যাবে সামনে। সবুজ গ্রাম, অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে এখান থেকেই সরাসরি মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। এইবার আমরা চারদিক থেকে হানাদারদের আক্রমণ করবো। আমরা দেখিয়ে দেবো বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।

নারায়ণ : রহমান ভাই, আজ আমার বারবার মনে পড়ছে ঢাকার সেই ভয়াবহ পঁচিশে মার্চ, সেই হাহাকার, সেই করুণ আর্তনাদ। আমি এখনও যেন শুনতে পাই খান-সেনাদের বুলেটে ঢলে পড়া আমার মায়ের সেই শেষ আদেশ : খোকা তুই প্রতিশোধ নিবি, প্রতিশোধ নিবি তোর মায়ের, তোর দেশের।

(নেপথ্যে ঢাকার হাহাকার, মায়ের আর্তনাদ ও শেষ আদেশ দূর থেকে ভেসে আসবে)

মাইকেল : আমিও ভুলিনি নারায়ণদা আমার বোনের হাহাকার। আমি এখনও শুনতে পাই আমার বোন মেরির—তার বান্ধবী রাবেয়া, মরিয়ম, লক্ষ্মীর চীৎকার। তারা মৃত্যুর আগ্ পর্যন্ত বার বার বলেছে : প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই। আমরা মরে যাচ্ছি— তোমরা বেঁচে থাকবে, প্রতিশোধ নেবে প্রতিশোধ। (নেপথ্যে মহিলাদের চীৎকার ও সংলাপ ক্ষীণভাবে ভেসে আসবে)

শান্তি : সত্যিই কি আমরা বেঁচে আছি মাইকেল? সত্যিই কি আমরা তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি? সত্যিই কি আমার বৃদ্ধ বাবার আদেশ আমি পালন করতে সক্ষম হয়েছি? আমাদের সবার চোখের সামনে আল্লাহর ঘর মসজিদ, মন্দির, ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গুড়িয়ে দিলো খানরা, আমার বাবা বাধা দিতে চাইলেন, বেয়োনেট দিয়ে তারা হত্যা করলো তাঁকে। আমরা ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখলাম বাবার বুক দিয়ে গল গল করে রক্তের নদী নামছে। বাবা বলতেন কাউকে ঘৃণা করতে নেই, কারুর প্রতি হিংসা করতে নেই। কিন্তু, কিন্তু যে মানুষ নয়, যে পশুও অধম, যে মানুষেরই শত্রু তাকেও কি ঘৃণা করবো না? (নেপথ্যে—মার ডালো বাঙালিকো)

রহমান : তুমি আমি ঘৃণা না করার কে? যারা গুলি খেয়ে মরেছে, যে নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে, যে শিশু আগুনে পুড়ে মরেছে তাকে জিজ্ঞেস করো ঘৃণা করা উচিত কিনা। যে মানুষ, তার বিরুদ্ধে তো আমাদের কোনও যুদ্ধ নেই—কিন্তু যে অমানুষ, যে মানুষের শত্রু তাকে আমরা ধ্বংস করবোই।

শান্তি : ঠিকই বলেছ রহমান ভাই। আচ্ছা রহমান ভাই, চট্টগ্রামে আমরা যে দুর্ভাগ্যের মুখে পড়েছিলাম তাতো বললাম, কিন্তু তুমি তো কিছুই বললে না তোমার কথা!

রহমান : আজ আমাদের ব্যক্তিগত কোনও সংবাদ তো নেই শান্তি। আমাদের জিজ্ঞাসা একটি : বাংলাদেশ কেমন আছে। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একমাত্র নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। আর সেজন্যেই তোমরা সবাই নিজেদের কথা বলোনি, বলোনি কি দুঃখের পাহাড় বুকের মধ্যে প্রতিদিন বহন করছো।

নারায়ণ : বলিনি এই জন্যে যে, বলার সময় নেই আমাদের। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত সময় নেই আমাদের। তবু আজ এই মুহূর্তে সেইসব বেদনার কথা আমাদের মনে পড়ে গেল যা স্মরণে এলে হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই জানতে বড় ইচ্ছা আমাদের তোমার কথা, তোমার ব্যক্তিগত কথা।

রহমান : (করুণ কণ্ঠে) কমরেড, তোমরা আমার জীবনের, মরণের বন্ধু। তোমাদের বলতে আমার বাধা নেই। কুষ্টিয়ায় ছিলাম আমরা। এই হতভাগ্য আমি বাদে আমাদের আর সবাই হারিয়ে গেছে অনন্তে। তাদের হাত-পা বেঁধে আমাদেরই ঘরে পুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয় নরপশুরা।

(নেপথ্যে ক্ষীণ শব্দ : বাঁচাও—বাঁচাও)

সবাই : আহা!

(দূর থেকে ক্ষীণ মার্চের শব্দ ভেসে আসবে)

রহমান : ঐ শোন, মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। বন্ধুগণ, প্রত্যেক জাতির জীবনের একটি চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে। তখন তাকে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, মুক্ত আকাশ ও বন্ধ ঘর—এর যে-কোনও একটি বেছে নিতে হয়। তাকে বলতে হয় সে সম্মান চায়, না অসম্মান চায়? জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমরা সেই চরম অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। আমরা ছাব্বিশে মার্চেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি—প্রাণ দেবো, কিন্তু স্বাধীনতা চাই। সেই সিদ্ধান্ত আজ আমরা চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করার কাজে লিপ্ত। কাজ যখন শেষ হবে তখন আমি নিজে আর আমরা অনেকেই বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করছি, প্রাণ দিচ্ছি।

শান্তি : আমরা যুদ্ধ করছি শোষণের বিরুদ্ধে। একজন মানুষ যাতে আরেকজন মানুষকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্যেই আমরা প্রাণ দিচ্ছি। (মার্চের শব্দ আরো কাছে চলে আসবে)

মাইকেল : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও তাই চেয়েছেন। তিনি বলেছেন সবাই সমান অধিকার পাবে, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। মানবিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই কায়েম করতে হবে।

নারায়ণ : আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও তাই চায়। তারা চায় কেউ যেন আর তাদের ঠকাতে না পারে, চব্বিশ বছর ধরে যে শোষণ হয়েছে তা যেন আর না হয়। কেউ যেন বলতে না পারে আমি শোষিত, বঞ্চিত।

রহমান : বন্ধুগণ! বঙ্গবন্ধুর সেই মহান ঘোষণার কথা পুনরায় বলেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি ও অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন: এদেশের সম্পদ সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। দেশের মানুষকে প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি প্রদানের জন্য সমাজতন্ত্র-ভিত্তিক একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথাই তাঁরা বারবার বলেছেন। আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী সেই মহান লক্ষ অর্জনের পথে চলেছে। তাদেরকে কোনও অন্যায়-অত্যাচারী শক্তি বাধা দিতে পারবে না।

(মার্চ আরো কাছে চলে এসেছে)

শান্তি : আমরা সত্যের সৈনিক, তাই আমরা অজেয়। দেশের মাটি আমাদের বন্ধু, দেশের মানুষ আমাদের সহায়। আমরা যতই সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবো, দেশের মানুষ ততই আমাদের সাহায্য করবে; তারপর একসময় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুর উপর। এভাবে চারপাশ থেকে শত্রুকে আমরা ঘিরে ধরবো—পিষে মারবো তাকে।

(মার্চের শব্দ কাছে)

রহমান : বন্ধুগণ, আমরা জনতার প্রতিনিধি, জনতার অংশ, জনতার বন্ধু। আমরা ন্যায়ের প্রতীক, আলোর পথিক, মানবতার প্রতীক। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রাণ দেবো, জয়ী আমরা হবোই। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মায়, মরে যায়, আবার জন্মায়, আবার মরে যায়—জীবনের প্রবাহ এভাবেই চলে আসছে, চলে আসছে আদিকাল থেকে। সাধারণভাবে একজনের জীবন আর একজনের জীবনের চেয়ে কি বেশি মূল্যবান? না, তা নয়। কিন্তু যে জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য বিসর্জিত হয়, যে জীবন ন্যায়ের জন্য বিসর্জিত হয়, সে জীবনের ক্ষয় নেই। সে জীবন অব্যয় অক্ষয় অমর। আজ আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য, ন্যায়ের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছি, যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আজ আমরা মুখোমুখি দাঁড়াবো অন্ধকারের সঙ্গে। কে আমাদের জয়কে ঠেকাবে? কে আমাদের পথ রোধ করবে? কে বাধা দেবে ইতিহাসকে? সত্যকে? ন্যায়কে?

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

# কে আমাদের রুখবে?

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

(মুক্তিবাহিনীর শিবির। গেরিলাদল হানাদারদের আক্রমণ করার পূর্বমুহূর্তে প্রস্তুত। গেরিলা অধিনায়ক নিয়াজ তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন।)

নিয়াজ : তবু বন্ধুগণ লড়াই আমাদের করতেই হবে। সমস্ত প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদকে বরণ করে নিয়ে শত্রুধ্বংসের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য—বাংলার মাটিতে যারা রক্ত ঝরিয়েছে, বাংলার বুকে যারা আগুন জ্বালিয়েছে, বাংলাকে যারা শ্মশান করেছে, তাদের ক্ষমা নেই। তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করব, বাংলার মাটি মুক্ত করব শয়তানদের কবল থেকে। আর এমনই শিক্ষা আমরা দেবো যেন ভবিষ্যতে কেউ আবার বাংলার মাটিতে পা রাখার জায়গা না পায়। বন্ধুগণ প্রস্তুত!

সমস্বরে : প্রস্তুত কমরেড।

নিয়াজ : তবে এগিয়ে যাও—নির্ভয়, নির্ভীক। ভয়ংকর ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কাপুরুষ হানাদারদের উপর। ওদের নিঃশেষ করে দেবে। প্রভাত আলোর মতো তোমাদের গতি হবে সম্মুখে। এগিয়ে যাও। ... মানিক, তুমি স্বপনকে ডেকে নিয়ে এসো।

মানিক : নিয়াজ ভাই আসতে পারি?

নিয়াজ : এসো, মানিক স্বপন কোথায়? ও এসেছ, শোন তোমাদের উপর একটা কাজের ভার দেবো, এর সফলতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের পরবর্তী আক্রমণ। যেমন করেই হোক এ কাজ তোমাদের করতেই হবে।

স্বপন : প্রাণ থাকতে পিছিয়ে আসবো না নিয়াজ ভাই। হয় সাফল্য, না হয় মৃত্যু।

নিয়াজ : সাবাস। এই হচ্ছে বাংলার সন্তানের, বাংলার মুক্তিযোদ্ধার কথা। এইতো চাই।

মানিক : আমরা নিয়েছি এগিয়ে চলার শপথ—চলাই আমাদের গতি, চলাই আমাদের জীবন।

নিয়াজ : হাঁ, চলাই আমাদের জীবন।
(জনান্তিকে : হল্ট, হু কামস্ দেয়ার) (মহিলা কণ্ঠ : ফ্রেন্ড)
রেখা এসে গেছে। ও তোমাদের সংগে যাবে। দিনের বেলায় যেতে হবে। বিপদসংকুল যদিও, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে।

রেখা : জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। বিপদের কথা শুনলে মন আমার আনন্দে নেচে ওঠে। বিপদহীন, শংকাহীন জীবন বড্ড ঠুনকো লাগে কমরেড। আমি চাই মৃত্যুর মাঝে জীবনের গান গাইতে।

স্বপন : আর সে গান রক্তরাঙ্গা নির্ভীক জীবনের গান।

মানিক : রৌদ্রোজ্জ্বল সগ্রামী জীবনের গান।

নিয়াজ : নির্ভয় নিঃশঙ্ক চলার শপথ যে নিয়েছে তার কাছে কোনো বাধাই বাধা নয়। দুস্তর সমুদ্র বা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় কিছুই তার পথ রোধ করতে পারে না।

(বিস্ফোরণের শব্দ দূর থেকে)

শুনলেন তো, ফরহাদপুরের ব্রিজ উড়ে গেল। হানাদারদের পথ আজ থেকে রুদ্ধ হয়ে গেল।

রেখা : এবার আমরা বাকী পথটুকুও বন্ধ করে দেবো। আজ ওরা গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ পাগলা জানোয়ারের মতো হামলা চালাচ্ছে। ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে পোড়াচ্ছে। মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে হত্যা করছে।

নিয়াজ : আর মা-বোনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে শয়তানরা ১০০টা বন্দি শিবির করেছে। আর সেখানে হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করে অকথ্য নির্যাতন করছে। মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছেলেখেলা করছে। এ নির্যাতন বন্ধ করব, নির্যাতনকারীর মৃতদেহের স্তূপে লেখা হবে হানাদারের গ্লানিকর পরাজয়।

মানিক : নিয়াজ ভাই, আমাদের কি কাজের ভার দেবেন বলেছিলেন না?

নিয়াজ : ও হ্যাঁ, শোন, নগরপুরে দুশমদের একটা শক্ত ঘাঁটি আছে। এ ঘাঁটিটা আমাদের নষ্ট করতে হবে। এ ঘাঁটিটা নষ্ট হলে আমরা নদীপথ এবং সড়ক উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। শহরে আঘাত হানার পক্ষেও সুবিধা হবে।

স্বপন : এ আক্রমণে আমি নেতৃত্ব দেবো নিয়াজ ভাই, আমাকে শুধু পাঁচটা ছেলে দেন। আমি শয়তানদের ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে আসবো।

রেখা : নেতৃত্ব তুমি দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু এভাবে এতো অল্প ছেলে নিয়ে গেলে কতখানি সফল হবে ভেবে দেখেছ?

স্বপন : এখন এতো ভেবে দেখার সময় নেই। এখন জানি শুধু শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।

নিয়াজ : না, স্বপন। বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েই তোমরা এগিয়ে যাবে। আমরা ত্রিমুখী আক্রমণ চালাবো। তিনটে দল থাকবে, তার একটার নেতৃত্ব নেবে তুমি।

মানিক : আমার কাজ কি নিয়াজ ভাই?

নিয়াজ : তোমারও কাজ আছে। তুমি থাকবে রক্ষণভাগে। আক্রমণ শুরু হলে, শহর থেকে শয়তানদের সাহায্য আসতে পারে। তুমি এই সাহায্য আসার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কোনোভাবেই যেন তারা সাহায্য নিয়ে আসতে না পারে।

রেখা : আর আমি? আমি কি করব?

নিয়াজ : তুমি আমার সংগে ওষুধের ব্যান্ডেজ সব নিয়ে থাকবে। প্রয়োজন হতে পারে। একটা স্ট্রেচার নিয়ে নিয়ো। মানিক নায়েক কাসেম, বাবলা,

রশিদ, কালু, স্বপন তোমার সংগে থাকবে। নায়েক মোহর আলী রফিক, বিজন, মনি এবং আমি নায়ক নিয়ামুদ্দিনকে নিয়ে নেবো। নাও প্রস্তুত হয়ে নাও, অস্ত্রশস্ত্র সব নিয়ে নাও। শয়তানদের গুলির জবাব দেবে— বেশি গুলি অহেতুক খরচ করো না।

(ক্ষণ বিরতি)

প্রস্তুত, এগিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান কেউ অহেতুক উত্তেজিত হয়ে উঠবে না বিপদের মুখে যে ধীরমস্তিষ্কে, শান্ত মাথায় কাজ করতে পারে সে-ই কামিয়াব হয়। যাও, এগিয়ে যাও।

(মেশিনগান এবং রাইফেলের গুলি)

মানিক : কাসেম ভাই, ডাইনে চেপে যান, বাঁদিকের মেশিনগানটা বন্ধ করতে হবে। (গুলি চলতেই থাকবে)

স্বপন : রফিক-বিজন বাঁয়ের খাঁড়ি দিয়ে উঠে যাও, পাশের বাংকারের মেশিনগানটা স্তব্ধ করে দাও। মোহর ভাই থামো, এগিয়ে যেয়ো না, থামো ...

মানিক : বাবলা, কাসেম ভাই কোথায়?

(মর্টারের শব্দ ও মেশিনগানের গুলি)

নিয়াজ : মিনিটে ৫টা করে সেল করো, ডাইনে, আর একটু ডাইনে। ঠিক হয়েছে, বাছাধনদের ট্রাকটা একেবারে গেছে। মর্টার থামাও।

স্বপন : রফিক চার্জ। (গ্রেনেডের বিস্ফোরণ)

মানিক : বাবলা চার্জ। (গ্রেনেডের বিস্ফোরণ) এবার জয় বাংলা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। (সমস্বরে—জয় বাংলা)

হ্যাণ্ডস আপ্। ঐ দেখ একটা শয়তান পালাচ্ছে, (গুলির শব্দ) যাক মরেছে। স্বপন ভালোই হয়েছে, নাও ভাই অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদগুলো নিয়ে নাও। (কাতরানোর শব্দ)

স্বপন : কে কাতরাচ্ছে!... বিজন দেখ তো ভাই।....আরে একি কাসেম ভাই ... কাসেম ভাই—(আর্তনাদ করে ওঠে)

কাসেম : আমাকে নিয়াজ ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলো।

মানিক : নে, ধরাধরি করে ওঠা। চল চল

স্বপন : তার আগে ক্ষতস্থানটা বেঁধে নে।

নিয়াজ : কি, কি হয়েছে স্বপন?

স্বপন : কাসেম ভাইয়ের গুলি লেগেছে।

নিয়াজ : কাসেম!

মানিক : কাসেম ভাই!

কাসেম : কেঁদো না ভাই। কেউই বেঁচে থাকার জন্য আসে না। একদিন তাকে যেতেই হয়। আমার দুঃখ নাই, আমি আমার জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছি। এ মৃত্যু আমার অনেক গৌরবের। দুঃখ করো না।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

শিরোনাম : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান।
সূত্র: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৯৭১।

# সোনার বাংলা

**২৯ অক্টোবর, ১৯৭১**

সবাই : আস্‌সালামু আলায়কুম।

ছোটমিয়া : ওয়ালায়কুম আস্‌সালাম।

রুস্তম : কি জমির ভাই ভাবছ কি? আমাদের ছোটমিয়া গো, ছোটমিয়া। আশফাক ভাই কাল যাবার সময় আমাকে বলল, 'চলো বেড়িয়ে আসি'।

জমির : কাল তাহলে তুমি ছোটমিয়ার ওখানে গেছিলে? তা ভালোই হয়েছে।

কাজলীর মা : কি জমির ভাই, আশফাক ভাই আজ আসবে না?

ছোটমিয়া : আশরাফ ভাই আজ আর আসবেন না। উনি রক্ষীবাহিনী গঠনের ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই কাল আমাকে বললেন 'তুমি ভাই আসরে যেয়ো'।

কাজলীরমা : ভালোই হয়েছে।

ছোটমিয়া : জমির ভাই, এবার তোমাদের খবর-টবর বলো। এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে তো যুদ্ধের দামামা বাজছে। একদিকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর অন্যদিকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী।

রুস্তম : ওদিকে আবার জুটেছে ' চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।'

কাজলীরমা : তার মানে, কি বলছ রুস্তম!

জমির ভাই : রুস্তম আজকে আবার ভালো কথা বলছে মনে হচ্ছে! কার কথা বলছ রুস্তম!

রুস্তম : ও, দেখেছো তো শুধু শুধু আমাকে বোকা ভাবো, এখন দেখো বুদ্ধি হয়েছে কিনা।

জমির ভাই : বুদ্ধি তো হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কার কথা বলছ আগে সেটা বলো।

ছোটমিয়া : বলো, রুস্তম। কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া ভালো না। কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত।

রুস্তম : বলব? ওই রাজাকারদের কথা বলছি। খান সৈন্যেরা যত না চেঁচায়, তার চেয়ে বেশি লাফায় রাজাকাররা।

জমির ভাই : তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, 'রাজা যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'।

কাজলী মা : ঠিকই বলেছ জমির ভাই, রুস্তম কিন্তু ঠিকই ধরেছে।

ছোটমিয়া : রুস্তমেরও ধ্যান-ধারণা আছে। আজ বাংলার প্রতিটি মানুষ সচেতন, তারা প্রত্যেকে নিজের দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রাণ যায় তবু স্বীকার, স্বাধীনতা চাই-ই।

জমির ভাই : আমরা দখলদার বাহিনীকে তাড়াবোই। প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ছেলেরা ট্রেনিং নিচ্ছে, মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে।

রুস্তম : ট্রেনিং আমি নিচ্ছি, দুশমনের বিষদাঁত ভাঙ্গতেই হবে। এমন শিক্ষা দিবো জীবনে যেন আর কোনোদিন—

কাজলীর মা : থেমে গেলে কেন, বলো।

ছোটমিয়া : রুস্তম বলতে চাচ্ছে, দুশমন যেন আর কোনোদিন বাংলার মুখো না হয়, বা বাংলার নামও মুখে না আনে। তাই না রুস্তম?

রুস্তম : ঠিক বলেছ ছোটমিয়া। শক্ত কথা তো একটু আটকে যায়। তবে শিখে নিয়েছি। তাই না ছোটমিয়া?

ছোটমিয়া : ঠিকই, মানুষ ঠেকতে ঠেকতেই শেখে।

জমির ভাই : এই রাজাকাররা শিখছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে এমনই মার খাচ্ছে যে বদবুদ্ধি সব কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে!

কাজলীর মা : যাবে না, অন্যায় কদিন থাকবে বলো! দুদিন হয়তো মানুষকে কষ্ট দেবে, তারপর যেতেই হবে।

ছোটমিয়া : ঠিকই, অন্যায় বেশিদিন থাকতে পারে না। একদিন তাকে দূর হতেই হবে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবেই।

জমির ভাই : এই যেমন দেখ না, আমতলীর বসিরউদ্দি খবর দিয়ে গেল, বিশজন রাজাকার পালিয়ে এসেছে, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

রুস্তম : কেন, তিড়িং বিড়িং ফুরালো? হাতে তো রাইফেল নিয়ে গাঁ-গেরামের হাঁসটা মুরগিটা ছাগলটা খুব জুত করে খাওয়া হচ্ছিল, কেন সে শখ মিটে গেল?

কাজলীর মা : সখ মিটবে না? মুক্তিবাহিনীর মার জানা আছে না—এমনই মার দেয়, ল্যাজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড়।

রুস্তম : মুক্তিবাহিনীর ভয়ে খানসেনাদের 'রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম হয়ে গেছে।'

জমির ভাই : কথাটা একেবারে সত্য বলেছ রুস্তম। আর তার জন্যেই তো ওরা নিজেরা কোথাও যাওয়ার আগে রাজাকারদের পাঠিয়ে দেয়। হালচাল দেখে তারপর এগোয়।

রুস্তম : কথায় আছে না, সাবধানের মার নেই।

ছোটমিয়া : কথাটা ঠিকই, কিন্তু এত করেও দখলদার পাকবাহিনীর কূল রক্ষা হচ্ছে না। ওরা ভেবেছিল ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের ইচ্ছাকে, সমগ্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু বাংলার মানুষের বাঁচার ইচ্ছাই বাংলার মানুষকে জাগিয়েছে। আজ বাংলার মানুষ ঘরে-বাইরে সংগ্রামী। একদিকে লড়াই করছে দুঃসাহসী বীর মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে সহায়তা করছে বাংলার সাধারণ মানুষ।

জমির ভাই : আর তাই রাজাকারদের অবস্থা হয়েছে 'বিনা জলে মাছের মতো' খাবি খাচ্ছে।

কাজলীর মা : তার জন্যেই উপায় না দেখে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা দিচ্ছে। বুঝলে ছোটমিয়া, ওদের নাক-কানগুলো কেটে দিতে হয়। কি কষ্টই না মানুষকে দিচ্ছে!

রুস্তম : ওরা যেমন যেমন করে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তেমন তেমন করে শোধ তুলে নেওয়া উচিত।

ছোটমিয়া : ওটা ভুল ধারণা। যারা নিজে এসে ধরা দেয়, তাদের উপর অত্যাচার করাটা ভুল। ওতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়। আর তাছাড়া রাজাকার মানেই যে খারাপ একটা কিছু তা নয়। তুমি কি বলো জমির ভাই।

রুস্তম : জমির ভাইয়ের মনে লাগেনি কথাটা, তুমিই একটু বুঝিয়ে বলো ছোটমিয়া।

কাজলীর মা : সেই ভালো ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া : আচ্ছা জমির ভাই, ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ—কিন্তু সব মানুষই কি খারাপ? তা নয়। আজ বাংলাদেশের রাজাকার যারা তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণের দায়ে রাজাকারে নাম লিখেয়েছে। অনেকে হয়তো সাময়িক লোভে পড়ে রাজাকার হয়েছে। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারছে তখনই দলে দলে সরে আসছে। তখন তাদের আর শাস্তি দিলে ভুল হবে। মানুষেই ভুল করে, তাই না? কি বলো জমির ভাই?

জমির ভাই : ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তবে দুর্বলের উপর আমাদের রাগ নাই, কিন্তু দখলদার সৈন্যের অত্যাচারের জবাব আমরা দেবো।

ছোটমিয়া : ঠিকই, দুশমনদের যোগ্য জবাবই আমরা দেবো। তাদের সমস্ত শক্তি আর দম্ভ আমরা নিঃশেষে চূর্ণ করব।

কাজলীর মা : এ জন্যেই তো ঘরে ঘরে ছেলেরা আজ ট্রেনিং নিচ্ছে। মা-বোনেরা তৈরি হচ্ছে।

ছোটমিয়া : নিশ্চয়ই, কেননা এ সংগ্রাম আমাদেরই স্বাধীনতার সংগ্রাম

রুস্তম : ছোটমিয়া, বলছিলাম এতো সুন্দর সুন্দর কথা হলো এরপর একটা গান হলে হতো না?

জমির ভাই : ঠিকই ছোটমিয়া, একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া : বেশ, তাহলে শোন, একটা দেশাত্মবোধক গান শোন।

(দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া : গান তো শুনলে, বেশ ভালই লাগলো, না কি বলো?

রুস্তম : এরকম গান শুনলে রক্তটা একেবারে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

জমির ভাই : ঠিকই।

কাজলীর মা : সবই তো হলো। ছোটমিয়া, হাতে তো সময়ও নাই।

ছোটমিয়া : হাঁ, হাতে আজকে আমাদের আর সময় নেই, চলো আজকের মতো উঠি।

রুস্তম : চলো।

১ নভেম্বর, ১৯৭১

জমির ভাই : আস্‌সালামু আলায়কুম

সবাই : ওয়ালায়কুম আস্‌সালাম।

ছোটমিয়া : এসো জমির ভাই। খবর সব ভালো তো?

রুস্তম : জমির ভাই নিশ্চয় খবর নিয়ে এসেছে। আজ আসরে আবার ' লেট' এ এল দেখছ না?

জমির ভাই : রোজদিন নিজে দেরী করে আসো। আজ তাই খুব ঠাট্টা হচ্ছে, না?

কাজলীর মা : ঠাট্টা করেনি জমির ভাই। রুস্তম সত্যি বলছে। একটু আগে ছোটমিয়াকে বলছিল জমির ভাই খুব খাটছে।

ছোটমিয়া : খুব ভালো কথা। জমির ভাই শুধু কেন, তুমিও তো খুব খাটো।

কাজলীর মা : নিজের কথা কি নিজে বলা যায় ছোটমিয়া? অন্যের উপর দিয়ে যদি যায় ভালো কথা।

রুস্তম : কি যে বলো। একটু কাজ করি, তা আবার বলে বেড়াতে হবে নাকি? কাজ তো করতে হবেই। সব মানুষ কাজ করছে আর আমি একলা বসে থাকবো নাকি?

জমির ভাই : কি বলছো রুস্তম। তুমি কাজ করো না একথা বলছে কে?

ছোটমিয়া : ওটা কেউই বলেনি, তবে রুস্তম মনে মনে সন্দেহ করছে, হয়তো সবাই ভাবছে রুস্তম কাজ করে না। তাই না রুস্তম?

রুস্তম : ঠিকই ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া : তা কেউ ভাবে না রুস্তম। যে কাজ করবে সে তার মূল্য অবশ্যই পাবে। আজকে আমাদের সবাইকে খাটতে হবে। বর্বর ইয়াহিয়ার সৈন্যেরা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, ক্ষেতখামারে ফসল নষ্ট করেছে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকার সময় তো কারোরই নেই।

কাজলীর মা : এর জন্যেই তো। দিন-রাত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরছি। এই সংগ্রামে আমাদের মা-বোনদেরও দায়িত্ব আছে—কর্তব্য আছে, সেটা তাদের বুঝাচ্ছি। নিজের নিজের সংসার গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করছি।

জমির ভাই : এক হিসেবে এটা তোমার বিরাট দায়িত্ব। আমাদের সবার সবারই প্রতি দায়িত্ব আছে। তুমি ঠিকই করছ।

ছোটমিয়া : আজকের এই দিনে আমাদের মা-বোনরা কেউই বসে নেই। যার যা কাজ করে যাচ্ছেন। এতদিন তোমরা ছিলে অন্দরে কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আজ সংগ্রামে তোমাদেরও ডাক পড়েছে, আজ তোমরাও বেরিয়ে এসেছো বাইরে। আজ তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না কি করব, কেন করব।

রুস্তম : দেখো ছোটমিয়া। এই লড়াই শুরু হয়ে কতো মানুষ ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছে। কতো ভাই ভাইকে হারিয়েছে।

জমির ভাই : ও কথা তুলে মন খারাপ না করাই ভালো, তাই না ছোটমিয়া?

কাজলীর মা : আগে বাপু শোনই কথাটা কি বলতে চাইছে। কথার মাঝে বাগড়া দেওয়া—

ছোটমিয়া : থামো, হয়েছে। রাগ করে জমির ভাইকে এমন করে না ধমকালে হতো না? যাক রুস্তম কি বলতে চাইছো বল তো?

রুস্তম : কি আর বলব, মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

কাজলীর মা : ও মা, এতটুকু কথা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলে চলবে কি করে রুস্তম, তুমি না সৈনিক, তুমি না লড়াই করো?

জমির ভাই : আমি ওভাবে কথাটা বলিনি ছোটমিয়া। আমি ভাবছিলাম, রুস্তম হয়তো কথার তোড়ে আসল কথাই চাপা দিয়ে দেবে, তাই বলেছিলাম। যাক রুস্তম বল।

ছোটমিয়া : আচ্ছা এবার বলো রুস্তম। এখন আর অভিমান করার সময় নেই রুস্তম। আর ওটা তোমার সাজেও না। আজ আমরা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত। কোথাও কোনোদিকে চাইবার সময় নেই আমাদের। এখন সোজা কথা বলো, সোজা কাজ করো। অযথা দুঃখ করে সময় কাটিয়ে লাভ আছে? মনে বল রাখো, বুকে সাহস রাখো, চোখ-কান খুলে রেখে লড়াই চালিয়ে যাও।

রুস্তম : হক কথার এক কথা। ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তাই তো বলছিলাম আমি আজ ভোরে গাবতলীর মাঠ দিয়ে কাসিমপুরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় দেখা মানিকের সাথে। ওই যে মানকে গো—মজিরুদ্দির লাতিটা।

কাজলীর মা : মজিরুদ্দির লাতির আবার কি হলো! খুব ভালো লোক—কিছু হয়েছে নাকি?

জমির ভাই : কৈ, আমি তো শুনিনি কিছু হয়েছে নাকি?

রুস্তম : না কিছু হয়নি। আগে কথাটা শুনোই না বাপু, তারপর পিড়িং পিড়িং করো। বাঁধা সারিন্দার তার হাত লাগলেই পিড়িং।

ছোটমিয়া : থামো রুস্তম। কথাটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। বলো।

রুস্তম : হ্যাঁ, তারপরে মানকে তো মুষড়ে, মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তোর। মুখ এমন শুকনো কেন? বলে কি জানোয়ারগুলো যেখানেই যাচ্ছে সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষগুলোকে মেরে খতম করে দিচ্ছে।

ছোটমিয়া : কাপুরুষ শক্তিপ্রয়োগ করে নিরীহের উপরে। এজন্যেই আমরা আজ রুখে দাঁড়িয়েছি, মরণপণ ক.র লড়াই করে যাচ্ছি।

রুস্তম : আমিও তাই বললাম। যুদ্ধ করছি, করব, কিন্তু শেখ মুজিব বলেছেন, 'দেশকে স্বাধীন করবো।' তাই স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আমরা করবই।

জমির ভাই : ঠিক বলেছ রুস্তম। গ্রামে গ্রামে আজ এজন্যেই আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। যেখানেই দুশমনকে পাও, মারো—ইঁদুরের মতো মেরে মেরে খতম করো।

কাজলীর মা : এর জন্যই তো খানসেনারা শিবির থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। কখন কোনদিকে মারা পড়ে ঠিক আছে।

ছোটমিয়া : মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে গেরিলাদল। আর সঙ্গে সহযোগিতা করছে বাংলার সংগ্রামী মানুষ। প্রতিটি বাড়ি হয়ে উঠেছে দুর্গ। প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠেছে সৈনিক।

রুস্তম : ইয়াহিয়া বুঝতে পারেনি, না বুঝেই ভীমরুলের চাকে ঢিল দিয়েছে। এখন ভীমরুলের কামড়ের চোটে চোখ-মুখ অন্ধকার।

কাজলীর মা : এখন তো খান সেনাদের অবস্থা ' ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'।

ছোটমিয়া : ভীরু কাপুরুষরা যত অত্যাচার করছে, আমাদের মানুষের মনে সাহস এবং শক্তি ততই বেড়ে যাচ্ছে। মানিককে বুঝিয়ে দিয়েছো তো 'শয়তান জ্বালাতে পারে, মারতে পারে না'। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একযোগে লেগেছে—আমরা কামিয়াব হবোই। বর্বরদের তাড়াবোই আমরা।

জমির ভাই : মনে বল ধরতে হবে, আল্লার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, এবং লড়াই করে যেতে হবে। তাই না?

কাজলীর মা : আমারও কথা তাই জমির ভাই।

ছোটমিয়া : আজকের সংগ্রামে জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা এবং শক্তি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং সংগে সংগে দরকার অটুট মনোবল, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে—আমরা জিতব, জিতব, জিতবই। আমাদের আশা-আকাংক্ষা পরিপূরণ হবেই।

রুস্তম : মানকেকে খুব বুঝালাম ছোটমিয়া। তারপরে মানকের সে কি তড়পানি! বলে কিনা, ঠিক বলেছিস রুস্তম, লড়াই যখন করছি, তখন আর ভাবব না, দুশমনকে তাড়িয়ে তবে আরাম করবো। মানকে আবার আশফাক ভাইয়ের কাছে গেল।

জমির ভাই : রক্ষীবাহিনীতে নাম লেখাতে, না?

কাজলীর মা : ঠিকই করেছে। পঙ্গু মনের জোরে পাহাড় ডিঙায়। আর আমাদের তো সবই আছে।

রুস্তম : কি ব্যাপার জমির ভাই, কথায় কথায় তোমাদের খেয়ালই নাই।

জমির ভাই : কি হলো আবার?

রুস্তম : গান শুনবে না? ছোটমিয়া একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া : ওহো, আমারও খেয়াল নাই। আচ্ছা এবার তাহলে একটা গান শোন, দেশাত্মবোধক গান।

(দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া : গান তো শোনা হলো, হাতে সময়ও নাই আর—চলো আজকের মতো উঠি।

কাজলীর মা : চলো, জমির ভাই, রুস্তম চলো যাই।

সবাই : চলো, চলো।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

# জনতার আদালত

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

কুঁকড়্যা : শুন রাসুবু, আমি খুব ভালো কর‍্যা বুঝ্যা লিয়্যাছি, আমাধের দুষমুন আমাধেরই শায়েস্তা কইরতে হবে। তুমি যে একটু আগে বুলল্যা, দানেশ মিয়ার ব্যাটা রাজাকারে ভর্তি হয়া ধরাখে সরা জ্ঞান করছে—তা-ঠিক। আইজক্যাল উঁই খালি লুটপাইট কইরছে না, আরও ম্যালা কিছু আছে।

রাসু : আরে খুলে না বললে কি আর আমি জানিনে। দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম ত পাণ্ডা, ওর সাথে যোগ দিয়েছে মোমিন বেপারীর শালা আর কালু মিস্তিরীর ভাই। সেদিন দেখো না—বলা নাই কওয়া নাই, একদল মিলে এসে আমার গাছের ডাবগুলো পেড়ে নিয়ে গেল, কি না ওদের কে অফিসার এসেছে, সে খাবে। শোন কথা, বেটারা যেন সব বাপের সম্পত্তি পেয়েছে। তা কে বলতে যাবে বল, আমার বোনের ছেলেটা গিয়ে জিজ্ঞেসে করেছে, তাতেই রাগ কতো, এই মারে কি সেই মারে।

কুঁকড়্যা : তুমার ডাব খায়্যাছে। আমার একদিন জাল দিয়্যা মাছ মার‍্যা লিয়্যা গিয়্যাছে। আমি ছিল্যাম না, নাহেলে সেদিন আর জান লিয়্যা যাত্যে দিত্যাম না। আমিও তক্কে তক্কে আছি, আর একদিন পাল্যে হয়।

রাসু : আরে শুধু ফল পাকুড় গেলে ত কথাই ছিল না। ওদের জ্বালাতে আজ কাল বো-বিটীরই কি ঘাট-ঘাটালীতে যাওয়ার যো আছে! সেদিন আমেনা বুবুর বড়ো মেয়েটাকে পানি নিয়ে আসার সময় ধরে, সে যা-তা, আমেনা বুবু যখোন গিয়ে বলল—হ্যাঁরে রহিম, এক পাড়ার ছেলে-মেয়ে, আমার বাশেরা কি তোর বোন নারে! তো সে হারামজাদা কথায় তো কান দিলই না, যা-তা বলতে শুরু করলো। মনে হয় নোড়া দিয়ে ওর মুখ ভেঙ্গে দিই।

কুঁকড়্যা : আমিও শুন্যাছি, আবার হই চই হয়্যাছিল বুল্যা নাকি রহিম আমেনা বুবুকে শাসিয়্যা গেছে—বাশেরাকে চুরি কর‍্যা লিয়্যা যাবে বুল্যা। শুন কথা, দিন দিন হচ্ছে কি? আমাদের সহ্যের বাহেরে চল্যা গেলছে, মোড়ল ভাই আসুক, তুমরাও সবাই আছ, আজই ওদেরকে ডাক্যা আন্যা আমরাই ওদের বিচার করব। তুমরা সবাই মোড়ল ভাইকে বুলব্যা। আইজই য্যানে একটা ব্যবস্থা করে।

মোড়ল : কি ব্যাপার, কুঁকড়্যাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন। নোতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

রাসু : এইত মোড়ল ভাই এসেছে। বল কুঁকড়্যা ভাই, একটু গুছিয়ে বলো ত।

কুঁকুড়্যা : আমি খুব রাগ্যা গেলছি, আমি সাজিয়্যা বুলতে পাইরবো না, তুমি বুল।

মোড়ল : কি হয়েছে রাসু বুবু?

রাসু : কি হয়েছে তা' আমি বলব আর তুমি জানবে? তোমার কি নিজে থেকেই খবর রাখা উচিত ছিল না মোড়ল ভাই। থাক্‌গে যা, বলি শোন। এই যে দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম, গুণ্ডাপাণ্ডার দল নিয়ে রাজাকারে নাম লিখিয়ে গোটা গ্রামটাকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে, এর তোমরা কোন বিহিত ব্যবস্থা করবে, না আমাদেরকে দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মোড়ল : তোমরা কি বলতে চাও, আমি এসব কোনও খবর রাখি না, না কোনও চেষ্টা করছি না। নিজে কদিন রাস্তায়-হাটে ডেকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছি এরপরেও যদি তাদের অত্যাচার বন্ধ না হয় বা রাজাকারের দল থেকে নাম না কাঁটায় তখোন বাধ্য হয়েই মুক্তিবাহিনীর লিস্টে ওদের নাম তুলে দিতে হবে।

কুঁকড়্যা : যদ্দিন সে ব্যবস্থা না হয়, তদ্দিন কি আমরা সহ্য করবো ভাব্যাছো মোড়ল ভাই। এতো বাড়া বাড়্যাছে ওরা যে আইজকাল কাঠা ঘাঁটাতে বৌ-বিটীর হাঁটা-চলা বন্ধ হবার যো হয়্যাছে। কেউ কিছু বুললেই ভয় দেখায়। আইজকাল ত পকেটে ছুটু বন্দুক লিয়্যাই ব্যাড়াই।

রাসু : হ্যাঁ, বাপেদের কাছ থেকে বন্দুক পেয়েছে ত, গুলি-বারুদের হিসেব নাই। আরে মানুষ না হয় দুর্বল, খোদা কি দেখছে না, তোদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবি তোরা।

কুঁকড়্যা : বাদ দ্যাও বুবু ওসব কথা, মোড়ল ভাই। আমি এখুনই যায়্যা ডাক্যা আনছি ওদেরকে। হয় তুমি এখনুই ওদের বিচার কইরব্যা, না হলে কিন্তু খুন খারাবী হয়্যা গেলে আমার দোষ দিতে পাইরব্যা না, হ্যাঁ।

মোড়ল : আরে, কুঁকড়্যা ভাই, মাথা গরম করো না, শোন শোন ...

কুঁকড়্যা : শুনাশুনির কিছু নাই। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। আমি কিছু বুইলবো না, যা বোলার তুমিই বুলো, আমি খালি ডাক্যা আনছি, বুইঝল্যা— আমি চন্নু। (একটু বিরতি)

মোড়ল : রাসু বুবু তুমি একটু বসো, আমি আর দু'চারটে মুরুব্বীকে ডেকে আনি, হাজার হলেও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ব্যাপার, সবারই থাকা উচিত। আরে, এইত নিয়ামত চাচা এসে গেছে, বসো চাচা বসো, পেছনে ওই অন্ধকারের দিকে কে বসে আছে। আবেদ ভাই নাকি—আঃ হা, পেছনে কেন, সামনে এসে বসো না, এসো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসো ওখানেই বসো, আরে ডাক্তার সাহেবকে আড়াল করে দিয়ো না, একটু গুছিয়ে বসো।

রাসু : আচ্ছা মোড়ল ভাই, দানেশ মিয়াকে একটু ডেকে নিলে হতো না, ছেলের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে দানেশ ভাইয়েরও কিছু জেনে রাখা ভালো। পরে আবার না বলে যে, আমরাই অন্যাই করেছি।

মোড়ল : এতো রাগা তোমরা রেগেছ রাসুবুবু, যে, মানুষ পর্যন্ত চিনতে পারছ না, সামনের সারির ওই বামদিকে ওটা কে বসে আছে, দানেশ ভাই না, লজ্জায় এতোক্ষণ কথা বলেনি বুঝলে। দেশ ও দশের এই দুর্দিনের কারো ছেলে যদি শত্রুর সাথে পাঞ্জা মিলিয়ে এমন সব জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, তবে স্বভাবতই সে বাপের মুখ লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

রাসু : আচ্ছা মোড়ল ভাই, এই যে পাকিস্তানের মিলিটারিদের অমানুষিক অত্যাচার, লুট, গ্রাম পোড়ানো, খুন আর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করা—আর দেশেরই কিছু লোকের ওদের দিকে হয়ে ওদেরকে সহযোগিতা করা, এর কি কোনও ব্যবস্থা নাই? কিছু একটু বলো না—এরকম সময়ে আমাদের কি করা উচিত?

মোড়ল : হ্যাঁ, আমি তোমাদের সবাইকেই এ'সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, দেখ—পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের শত্রু। তারা শুধু শোষণ করার জন্য আমাদেরকে জুলুম করে ওদের গোলাম করে রাখতে চায়। ওদের মেরে নিঃশেষ করে দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। রীতিমতো যুদ্ধ হচ্ছে এবং শুনলে অবাক হবে, খোদা সহায় আছেন বলেই, সব জায়গাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা মার খাচ্ছে আর পিছু হটছে। আমাদের কাজ হলো—সবরকমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে অসহযোগিতা করা এবং এমন কিছু না করা, যাতে আমাদের দেশের পয়সা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।

রাসু : তা কি করে সম্ভব? ওরা আমাদের ধার ধারছে থোড়াই? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই ত করছে।

মোড়ল : খুব সম্ভব। ওদের মনোবল এতো ভেঙ্গে গেছে, যে, আজকাল কোনও জায়গায় আর নিজেরা এগোচ্ছে না। আমাদেরই ভাই-ছেলে দিয়ে তৈরি করা রাজাকার আল-বদর বাহিনীকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ছেলেরা যাতে ওদের কাজ না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারপরে—ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যত ক্ষতিই হোক, একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য ক্রয় করা চলবে না। আমরা যারা দেশে অসহায় হয়ে পড়ে আছি, তারা এভাবেই মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, তাতে করে যুদ্ধরত আমাদের ভাইদের কাজ এগিয়ে যাবে।

কুঁকড়্যা : এই যে মোড়ল ভাই। তোমার আসামীরা। সবাইকে নিয়্যা আস্যাছি। যা বোলার তুমি বোলো।

মোড়ল : এইযে রহিম, বাদশা মিয়া, শাকের ভাই, বসো, সব বসো।

রাসু : এঃ আদর করে আবার বসতে বলা হচ্ছে। ওরা ভদ্রলোকের মধ্যে বসার যোগ্য?

মোড়ল : থাম রাসু বুবু। অমন করে কাউকে বলতে নেই। দোষ থাক্ গুণ থাক, ওরা আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে। আমাদেরই ভাই-ভাইপো। আমরা

মানুষের কাজের সমালোচনা করতে পারি, কাজকে ঘৃণা করতে পারি—মানুষকে নয়।

কুঁকড়্যা : তুমার ওই ব্যবহারেই ত ওরা অতো আস্কারা পায়্যাছে। হুঁঃ, কথায় আছে—ছেল্যাক্ থাবা, বুড়্যাক বাবা, তা না ভাই-সোনা কর‍্যা কর‍্যা....

মোড়ল : তুমি থাম কুঁকড়্যা ভাই। শোন রহিম, তোমরাও শোন বাদশা ভাই। তোমরা রাজাকার হয়েছে ভালো কথা, যদিও আমাদের সেটুকুই বরদাস্ত করা উচিত নয়। অন্যান্য স্থানের রাজাকাররা শুধু নামেই রাজাকার, তারা কাজ করছে। আমাদের তোমরা তাতো করছই না, উল্টে তোমাদের অত্যাচারে গাঁয়ের লোকের সুখ-শান্তি শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ। এমন কোনও নোংরা কাজ নাই যা তোমরা করোনি। আজ এই সভা যে শাস্তি তোমাদের দেবে—তা তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। কারণ, গ্রামবাসীরা তোমাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তোমাদের বিচার করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে।

(সমস্বরে কয়েকজনে)

সমস্বর : আমরা ওদের মুখ দেখতে চাই না। ওদের গ্রাম থেকে বের করা হোক। ওদের যোগ্য শাস্তি দেয়া হোক।

কুঁকড়্যা : মাইরের বদল মাইর। ওরা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে, আমরা তার বদলা মার‍্যা লিবো।

মোড়ল : দেখছ ত রহিম, তোমাদের বিষয়ে মানুষ কতো উত্তেজিত। যাহোক, ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়। এবার যদি তোমরা কথা দাও যে আর কখনও অন্যায় করবে না আর উপস্থিত সবার কাছে ক্ষমা চাও ...

কুঁকড়্যা : ওসব বুজিন্যা। এই বুটারা—পাঞ্জাবিরা তোধের বাপ। দেশের লোক ভালো লাগে না! এই দেখ শাস্তি কি দিই। (লাঠির শব্দ)

(উঃ হু-হু-রে, আঃ, ওরে বাবারে)

মোড়ল : থাম কুঁকড়্যা ভাই। এবারের মতো ওদেরকে ক্ষমা করা হলো। তবে জানিয়ে রাখি, মুক্তিবাহিনীর তালিকায় তোমাদের নাম দেয়া আছে, ওরা তোমাদের গতিবিধির ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সাবধান না হলে ভবিষ্যতে মারা পড়বে বলে দিলাম।

কুঁকড়্যা : হ্যাঁ— তেড়িবেড়ি কইরব্যা তো মইরব্যা।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

# গ্রাম বাংলা

**১৬ নভেম্বর, ১৯৭১**

মাষ্টার ভাই : সবাই এসে গেছে? ময়না বু'তো এখনো এল না? রাত হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া শীতের মধ্যে লোকজনকে বেশিক্ষণ আটকে রাখাও যাবে না। তুমি ওদের খবর দিয়েছিলে তো?

বনি : হ্যা, ভালো করে বলে দিয়েছি, কাজের কথা আছে, লোকজন আসবে, সাঁঝ লাগতেই ইদলপুরের স্কুলে চলে এসো।

মাষ্টার ভাই : তাহলে ওরা আসবে। যাক এবার আমরা কথাবার্তা শুরু করি। দেখ তো বাইরে কার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বনি : ভালোই হয়েছে, ময়না বু এসে গেছে। এসো বুবু এসো।

ময়না বু : আঁধারি রাত, আসতে একটু কষ্ট হলো বাপু। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আসতে পারিনি।

মাষ্টার ভাই : ভয়ের কি আছে? ভয়কে জয় করে চলতে হবে।

ময়না বু : ভয় নয়, তবে, 'সাবধানের মার নাই'। শয়তান জল্লাদ বাহিনীর চেলাগুলো কোথায় কখন কিভাবে আসে কেউ জানে?

মাষ্টার ভাই : ময়না বু'র কথাটা ঠিকই 'সাবধানের মার নাই'। শয়তান গুলো তো নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, মারলেই হলো। তাছাড়া মনুষ্যত্ব বলতে ওদের নাই কিছুই। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালিরে মারো, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করে দাও।

বনি : আমরাও কিন্তু কসম করেছি, ওই জানোয়ারগুলোকে না তাড়াতে পারলে, আমরাও আরাম করব না। দেখ না, দিনে মাঠে কাজ করি, রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর সাথে দুশমনকে মারতে যাই।

ময়না বু : এটা আমাদের করতেই হবে। দেশ যখন শত্রুমুক্ত হবে, তখন বসে বসে গল্পগুজব হৈ-হল্লা ঠাট্টা-তামাসা করা যাবে, কি বলো?

বনি : আমার কথাটাও তাই। যারা আমাদের জানের দুশমন তাদের আমরা শেষ করবই।

মাষ্টার ভাই : আজকে এই শপথ নিয়েছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ, প্রতিটি স্তরের মানুষ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে।

বনি : কিন্তু একটা কাজ খুব ভালো হয়েছে মাষ্টার ভাই, কথায় আছে না সাপের লেজ আর শত্রুর শেষ রাখতে নাই। মুক্তিবাহিনী একথা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে— দেশের শত্রু দালাল, এই দালালগুলোকে মেরে শেষ করছে।

ময়না বু : পাকিস্তানের দালালগুলোই তো পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে ঐ জল্লাদ বাহিনীকে, ওরা কাকে চেনে বলো তো? ওরা এদেশের মানুষ, না,

কাউকে চেনে? দালালরাই তো লোকজনকে চিনিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে।

বনি : এ জন্যেই তো আমরাও একটা একটা করে দালাল শেষ করছি। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে এতটুকু কাজ করবে, তাকে আমরা কিছুতেই রেহাই দিব না। আমরাও দালালদের চিনে চিনে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিব।

মাস্টার ভাই : হ্যাঁ, দেশের এই মারাত্মক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী এবং সুযোগসন্ধানী সেইসব শয়তান, যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মানুষের নিঃসহায়তার সুযোগ নিয়ে মানুষকে জ্বালাতন করছে, তাদেরকে আমাদের খতম করতে হবে। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে—এইসব দালালদের শেষ না করলে গেরিলা বাহিনীর গোপন আস্তানাও গোপন থাকবে না। অতএব আমাদের সংগ্রামের নিরাপত্তার জন্য, সাফল্যের জন্য আমাদের ঘরের দুশমনের চিহ্ন রাখব না। এরাই হচ্ছে জাতির কলংক, এদের ঠাঁই নেই বাংলার মাটিতে।

ময়না বু : ওদিকে আবার মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের খবর ভালো। চট্টগ্রাম, চালনা—দুটো বন্দরেই বিদেশী জাহাজ আসতে চাচ্ছে না।

বনি : কেন ময়না বু?

ময়না বু : আমাদের গেরিলারা কড়া পাহারার মধ্যেও হরদম জাহাজ ডুবাতেই আছে। অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ এরই মধ্যে অনেকটা ডুবেছে। তাছাড়া দিন কয়েক আগে একটা তেলবাহী জাহাজও ডুবিয়ে দিয়েছে। এত কড়া পাহারার মধ্যেও এ দুর্ঘটনা ঘটাতে শয়তান পাকবাহিনী তো, হকচকিয়ে গেছে।

বনি : শুধু জাহাজই না ময়না বু, লঞ্চ, নৌকা কিছুই নিরাপদ না। নৌকায় করে শয়তানগুলো যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনী গুলি করে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ওদের এখন তরাস ধরে গেছে, ডাঙাতেও ভয়, পানিতেও ভয়।

ময়না বু : জুলুম করার আগেই একথা ভাবা উচিত ছিল। অন্যায় করলে তার প্রতিফল পেতেই হবে। আমাদেরই টাকায় গুলি কিনে আমাদেরই খুন করবে, এ তো হতে পারে না! এজন্যেই দিন কয়েক আগে দুটো জাহাজ বাংলাদেশ থেকে পাট নেবে বলে এসেছিল, গেরিলারা ও-দুটোও ডুবিয়েছে।

মাস্টার ভাই : বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে বলেছিলেন আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'। আজ দেখো সে কথাটা কতখানি সত্য। শয়তানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে। এখন পাগলা কুকুরের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটছে। বিদেশ থেকে সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার সম্পদ নিয়ে যে শক্তিমত্ততা দেখাতো আজ তার সেসব জারিজুরি ভেঙে গেছে।

বনি : এবারে তো বাংলাদেশের মানুষ পাট ভেঙে ফেলে ধান বুনে দিয়েছিল, যার জন্য পাটের উৎপাদনও কমে গেছে অনেক।

মাস্টার ভাই : শুধু পাটই না—চা, তামাক এগুলোরও কোনও উৎপাদন নাই। চায়ের বাগানগুলো এখন মুক্তিবাহিনীর কব্জায়, যার জন্য জল্লাদ সৈন্যদের ভাগ্যে আর চা জুটছে না, এখন নিষিদ্ধ পদার্থের মতো চা খাওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে জল্লাদবাহিনীর। যে অন্যায় তারা করেছে তার তিল তিল করে শোধ তুলে দিবো আমরা।

বনি : একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম মাস্টার ভাই, সেদিন তুমি বললে না, কতগুলো খানসেনা খতম হয়েছে?

মাস্টার ভাই : গত এক মাসের হিসেব ২৪৭০ জন জল্লাদ সেনা, আর তাদের অফিসার খতম হয়েছে এবং রাজাকার পুলিশ মিলিয়ে খতম হয়েছে ২২০০ জন। ২৪টা সামরিক গাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, ৫টা মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন নষ্ট হয়েছে।

ময়না বু : খুব ভালো হয়েছে—'যেমন কর্ম তেমন ফল'। বাংলাকে দেখেছে, বাংলার মানুষকে দেখেনি। বাংলার মানুষও যে প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে লড়াই করতে পারে, জুলুমের প্রতিকার করতে পারে, এবার বুঝেছে।

বনি : লড়াইয়ের খবর-টবর বলো মাস্টার ভাই।

মাস্টার ভাই : আমাদের মুক্তিবাহিনী একটা গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অধিকাংশ স্থানই দখল করে নিয়েছে, সড়কটা হচ্ছে দিনাজপুর-ফুলবাড়ির মধ্যে। এই সড়কের পার্শ্বে দুশমনদের যেসব রাজাকার ছিল, এখন সেগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে, মুক্তি-বাহিনীর কাজে লেগেছে। এখানের লড়াইয়ে ৪৫ জন পাকসেনা খতম এবং তিনজন আহত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি সেক্টরেই তুমুল লড়াই চলছে।

বনি : লড়াই আরো জোরদার হয়েছে। দুশমনরা পিছু হটতে শুরু করেছে। টাঙ্গাইল তো মুক্তই হয়ে গেছে মাস্টার ভাই।

ময়না বু : আস্তে আস্তে সবই মুক্ত হবে বনি। ধৈর্য ধরতে হবে, মনের বল রাখতে হবে। তাই না মাস্টার ভাই?

মাস্টার ভাই : ঠিকই। লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চোটে জল্লাদবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা লড়াই করছি স্বতস্ফূর্ত ভাবে, নিজের দেশকে উদ্ধার করার জন্যে, আর ওদের সৈন্যরা বেতনভোগী পেশাদার সৈন্য—দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। দেশের জন্য যার বদর আছে তার শক্তি ওই ভাড়াটিয়া সৈন্যদের চেয়ে দশগুণ বেশি।

বনি : এটা একেবারে খাঁটি সত্য কথা। দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য জান দিতে যাওয়া কি কম কথা মাস্টার ভাই? এর থেকে বড় গৌরব আর কি আছে? কিন্তু ওই দালালগুলো বুঝতে পারেনি সে কথা। তাই মরছেও দমাদম।

ময়না বু : 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

বনি : ঠিক বলেছ—ময়না বু, লোভের খেসারত দিচ্ছে। ইসাহাকের ঠ্যাং খোঁড়া হলো, সুলতানউদ্দিন মরলো, মোনেম খাঁ মরলো, একে একে সব মরবে।

মাস্টার ভাই : ফসলের জমিতে যেমন আগাছা রাখতে নাই, ঠিক তেমন একটা সমাজে বা জাতির মধ্যে বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক রাখতে নাই। যাক শোন, তোমাদের একটা কথা বলি, সবাই খেয়াল রাখবে কে আমাদের মধ্যে মোনাফেকি করার সুযোগ নিচ্ছে—তার নাম চাই, নাম দিতে হবে মুক্তিবাহিনীকে। গ্রামে গ্রামে লোক লাগাও, ময়না বু তোমার পক্ষে এ কাজটা করা অনেক সহজ, তুমি অন্দরমহলের মারফত খবর পাবে। খবরগুলো পৌঁছে দিও।

ময়না বু : আচ্ছা মাস্টার ভাই। তা মাস্টার ভাই বলছিলাম কি, রাত তো অনেক হলো, আমি উঠি।

বনি : তুমি একলাই যাবে না, আমরাও যাবো।

মাস্টার ভাই : হ্যাঁ চলো, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে, চলো আমরাও যাই।

বনি : কাল সকালে তুমি একবার আমার সাথে দেখা করো, কথা আছে।

মাস্টার ভাই : চলো, যাই।

সবাই : চলো।

**৩০ নভেম্বর, ১৯৭১**

মাস্টার ভাই : যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন মারাত্মক। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, আর পাকিস্তানি শয়তানগুলো প্রাণের ভয়ে পিছে হটে যাচ্ছে। বনি, আমাদের আরো সজাগ আরো সতর্ক হতে হবে।

বনি : আমরা সতর্ক আছি মাস্টার ভাই। মানুষের মনের শক্তি কেমন বেড়ে গেছে শুনেছ! মুক্তিবাহিনী যতই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ ততই যেন নতুন শক্তি অর্জন করছে।

মাস্টার ভাই : এটা তো খুবই স্বাভাবিক বনি। বাংলার মানুষ যেমন আমাদের গেরিলাদের আশ্রয়স্থল, আমাদের গেরিলারা এবং মুক্তিবাহিনী ঠিক তেমনি বাংলার মানুষের ভরসাস্থল।

বনি : পরশু কালিগঞ্জ গেছিলাম। মুক্তিবাহিনীর গানবোটে চড়ে। গায়ের লোক আমাদের বোট দেখে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে নদীর পাড়ে এসে হাজির, আর আমাদের দেখে কতো খুশি! .... কে যায়? কে?

বসির ভাই : আমি বসির। কে, বনি নাকি?....আরো মাস্টার ভাই দেখছি। আসসালামু আলায়কুম।

মাস্টার ভাই : ওয়ালায়কুম আসসালাম। এসো বসির ভাই। কোথায় যাচ্ছিলে?

বসির ভাই : ময়না বুবুর কাছে যাচ্ছিলাম। কাল কিছু কাপড়-চোপড় ময়নাবুবু জোগাড় করেছে, মুক্তাঞ্চলের গরিব-দুখীকে দেওয়ার জন্য, ওগুলো নিয়ে আসি।

বনি : আমিও কিছু জোগাড় করেছি, তাহলে তুমি সেগুলোও নিয়ে যেয়ো, আমি আবার অন্য কাজে আটকা পড়ে গেছি, সময় পাচ্ছি না।

বসির ভাই : ঠিক আছে নিয়ে যাবো। তারপর কি গল্প করছিলে তোমরা।

বনি : গল্প না, বসির ভাই। সত্যি ঘটনা।

মাস্টার ভাই : বনি পরশুদিন কালিগঞ্জে গেছিল তারই গল্প করছে।

বসির ভাই : কও, শুনি। আমিও যাবো একদিন।

বনি : যা বলছিলাম, মাস্টার ভাই, ঘাটে যখন বোট ভিড়ল, লোকে কি খুশি। এর মধ্যে এক বুড়া মানুষ হঠাৎ বলে উঠল 'বাপুরে, আজ তোমাদের গানবোট দেখে আমরা ছুটে আসছি তোমাদের দেখার জন্য। আর দুদিন আগে ওই শয়তানের বাচ্চারা যখন আসত, নদীর দুই পাড়ে গাঁয়ের লোক কে যে কোথা পালাবে, তার হিসাব পেতো না। মেশিনগান ফিট করে রাখতো। সমানে গুলি চালাতো পাড়ে, কে মরবে, কে বাঁচবে, বলা মুস্কিল ছিল।

মাস্টার ভাই : মানুষের মনে ভয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এলোপাতাড়ি গুলি চালাতো, সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কিছু যেতো-আসতো না—কিন্তু আজ শয়তানরা বুঝতে পেরেছে, বাংলার মানুষ তাদের চরম ঘৃণা করে। মুক্তিবাহিনীকে পরম আদরে তারা ডেকে নেয় কিন্তু জল্লাদদের দেখলে ঘৃণায় মরে যায়।

বসির ভাই : কথাটা কিন্তু ঠিক। অত্যাচার করে যে মানুষের মুক্তির ইচ্ছাকে দমানো যায় না সেটা শয়তানগুলো বুঝেছে।

মাস্টার ভাই : আর আজ বেঈমানের জাতগুলো তাই ' পোড়া মাটি নীতি' অবলম্বন করেছে। তারা যে অঞ্চল ছেড়ে পিছু হটে যাচ্ছে সে অঞ্চলটা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ধান চাল লুটপাট করে দিয়ে যাচ্ছে, বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বনি : তাতেই কি মানুষকে কোনোদিন দাবিয়ে রাখতে পারবে?

মাস্টার ভাই : না, মোটেই না। এ জন্যই তো আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না।'

বসির ভাই : মাস্টার ভাই, চলো না হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে যাই, ময়না বুবুর ওখানে।

বনি : কথাটা ঠিকই বলেছ বসির ভাই। চলো মাস্টার ভাই ময়না বুবুর ওখানেই যাই, কাজের কথাও হবে, একটু গল্প করাও যাবে।

বনি : ময়নাবু'.... ও ময়নাবু'।

ময়না বুবু : কে? বনি নাকিরে—আরে ভাই, কাজ করছি।

বসির ভাই : আমরাও এসে গেছি ময়না বুবু,

ময়না বুবু : এসো, এসো, মাস্টার ভাইও দেখছি, বসো।

মাস্টার ভাই : কাপড়-চোপড় তো অনেক জোগাড় হয়েছে দেখছি ময়নাবুবু। ভালোই করেছ। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবন তো ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটছে, মুক্ত হওয়ার পর মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবণ কাটছে একটা বিভীষিকাময় ঘোরের মধ্যে। স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, ঘুম নাই, আরাম নাই, এদিকে শয়তানগুলো আর রাজাকার-বদর বাহিনীর জানোয়ারগুলো মানুষের ঘর থেকে তাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে। তাদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম অন্তত কিছু করতেই হবে। ময়নাবুবু আমিও কিছু জিনিস ঔষধপত্র আর কাপড়-চোপড় জোগাড় করে দেবো।

ময়না বুবু : আমরা তো মানুষের সেবা করতে পারি। তাই এই সেবার ভারটা আমি হাতে তুলে নিয়েছি।

মাস্টার ভাই : আজ বাংলার মা-বোনেরা এভাবেই তো দেশের সেবা করছে, সেবা করার জন্য এগিয়ে এসেছে ময়নাবুবু। আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যে যা কাজ করতে পারে, সে তাই করবে। যে-কোনও কাজ দ্বারাই মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করা যায়। যে মুক্তিবাহিনীর জন্য মরচা খোঁড়ে, তাদের শত্রুর অবস্থানের খবর এনে দেয় অথবা মুক্তিবাহিনীর গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যায়, সেও মুক্তিসংগ্রামের সামিল, সেও মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করছে।

ময়না বুবু : যুদ্ধের খবর-টবর কিছু বলো মাস্টার ভাই।

বনি : তাহলে আমিই বলি—যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে তুমুল লড়াই চলছে। ক্যান্টনমেন্টের উপর চরম আঘাত হানছে। এদিকে আবার জল্লাদবাহিনী মসজিদে মসজিদে ওদের জন্য দোওয়া করতে বলেছে। বেটারা মরে মরে ভূত হচ্ছে আর আতংক বাড়ছে।

বসির ভাই : নোয়াখালীর কথা শুনেছ? মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখল করে এখন ফেনীর দিকে এগিয়ে চলেছে। পথে ছাগলনাইয়া দখল করে নিয়েছে। ছাগলনাইয়া ফেনী থেকে মাত্র চার মাইল দূরে।

ময়না বুবু : এদিকে তো আমি শুনলাম, পচাগড় মুক্তিবাহিনীর দখলে আর সেটা দখল করার জন্য পাক ফৌজ খুবই চেষ্টা চালাচ্ছে।

বসির ভাই : চেষ্টা তো করবেই, কিন্তু পারলে হয়। মুক্তিবাহিনী যেখানে মুক্ত করছে, তাদের ঘাঁটি শক্ত করছে।

ময়না বুবু : ঢাকা শহরে তো হরদম বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। কয়েকটি পেট্রোল বোমার আগুনে রেলসেতুগুলোর চরম ক্ষতি হয়েছে।

মাষ্টার ভাই : মুক্তিবাহিনী এখন প্রতিটি সেক্টরে তৎপর। রাস্তা-রেল-নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অধিকৃত অঞ্চলে পঞ্চাশ থেকে একশ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। সমস্ত শহরের চারিদিকে পরিখা খোঁড়া হয়েছে। দোকানপাট সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় তো জোর গুজন দু' হাজার মুক্তিসেনা প্রস্তুত, যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বসির ভাই : মুক্তিবাহিনী এদিকে ঝিনাইদহ পাঁচমাথার মোড় দখল করে নিয়ে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে।

বনি : এদিকে তো আর দু' চারদিনের মধ্যেই রাজশাহী-নবাবগঞ্জ দখল হওয়ার উপক্রম। মুক্তিবাহিনী ১৭ জন রাজাকার, তিনজন পাকসেনা বন্দি করে এনেছে আর বহু রাইফেল আর গুলি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

ময়না বুবু : এর জন্যই তো শয়তানগুলো এখন পালাবার পথ খুঁজছে।

মাস্টার ভাই : পালাবে আর কোথায়? এখন ওরা সবাই আশ্রয় নিতে চাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টগুলোয়। আর মুক্তিবাহিনী তাদের সে পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এখন শয়তানগুলো ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বাংলাদেশের পথে-ঘাটে মুক্তি-বাহিনীর হাতে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরছে। পাকিস্তানি ৬০টা ট্যাংকের মধ্যে ১৭ টাই তো মারা পড়েছে। বিমান বহরের ১৮টা বিমানের মধ্যে পাঁচটা নেই। নদী-আকাশপথ আর সড়কে কোথাও নিস্তার নেই। শয়তানদের।

ময়না বুবু : সংঘবদ্ধ মুক্তিকামী মানুষের শক্তি যে কি প্রচণ্ড তার প্রমাণ পাচ্ছে শয়তানরা এখন।

বনি : আরো পাবে বুবু, কিন্তু সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

বসির ভাই : যাক ময়নাবুবু, কথাবার্তা তো হলো, এবার কাপড়-চোপড়গুলো দাও, আমাদের আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলে যাবো।

ময়নাবুব : এইযে দিচ্ছি ভাই।—নাও, কাল আরো কিছু পাবো, পরশু এসে নিয়ে যেয়ো।

বসির ভাই : আচ্ছা।

মাস্টার ভাই : চলো, আমরা তাহলে যাই। বুবু চলি।

**৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

মাস্টার ভাই : এখন আমাদের দুর্যোগময় রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে। এখন আমাদের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শত্রুশিবির একের পর এক মুক্তিবাহিনীর পদদলিত হচ্ছে। মুক্তাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে দিনের পর দিন। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ এখন ফেলছে স্বস্তির

নিশ্বাস! মুক্তাঞ্চল দিয়েছে তাদের নতুন জীবনের আশ্বাস। আজ আমরা জমায়েত হয়েছি দুটো কারণে। একটা হলো—আমরা মুক্তিবাহিনীকে কিভাবে আরো সাহায্য করতে পারি তারই পরিকল্পনা নিতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হলো—সদ্য মুক্তাঞ্চলের বিপর্যস্ত জীবনধারা আমরা আবার স্বাভাবিক এবং সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। এ কাজ নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তার জন্য চিন্তা আমরা করি না, কেননা মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তি আপন আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, সচেষ্ট এবং উন্মুখ। আমরা গভীরভাবে আমাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী।... কি ব্যাপার বসির ভাই কিছু বলবে নাকি?

বসির ভাই : পাকিস্তানি জল্লাদগুলো নিজের ঘাঁটি ছেড়ে পালাবার সময় আশেপাশের গ্রাম-বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এর জন্য আমরা কি করব? আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি, আমাদের বলো।

বনি : হ্যাঁ মাষ্টার ভাই, বসির ভাই ঠিকই বলেছে। প্রত্যেকটা জায়গায় একই রকম অন্যায় করছে ওরা। আমাদের বুদ্ধি দাও কি ভাবে সাহায্য করব আমরা।

মাষ্টার ভাই : নানাভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা। প্রথমত যেসব অঞ্চলে ওরা এমন অত্যাচার করছে বা করেছে সেখানের খুঁটিনাটি খবরাখবর আর ক্ষতির পরিমাণ জানতে হবে। তারপর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অত্যাচারিত মানুষকে আশু সাহায্য করতে হবে। অসুস্থ আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র নিয়ে যেতে হবে।

মাষ্টার ভাই : তাহলে সবাই প্রস্তুত। প্রতিটি মানুষকে খবর দিয়ে রাখো। যে ছোট ছোট দল ভাগ করে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তাদের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত থাকবে।

বসির ভাই : সে কথা বলে দিয়েছি মাষ্টার ভাই। ইতিমধ্যেই কয়েকটা সাহায্যকারীদল চলে গেছে। ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়ও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছু জোগাড় করে রেখেছি।

মাষ্টার ভাই : খুব ভালো করেছ। লড়াই যেভাবে তীব্রতর হচ্ছে, তাতে বিজয়ের দিন আমাদের সুদূর নয়। জল্লাদবাহিনীর বিষদাঁতগুলো একের পর এক ভেঙে আমরা মুক্ত করব বাংলাদেশ।

বনি : এদিকে তো মুক্তিবাহিনী যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর জেলার আরো কয়েকটি থানা দখল করে নিয়েছে।

বসির ভাই : শুধু তাই নাকি? গেরিলা আক্রমণে হেরে গিয়ে পাক ফৌজ যশোর শহর থেকে পাকবাহিনীর সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে মাগুরা শহরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ময়নাবুবু : মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকফৌজ এখন চেঁচাচ্ছে 'পালাও' পালাও'। এখন ওরা যাযাবরের মতো আজ এ-শহরে কাল ও-শহরে পালাবে, শেষে পালাবার যখন পথ আর থাকবে না তখন কি করবে?

বনি : তখন বঙ্গোপসাগরে—পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরী মহানন্দা আত্রাই আর পুনর্ভবায় ইঁদুরের মতো ডুবে মরবে। আর তা না হলে এখন যেমন মাঝে মাঝেই ধরা দিচ্ছে, তখন মুক্তিবাহিনীর কাছে দলে দলে ধরা দেবে।

ময়নাবুবু : সাহায্যের সব রাস্তাগুলোই তো বন্ধ হয়ে গেছে। নদীপথ, সড়ক আর রেলপথে যোগাযোগ তো বন্ধ, এদিকে আবার বিমানপথও বন্ধ হবার উপক্রম। গেরিলারা লালমনিরহাট বিমানবন্দর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

মাস্টার ভাই : যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শয়তানগুলোর এখন আর অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না, তখন হবে হয় মৃত্যু নয় আত্মসমর্পণ। এ ঘটতেই হবে, হতে বাধ্য। ইতিহাসের লিখন মর্মান্তিকভাবে ওদের যে পরাজয় লিখে রেখেছে, তাতে হানাদারদের নিঃশেষ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বনি : এদিকে শুনেছ গেরিলাবাহিনী নাগেশ্বরী থানাটা দখল করে নিয়ে লালমনিরহাট বিমানবন্দরটা ঘিরে ফেলেছে, এখান থেকে হানাদারদের জন্য বিমান চলাচল বা বিমানের সাহায্যে কোনও সাহায্য দ্রব্য পাঠানো একেবারে বন্ধ—

বসির ভাই : গত বুধবার মুক্তিবাহিনী সিলেটের শমসেরনগর বিমানঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছে। রংপুরের ধরলা নদীর উপরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে হানাদারদের আঘাত হানার জন্য দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার ভাই : মুক্তিবাহিনী খুলনার সাতক্ষীরা শহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে এবং ফেনীর কমলপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা যশোর জেলার সাদিপুর, ঝিনাইকুণ্ড এবং জামিরা এলাকা থেকে দখলদার সৈন্যদের বিতাড়িত করেছে।

ময়নাবুবু : মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর জেলার বোদা থানা সদর দপ্তর দখল করে নিয়েছে। পচাগড় থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এই বোদা থানা। এখন মুক্তিবাহিনী তীব্রগতিতে ঠাকুরগাঁয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে দখল করে নিয়েছে। এদিকে আবার ময়দানদীঘি এলাকাটা হানাদার বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে।

বনি : মুক্তিবাহিনী এখন যেখানে আঘাত হানছে সেখান থেকেই শয়তানরা পিছু হটছে। সময় হয়ে গেছে, বাছাধনরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে এখন 'ইয়া নফসি, ইয়া নফসি' শুরু করেছে।

বসির ভাই : বনি, একটা সুন্দর আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে শুরু করেছ ফাজলামি, তোমাকে কতবার বলা হয়েছে, এখন ঐসব হালকা কথাবার্তা বলবে না।

মাস্টার ভাই : যাক তোমরা দুজনেই থামো, মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা জেলার তিনটে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে। শয়তানদের বাইরের সংগে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই এলাকাগুলো হলো গঙ্গাসাগর এবং রাজারকোট।

বসির ভাই : যশোর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে নাভারন-সাতক্ষীরা রোডটি থেকে পাক জল্লাদবাহিনীদের সরিয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরা শহর থেকে তিন মাইল দূরে ভোমরা-সাতক্ষীরা রোডে হানাদারদের সংগে মুক্তিবাহিনীর জোর লড়াই চলছে।

বনি : কুষ্টিয়া জেলার কথাও শোন তাহলে। জীবননগর তো মুক্তিবাহিনীর দখলে; এদিকে আবার জীবননগর থানার উত্তর-পূর্বে আন্দুলবাড়িয়া এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। চুয়াডাঙ্গা দখলের ব্যাপার নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সংগে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

ময়নাবুবু : ও কথাটা বললি না? ওই যে ঈশ্বরচন্দ্রপুর এবং দামুরহুদা থানার কাছেও তুমুল লড়াই চলছে। এখন মুক্তিবাহিনী শুধু বলছে 'মারো আর তাড়ো'।

মাস্টার ভাই : মারো আর তাড়ো। কথাটা ঠিকই। বগুড়া জেলায় মুক্তিবাহিনী আরিয়াকান্দি থানায় ২২ জন পাক দস্যুকে খতম করেছে। আর বেঁচেছিল দুজন, তারা আবার পালাতে না পেরে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ময়নাবুবু : পাক জানোয়ারগুলো যেখানে না পারছে, সেখানেই বিমান আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষদের মারছে, তাদের বাড়িঘর নষ্ট করে ফেলছে।

মাস্টার ভাই : কিন্তু তাতেই কি বাংলাদেশের মানুষের মনোবল ভাঙাতে পারবে? পারবে না। কোনোদিন ওরা সক্ষম হবে না। বাংলার মানুষের মন আরো সবল, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। শত দুঃখ-কষ্টেও বাংলার মানুষ ভেঙে পড়বে না।

বনি : বাংলার মানুষ বরং মুক্তাঞ্চলে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করেছে; চাষবাস করছে, ফসল কাটছে, ফসল তুলছে ঘরে।

মাস্টার ভাই : এদিকে আরেক খবর শুনেছ? ঢাকার বেতার কেন্দ্র, পাকিস্তানের প্রলাপের ভাণ্ডার একদম বন্ধ হয়ে গেছে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণে শেষ পর্যন্ত ওদের দালালী কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বসির ভাই : ওদের হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে, গলার স্বরও বন্ধ হয়ে আসবে। হতেই হবে।

মাস্টার ভাই : যাক, যুদ্ধের আলোচনা হলো, আমরা খবরবরাখবর তো শুনলাম, এবার আমরা আমাদের অন্য আলোচনায় আসি।

ময়নাবুবু : বলো মাস্টার ভাই। আমরাও কাজের কথা শুনি।

মাস্টার ভাই : ময়নাবুবু শোন, মেয়েদের কাজ প্রচুর আছে। তোমরা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষকে সান্ত্বনা দেবে। নতুন করে গেরস্থালী যারা গুছিয়ে নিচ্ছে, তাদের সাহায্য করবে। মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া বা তার ভাঙা সংসার গড়ে তোলার কাজে তোমরা সাহায্য করতে পারবে সবচেয়ে

বেশি। এ কাজের ভারটা তোমাদেরই নিতে হবে। তাছাড়া শয়তানদের বোমায় আহত বা যুদ্ধে আহত মানুষের সেবা করার দায়িত্বও তোমাদের নিতে হবে। আশা করি এ কাজটা ভালোই পারবে তোমরা, তাই না?

ময়নাবুব : হ্যাঁ, মাস্টার ভাই। খুব ভালোভাবে পারব। আমি আমার দলবল নিয়ে এই কাজই করছি, দরকার হলে আরো কয়েকজনকে নিয়ে নিবো।

মাস্টার ভাই : বসির ভাই, বনি—তোমাদের কাজ হবে আহত অসুস্থ মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা, মানুষের ঘরবাড়ি তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং খাদ্য এবং আশ্রয়হীন মানুষের জন্য খাদ্য এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

বসির ভাই : বনি, তাহলে আমি উত্তর পাড়ায় যাচ্ছি, ওখানেই কাজ করব, আর তুমি তোমার ছেলেদের নিয়ে পূর্ব পাড়ায় চলে যাও।

বনি : হ্যাঁ, আমি পূর্ব পাড়ায় থাকবো, মাস্টার ভাই তুমি আসবে তো? আমাদের মাঝে মাঝে বুদ্ধি-সুদ্ধি দিবে, কিভাবে কাজ করলে সুবিধা হবে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিবে।

মাস্টার ভাই : নিশ্চয় আমি সব জায়গায় যাবো, আমি সবসময় তোমাদের সংগে সংগে থাকবো, আর শোন কাল আবার এ সময় এস, কতগুলো নির্দেশ আছে, সেগুলো জানিয়ে দেবো। আর একটা কাজ করো, মানুষের মনোবল অটুট রাখার জন্য তাদের সংগে গল্পগুজব করবে, যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। আর হ্যাঁ, শয়তানদের ঘাঁটির খবরবরাখবর, ওদের চলাফেরার খবরগুলো কিন্তু অবশ্যই জোগাড় করবে।

বনি : ঠিক আছে, তাহলে আমরা যাই। ময়নাবুবু চলো যাই তোমাকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে আমি যাবো।

ময়নাবুবু : চল উঠি, মাস্টার ভাই তাহলে গেলাম।

মাস্টার ভাই : আচ্ছা।

বসির ভাই : তাহলে মাস্টার ভাই, চলো আমরাও যাই।

মাস্টার ভাই : চলো।

(রচনা ও পরিচালনা : মুস্তাফিজুর রহমান)

(এক)

জয় বাংলা বাংলার জয় ॥
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময় ॥

বাংলার-প্রতিঘর ভরে দিতে
চাই মোরা অন্নে।
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে
মুক্তির সিক্ত তারুণ্যে ॥

নেই——ভয়
হয় হউক রক্তের প্রখ্যাত ক্ষয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
অশোকের ছায় যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ।
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ ॥
শাসনের নামে চলে শোষণের
সুকঠিন যন্ত্র।
বজ্রের হুংকারে শৃংখল ভাংতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর —— নয়।
তিলে তিলে মানুষের এই পরাজয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয় ॥

(কথা — গাজী মজহারুল আনোয়ার)

(দুই)

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা।
যার নদী জলে ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে নদীর নীল অম্বরে মোর মেলছে পাখা
সারাটি জীবন সে মাটির গানে অস্ত্র ধরি ॥

নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি—
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি ॥

যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভুলে
যে গৃহকপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খুলে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি ॥

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য আজি অস্ত্র ধরি ॥

(কথা — গোবিন্দ হালদার)
[ শিল্পী আপেল মাহমুদ ]

(তিন)

আমি এক বাংলার মুক্তি সেনা
মৃত্যুর পথ চলিতে
কভু করি না ভয় করি না।
মৃত্যুরে পায়ে দলে চলি হাসিতে।
দুঃসহ জীবনের রাহু মুক্তি
প্রাণে মেখে সূর্যের নবশক্তি
বজ্রশপথে নেমেছি যুদ্ধে
বাঙালির জয় হবে নিশ্চয়
চলেছে এ দুর্জয় মুক্তির পথে।
বাংলার তরে আমি সঁপেছি এ মন
নেই জ্বালা হাহাকার নেই হুতাশন।
রক্তে রাঙা আজ বিপ্লবী মন
ক্ষমা নেই বাংলার গণদুশমন

বজ্রের তূর্যের মন্ত্রে
মারবো এবার মরবো না আর
চলেছি যে শত্রুকে পায়ে দলিতে।
(কথা— নেওয়াজিস হোসেন)*

(চার)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা ॥
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শোধবে তারা
ও জনতা এই জনতা এই জনতা ॥
তোমার সভায় আমীর যারা,
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা।
তোমার রাজা মহারাজা,
করজোড়ে মাগবে বিচার।
ঠিক যেন তা এই জনতা ॥

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে ॥
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে।
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে
প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে ॥
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে,
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে।
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে ॥
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।
ঠিক যেন তা এই জনতা ॥

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা ॥

(কথা—সলিল চৌধুরী)

---

[ * ১৯৭১ সালে নেওয়াজিস হোসেনের বয়স পনেরো বছরের বেশি ছিল না।]

(পাঁচ)

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি
বলো যতো খাঁটি
তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটিরে
আমার জন্মভূমির মাটি ॥
ধন জন মন যত ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে।
কত মার ধন মানিক রতন
কত জ্ঞানীগুণী কত মহাজন।
এনেছে আলোর সূর্য এখানে
আঁধারের পথ পাতি রে
আমার বাংলা .... .... .... ॥
এই মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম
কত তিতুমীর, কত ঈশা খান
দিয়েছে জীবন, দেয়নি তো মান।
রক্ত শয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়েছে পরিপাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।

(কথা—আবদুল লতিফ)

[ শিল্পী—শাহনাজ রহমতুল্লাহ ]

(ছয়)

ছোটদের বড়দের সকলের।
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের ॥

নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান দেশ মাতা এক সকলের
লাঙ্গলের সাথে আজ চাকা ঘুরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা সে যে কোন প্রাণে
মসজিদ, মন্দির, গির্জার আবাহনে

বাণী শুনি একই সুরের ॥
চাষাদের মজুরের ফকিরের
ফকিরের নিঃস্বের গরিবের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।
বড়দের ছোটদের সকলের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার এদেশ সব মানুষের ..... ॥

(শিল্পী—রথীন্দ্রনাথ রায়)

(সাত)

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই ॥

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক কাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥
প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি ত শান্তি আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত

হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রা চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

হতে পারি পথভ্রম আরও বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আশায় ত সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই।

আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন অগ্নিশিখা জ্বলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

(কথা—সিকান্দার আবু জাফর)

(আট)

মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
অনাচার অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-ঝংকার-হুংকার
আমরণ সংঘাত, প্রচণ্ড উদ্দাম
সংগ্রাম—সংগ্রাম—সংগ্রাম!

ক্ষমতা দম্ভ লোভ লালসায় যারা
জনতার অধিকার করে খর্ব
ঘরে ঘরে গড়েছি দুর্জয় প্রতিরোধ দুর্গ
তাদের আজ প্রতিহত করবোই করবো।

যারা শানুষের রক্ত চোখে,
মানুষের মাঝে আনে ব্যবধান

যারা পৃথিবীর কলঙ্ক কালিমা,
কেড়ে নেয় মা-বোনের সম্মান
এসো রক্তশপথে আজ আঘাতে আঘাতে
তাদের করি খান্ খান্—

বাঁচার জন্য ভয় সংশয় রেখে
প্রতিজ্ঞা করেছি আজ মোরা লড়বো
কাটিয়ে জীবনের দুঃখ ঝরা রাত্রি
নতুন এক পৃথিবী গড়বোই গড়বো।

(কথা—শহীদুল ইসলাম)

(নয়)

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
পাড়ি দিবরে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে ॥
জীবন কাটি যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।
ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই।
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই ॥

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে ॥

জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না।
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না ॥

বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায় ॥

হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শান্ত সোনার
দেখি ঐ ভোরের পাখি গায় ॥

তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পারে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে।
তীরহারা এই ঢেউয়ের
সাগর পাড়ি দিব রে ॥

(শিল্পী : আপেল মাহমুদ ও সঙ্গীরা)

(দশ)

অবাক পৃথিবী দেখো
রূপসী বাংলা রুদ্র মূর্তি আজ ॥

তোমরা চিন্‌তে মায়াভরা সেই বাংলাকে
তোমরা জান্‌তে শস্য শ্যামলা বাংলাকে
সেই সে বাংলা আজ হয়েছে ক্ষুধার রাজ ॥
যে দেশ ছিল সোনার ফসলে ভরা
যে দেশ ছিল নীল নভঃনীলে বেড়া
আঘাতে আঘাতে সেই পলিমাটি চৌচির হলো আজ ॥

যে মায়াকুঞ্জ একদিন ছিল পাখির কূজনে ভরা
যে সহজ মন একদিন ছিল স্নেহ প্রীতি মায়া ঘেরা
সে হৃদয় যন্ত্রে আজ গরজে উঠেছে বাজ ॥

(কথা : নূরে আলম সিদ্দিকী)

(এগারো)

রক্তেই যদি ফোটে
জীবনের ফুল
ফুটুক না, ফুটুক না, ফুটুক না ॥

আঘাতেই যদি বাজে
প্রভাতের সুর
বাজুক না, বাজুক না, বাজুক না ॥

গান গান গান বেজেছে অগ্নি গান
দূর সব ব্যবধান
সাত কোটি প্রাণ বিসর্জনে
বাংলা গ্লানি ঘুচুক না, ঘুচুক না ॥

এক এক এক
হয়েছি সবাই এক
আসুক দুর্বিপাক
ক্ষুব্ধ মিছিল চলবেই চলবে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠুক না, উঠুক না ॥

(কথা : সৈয়দ শামসুল হুদা)

(বারো)

নোঙর তোল তোল সময় যে হলো হলো
হাওয়ার বুক নৌকা এবার
জোয়ারে ভাসিয়ে দাও
শক্ত মুঠি বাঁধনে বজ্র বাঁধিয়া নাও
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা ভোল
দূর দিগন্তে সূর্য রথে
দৃষ্টি রেখেছ স্থির
সবুজ আশায় স্বপ্নেরা আজ
নয়নে করেছে ভিড়
হৃদয়ে তোমার মুক্তি আলো
আলোর দুয়ার খোল ॥

(কথা : নঈম গওহর)

(তেরো)

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো, এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে জেগেছে কাঁপন
আয়রে বাঙালি ডাকিছে রণ ॥

ঘরে ঘরে ঐ জ্বলছে অগ্নিশিখা
শহীদের খুনে লিখতে রক্ত লেখা
আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গেছে পাহাড়
ভেঙ্গেছে ওরে বন্ধুগণ ॥

দিকে দিকে তোরা আয়রে সর্বহারা,
মুক্তি শপথ ভেঙ্গেছে বন্দি কারা ॥

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে পথের বাঁধন
ওরে ও বাঙ্গালি শোন্‌রে শোন ॥

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো এ জীবন পণ।

(কথা : টি. এইচ. শিকদার)

(চৌদ্দ)

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে পরশ মনে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল ॥
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল,
হয়েছে কাল, হয়েছে কাল ॥

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুন প্রতিরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া শ্মশান, নয়া শ্মশান।

আর দেরী নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয় বিষাণ
বিদ্যুৎ গতি হউক অভিযান।
ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রুজাল, শত্রুজাল ॥

(কথা— গোবিন্দ হালদার, সুর—সমর দাশ)

(পনেরো)

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আন্‌লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না ॥

দুঃসহ এ বেদনার কন্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আন্‌লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না ॥
কিষাণ কিষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে
আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে
আমরা তোমাদের ভুলব না ॥

(কথা— গোবিন্দ হালদার, শিল্পী—স্বপ্না রায়)

### (ষোলো)

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে ॥

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে ॥

ভাইয়ের বুকের রক্তে আজিকে
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে
সংগ্রামী আজ মহা জনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে ॥

বাংলাদেশের লাখো বাঙালি
জয়ের নেশায় চলে রক্ত ঢালি
আলোর দেয়ালী ঘরে ঘরে জ্বালি
ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালি—
শহীদ স্মৃতি বরণে ॥

(কথা—ফজল-এ-খোদা)

(সতেরো)

সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের
শ্মশান করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মতো
জবাব দিতে হবে ॥

শ্যামল বরণী সোনালী ফসলে
ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সদা ব'য়ে যেত
পূত অমৃত ধারা
অগ্নিদাহনে সে সুখ স্বপ্ন
দগ্ধ করেছে কে?
আমরা চেয়েছি ক্ষুধার অন্ন
একটি স্নেহের নীড়
নগদ পাওনা হিসেব কষিতে
ছিল না লোভের ভীড় ॥

দেশের মাটিতে আমরা ফলাবো
ফসলের কাঁচা সোনা
চিরদিন তুমি নিয়ে যাবে কেড়ে
হায়রে উন্মাদনা
এই বাঙালির বুকের রক্তে
বন্যা বহালো কে?
পৃথিবী তোমার আসামীর মতো
জবাব দিতে হবে ॥

(কথা, সুর ও শিল্পী—মকসুদ আলী খান সাঁই)

(আঠারো)

সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে,
বন্ধুগো এসো হয়েছে সময়,
পথ যে তোমায় ডাকছে ॥

বন্ধুগো আজ চেয়ো না পিছে,
আজকে শঙ্কা করো না মিছে,
বাংলার মাটি, বাংলার তৃণ,
তোমাদেরই কথা বলছে ॥

বন্ধু অনেক বেদনা সয়েছি,
অনেক হয়েছি কাতর,
বন্ধু ভুলেছি বেদনা এবার
হৃদয় করেছি পাথর ॥

রক্তের দাম চাইনাকো আর
আজকে দেখুক বিশ্ব আবার,
বাংলার প্রাণে, বাংলার গানে
আগুনের শিখা জ্বলছে ॥

(কথা-সারওয়ার জাহান)

(উনিশ)

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারীভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা
ছেঁড়ে খুড়ে খাবলায়
খাবলায় নরপাল ॥

ঘুম নয় এই খাঁটি ক্রান্তি
ভাঙো ভাই খোয়ারির ক্লান্তি
হালখাতা বৈশাখে
শিষ দেয় সৈনিক হরিয়াল ॥

দুর্বার বন্যার তোড়জোড়
মুখরিত করে এই রাঙা ভোর
নায়ে ঠেলা মারো হেই এইবার
তোলো পাল তোলো পাল ধরো হাল ॥
কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার
হাতিয়ার কলমের তলোয়ার
সংগ্রামী ব্যালাডে
ডাক দেয় কমরেড কবিয়াল ॥

(কথা : আবুবকর সিদ্দিক)

[ সুর ও স্বরলিপি : সাধন সরকার ]

(কুড়ি)

শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ ॥

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ ॥

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয়বাংলা' বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিন মণি।

(কথা— গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শিল্পী—অংশুমান রায়)

(একুশ)

অত্যাচারীর পাষাণ কারা জ্বালিয়ে দাও।
সভ্যতার ওই বধ্যভূমি জ্বালিয়ে দাও।
শত্রুহনন চল্‌ছে দিকে দিকে
সকল যুগের নিপীড়িতের পক্ষ থেকে
আপোহসীন সংগ্রামের
শেষ কথাটি জানিয়ে দাও।

অসুরের হাড়কাঠে
তোর পায়ের ধূলিঝড়
ওরে লাগুক,
লাগুক ভয়ঙ্কর—

খুনের বদলা খুন নেবো
খুন নেবো আজ
রক্ত লোভীর খুনী পাঁজর ভেঙ্গে

হানাদারের কল্‌জে ছিঁড়ে
খুনের আগুন জ্বালিয়ে দাও ॥

(কথা—আল মুজাহিদী)

(বাইশ)

আমার নেতা শেখ মুজিব,
তোমার নেতা শেখ মুজিব,
দেশের নেতা শেখ মুজিব,
দশের নেতা শেখ মুজিব,
আহা বাংলা মা'র কোল কইরাছে উজল।
ওরে মনের আশা আল্লায় তাঁরে কইরা দিক সফল রে
আশার আলো করতাছে ঝলমল,
ও দ্যাখো আশার আলো করতাছে ঝলমল ॥

আমার নেতা শেখ মুজিব,
দিশার নেতা শেখ মুজিব,
যুগের নেতা শেখ মুজিব,
সবার নেতা শেখ মুজিব,
আজি নেতার নেতা হইছে শেখের ব্যাটা।
ওরে সাবাস ব্যাটার বুকের পাটা, যেমন বিজলী ঠাটা রে
চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা,
এবার চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা ॥
হাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
জাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
চুলির বন্ধু শেখ মুজিব,
আহা এমন বন্ধুর তুলনা আর নাই।
ওরে নিজের প্রাণ বিলাইয়া করে দ্যাশেরি ভালাই রে,
আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই
ও এবার আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই !!

(কথা ও সুর—হাফিজুর রহমান)

(তেইশ)

ও বগিলারে,
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া ॥
ও বগিলারে, ...।

শিয়াল কান্দে, কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া হায়রে ॥
দুপুর রাইতে ডুপরি কান্দে, ভুট্টো বড় মিয়া, কান্দে!!
ও বগিলারে, ... ।

আপন ফান্দে আপনি বন্দি টিক্কার চৌখত পানি, ঐ দেখ ॥
আন্ধার দেখে মাইরের চোটে মিছাই বন্দুক তানি ॥
ও বগিলারে, ... ।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বাংলার মাটি ঠুকরি ভাংলু কার।
আষাঢ় মাসোত কাদোয় পড়ি
হলু নাজেহাল, ও তুই হলু নাজেহাল।
শাওন মাসোত ফালগুন ছাড়ি
নেংটি করলো ছাড়
বৈঠার গুঁতায় বাপরে মরে
জান বাঁচে না আর
ও তোর জান বাঁচে না আর।
মরদ মরদ কাওয়ার শালি
কেমন তোর মরদানি ঐ ॥
বন্দুক ছাড়ি ঘর উদাসী, ও তুই ॥
বউয়ের আগে কেরদানি
গাইলের চোটে কোমর ভাংগী ভাত বাড়িনু গিয়া
হাত বাড়াইয়া কান্দে এখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া, টিক্কা-ইয়াহিয়া
ও বগিলারে
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।

(কথা—হরলাল রায়, শিল্পী—রথীন্দ্রনাথ রায়)

(চব্বিশ)

ওরে আমার দেশের মানিক সোনা ॥
তোরা হাসিয়া জীবন দিতেছিস
শেখ মুজিবের সব জানা ॥

তোদের মতো কে আর আছে,
তোদেরে মারতে বসেছেরে ॥
তোরা দুরাচারী ধ্বংস কর
সহায় আছে রাব্বানা ॥

কত দিন করবে শয়তানী
উড়িয়ে দেরে তার জীবন খান ॥
তোরা শেষ কর তাদের দুশমনি
গুলিকে ভয় কইর না ॥

যত শয়তান আছেরে দেশে,
বেশিদিন রবে না,
কয়দিন পরে খুঁজলে তাদের,
একটিও পাবি না ॥

তোদের কাছে সবাই নত,
শেষ করে দাও শত শত ॥
এখন হইছে বাঘে হত হত
প্রাণ ভয়ে আর বাঁচে না ॥

(কথা : সুর ও শিল্পী—শাহ্ আলী সরকার)

(পঁচিশ)

মোদের ফসল কেড়ে নিলরে,
যারা মারলো জাতি-কুলরে,
তোরা ভাই শেষ কর তাদেরে ॥
তাদের পাঠাইয়া দেরে তোরা,
ঐ না যমের ঘরে ॥

তোদের খাইয়া মানুষ হইল,
তাই বাঘেরা বেঁচে রইলরে ॥
এবার বুঝিয়ে দে ভাই সকল
কেমনে যায় সে পারে ॥

হানাদারীর পাঞ্জেগানা
ভিতরে শয়তানী
এবার বুঝুক বাঙ্গালিদের
সিংহ বিক্রমণি ॥

তোরা জয়ধ্বনি কর ... বাঙ্গালি
জোরছে কষে গুলি মাররে ॥

দেখবি তোরা জয় হয়েছিস
এই ভব সংসারে ॥

(কথা, সুর ও শিল্পী—শাহ্ আলী সরকার)

(ছাব্বিশ)

ওরে ও বাঙ্গালিরে,
দুশমনদেরে, দেশে রাইখ না ॥
যারা তোদের খাইয়া তোদের মারে
তারে ক্ষমা কইর না ॥
খানের ঘরে খান ইয়াহিয়া—
মানব পশু গেছেরে হইয়া ॥
ভাইরে মারে ভাই হইয়া
কি আজব এ ঘটনা ॥
কতদিন আর ঘুমাও ঘরে;
চাইয়া দেখ আজ বাহিরে,
ওরে অবোধ নয়ন মেললি না ॥

ও বাঙ্গালি—
মরুভূমির বাঘে ঘুরে
এবার মার ধইরে ধইরে ॥
চালাও গুলি বুদ্ধির জোরে
একটিও প্রাণ রাইখ না ॥

(কথা, সুর ও শিল্পী—শাহ্ আলী সরকার)

(১—৪ গান শামসুল হুদা চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িকী 'অনেক রক্ত একটি জাতি', ৫—১৬ গান ' বেতার বাংলা ডিসেম্বর, ১৯৭৯', ১৭—২৩ গান শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'একাত্তরের রণাঙ্গন' এবং ২৪—২৬ গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত।)

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজি অনুষ্ঠান : নিউজ কমেন্টারি।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ : জুন—সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

# NEWS COMMENTARY*

১৯ জুন, ১৯৭১

With the postponement of the forthcoming meeting of the Aid-to-Pakistan Consortium of World Bank begins a New pahse in the international response to the genocidal war in Bangladesh—formerly the majority wing of Pakistan. The postponement is particularly significant because this is for the first time in the 86-day old war between the people powers including USA and Britian have spoken in silent but real terms about their dislike of what is happening in the East. After all, the Consortium is not a charitable organisation. It grants interest carrying loans only when it feels that the recipient country can guarantee the safety of both principal and interest. It does not require an expert to see that the genocidal war has made Pakistan totally bankrupt. Although the Newsweek has quoted a very low price for Pakistani rupees at the international money market, the reality is that Pakistani rupees is not saleable at all. Eye-witness reports from such open money markets as Beirut Hong Kong and Bangkok indicate that buyers would not even touch Pakistani rupee let alone naming a price however low. Pakistan is trying to find a temporary relief by borrowing from rich Arab sheikhdoms. But they, too, are business men and are not likely to prove too eager to throw large amounts of gold down the one-way drains fo Pakistan's dewindling economy.

The World Bank team that visited Bangladesh last week quickly saw through the carefully fabricated veil of deception put up for them by Yahya's henehmen. According to its report, widespread famine is just round the corner in Bangladesh.

---

* ইংরেজি সংবাদ ভাষ্যগুলি 'আহমেদ চৌধুরী' ছদ্মনামে আলমগীর কবীর রচিত।

Peter Cargil, Chairman of the World Bank Aid-Pakistan Consortium, has talked only about possible increased food aid prior to his departure from Karachi. Through the diplomatic euphemisms of his comments it has become clear that the World Bank wants Pakistan to find a political solution of the problem in the East before further economic aid can be considered with seriousness. Almost simultaneously comes a similar statement, from William Rogers, US Secretary of State. He, too, has stressed upon a political settlement of the war in Bangladesh for what he termed as lasting peace in the sub-continent. France, Canada and Japan—three other members of the Aid Pakistan club are presumably thinking on the same line.

Thus two clear-cut world opinions are polarising fast on Bangladesh issue. The public opinion around the world, greatly moulded by extensive press reporiting, is clearly in favour of recognising Sheikh Mujibur Rahaman and his party as the sole legal and moral spokesman for the people of Bangladesh. They are convinced that after the genocidal war of The Army junta over the people of Bangladesh the Nery basis Pakistan has now vanished and that the people of Bangladesh must be granted independence forthwith. They are genuinely worried about a serious threat to international peace in the area.

The second opinion is that of Western governments. It has been rather slow in crystalising, but is clearly bringing pressure now upon Yahya regime to seek political solution of the problem. If the lunatic generals are in a listening mood they are likely to be tempted by the proposal because it offers them sufficient room for political ....amoeuvering with out can ceding anything. A flowing of proposats and counter proposals would buy them sufficient time during which to make a yet another frantic effort to find money for footing the bill of the mad adventure—an adventure that aims at a total colonisation of Bangladesh, at least for a few decades. It would be foolish to expect that a fascist army that undertakes and executesa mass extermination programme without any armed provocation whatsoever would agree willingly to a political settelement. ...

If, as a repurcussion, thousands of Muslims die in the communally vulnerable areas of India, Pakistani junta could not care less. All they want is a political advantage over India. Those Muslims of India who have been showing their allegiance to the Pakistani Junta and are finding it difficult even to sympathise with great misery perpetrated by the junta on the people of Bangladesh should note this point. They should also note the treatment that is being meted out to the refugees from India in various West Pakistan provinces, particularly in West Punjab. However, the Indian Prime Minister has more than once expressed her determination to counter the visious Pakistani plot and has already taken measures against communal violence in India.

The world must act now—not only in the interest of the captives and displaced of Bangladesh but also in its own interest. It must recognise the legitimate, popularly elected government of Bangladesh and arrange for the total withdrawal of the iavading army of Yahya. Only this can ensure a political stability in the region.

.... জুন, ১৯৭১

Western governments, although still inadequately, are showing signs of awakening to the gigantic refugee problem that Pakistani Army janta has inflicted with deliberation upon India. According to roports, Releif goods are pouring in daily in Calcutta. These are being distributed speedily among the sufferring millions in the camps. The quantum of aid is expected to rise over the coming weeks. But this should not encourage to much hope in the sufferers inside and outisde Bangladesh. The sympathy for the refugees in the international community may continue indefinitely, but, the aid pipeline is most certain to dry up gradually before the end of the year. Naturally, one could not possibly expect the donor countries to go on bearing such a heavy burden indefinitiely. So what happens in the end? The load again passes on the the hardpressed economy of India. But can India absorb such a shock? No.

Thus a permanent solution must be found immediately before the sub-continent develops into another bloody trouble spot of the world. The Pakistani junta seems to have been fairly successful in the propagand field in its effort of diverting the world attention from the cause to the effect, from the criminal to the crime. The world seems to be more keen on arranging temporary relief for refugees who have crossed the border than on containing hordes of Yahya who were not only responsible for the crisis but are bent upon delaying the inevitable solution, namely, a free political climate, honourable and suitable for the refugees to go back eagerly to their homes. They cannot go back as long as the occupation army that murdered their dear ones and uprooted them with senseless brutality remain on the soil. The world must equally wake up to fate of the millions of captives who for various reasons failed to leave their country and are now desperately marking time in a state of terror. Deliberate destruction of foodgrains and foodcrops all over the occupied area has made an unprecedented famine a sure possiblity. Because of the almost total disruption of the communiation system, distribution of foodstocks that escaped destruction has become impossible. Already famine looms large over the districts like, Barisal, Patuakhali and Faridpur. Since Pak Army's carnage people have been subsisting on summer fruits before they could even ripen. By the end of May, all green mangoes, jack-fruits, bananas and whatever was humanly edibel were exhausted. Price of rice shot up from Rupees forty a maund i. e. 80 pounds to Rs. 90 a maund. A match box costs 50 paisa. There is no salt, on sugar or tea. Nobody, rich and poor alike, has the money to buy anything. Pakistan Army soldiers and officers not only destroyed market places and foodgrain stocks but also robbed every household of cash money and gold. Overnight thousands of families were reduced to beggary. But there is none left rich enough to given them alms.

This is the state of affairs that these lunatic generals of Pakistan are bent upon of continuing unless there is a

superior power either to eliminate them or to force them to call off the mad adventure. The heavy causalty among the young officers has given rise to some dissension within Pakistan army. A coup d'etat cannot be ruled out. But the world cannot go on waiting silently for that to happen, nobody knows when....

২০ জুলাই ১৯৭১

A frightened Yahya has threatened war. The depserate man has now brought out his last card in the game of international deception and blackmail that he has been playing ever since he let loose his primitive hordes to massacre inncoent human beings in Bangladesh. In an interview with a correspondent of the Financial Times of London he has tereatened India with war if, as he liked to put it, India captured any part of East Pakistan. He even hinted that if he declares War on India he will not be alone—meaning he will be backed by some other state in his aggression. This is, indeed, yet another of the series of political blunders that he and his accomplices have been committing ever since March 1, the day he dealt a lethal blow to the re-emergence of domocracy in Pakistan and paved the way toward total disintegration 25 days later. Yahya's threat is an expression of extreme frustration that usually makes appearance prior to a nervous breakdown. This is, in reality, a public admission of the precarious War position in Bangladesh. He has now admitted that Pak Army has lost positional control over vast areas of Bangladesh.

Accoridng to reports from various fronts, Pakistan Army has retreating in all sectors following massive inspired attacks by Liberation Forces. In the western sector, Pak Army sufferred partict heavy casualites and almost whole of Kushtia district has recaptured by Mukti Bahini.

Observers believe that the significant setbacks suffered by Pakistan Army in this sector has been mainly responsible for Yahia threat of war on India. Naturally he is accusing India for terrible that his occupation army lost to Mukti Bahini. How could he that his 'invincible' army has been putting up a pathet-

ic show a the ill-equipped but superbly inspired youths of Bangladesh Liberation Forces? The pretending that his men were losing to mighty is a desperate attempt at an artificial resuscitation of, at least own moral. But the world knows better. Scores of foreign jour have toured the liberated areas of Bangladesh. They have also the camps of Mukti Bahini miles inside Bangladesh territory talked with the commanders and commandos.

Foreign Television networks shot films of Mukti Bahini open from war fronts. Their reports would easily testify that Indian nothing to do with the liberation war. As a matter of principle war is being fought only by the dedicated citizens of Bangladesh The cause of their spectacular success has been, not a grant fire power, but a supreme sense of dedication. They are fighting the liberation of their motherland. Pakistan invaders, even though they bristle with armoury, will never match their spirit and armament. But Yahya and his accomplices are too drunk with narcissistic madness to be able to recognise this. After all the war not threaten the clique of their families. As thousands of soldiers die thousands of miles away in the muddy, rain-soaked of Bangladesh these officers enjoy the cool comforts of office and company of international call-girls. Swiss banks are looking the safety of their private fortunes—fortunes that they accute robbing Bangladesh and Pakistan for the coming rainy day. the army rank and file discover their visious motives and make too hot—they will have chartered Boeings to fly them with their to the safety of Swiss villas.

The darkly hint that Yahya will not be alone when he aggression against India shows that he has still remained the bully he always was. Obviously he has forgotten that China ventured outside her borders since Korea. Even the US-backed of Laos could not stir her up. Whether she will come in direct military confrontation with India just to please Yahya's fascist junta is a question that is not too difficult to answer. On the other hand, India is no.... to be frightened by the desperate muscle-flexing of amilitarily sterile—and deeply frightened gang leader such as Yahya. Moreover,

Yahya's self-deceiving presumption that India is friendless once again points out his total back of political understanding.

৮ আগষ্ট, ১৯৭১

With Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko's significant visit to New Delhi probably begins the decisive stage of the Bangladesh liberation Struggle. The Soviet Government has reportedly given clear indications about its support for India if Islamabad military junta with American and Chinese approval chooses to declare war against India in its frantic and clearly suicidal effort to avert military defeat in Bangladesh in the hands of the Bangladesh Liberation Forces. This resolute stand of the Soivet Government may well mean an end to Yahya's war cries as both Nixon and Lin Piao are not likely to risk a world war with unthinkable consequesnces just to save the ulgy faces of Yahya and his accomplices. It other words, the possiblity of Indo-Isalmabad military conflict has now become a great deal remoter than it seemed even a few days ago. And that means the failure of Yahya junta to internationalise the Bangladesh issue with a view to crushing the liberation struggle.

Political observers believe that the Chinese, even the American stand on the issue might experience qualitative changes during the coming weeks—the weeks that are sure to prove crucial for the future of Bangladesh, West Pakistan and South East Asia. The Indian protest against American military and ecomomic aid to Islamabad junta is certain to have discernible effect on Nixon Administration. India has informed Washington that she considers such aid as hostile acts against India as Yahya's are threats were direct consequences of American support. The Indian denouncement is likely to have telling effects on American domestic politics. Nixon, by what now gradually appears to be a short-sighted policy, has alienated the largest democracy in the world but has gained nothing tangible yet from the Chiness front in return. While India is definitely moving out of the sphere of American influence, China is still sounding no less belligerent so far as U. S. Imperialism is concerend. Noxon is yet to not any concerets gain to prove to the voters that Peking has been floored and the

threat of revolutionary communism has been eliminated to justify the sacirifice of U. S. influence over India that was cultivated with so much sweat after Indo-Chinese border clash in 1962. China in her own interest may not concede an idecological sell-out to USA just to gain an entry at the United Nations without which she has been doing not so badly so far. Finally, comes the cruel treatment of the people of Bangladesh by President Nixon. Despite compera-tively poor publicity of the genocidal crimes of Yahya junta in the United States politically consicous people in general were shocked by the way Nixon lined up with the murderes. This porved an added burden over a conscience already badly bruised over Vietnam. In his desperate attempt at getting a hold over the Chinese plum Nixon did not have the time even to use the publicity media to create opinion in favour of the Pakistani fascists. Now if Sheikh Mujibur Rahman is murdered as has been threatened by Yahya regime when Nixon could easily secure his personal safety and release, that would mean really the point of no return for him. With such a poor record Nixon would surely prove a very bad runner at the 1972 presidential elections.

It is not that Nixon does not realise the mess he has got himself in during last few weeks. What then could be his strategy to avert his impedding political disaster for the Republicans. His first move is likely to be to find a 'political soultion' short of independence for Bangladesh and get Sheikh Mujib to consent to it. As Yahya junta has made the scene too messy to make them presentable at a conference table one should not be surprised to see the good old CIA back at its favourite game and pull off a coup d'etat by a group of so-called moderate generals.

Field reports by American officials still staying in Bangladesh must have convinced him that, let alone victory a military defeat is imminent for the Pakistani army caught in Bangladesh. If Nixon succeeds in saving the surviving army personnel here Pakistan would still remain tied to US apron strings out of sheer gratitude.

On the other hand, the Chinese stand on the issue on longer appears rigid. Peking radio has remained quiet over the issue for

an unusally long time. The latest all-out American support for the Pakistani junta must have brought home to them the reality of Sino-Pak friendship based on nothing else but a common hatred against India. Despite all those arms and interest-free economic aid etc. Pakistan has always remained very much a baby of the White House. This is a reality that must taste rather unpalatable to the foreign relation experts in Peking. Recently, discernible indications are there of a charged Chinese attitude toward India. Now with Indian discenchantment with American friendship may begin a newer phase in Indo-Chinese relationship because, until now, the major Chinese objection was against Indo-American understanding. On this side, Indian political leaders of almost all the major parties including the ruling Congress Party are increasingly expressing opinions in fovour of a serious review of the Indo-Chinese cold confrontation. All these new developments certainly encourage prediction of an international atmosphere favourable to the furure of Bangladesh. With the series of spectacular successes of the Mukti Bahini on the battle field and their increasing might and capbility to go soon for a positional warfare to liberate and hold the occupied areas of Bangladesh comes the possiblility of the recognition of the Government of Bangladesh by more than one country. The month of August is sure to prove the most significant for the liberation struggle of Bangladesh.

### ১২ আগস্ট, ১৯৭১

I can't help repeating my fear once again. The question of the moment—Is Sheikh still alive? Has he not been done away with by the maniacs before Yahya's sudden declaration of the date of trial with shortest possible notice—a notice of precisely 48 hours? Why the hurry? Sheikh was nor running away! He was in their hands and far away from the battlefield where defeat is engulfing the Pak army not too slowly and, quite steadily. There must be a greater reason behind the timing of the trial than a mere wish to show the world their kind of justice.

Sheikh had been kept incommunicado since his arrest. Nobody other than his vile captors has seen him. Of course, Begum Sulaiman, daughter of late Shahid Subrawardy and presently a quisling of the military junta, claimed in Dacca late last May that she has met Shelikh Mujibur Raman at the military jail in Attock in her bid to make the leader agree to a socalled compromise formula devised by the killer generals. Appearently, Sheikh has told her to mind her own business. Even if this story is true, it is more than seven weeks now that no one has visited Sheikh to be able to tell the world about the state of his physical and mental health. Only Yahya himself conceded to a foreign journalist sometime ago that Sheikh was keeping bad health because the food supplied by the army was proving disagreeble.

There were also rumours that the leader was being subjected to inhuman torutre. I would not be surprised if it is true. it is a public fact that Yahya hated his guts. For a man almost totally devoid of civilised sensibilities fully trained by the British in colonial arrogance unarmed Shelikh's refusal to be browebeaten or to give in to army threat had consumed Yahya's brittle patience in on time.

Let me refer to his speeches since the day he declared the postponement of the national assembly session after consulting Bhutto and ignoring totally the majority party leader. He accused Sheikh of his failing to come to a socalled "consensus" with Bhutto but forgot his manners totally in the anger. While he referred to the villain as Mr. Bhutto Sheikh was being referred to as Mujib. For a man raised in British-style army mess such lapse of courtesy could not have been an oversight. It easily betrayed his total dislike of the personality, In his next speech on 6th of March in which he grudgingly agreed to call the national assembly session on March 25 he again insulted Sheikh in the same manner, in fact added a crude venom everythime he pronounced the name. In his speech of March 26 we noticed the repitition of the bad manner once again. It was clear that nothing would please Yahya more than to see Sheikh dead.

A deliberately leaked-out information alleging that Sheikh .... had refused a defence counsel provided an added ground to the suspicion about a foul-play. Outside world did not have any contact with Sheikh. How could the refusal-to-defend story reach the world press unless with Yahya's collaboration? Doesn't this "refusal story" come very handy if the so-called trial is meant to be cover-up for an already committed crime? Particularly when everybody knows that Sheikh would never have agreed to be tried by a foreign military court. The mystery has been further hardened by the repoted transfer of Mrs. Mujibur Rahman to Karachi from Dacca where she was kept under house-arrest since last April along with her children. Is the family being liquidated as well? The fact is that no crime is impossible for these men from the pages of medieval tales of horror.

That the junta has proceeded with the illegal trial depsite worldwide condemnation including repeated concerns expressed by its mentor, the U. S. State Deparement gives more credence to the fear. If it truns out to be a fact, it would be proved that Yahya was taking the foreign press for a ride while his hangmen were putting the noose round Shaikh Mujib's neck. It would be interesting to note Nixon's response to the crime. The pretext he has been putting forward so far to justify continuance of arms and econmic aid to the junta was that the U. S. government could gain a leverage this way for what .... a political accomodation over Bangladesh. As long as Sheikh lives and remains in captivity the pretext comes very handy as a cover-up device. But without him, Nixon would be in a quandery. He has miserably lost in the international power game as he has only a pingpong ball to show to his voters in exchange of world's largest democracy. Sheikh's death is certain to spell dissaster for Nixon and, consequently, for his proteges in Islamabad.

As for the people of Bangladesh—they will not rest until the murder has been avenged to their satisfaction.

If by one chance in a thousand, Sheikh is still alive it would be for the world powers to stop this farce of a trial before it is too late.

... Reports form Islamabad suggest that Yahya has lost control of Tikka Khan. The maniacal murderer in Dacca has stopped just short of publicly declaring himself the supeme ruler of what Islamabad likes to believe its Eastern colony. Now Yahya is afraid of visting Dacca. On the other side Tikka is scared of touring Islamabad for fear of sudden arrest. Yahys has for the second time put off his much-publicised tour of Occupied areas of Bangladesh—a place he did not dare to visit since he betrayed Sheikh Mujibur Rahman and the people of Bangladesh and fled from Dacca like a thief in the darkness of night. Two weeks ago he pompously asked a number of foreign journalists to hang around if they wanted to accompany him his tour of Dacca. Some of them must still be hanging around but with tongues in their cheeks. Meanswhile, Tikka Khan was conspicuously absent from the meeting of so-called National Econmic Council held in Islamabad sometime ago.

It is also interesting to note that on August 14 Yahya, as a matter of routine, decorated Tikka with Hilal-e-Quaid=e-Azam. Yet, if the relations were good, he would most certainly have been decorated with the highest award Hial-e-Pakistan for completing the historic task of destroying Pakistan. Of course, it is possible, that Yahya has kept the medal for himself.

The rift between the gangsters appearently resulted over Tikka's total lack of understanding of the world reaction to his crimes. He led Yahya into believing that the situation was really normal in the East and that he could send any number of foreign journalists to see it for themselves. Perhaps he thought that the journalists could be bought over just like those hacks from West Pakistan by drinks and dinners in the army mess. Perhaps like those silly West Pakistanis (with the notable exception of Anothony Mascarenhas) they, too, would parrot his hand-outs. Like an honest fool Yeahya believed in him and sent the journalists who in due time exploded the lies of Tikka. This apparently annoyed Yahya who would have preferred to keep the

journalists' out particularly when the naked aggression against the people of Bangladesh could not be hidden with mere repairs of some badly damaged buildings of Dacca.

He was hoping to get Tikka in Islamabad in order to punish him for the costly folly. But, then, Tikka got the smell of it thorugh his personal friends in the junta and stayed out. Now he could not care less if Yahya's international position is made doubly ludicrous by his repeated failures to keep the schedule of Dacca tour.

One thing is certain that the twin can no longer co-exist. Either Tikka goes or Yahya goes. Appearntly, President Nixon would like to see both go levaing the power in the hands of other pro-American generals who might not find it so difficult to swallow some kind of an agreement with Sheikh Mujib. The President is clearly against Bangladesh independence but would be very happy to see a political solution withing the framework of Pakistan—something that is, of course, totally unacceptable to the people of Bangladesh now.

## ॥ সংযোজন ॥

শিরোনাম : ২৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানমালার আরও কয়েকটি কথিকা।
সূত্র : 'বেতার বাংলা' মার্চ ও এপ্রিল, তারিখ ............১৯৭১। ১৯৭২।

# তথাকথিত পাকিস্তান বেতার ঢাকা

ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। না, গ্যাস চেম্বার কিম্বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বেতার কর্মচারীদের হত্যা করা হচ্ছে না। মিথ্যে প্রচারকে জিইয়ে রাখবার জন্য তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং এই প্রয়োজনটুকু না থাকলে বেতারের সঙ্গে জড়িত সবাইকে মানবতার বর্বরতম শত্রু ইয়াহিয়া সরকার এতদিনে নিশ্চয়ই হত্যা করতো। তবু বলছি ঢাকার বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর কি হতে পারে?

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-এর পর যদি কারো বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হ'ত তাহলে দেখতে পেতেন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সামী কোরায়শীর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর দ্বিতীয় আর একটি টেলিফোন শোভা পাচ্ছে। সাধারণ টেলিফোনের থেকে এর গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এই টেলিফোন থেকে একটি মাত্র জায়গায় যোগাযোগ করা যায় এবং সে জায়গাটা হচ্ছে কসাইদের সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কেন এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেলিফোন লিঙ্ক-এর এই আলাদা ব্যবস্থা? ঢাকার বেতারে আরও ৬ জন সিনিয়র সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আছেন। কিন্তু কেনই বা বেছে সামী কোরায়শীর কক্ষে এই টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হ'ল? যদিও তিনি অনেক জুনিয়র–এর একমাত্র উত্তর সামী কোরায়শী পশ্চিম পাকিস্তানি। অতএব, তিনি কসাই সরকারের একনিষ্ঠ পদলেহী। অবশ্য সামী কোরায়শী ছাড়াও ঢাকা বেতারে আরও এমন কয়েকজন দালাল রয়েছে যারা সামরিক স্বার্থের লালসায় বর্বরতার গ্যাংরিনে আক্রান্ত শত্রুদের পদলেহন করছে। বাংলার মানুষের ন্যায়দণ্ড তাদেরকে কোনো দিনই ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করতে পারে না।

---

(১৯৭১-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বেতারের কয়েকজন কর্মীসহ আশরাফুল আলম শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র ছেড়ে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দেন। এই কথিকাটি ১৯৭১-এর ৯ই জুন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল। –বেতার বাংলা, ১৯৭২)

এ থেকে আর একটি সত্য আগুনের মতো জ্বল জ্বল করে ওঠে। আর সেটা হচ্ছে কসাই সরকার বাঙালিদের কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছে না, বাংলার মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে তারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত। অবশ্য এটা অত্যন্ত পুরোনো সত্য। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে–এত অবিশ্বাস, এত সন্ত্রস্ততা, এত আতঙ্ক সত্ত্বেও বর্বর সরকার মিথ্যে প্রচারে প্রলেপ বুলিয়ে তাদের কুৎসিত মানসিকতাকে চাপা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাই রেডিও পাকিস্তানের খবরে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, অমুক জায়গার জনসাধারণ কসাইদের ভাষায় দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিয়েছে। একদিকে তারা প্রচার করছে শান্তি কমিটির কথা, অন্যদিকে প্রচার করছে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই যদি হবে তাহলে শান্তি কমিটির প্রয়োজন পড়ল কেন? কেন নানা ধরনের মিথ্যে প্রচারণার বেসাতি? কেনই বা বার বার প্রচার করা হচ্ছে আপনারা সবাই কাজে যোগ দিন? এর উত্তর বাংলার মানুষ জানে। নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

বলছিলাম ঢাকা বেতারের কথা। কিভাবে সেখানে ন্যায়কে, সত্যকে হত্যা করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে আসছি। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামত–শত্রু কবলিত ঢাকা বেতারের একটি নিত্যকার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কি সত্যি কথা প্রচার করা হয়? এর উত্তর জানতে হ'লে পত্রিকা অফিসের কথা জানা প্রয়োজন। বর্বর জঙ্গীশাহী বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় টেলিফোনে জানিয়ে দেন। এবং সেইসব বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় লেখা হয়ে থাকে। এরপর লিখিত বক্তব্য ছাপাবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেটা অনুমোদন করেন।

পত্রিকার সমস্ত সংবাদ ঠিক একই নিয়মে ছাপা হয়–শুধুমাত্র তারিখ, পত্রিকার নাম এবং সম্পাদকের নাম ছাড়া। বিবেকহীন নির্মম বেয়নেট সত্যকে লংঘন করে যে পত্রিকার জন্ম দেয় তার মধ্যে আর যাই থাক বিন্দুমাত্র সত্যের প্রয়াস থাকে না। তাই দৈনিক পত্রিকার মতামত একটি জাল অনুষ্ঠান। ঢাকা বেতারে এ ধরনের অনেক জালিয়াতি চলছে। ২৫শে মার্চের পরও আমি ঢাকা বেতারে কিছুদিন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে ছিলাম, পরে ও-বি সেকশনে লোক না থাকায় সেই সেকশনে আমাকে দেয়া হ'ল। ও-বি অর্থাৎ আউটসাইড ব্রডকাস্ট সম্পর্কে বলার আগে 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠানটির কথা না বলে পারছি না। ২৫শে মার্চের পর প্রথম যেদিন পত্রবিতান প্রচার করা হ'ল তার দুদিন আগে এই অনুষ্ঠানটির স্ক্রিপ দেয়া হ'ল। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব দেয়া হয়। সেই চিঠিগুলোর তারিখ দেখে অবাক হয়ে গেলাম, চিঠিগুলো ১৯৭০ সালের। আরও অবাক হলাম চিঠিগুলোর উপরে লেখা 'রিপ্লাই', অর্থাৎ ৭০-এর কোনো এক সন্ধ্যায় এই চিঠিগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক। দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার পত্রবিতান অনুষ্ঠান-এর পালা এল। কিন্তু কর্তৃপক্ষও একটু চিন্তায় পড়লেন, শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাকে পুরোনো কিছু চিঠি খোঁজ করতে বললেন। দোতলার একটা অফিসরুমে গিয়ে দেখলাম আলমারির পাশে মেঝেতে অসংখ্য চিঠি পড়ে আছে। এত চিঠি? একটু অবাক হবারই কথা। চিঠিগুলো ১৯৭১ সালেরই, কিন্তু ২৫শে মার্চের আগের লেখা। একটার পর একা চিঠি পড়তে লাগলাম। প্রত্যেকটা চিঠির বক্তব্য প্রায় একই ধরনের। এক সময় ঢাকা বেতার কেন্দ্র

থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে যেসব অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল তারই প্রশংসায় ভরপুর। একটা চিঠির এক জায়গায় পড়লাম "বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য ধন্যবাদ–অনুষ্ঠানগুলি শুনিয়ে এত আনন্দ লাগে যে, আমার মায়ের মৃত্যুশোকও আমি ভুলিয়া যাইতে পারিব।"

প্রতিটি চিঠিই অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য ছাড়াও কুটিল ভুট্টো ও প্রধান কসাই ইয়াহিয়ার কঠোর সমালোচনায় ভরা ছিল।

দোতলার সেই কক্ষে যখন চিঠিগুলো পড়ছিলাম পাশের কোনো রুম-এর স্পিকার থেকে পাকিস্তানি খবর-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারী, দেশের প্রধান শত্রু শেখ মুজিব এইসব শব্দ ভেসে আসছিল, আমি তখন যে চিঠিখানা পড়ছিলাম তাতে অল্প বয়সের একটি ছেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লিখছে–

"এয়ারপোর্ট-এ ইয়াহিয়া খান আসলে তাকে তো বাচ্চা ছেলের দ্বারা মালা দিয়ে স্বাগত জানান হয়, তাই না? জানেন আমাকে যদি তাকে মালা দেয়ার জন্য নেয়া হ'ত তাহলে লুকিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে যেতাম আর মালার বদলে তাকে গুলি করে মারতাম।"

এইসব চিঠি নিয়ে কর্তৃপক্ষকে দেখালাম। কিন্তু এ দিনে তো আর 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠান চলে না। জনৈক কর্তাব্যক্তি নির্দেশ দিলেন কিছু মিথ্যে ঠিকানা দিয়ে সমস্ত স্ক্রিপ্ট লিখতে। ক্ষমা করবেন, আমি লজ্জিত। সেই নির্দেশ মত স্ক্রিপ্ট লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তা যথারীতি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার করেছিলাম। তারিখটা আমার স্মরণ নেই। ২৫শে মার্চের পর যে মাসে দ্বিতীয় যেদিন পত্রবিতান অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় সেই দিনের কথা বলছি। ঐ দিনের চিঠির সত্যতা সম্পর্কে যে-কোনও শ্রোতা শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সেই ঠিকানায় বেতার কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবেন না। কারণ নাম-ঠিকানা সবই কাল্পনিক ছিল। সেই দিনের পত্রবিতানে এমন অনেক কাল্পনিক শ্রোতার চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছিল যারা নাকি কষ্টিপাথর, প্লেইন ট্রুথ, ঢাকা ও তার আশেপাশে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। কি ভয়ঙ্কর জালিয়াতি!

ঢাকার আউট ব্রডকাস্ট সেকশনকে 'ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে' এই শীর্ষক অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করতে হ'ত। ঢাকা এবং তার আশেপাশে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তারই উপর শত্রুদের ভাষায় প্রামাণ্য প্রচার করা হত। যেমন ট্রেন কেমন চলছে কিংবা ফ্যাক্টরি কেমন চলছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার। আর এই সাক্ষাৎকারগুলো নিতে আমাকেই যেতে হ'ত। গেল মাসের প্রথম দিকের কথা। পোরটেবল রেকর্ডিং মেশিন নিয়ে কমলাপুর স্টেশনে গেলাম। সমস্ত স্টেশন খাঁ খাঁ করছে। ডিকেড অব রিফর্মস-এর ভাষায় এশিয়ার বৃহত্তম স্টেশনের এ কি পরিণতি! জনহীন নিস্তব্ধতায় চারদিক থমথম করছিল। মনে হচ্ছিল নির্জনতার দ্বারা সমস্ত স্টেশনটা লাঞ্ছিত। টিকেট কাউন্টারের পাশের বিরাট চত্বরটার উপর দিয়ে একমাত্র আমিই প্ল্যাটফর্মের ভেতর ভেতর প্রবেশ করলাম। দু'একজন উর্দুভাষী টিকেট কালেক্টর ও দু'একজন অন্যান্য কর্মচারী প্ল্যাটফর্মে অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল! দূরে দেখতে পেলাম

লাইনে দাঁড়ানো নিস্তব্ধ কতগুলো কম্পার্টমেন্ট। জানালাগুলো বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায়, বহুদিন চাক্কা ঘোরেনি। প্রথমে স্টেশনের জনৈক পদস্থ কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নিলাম। বুঝতে পারলাম তিনি নিরুপায় হয়েই ইন্টারভিউ দিলেন। প্যাসেঞ্জারদেরও সাক্ষাৎকার নিতে হবে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার পাব কোথায়? স্টেশনের কয়েকজন কর্মচারীকে প্যাসেঞ্জারের ভূমিকায় অভিনয় করালাম। তারা সবাই উর্দুভাষী। বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন। স্টেশনের সেই পদস্থ কর্মচারীই ব্যবস্থা করে দিলেন। সাইডিং-এ একটা ইঞ্জিন দাঁড় করানো ছিল। সেখান থেকে সাউণ্ড এফেক্ট সংগ্রহ করলাম। যথারীতি ট্রেন চলাচলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হ'ল। অথচ যবনিকার দুয়ারে যে অভিনয়টুকু করান হ'ল, যে সাজান মিথ্যে কথাগুলো বলান হ'ল তার হিসেব কে রাখে? এরি নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান! বেয়নেটের আগায় অনেকেই বাধ্য হয়ে সাজানো সাজানো কথা তোতাপাখির মতো আউড়ে গেছে। এবং সেই সব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ফলাও করে "ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে" শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। বর্বর ইয়াহিয়া সরকার এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি, ঢাকা শহরে একটামাত্র কারখানা পুরোদমে চলেছে। আর তা হচ্ছে ঢাকা বেতার। যেখান থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে "মিথ্যে" ম্যানুফ্যাক্চার করা হয়।

মে মাসের ৮ তারিখে স্কুলগুলো খোলার জন্য বর্বর সরকার নির্দেশ দিয়েছিল। তিন-চারটে স্কুলে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও স্কুলে ছাত্র দেখতে পাইনি। ঢাকার কোনও এক নামকরা স্কুলের গেটে দেখলাম জনা ৫/৬ ছেলে জটলা করছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম তারা ক্লাশ করবেও না। এমনকি স্কুলবাড়ির ভিতরে ঢুকতেও তারা ভয় পাচ্ছিল। কারণ যে-কোনো মুহূর্তে দু'পেয়ে পশুরা এসে তাদেরকে হত্যা করতে পারে। তবুও স্কুলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল। দু'একজন শিক্ষক যাদেরকে বেয়নেটের ডগায় স্কুল খুলতে বাধ্য করান হয়েছিল তারাই সেই বেয়নেটের ভয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ক্লাশে কোনো ছাত্রী নেই অথচ একজন শিক্ষয়িত্রী ক্লাশে পড়াচ্ছেন। এমনি একজন শিক্ষয়িত্রীর কণ্ঠস্বরও সেদিনের সেই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল অথচ ছাত্রীবিহীন একটি ক্লাশকে সেই শিক্ষয়িত্রী শুধু পড়ানোর অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ ধরনের অভিনয় করতে বাধ্য করেছিল।

এরই নাম স্বাভাবিকতা, এরই নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। এবং এরই নাম জালিয়াতি। 'ডকুমেন্টারি' নামে তারা জাল অনুষ্ঠান প্রচার করছেন। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে তারা কাল্পনিক শ্রোতাদের কাল্পনিক চিঠির উত্তর দিচ্ছেন, সংবাদ সেখানে 'ম্যানুফ্যাকচার' করা হয়, যে-কোনও 'স্ক্রিপ্ট' প্রচারের পূর্বে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় ; কোরানের কোনো কোনো আয়াত এমনকি ছুরা, হাদিসের কোনো কোনো অংশ বা পুরো হাদিস তারা প্রচার করতে দিচ্ছেন না। কোরানের উদ্ধৃতি কেটে দেয়া হয়েছে। বেতার কেন্দ্রের ডিউটি রুমের আলমারিতে রাখা হাদিসের খাতা খুললে দেখতে পাবেন কোনো কোনো হাদিসের কিছু অংশ কালির আঁচড়

টেনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এমনকি কোনো কোনো হাদিস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে-"আল্লাহতালা সে জাতির অবস্থা কখনই পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে।" আল-কোরানের এই বিখ্যাত বাণীটি শত্রুর দ্বারা পরিচালিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আর শোনা যায় না। মোটের উপর মিথ্যার বারুদ পুড়িয়ে ঢাকা বেতার আতসবাজির খেলায় মেতে উঠেছে। সেখান থেকে এক ধরনের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে-যাকে সহজ কথায় ছ্যাবলামো ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ঢাকা বেতার একটা অনুষ্ঠানের নাম সোহাগ করে রেখেছে 'প্লেইন ট্রুথ'। অনুষ্ঠানের বক্তব্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে তারা কতগুলো জটিল মিথ্যের জাল বুনছেন। অনুষ্ঠানটির নাম 'কমপ্লেক্স লাই' দিলেই ভালো হ'ত। তাই বলছিলাম-ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর কি হতে পারে!

(আশরাফুল আলম রচিত)

# মৃত্যুহীন প্রাণ

মাকে গল্প বলতে বললে মা গড়িমসি করতেন। পরে আমাদের আগ্রহ দেখে শুরু করতেন।

এক দেশে ছিল এক রাজা। আর রাণী। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সেপাই লস্করে জনে মানুষে ম ম করে রাজপুরী, আমলায় পইলায়, উজিরে নাজিরে রাজদরবারের কী রবরবা! কিন্তু আজ গল্পের ধরন পাল্টে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিখিয়ে দিয়েছেন রাজা একটি নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যেকেই এক-একটি রাজা। আমরা সবাই রাজা। শুধু স্বাধীনতা বন্দি নয়, জালেমের কারাগারে ন্যায়বিচর, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ২৪ বছর ধরে মাথা কুটে মরছে। বন্দি আমার বাংলা। আমার রূপসী বাংলা। আমরা ধর্ষিতা বাংলা। আমার জননী বাংলা।

রাজপুত্র একটি নয়। হাজার হাজার, লাখ লাখ রাজপুত্র–মাতৃ অপমানের তীব্র প্রতিশোধ কামনায় ছায়াহীন, বৃক্ষহীন ধূ ধূ তেপান্তরের ধূসর পথ অতিক্রম করে চলছে বন্দিনী মাকে উদ্ধার করতে।

আমার মা রাজপুত্রের যে বর্ণনা দিতেন তার সঙ্গে এর কত তফাৎ। সেই রাজপুত্রের পোশাকে জরীর কারুকাজ, সূর্য এসে চুমু দিলেই সাত রং খেলা করে তার দেহে। রূপোর খাপে কারুকাজ করা তলোয়ার। মাথায় মণিমুক্তা খচিত উষ্ণীষ। গলায় গজমতি হার। কানে কানপাশা। চন্দন চর্চিত কপালে জয়-তিলক। চরণে চটকদার বাহারী জুতো। ঘোড়াটাই বা কম কী! দুধের মতো সাদা ধবধবে চোখ জুড়ানো ঘোড়া। তার উপর মখমলের জিন। আর আমার রাজপুত্র! পায়ে তার জুতো নেই। না বর্ষায়, না শীতে। পরণে একটি মাত্র লুঙ্গি। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা গেঞ্জি, নইলে গামছাই সার। চন্দন চর্চিত অঙ্গ নয়, ক্রলিং করে করে সারা গায়ে মেখেছে বাংলার মাটি। তলোয়ার তো নেই। হাতে লাঠি, নয় বর্শা। রাজাকার বা হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা থ্রি-নট-থ্রি। আমার রাজপুত্র বলে, না না ছিনিয়ে আনা নয়, ওটা তো রোজগার। রোজগারটা যদি এল-এম-জি হয়! ব্যাস আহার-নিদ্রা মাথায় উঠল, তেল দাও, সাফ কর, শোবার সময় বুকে জড়িয়ে ধরে শোও–স্বপ্নও ঐ এল-এম-জি নিয়ে। না, রাজকন্যা-টন্যা নয়, এমনকি পরীটরী কাছ ঘেঁষতে পারে না তার, সে স্বপ্ন দেখে বিশাল এক প্রান্তরে সে দাঁড়িয়ে আছে, এল-এম-জি একটানা গর্জন করে চলেছে, আর শত্রুসেনারা, তাগড়া ছোট চাচা প্রবল ঝাঁকুনী দিলে কুলগাছের কুলগুলো যেমন ঝুপ ঝুপ করে শিশিরের উপর ঝরে পড়ত, তেমনি রাক্ষসগুলো ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে তো পড়ছেই। এক সময় একটা বুলেট এসে তাকে থামিয়ে দেয়। সে দ্যাখে, তার প্রিয় পতাকা দিয়ে গোটা শরীর জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে–আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

গান শুনতে শুনতেই তার ঘুম ভাঙে। আহা স্বপ্নটা যদি সত্য হয়। ধীরে ধীরে নতুন রাখা দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলায় সে।

আচ্ছা, আমার এই রাজপুত্রের কাছে আমার মায়ের রাজপুত্তুরটাকে একটু পানসে পানসে মনে হয় না! ঐ রাজপুত্রটা যেন যাত্রা-থিয়েটারের। কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা। না? নিজের কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, কোনও কাজ নিজের করার মুরোদ নেই, হয় ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নয় পরীটরী এসে করে দেয়। না হলেই চিত্তির।

আমার মায়ের কিস্সা শেষ হতো এভাবে-তারপর? তারপর আর কি, রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। আর আমার রাজপুত্র?

না। না, না, এমন রাজপুত্র পৃথিবী কোনোদিন দেখেনি, কোনও কবি কল্পনা করতে পারে না এর রূপের। পৃথিবীতে এর কথা কেউ কোনোদিন বলেনি। বীর প্রসবিনী বাংলাদেশের গর্ভেই এমন রত্ন জন্মগ্রহণ করে। খালি হাতে যারা বীরের মতো লড়াই করতে পারে। যারা হাসতে হাসতে মারতে পারে, হাসতে হাসতে বীরের মতো মরতে জানে। আমার রাজপুত্র জানে মৃত্যু কত তুচ্ছ। জানে, মানুষ। মরে। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ হাসপাতালে মরে, কিন্তু প্রাণ দিতে জানে না। আমার রাজপুত্র শুধু মারতেই নয়, প্রাণ দিতেও জানে। যে প্রাণ মানুষের কল্যাণের জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সবাইকে মর্যাদা দেয়ার জন্য, দেশের জন্য নিবেদিত, তার জন্য মৃত্যুবরণ করার মতো সৌভাগ্য আর কিছুতেই নয়। সকল জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানা। এ প্রাণ মরে না, চিরকাল বেঁচে থাকে। মেয়েরা ঘাটে চাল ধুতে ধুতে তারই গল্প করে, পাল তুলে দিয়ে বৈঠায় ক্লান্ত হাত রেখে মাঝি তারই গান গায়, কবিরা তাকে নিয়ে অমর কাব্য রচনা করেন, ক্ষেতে হুকোয় তামাক ভরতে ভরতে তারই গল্প চলে বুড়োদের আসরে।

সাধ্য আছে কোনো নূরুল আমীনের কোনো নতুন অস্ত্র দিয়ে, বুলেট দিয়ে, স্যাবরজেট দিয়ে বা শ্যাকে ট্যাঙ্ক দিয়ে বাংলার বুক থেকে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামকে হত্যা করতে পারে? না। কেন? আমার রাজপুত্র মৃত্যুহীন প্রাণ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিস্সার রাজপুত্র রাজা হয়, তারপর এক সময় মারাও যায়। এই রাজপুত্রের মৃত্যু নেই। এরা মৃত্যুহীন প্রাণ।

(আসাদ চৌধুরী রচিত)

# ইবলিশের মুখোশ

যখন ছোট ছিলাম, বয়স যখন পাঁচ কিংবা ছ'য়ের কোঠায় ছিল তখন দাদীমা গল্প শোনাতেন। ঝোলা বোঝাই গল্প ছিল দাদীমার। আজগুবি সব ভূতের গল্প। গল্প শুনতে শুনতে কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, কখনো আবার প্রত্যক্ষ ভূত দেখার মতোই আঁৎকে উঠতাম। বুকের ভেতরটা দুর দুর করে কেঁপে উঠতো। কোনও কোনও দিন এত ভয় পেতাম যে ভয়ের প্রচণ্ডতায় দাদীমাকেই নিজের অজান্তে জড়িয়ে ধরতাম। এতো ভয় পেতাম তবু কিন্তু গল্প শোনার নেশা কাটত না। ভয় খেয়ে গেছি বলে দাদীমা একটু থেমে গেলেই ওকে তাড়া দিয়েছি আবার শুরু করবার জন্য।

দাদীমার ভূতের গল্পে কেমন একটা যাদু ছিল। গল্পের সব নায়ক-নায়িকারা ছিল জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখি। মজার ব্যাপার হলো জন্তু-জনোয়ারগুলো কথা বলতে পারত। দাদীমা সেই জন্তু-জানোয়ারদের হাঁকডাকের স্বর ও গোঙানী অবিকল নকল করে শোনাতে পারত। জন্তুরা কেমন আচমকা তাদের রূপ পাল্টাতে পারত এবং দেহের রূপ পাল্টাবার সাথে সাথে বাচনভঙ্গিও কেমন পাল্টে যেত, দাদীমা সবকিছু পরিবর্তন করে শোনাতে পারতো। দাদীমার গল্পের সব জন্তু-জানোয়াররাই ছিল ভূত-প্রেত। সন্ধ্যার অন্ধকারে গুটি গুটি মেরে গল্প শুনতাম। অন্ধকারে ভূতেরা কেমন করে হাঁটে, কেমন করে চাঁপা গোঙাতে পাহাড় পর্বত নদী খাল বিল অতিক্রম করে তা দিব্যি দেখতে পেতাম। দু'মিনিট আগেই যে ভূতটির আকৃতি একটি হিংস্র বাঘের ন্যায় ছিল হঠাৎ কেমন করে তা একটি পোষা ময়না পাখি বনে গিয়ে মিহি সুরে গান শুরু করত তা তখন ভেবেই পেতাম না। তখন ওই সব বিশ্বাস করতাম। কেননা, বয়েসটা ছিল পাঁচের কোঠায়। দু'দশক পর আজ হলে দাদীমার সেই আজগুবি ভূতের গল্প হয়ত আমল দিতাম না। দাদীমার ভূতের গল্পে তখন শুধু এক জন্তু অন্য জন্তু বা পশু-পাখিতে রূপান্তরিত হত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একাত্তরের প্রান্তসীমানায় মানুষও যে ভূত হতে পারে এবং রাতের অন্ধকারে তারা নরঘাতক পশু হতে পারে তা হয়ত দাদীমা জানতো না। জানা থাকলে এ মনুষ্যবেশী ভূতদের গল্পও দাদীমা বলতে পারতো। বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে এই মনুষ্যবেশী ভূত তথা হিংস্র জানোয়ারদের আজকাল বিচরণ করতে দেখা যায়। সত্যি সত্যি বা ভূত তার অস্তিত্ব বুঝে পাওয়া কঠিন-কিন্তু এরা যে মনুষ্যবেশী ভূত, এদের মূর্তিমান অস্তিত্ব আবিষ্কার করাটা তেমন দুরূহ কাজ নয়।

বাংলার মুক্তিসেনারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে তাদের শৌর্যবীর্য ও পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হানাদার জন্তুদের আবিষ্কার করে চলেছেন। মনুষ্যবেশী এই জন্তুদের মুণ্ড আবিষ্কারই এখন এই বীর সেনাদের জীবনের পরম কামনা।

গত কয়েক দিনে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে মুক্তিবাহিনীর বীর গেরিলাদের হাতে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর বাংলাদেশে জন্তুরাজ জেনারেল নিয়াজী এই সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। নিয়াজী বলেছে, আমার জওয়ানরা ভারতীয় অনুচরদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং পাল্টা আক্রমণের

মুখে ভারতীয় অনুচররা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। ওদিকে ইয়াহিয়া খানই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিকৃত রূপ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য মনুষ্যবেশী ভূতের মতো গোঙাতে শুরু করেছে। ভারত নাকি পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি আক্রমণ করছে। বেমালুম চেপে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খাঁ তার আব্বা হুজুর ইয়াহিয়ার চেয়েও কয়েক হাত বেড়ে গলাবাজি করেছে। ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তে নাকি একটি যুদ্ধাবস্থার মতো পরিবেশ বিরাজ করছে।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' এ কথার যথার্থতাই প্রমাণ করেছে ইয়াহিয়ার তাঁবেদার সুলতান মোহাম্মদ খাঁ। মনুষ্যবেশী পশুসম্রাট ইয়াহিয়া আরেক কাণ্ড করে বসেছে। ঈদুলফিত্‌র উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি। ভারত কিন্তু এর যথোচিৎ জবাব দিয়েছে। গত তেইশ বছর ধরেই ভারত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে এসেছে। আজ হঠাৎ জঙ্গী শাসকদের প্রবক্তা ইয়াহিয়া খান ভারতের সংগে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য এত উদ্বেল হয়ে উঠলো কেন? মতলবটা কি? আসল মতলব আমরা টের পেয়েছি। উদ্দেশ্য সৌহার্দ্য স্থাপন নয়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিভ্রান্তির অতলে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু ইয়াহিয়া জানেন, বিভ্রান্তির অতলে বাংলাদেশের মানুষকে আর ডুবানো যাবে না। বাংলাদেশই নয়, বিশ্ববিবেকও আজ জাগ্রত।

ভূতের মুখে রাম নামই হোক আর সৌহার্দ্যের প্রস্তাবই হোক, সে আমাদের ব্যাপার নয়। তার জবাব ভারতই দিয়েছে এবং দেবে। কিন্তু আমাদের জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বুলেট-বেয়নেটে মনুষ্যবেশী জন্তুরা আমাদের সর্বহারা করেছে সেই বুলেট-বেয়নেটেই আমরা জবাব দেব। কেননা, আমরা তাদের স্বরূপ উদঘাটন করেছি। এরা দাদীমার সেই আজগুবি জন্তুবেশী ভূত নয়। এরা মনুষ্যবেশী হিংস্র জন্তু নরঘাতক, ইবলিশ। বাঙলার পবিত্র মাটি থেকে উৎখাত করে বিশ্বের দরবারে এই ইবলিশের মুখোশ আমরা ফাঁস করে দেবোই দেবো।

(মেসবাহ আহমেদ রচিত)

# রণাঙ্গনের চিঠি

যশোহরের রণাঙ্গনে ক্ষণিক বিরতির সময়ে জানতে পেলাম, গণতন্ত্রের পীঠস্থান মহান ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উল্লাসে ফেটে পড়েছে আমাদের সমস্ত শিবির। আনন্দে কোলাকুলি করছে সবাই, কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চীৎকার করে বলছে, আমার দেশের মাটি আমার মায়াঘেরা দেশের সোনার মাটি, কত ঝড় বয়ে গেল তোর উপর দিয়ে, শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তোর সোনার অংগ। ভাবিস না আমরা তোর শৃঙ্খল ঘোচাবো, তোকে মুক্ত করবো, আবার তোকে সাজাবো আমাদের প্রীতি-মমতা দিয়ে, সবটুকু শক্তি দিয়ে।

জানো বন্ধু, কী তৃষ্ণা কী আকুলতা নিয়ে কেটে গেছে গত আট মাস বারো দিন এই একটি সংবাদের জন্যে! কেটে গেছে কত বিনিদ্র রজনী। যখন রণক্ষেত্র থেকে আহত স্বামীকে কোলে করে নিয়ে ফিরেছি, তখন ভেবেছি আর কত দিন? স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে ভেবেছি আর কত দিন বাকী আমাদের স্বীকৃতির! মনে পড়ে কয়েকদিন আগে শেষনিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে আশরাফ ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল "স্বীকৃতি মিলেছে?" উত্তর দেবার আগেই আশরাফ শেষনিঃশ্বাস ফেলেছে। আমার বুকে আমার হাতে তখনও আশরাফের ছোপ ছোপ রক্ত। রক্ত কথা বলে উঠলো, "আমি আশরাফের রক্ত স্বীকৃতির দাবী নিয়ে বাংলার মাটিতে জমাট বেঁধে থাকবো, তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও। তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও।"

আজ স্বীকৃতি মিলেছে। আমার বুকপকেটে রয়েছে আশরাফের রক্তমাখা আমার রুমালটি। বার বার রুমালটি দু'চোখে চেপে ধরছি। আমাদের বন্ধু আশরাফের রক্ত–শোন, তুমি শোন, স্বীকৃতি মিলেছে তোমার। স্বীকৃতি মিলেছে আশরাফের, স্বীকৃতি মিলেছে কুদ্দুস, টিটু, আজাদ, তারিক, মাসুদ আরো শত শত শহীদের রক্তের। স্বীকৃতি মিলেছে দশ লক্ষ লোকের রক্তের, যারা বর্বর খুনী ইয়াহিয়ার বাহিনীর গুলির আঘাতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, স্বীকৃতি মিলেছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের।

বন্ধু, আনন্দে আমার চোখের জল ঝরছে। আশরাফের পবিত্র রক্তের সংগে আমার চোখের জল মিলে একাকার হয়ে গেছে। তুমিও কী কাঁদছো বন্ধু? কেঁদো না। দোহাই তোমার, কেঁদো না, চোখের জল মুছে ফেলো।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সরকারের বিমান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ৪৭টি পাকিস্তানি জংগী বিমান ভূপাতিত। তাদের দুটি যুদ্ধজাহাজ, একটি ডেস্ট্রয়ার, ১টি সাবমেরিন নিমজ্জিত। তাদের একটির পর একটি ঘাটির পতন ঘটেছে। আখাউড়া, লাকসাম, কুলাউড়া, লাতু, বিয়ানীবাজার, মিয়ার বাজার, ফেনী থেকে শত্রুসেনা সম্পূর্ণ বিতাড়িত। সমগ্র টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উড্ডীয়মান বাংলাদেশের জয় পতাকা।

সুতরাং, বন্ধু কেঁদো না। চোখের কোণে তোমার আনন্দের, বেদনার যে জলটুকু জমে উঠেছে তা মুছে ফেলো। আমরা এগিয়ে চলেছি, তোমরাও এগিয়ে চলো দুর্বার গতিতে। শত্রুর দুর্গে আঘাতের পর আঘাত হানবো আমরা। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো ওদের সামরিক শক্তি। ধূলোয় মিলিয়ে দেবো ওদের শক্তির দম্ভকে। তারপর আর মাত্র কয়েকদিন পর যখন বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যখন আমাদের সোনার বাংলার মাটি শত্রুস্পর্শের কলঙ্কমুক্ত হবে তখন আমরা কাঁদবো গলা জড়িয়ে আমাদের হারানো সাথীদের জন্যে। আমরা সেদিন চোখের জলে আমাদের বন্ধুদের শুভ্র, পবিত্র অম্লান স্মৃতিকে স্মরণ করবো। আর সবাই মিলে গড়ে তুলবো আমাদের সোনার বাংলাকে।

(গাজীউল হক রচিত)

# বিচার চাই

সারা বাংলাদেশ যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার নবীন আভায় অবগাহন করছে ঠিক সেই সময় এক দুঃসংবাদ আমাদের সবাইকে বিস্মিত, মর্মাহত ও বেদনার্ত করে তুলেছে। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে পশুর চেয়েও নির্মম খান-সেনারা ও তাদের দালালরা ঢাকার বুক থেকে শত শত বুদ্ধিজীবীকে গোপনে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই নরঘাতকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এরা বেছে বেছে হত্যা করেছে প্রখ্যাত অধ্যাপকদের, ডাক্তারদের, ইঞ্জিনিয়ারদের, সাংবাদিকদের। ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের অফিসারদেরকেও এরা হত্যা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পশুদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

প্রথম থেকে এই নরপশুরা যে একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের মানুষকে, তার ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এরা বর্ণগত ভিত্তিতে, ভাষাগত ভিত্তিতে, ধর্মগত ভিত্তিতে, সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়। আমরা প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আমরা বলেছি, উপযুক্ত অনুসন্ধান করে আমাদের এই অভিযোগ যাচাই করা হোক। আমরা বার বার জাতিসংঘের সদস্যদের বলেছি যে, যে আইন আপনারা পাশ করেছিলেন সেই আইন অনুসারে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা গণহত্যা। বর্ণগত ভিত্তিতে গণহত্যা চলেছে। গণহত্যা চলেছে ধর্মের নামে, ভাষার নামে, সংস্কৃতির নামে। আমরা চিৎকার করে বলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে মেরে ফেলা হচ্ছে। নারীর উপর নির্যাতন চলছে, বৃদ্ধ ও শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। আপনারা গণহত্যা হচ্ছে কিনা অন্তত একবার তদন্ত করুন, একবার দেখুন আমাদের ক্রন্দন যথার্থ কিনা। আমরা আরও বলেছি, একই বিষয়ের জন্য দু'ধরনের মানদণ্ড হতে পারে না–একথা আপনারাই একদিন বলেছিলেন। ন্যুরেমবার্গে হিটলারের সাঙ্গপাঙ্গদের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আপনারা বিচার করেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যুদ্ধাপরাধের, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের। তাদের বিরুদ্ধে আপনারা গণহত্যার অভিযোগ এনেছিলেন এবং সেই অপরাধে তাদের শাস্তিও দিয়েছিলেন। আর তখনই সেই আন্তর্জাতিক আদালতের মার্কিনী বিচারপতি কি মন্তব্য করেননি যে, একই অপরাধের জন্য বিচারের মানদণ্ড দু'রকম হতে পারে না? তিনি কি আরও বলেননি যে, ঊর্ধ্বতন অফিসারের আদেশেই অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার কোনও দোষ নেই, সব দোষ অফিসারের, এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়? তিনি কি বলেননি যে, যে যার কাজের জন্য দায়ী হবে? সেই মহান বিচারপতি কি আরও ঘোষণা করেননি যে আমরা এমন কোনও আইন তৈরি করবো না যা আমাদের বেলায় ব্যবহার করা যাবে না? গণহত্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন পাশ করার সময় একথা কি ঘোষণা করা হয়নি যে গণহত্যার বিচার করার জন্য জাতিসংঘ যে-কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তার অর্থ কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বোঝাবে না? সেখানে কি বলা হয়নি যে বর্ণগত, ধর্মগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত কারণে কাউকে হত্যা বা অত্যাচারিত করা যাবে না? জাতিসংঘের সনদের ৯৯ সংখ্যক ধারায় জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে কি ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে এসব হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া হয়নি? দুঃখের বিষয়,

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পুরাপুরি গণহত্যা অনুষ্ঠিত হলো, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বাংলার মাটি রঞ্জিত হলো, লক্ষ লক্ষ নারীর আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো, লক্ষ শিশুর আর্তনাদে কেঁদে উঠলো বাংলার গাছপালা, কিন্তু তাতে জাতিসংঘের গলাবাজ সদস্যদের হৃদয় সামান্যতমও কাঁপলো না। মানুষের মরণ আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছালো না। তারা নির্বিকার চিত্তে সম্মতি জানালো পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর কার্যাবলীর প্রতি। তারা গণহত্যা হতে দিলো, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে দিলো, তারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে মরতে দিলো, তারা অত্যাচারিতকে পায়ে দলে দিলো, অত্যাচারীকে সাদরে কোলে টেনে নিলো। তারা আইন ভঙ্গ হতে দিলো, তারা অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করলো।

বিশ্বশান্তির এই সব ধ্বজাধারীদের ধারণা যে, চোখ বুঁজে থাকলেই কঠিন কঠোর সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এদের ধারণা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র বলেই ন্যায়বিচার করার দরকার নেই। এরা মনে করে, দু'একবার আইন ভঙ্গ হতে দিলে এমন কোনও দোষ ঘটে না। এরা ভাবে, যত আইন ভঙ্গ হোক না কেন গোলমালে না জড়িয়ে পড়লেই বাঁচা যাবে। এরা ঠিক করেছে যে, কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখবো না।

দুঃখের বিষয় মহাকালের শিক্ষা এরা ভুলে গেছে। এরা ভুলে গেছে যে, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া কোনও উদারতার ব্যাপার নয়, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া দুপক্ষেরই বিপজ্জনক। হিটলার যখন বারবার অন্যায় করছিল তখন বৃহৎ শক্তিগুলো সব মেনে নিচ্ছিল, হিটলার ছোট ছোট দেশগুলো যখন দখল করছিল তখন চেম্বারলিন ছাতা দিয়ে তাকে বাতাস করছিলেন। কিন্তু সেই আইন ভঙ্গকারী হিটলারই কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ডেকে আনলো, ব্রিটেন ফ্রান্সসহ বহু দেশে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালালো। যদি প্রথম থেকেই বাধা দেয়া হতো তাহলে এই ধ্বংসের সম্মুখীন হতো না পৃথিবী।

পৃথিবীর সর্বত্র অন্যায় হচ্ছে। অথচ স্বার্থপরতার জন্য তার প্রতিকার করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের মানুষ প্রাণ দিলো, কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হলো না। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো চেয়ে চেয়ে তাই দেখলো। আমরা ক্ষুদ্র বলেই এই অবহেলা। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা যদি মিথ্যা না হয় তাহলে একদিন অন্যায়ের প্রশ্রয়দানকারীরা উপযুক্ত শিক্ষাই পাবে। অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য রক্ত দিয়েই শাস্তি পেতে হবে। এবং অত্যাচারীর হাতেই সেই শাস্তি পেতে হবে তাদের।

আমার সোনার বাংলার শত শত প্রতিভাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। কি করে কোন ভাষায় যে আমরা হাহাকার করবো বুঝতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়েছি। শত স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরাও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। কোনও কিছু দিয়েই তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ হবে না। যেসব সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন তাঁদের অভাবে সারাদেশ আজ কাঁদছে। আমরা সবাই আজ হাহাকার করছি। সেইসব বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময় চীৎকার করে আমরা বলতে চাই–হত্যাকারী যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারী যেন শিক্ষা পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শিক্ষা পায়।

তবে একথা ঠিক, অপরাধীর বিচারের ভার আমরা নিজের হাতে তুলে নেবো না। বিচার করবেন আমাদের সরকার। বিচারের ভার বহন করবেন সরকারের আইন বিভাগ।

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

শিরোনাম : ৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত সূচি (অংশ)।
সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র। তারিখ .... ১৯৭১।

২৫ আগস্ট, ১৯৭১

১। সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা (কোরাস)
২। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো। একটি কাহিনী (আপেল মাহমুদ)
৩। দুনিয়ার যত গরিবকে আজ
৪। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম

২য় অধিবেশন :

১। মুজিব বাইয়া যাওরে (আব্দুল জব্বার)
২। জাগো অনশন বন্দি উঠোরে যত (কোরাস)
৩। আমার দেশের মাটির গন্ধে (ফেরদৌসী রহমান)
৪। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
৫। জাগো জাগো ও বাঙ্গালি

৩য় অধিবেশন :

১। চল বীর সৈনিক (আপেল মাহমুদ)
২। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)
৩। জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
৪। আমার প্রতিবাদের ভাষা
৫। আমি শুনেছি শুনেছি বাংলা মায়ের কান্না (মান্না হক)

২৮ আগস্ট, ১৯৭১

২য় অধিবেশন :

১। শেখ মুজিব সত্যযুগের (তোরাব আলী শাহ)
২। মুজিব বাইয়া যাওরে (আব্দুল জব্বার)
৩। ওরা কোথায় গো (শাহ আলী সরকার)
৪। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৫। আজি বাংলাদেশের (অজিত রায়)

৩য় অধিবেশন :

১। বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
২। সোনার বাংলা বলো (কোরাস)
৩। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)
৪। অনেক রক্ত দিয়েছি (আ. জব্বার)
৫। দুর্জয় বাংলা— (কোরাস)

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১ম অধিবেশন :

১। সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের (কোরাস)
২। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম (কোরাস)
৩। আমার বাংলা দেশের মাটি (কোরাস)
৪। জাগো জাগো ও বাঙ্গালি (কোরাস)

২য় অধিবেশন :

১। ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা (কোরাস)
২। ভায়ের মায়ের (কোরাস)
৩। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নাই (কোরাস)
৪। হাজার বছর পরে (আ. জব্বার)
৫। জয়ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মো. শাহ বাঙালি)
৬। হায়রে পাষাণ তোদের শীর্ণ দেহ (স্বপ্না রায়)
৭। দুনিয়ার যত গরিবকে আজ কোরাস)
৮। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)

৩য় অধিবেশন :

১। রক্তে যদি ফোটে (কোরাস)
২। জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
৩। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৪। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক (তপন ভট্টাচার্য)
৫। বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৬। অনেক রক্ত দিয়েছি (আ. জব্বার)
৭। সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশন :

১। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ ও স্বপ্না রায়)
২। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)
৩। তোমার নেতা আমার নেতা (কোরাস)
৪। সোনার বাংলা বলে (কোরাস)
৫। জয়ধ্বনি কর শেখ মুজিবর (মো. শাহ বাঙালি)
৬। কার বা বিচার কে বা করেরে (হরলাল রায়)
৭। শিকল পরা ছল (নজরুল গীতি)
৮। জাগো অনশন বন্দি (নজরুল গীতি)

৩য় অধিবেশন :

১। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (কোরাস)
২। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৩। বাংলার মাটি বাংলার জল (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৪। যুদ্ধ কর অসি ধর (অনিল চন্দ্র দে)
৫। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)
৬। জাগো জাগো ও বাঙালি (কোরাস)

২১ অক্টোবর, ১৯৭১

১ম অধিবেশন :

১। ও আমার দেশের মাটি (অজিত রায়)
২। জয় জয় বাংলার জয় (কোরাস)
৩। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ)
৪। সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২য় অধিবেশন :

১। জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে (নাসরিন ও অরূপ)
২। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)
৩। জাগো জাগো ও বাঙ্গালি (কোরাস)
৪। বিচারপতি তোমার বিচার (কোরাস)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহম্মদ)
৬। জাগো অনশন বন্দি (নজরুলগীতি)
৭। কারার ঐ লৌহ কপাট—(নজরুলগীতি)

৩য় অধিবেশন :

১। ওরে জাগো জাগো ও বাঙ্গালি (কোরাস)
২। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (কোরাস)
৩। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (কোরাস)
৪। জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহমদ)
৬। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (অজিত রায়)
৭। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নেই (কোরাস)

১ নভেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশন :

১। জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো (কোরাস)

২। জয় জয় বাংলার জয় (কোরাস)

৩। পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে (কোরাস)

৪। বাংলার মাটি বাংলার জল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

৫। ও খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি (রথীন্দ্রনাথ)

৬। আরে ও মাঝি ভাই (মনিরা জামান)

৭। দুর্গম গিরি কান্তার মরু (নজরুলগীতি)

৮। চল ছুটে চল (পল্লীগীতি (আঙ্গুর)

৩য় অধিবেশন :

১। আমার প্রতিবাদের ভাষা (কোরাস)

২। যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক (কোরাস)

৩। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)

৪। আমি একজন মুক্তিসেনা (মান্না হক)

৫। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল)

৬। দুনিয়ার যত গরিবকে আজ (আপেল)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

১ম অধিবেশন :

১। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (কোরাস)

২। দিনের শোভা সূর্য রাতের শোভা চাঁদ (আ. গনি বোখারী)

৩। 'এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ'—একটি গীতিনকশা

সংযোজনা—শাহজান ফারুক

বর্ণনায়—আশরাফুল আলম

সঙ্গীত পরিচালনা—

১। সুজেয় শ্যাম

২। আপেল মাহমুদ

৩। রফিকুল আলম।

৩য় অধিবেশন :

১। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)

২। মোরা ঝঞ্ঝার মতো (কোরাস)

৩। জনতার সংগ্রাম চলবে (কোরাস)

৪। সোনার বাংলা (জারি গান) (হযরত আলী)

৫। চল ছুটে চল (মফিজ আঙ্গুর)
৬। একি অপরূপ (কোরাস)
৭। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (কোরাস)
৮। সংগ্রাম সংগ্রাম (অনুপ)

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
১। গীতিনক্শা (রক্ত চাই) (সঙ্গীত পরিচালনা : সুজেয় শ্যাম
২। জয় বাংলার জয় (কোরাস)
৩। জনতার সংগাম চলবেই (কোরাস)
৪। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৫। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (কোরাস)

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১। এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ
২। জয় ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মো. শাহ বাঙালি)
৩। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)
৪। সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি
৫। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৬। এই কথাটি ধরেই (লায়লা জামান) (ঐ)
৭। এবার তোর মরা গাঙ্গে (তপন ভট্টাচার্য) (ঐ)

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশন :
১। ধন্য আমার জন্মভূমি (কোরাস)
২। রক্ত চাই রক্ত চাই (কোরাস)
৩। আগুন আগুন আমরা আগুন (কোরাস)
৪। জনপদ প্রান্তরে সাগরে বন্দরে (কোরাস)
৫। ঝড় ঝঞ্জার মুখোমুখি (কোরাস)
৬। আহা ইয়াহিয়া কান্দেরে (হরলাল রায়)
৭। কার বা বিচার কে বা করে রে (হরলাল রায়)
৮। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশন :
১। পথের আঁধার আর নাই (কোরাস)
২। এবার উঠেছে মহাঝড় (কোরাস)

৩। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম (কোরাস)
৪। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)
৫। ও বাঙালি ভাই কে কে যাবি (ইন্দ্রমোহন রাজবংশী)
৬। ঐ ঐ ঐ চল চল নওজোয়ান (আ. গনি বোখারী)
৭। জয় বাংলা জয় (কোরাস)
৮। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (কোরাস)

দ্বিতীয় অধিবেশন :

১। ও বগিলারে কেন বা আইলো (রথীন্দ্রনাথ রায়)
২। সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ (কোরাস)
৩। ওরা কলিজা ছিঁড়ে
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। সম্মুখপানে চলবো মোরা
৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা তোদের (আ. গনি বোখারী)
৭। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)
৮। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১
দ্বিতীয় অধিবেশন :

১। দেয়ালের দেয়ালে লিখা (কোরাস)
২। ওরা যতই বলুক (কোরাস)
৩। সোনার বাংলা করবো সোনা (মো. নৌশেদ আলী)
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। পথের আঁধার আর নাই (লাকি আখন্দ)

তৃতীয় অধিবেশন :

১। সংগ্রাম সংগ্রাম (কোরাস)
২। আমার প্রতিবাদের ভাষা (কোরাস)
৩। মুক্তির একই পথ সংগ্রাম (কোরাস)
৪। দুর্জয় মোরা সাত কোটি (কোরাস)
৫। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (কোরাস)
৬। এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ (কোরাস)
৭। সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি (কোরাস)
৮। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৯। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)
১০। ও আমার দেশবাসী ভাই (মো. মুন্নাফ)

১১। জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
১২। আয়রে চাষি মজুর কুলি (কোরাস)
১৩। এবার তোর মরা গাঙে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১৪। এই কথাটি বলেই (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

**১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১**
**তৃতীয় অধিবেশন :**

১। জয় জয় জয় হবে বাংলার (কোরাস)
২। ওরা কলিজা ছিঁড়ে (কোরাস)
৩। ঝড় ঝঞ্ঝার মুখোমুখি (কোরাস)
৪। ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল (কোরাস)
৫। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (কোরাস)
৬। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
৭। রুখে দাঁড়াও রুখে দাঁড়াও (সরদার আলাউদ্দিন)
৮। বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৯। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল মাহমুদ)
১০। অনেক রক্ত দিয়েছি (আ. জব্বার)
১১। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

**১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১**
**প্রথম অধিবেশন :**

১। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (কোরাস)
২। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম (নজরুলগীতি)
৩। শিকল পরা ছল (নজরুলগীতি)
৪। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (কোরাস)
৫। সংগ্রাম আজ সংগ্রাম (কোরাস)
৬। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (কোরাস)

**তৃতীয় অধিবেশন :**

১। আমরা গেরিলা আমরা (কোরাস)
২। আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা (কোরাস)
৩। দুর্জয় বাংলা (কোরাস)
৪। দুর্গম দূর পথ বন্ধুর (কোরাস)
৫। নোঙ্গর তোল নোঙ্গর তোল (কোরাস)
৬। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)

৭। দস্যু মারিতে চল ধাইয়া (শাহ আলী সরকার)
৮। পরানের বন্ধুরে বলবো কি তোরে (দ্বৈত সঙ্গীত)
৯। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার (আপেল মাহমুদ)
১০। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
১১। চল যাই চল যাই (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

১৬. ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

১। আজ রণ সাজে বাজিয়ে বিষাণ (সমবেত কণ্ঠ)
২। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য (সমবেত কণ্ঠ)
৩। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (সমবেত কণ্ঠ)
৪। রক্ত রঙ্গীন উজ্জ্বল দিন (সমবেত কণ্ঠ)
৫। আজি মত্ত সাগর
৬। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম (নজরুল গীতি)
৭। রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি

দ্বিতীয় অধিবেশন :

১। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
২। পথের আঁধার আর নাই (কোরাস)
৩। চল বাঙ্গালি চল (পল্লীগীতি) (কোরাস)
৪। মুক্তি ভাই ঝম ঝম করে (তোরাব আলী শাহ)

তৃতীয় অধিবেশন :

১। সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গীকার (কোরাস)
২। সম্মুখপানে চলবো মোরা (কোরাস)
৩। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (কোরাস)
৪। মুজিবর মুজিবর (কোরাস)
৫। ওরে শোনরে তোরা শোন (কোরাস)
৬। আমি মরবো তাতে ক্ষতি নাই (কোরাস)
৭। আমার মুক্তিবাহিনী ভাইরা (তোরাব আলী শাহ)
৮। আকাশের তারার মতো (তোরাব আলী শাহ)
৯। ও আলোর পথ যাত্রী (কোরাস)
১০। চল চল চল (নজরুলগীতি)
১১। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১২। নাই নাই ভয় (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১৩। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

# পরিশিষ্ট—১

শিরোনাম : ২৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন।
সূত্র... তারিখ... ১৯৭১।

## ১. মুক্তিকামী বাঙালির প্রেরণার উৎস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

আতিকুর রহমান

ইথারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীর বীর পশুরা সেদিন বুলেট-বেয়োনেট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী আঘাত হেনেছে নরপশুদের বিরুদ্ধে।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি বাহিনী মরণ ছোবল হেনেছিল। শহর-বন্দর-গ্রামকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সেই আঘাতে হতচকিত বাংলার মানুষ পরদিন ২৬শে মার্চ বেতারে শ্রুত একটি বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন আশার বাণী। সে বাণী ছিল স্বাধীনতার, হানাদারদের কবল থেকে মুক্তির। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এই বেতার বাঙ্গালিদের যুগিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দেশকে মুক্ত করার প্রেরণা।

বিপ্লবী বীর সূর্যসেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল চট্টলার বুক থেকেই সেদিন বেতারে ঘোষিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা। আর কালুরঘাটস্থ পাকিস্তানি বেতারের ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পৌছানো হয়েছিল স্বাধীনতার সে বাণী। ২৬শে মার্চ জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

২৫শে মার্চ রাতে হানাদার হায়েনার দল হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর ২৬শে মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্রডকাস্টিং হাউসে যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখেছিলেন যাতে হানাদার বাহিনী প্রয়োজনবশত অবিলম্বে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করতে না পারে। ঢাকা বেতারও সেদিন নীরব ছিল।

চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করেছিলেন তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে।

২৬শে মার্চ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য একবার চট্টগ্রাম বেতার থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান প্রচারিত হয়েছিল।

সংগঠিতভাবে না হলেও সেদিনই সন্ধ্যায় আরেকদল কর্মী 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে পরিচয় দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। ২৭শে মার্চ এই কেন্দ্র থেকে মেজর (বর্তমান লে. কর্নেল) জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

এই কেন্দ্র থেকেই ২৮শে মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঢাকায় টিক্কা খানকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয়। সত্য না হলেও জনগণের হৃদয়ে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বেতার কর্মীরা সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ সেদিন করেছিলেন।

দুই ভাগে বিচ্ছিন্নভাবে এজন্য প্রচেষ্টা চলেছিল। প্রথম দিনে দুপুরে সামান্যক্ষণ অনুষ্ঠান প্রচারকালে গণ-পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ. হান্নান হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আর এই অনুষ্ঠান প্রচারে সহযোগিতা করেছে চট্টগ্রাম বেতারের ইঞ্জিনিয়ার মীর্জা নাসির, জনাব আবদুস সোবহান, চট্টগ্রাম কাস্টম বিভাগের জনাব আবদুল হালিম, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জনাব এম, এ, কাসেম প্রমুখ।

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সাথে জড়িত বেতার কর্মিগণ ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে এই প্রচার চালু রেখেছিলেন। সেসব বেতার কর্মীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার ডা. সৈয়দ আনোয়ার আলীর বাসভবনে জমায়েত হয়েছিলেন দেশপ্রেমিক কয়েকজন ব্যক্তি। নেপথ্যে শুরু হয়েছিল অপর প্রচেষ্টা। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার জনাব আসিকুল ইসলামের গাড়িতে (চট্টগ্রাম ট-৯৬১৫) সেদিন ডা. আনোয়ার আলী, জনাব ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ চন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা সবাই ছুটে গিয়েছিলেন আগ্রাবাদস্থ ব্রডকাস্টিং হাউসে। আরেকদিক থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী জনাব বেলাল মোহাম্মদ, জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, জনাব মাহবুব হাসান একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রডকাস্টিং হাউসে পৌছেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল ফলে সেদিন সন্ধ্যায়।

সেই কর্মীদের দল আবার একত্রে কালুরঘাট পৌছেন। খবর পেয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন টেকনিশিয়ান ও প্রোগ্রাম প্রডিউসার কয়েকজন।

রাত সাড়ে সাতটার দিকে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের একটি কক্ষকে স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করে জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তির নবতম হাতিয়ারের ব্যবহার।

প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে টেলিগ্রামের বাংলা ও ইংরেজী তর্জমা প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজী থেকে তর্জমা করেছিলেন ড. মঞ্জুলা আনোয়ার। ইংরেজীতে ঘোষণাটি পড়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিকুল ইসলাম। এই ঘোষণায় বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়নি শুধু—বাঙালি জাতি যে স্বাধীন হবেই সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

আধ ঘন্টার মত প্রচারকালে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ও বয়োবৃদ্ধ কবি আবদুস সালাম কথিকা পাঠ করেছেন। সেদিনের ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছেন কাজী হোসনে আরা।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত বেতার কর্মীরা অনিয়মিত হলেও অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। ৩০শে মার্চ হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা চালায়। আর তা ছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। স্যাবর বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ করে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইথারের ভাষা।

পরে বেতার কর্মীরা স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে তখন মুজিবনগরে গড়ে উঠছিল' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের পথ ধরেই। সেদিনের অনেক কর্মী পরে সেখানে যোগ দেন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্বে থেকে সেই কয়দিন অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অনুষ্ঠান চালু রাখার।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে তখনকার অনুষ্ঠান প্রচারে জড়িত ছিলেন এ ছাড়াও প্রোগ্রাম প্রডিউসার জনাব আবদুল্লা-আল-ফারুক ও জনাব মোস্তফা আনোয়ার, বেতার ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আহমদ শাকের, টেকনিক্যাল, এসিসট্যান্ট জনাব রশিদুল হাসান ও জনাব আমিনুর রহমান, টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, জনাব শরফুজ্জমান ও কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ।

সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন শিল্পপতি জনাব এ, কে, খানের দুই ভাইপো সেকান্দর ও হারুন!

অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন মেকানিক শফুর। প্রথমে ড্রাইভার হিসেবে চাকুরি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার জন্য মেকানিক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শত অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তার অদম্য প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় একদিন অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

দৈনিক 'পূর্বদেশ' ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

# ২. বেতার—মুক্তি সংগ্রামে

## বেলাল মোহাম্মদ

এই তথ্য-নিবন্ধ নির্মাণোদ্যত হয়ে প্রথমেই যে বিবেচনা বোধ করছি, তা হচ্ছে, ইতিহাস দুই কারণে বিকৃত হতে পারে। এক, প্রণেতার স্মৃতি বিপত্তি, যার কারণ কালবিলম্ব না করে লিপিবদ্ধকরণের পরিবেশের অপ্রতুলতা। দুই, অবস্থা গতিকে ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থে কোনো কোনো তথ্য গোপন বা অব্যক্ত রাখার আবশ্যকতা। এই শেষোক্ত কারণে অনেক সময় কোনও বক্তব্য বিষয়কে বিকৃত না করলেও সীমাবদ্ধতা দিয়ে ক্ষুণ্ন করতে পারে বেশ খানিকটা, অনেক কথাই স্মৃতিতে অম্লান হওয়া সত্ত্বেও সর্বমুহূর্তে প্রকাশ করা যায় না।

গোড়াতেই সবিনয়ে একটি কথা বলে রাখতে চাই, যে বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ কর্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, আমার সহকর্মীরা অনেকেই বর্তমান আছেন যারা এটি পাঠ করবেন এবং আমার ভ্রমের জন্য বা দৃষ্টিবৈচিত্র্য ও উপলব্ধির বিভ্রমের জন্য তাদের কারো কাছে এখানে বর্ণিত কোনো তথ্যকে অস্বস্তিকর আপত্তিক বিবেচিত হলে তা যেন ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির বা অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বস্তুত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে একজন সাংবাদিক যখন কোনও সংবাদ সরঞ্জাম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সংগ্রহ করেন, তখন তিনি ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে স্বয়ং জড়িত না হয়ে তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকা লিখতে গিয়ে আমরা স্বকীয় নগণ্য প্রয়াসকে ও সামগ্রিক সংগ্রামসূচি ও সংগ্রামী কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হই। এটি একটি সংগ্রামী জাতির অস্তিত্বের সংগে একটি ব্যক্তিজীবনের কর্মময় অস্তিত্ব রক্ষার আত্মপরিচয়মূলক সহজাত এবং নির্দোষ ঔৎসুক্য। অনুরূপ মানসিকতার প্রাবল্যে আমাদের ন'মাসকালের দেশ-রণাঙ্গনের যাবতীয় কথা প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় আত্মকথা।

বর্তমান সময়ে সঙ্গত কারণেই আমরা সবাই অসম্ভব রকম জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত বলেই নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকা আকারে এতো কথা বলতে হলো।

এবারে আরম্ভেরও প্রারম্ভিক হিসেবে বলতে হচ্ছে, একটা বিষয় রহস্যাবৃত থাকা পর্যন্ত তাই নিয়ে বিচিত্র বিক্ষিপ্ত জল্পনা-কল্পনারও যেমন অবকাশ আছে, তেমন অবকাশ আছে নানা রকম রটনার এবং নানা জনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ-সুবিধার।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইতিমধ্যেই একটি বহুবিতর্কিত জটিল প্রসংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে একজন নগণ্য বেতার কর্মী হিসেবে আমার সর্বসময়ের বক্তব্য হচ্ছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব কারুরই নেই। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বেতার বিভাগীয় কর্মীরাই আলোচ্য কেন্দ্রটি চালু করেছেন—সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক কিংবা হোক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে বা সহযোগিতায়।

---

* একই শিরোনামে ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে 'বেতার বাংলা'র বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত বেলাল মোহাম্মদ-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

কেননা, বেতারের মাইকের সামনে শব্দনিক্ষেপণ এবং শব্দকে ইথারে উৎক্ষেপণ এই দুই কর্মই বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় কর্মীগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ২৫শে মার্চ, ৭১-এর পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের বেতার কেন্দ্রগুলো দখলদার সরকারের সঙ্গে সত্যিকার অসহযোগিতা প্রদর্শনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল—তারই নিদর্শন হচ্ছে 'রেডিও পাকিস্তান' নাম-ঘোষণাটি সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজ নিজ আঞ্চলিক নাম ঘোষণা শুরু করেছিল, যেমন ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি কর্মীদের সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম ৭ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার করা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৫ই মার্চ, ৭১ স্থানীয় লালদীঘির ময়দানে অভিনীত গণনাটক মমতাজউদ্দীন রচিত 'এবারের সংগ্রাম'-এর রেকর্ড ১৭ই মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাজানো হয়েছিল। বেতারে তথা সরকারি কর্মচারীদের কানে নিত্যই বাজতো একটি বজ্রকণ্ঠের বাণী : বাঙালির স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ তোমাদের করতে বলা হলে তোমরা অফিস বন্ধ করে দেবে।

ঠিক তা-ই করেছিলাম ২৬শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা। প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে যে মূহর্তে বেতারের তখনকার প্রাদেশিক অনুষ্ঠানে সামরিক প্রশাসক প্রবর্তিত বিধানের প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে উপস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা বেতার ভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তার পরের ঘটনাগুলো অসম্ভব রকম স্বতঃস্ফূর্ত, অসম্ভব রকম বিচিত্র—বিক্ষিপ্ত বিচিত্র কি, তখন আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও এরকম কিছু একটা ভাবতে পারেন, এখন যদি বেতারে বাঙালিদের সংগ্রামের সপক্ষে কিছু প্রচার করা যেতো।

বস্তুত অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটারে বিভিন্ন পর্যায়ে একই দিনে ২৬শে মার্চ, ৭১ তিনবার স্বল্পকাল স্থায়ী তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হয়। একবার বেলা ২টা বেজে ৭ মিনিটে আর একবার সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে এবং আর একবার রাত ১০টায়। বস্তুত এই তিনটি ঘটনাই অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত—দেশে দখলদার সামরিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে যেমন সেদিন সর্বত্র গড়ে উঠেছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, এগুলোও ঠিক তেমনি।

দ্বিপ্রহরের অধিবেশনটির আমি প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতা নই। কিন্তু পরবর্তীকালে সঠিকভাবে জেনেছিলাম, সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান। তিনি ও তাঁর দলীয় সহকর্মীরা আমাদের কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ট্রান্সমিটার চালু করিয়েছিলেন। অধিবেশনটিতে ঘোষণা হিসেবে জনাব হান্নানের নাম ও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং জনাব হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাঁচ মিনিট ভাষণ প্রচার করেছিলেন। অধিবেশনের স্থিতিকালও ছিল ছয় থেকে সাত মিনিট।

জনাব হান্নানের প্রভাবে যেসব বেতারকর্মী/প্রকৌশলী ট্রান্সমিটার চালু করেছিলেন, তাঁরা পরে আর এমুখো হননি—অধিকন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬শে মার্চ ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে। তখনই আমার মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম—তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে—নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু'একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব/পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জিপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালি সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দু'জন জিপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টাসে কমান্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২টা। কমান্ডার আধ ঘণ্টার মধ্যে বেতারভবনের ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বস্ত হয়ে আমরা রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী—প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জিপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেন : তারা কাজ করবেন, তবে এক আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন—অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো! দ্বিতীয় শর্তটি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোনও মুহূর্তে কমান্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে ভালো কথা, আমার কিন্তু কি প্রচার করবো সেটা একটু চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরই আগ্রাবাদ গিয়ে আনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান—আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস-এর সামনে এসে জিপ ছেড়ে দিয়েছিলাম—গাড়ি আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার

ভবনে পৌঁছেই মাহবুব হাসান কন্ট্রোল রুমের সুইচ অন করেছিলেন। এমন সময় টেলিফোন। ট্রান্সমিটার থেকে প্রকৌশলী বন্ধুরা মাহবুব হাসানকে জানিয়েছিলেন তারা অনুষ্ঠান 'এয়ার'-এ দিতে পারবেন না। কেননা ইতিমধ্যেই তারা আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি সম্মতি দেননি—কাজেই তারা ট্রান্সমিটার ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি টেলিফোন ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দুই শর্তের একটি অবশ্যই কার্যকরী হবে।

মাহবুর হাসান আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসার নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক প্রকৌশলী ঠিক এ কথাটা বলেছিলেন : বেলাল সাহেব আমাকে কেন জড়াচ্ছেন! বেতার কেন্দ্রে আমি তো দু'নম্বর। আপনি বরং নাজমুল আলম সাহেবের পারমিশন নিন। দুপুরবেলা হান্নান সাহেব জোর করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে কাজ করালেন, তার জন্যে কি যে বিপদ আসে, আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।

আমি বলেছিলাম : আর-ডি সাহেবের বাসায় তো টেলিফোন নেই, ওঁর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করবো।

তিনি বলেছিলেন : আলম সাহেব এখন এ-আর-ডি কাহ্‌হার সাহেবের বাসায়—ওখানে টেলিফোন করুন।

ঠিক সে সময় আমার খোঁজে এনায়েতবাজার থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বেতার ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। জনাব আবদুল কাহ্‌হারের বাসায় টেলিফোন করে আমি কাসেমকে কথা বলতে দিয়েছিলাম। নাজমুল আলম সাহেব ওখানে আছেন কিনা এটাই জেনে নিতে বলেছিলাম। ওদিকে থেকে এই অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাওয়া হলে কাসেম আমার কথা বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রিসিভার আমার হাতে এসে গিয়েছিল।

নাজমুল আলমের সংগে অলোচনা করে আবদুল কাহ্‌হার আমাকে যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে, বেতার ভবন বন্দরে নোঙর করা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ বাবর', ' সোয়াত'-এর শেলিং-এর আওতায় যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুকবলিত হতে পারে। উত্তর হবে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ক্ষুদে স্টুডিওটি ব্যবহার করা—সেটি শহর থেকে বেশ দূরে—সে এলাকার পতন শীঘ্র হবার কারণ নেই। এ ছাড়া একযোগে দু'টি ঘর রক্ষা করার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি আবশ্যক। ট্রান্সমিটার ভবনটি ব্রডকাস্টিং পারপাস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে মাহবুব হাসান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক আর আমি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। গাড়িবারান্দায় আমাদের একজন মহিলা ঘোষিকা—তিনি একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেছিলেন : বেলাল ভাই, ইনি আমার চাচা ডাক্তার আনোয়ার—আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেন : আচ্ছা, আপনারা বেতার চালু করে কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন?

আমি বলেছিলাম : আগে চালু করার ব্যবস্থা করি, তারপর যা মুখে আসে বলবো। কথা তো সেই একটা, আমরা স্বাধীন।

তিনি সাইক্লোস্টাইল করা একটি ক্ষুদ্রকায় ঘোষণাপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন: এটা দেখুন তো! দুই বা তিন বাক্যবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পড়েই আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম : ভালোই হলো। এটা দিয়েই অধিবেশন শুরু করা হবে, আর এরই ভিত্তিতে প্রচার করা হবে সকল বক্তব্য।

সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দ্বীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬শে মার্চ ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে। তখনই আমার মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম—তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে—নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু'একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব/পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জিপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালি সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দু'জন জিপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টাসে কমান্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২টা। কমান্ডার আধ ঘন্টার মধ্যে বেতারভবনের ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বস্ত হয়ে আমরা রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী—প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জিপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেন : তারা কাজ করবেন, তবে এক আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন—অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো! দ্বিতীয় শর্তটি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোনও মুহূর্তে কমান্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে ভালো কথা, আমার কিন্তু কি প্রচার করবো সেটা একটু চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরই আগ্রাবাদ গিয়ে আনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান—আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস-এর সামনে এসে জিপ ছেড়ে দিয়েছিলাম—গাড়ি আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার

সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দ্বীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬শে মার্চ ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে। তখনই আমার মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম—তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে—নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু'একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব/পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জিপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালি সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দু'জন জিপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টাসে কমান্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২টা। কমান্ডার আধ ঘণ্টার মধ্যে বেতারভবনের ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বস্ত হয়ে আমরা রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী—প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জিপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেন : তারা কাজ করবেন, তবে এক আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন—অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো! দ্বিতীয় শর্তটি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোনও মুহূর্তে কমান্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে ভালো কথা, আমার কিন্তু কি প্রচার করবো সেটা একটু চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরই আগ্রাবাদ গিয়ে আনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান—আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস-এর সামনে এসে জিপ ছেড়ে দিয়েছিলাম—গাড়ি আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার

ভবনে পৌঁছেই মাহবুব হাসান কন্ট্রোল রুমের সুইচ অন করেছিলেন। এমন সময় টেলিফোন। ট্রান্সমিটার থেকে প্রকৌশলী বন্ধুরা মাহবুব হাসানকে জানিয়েছিলেন তারা অনুষ্ঠান 'এয়ার'-এ দিতে পারবেন না। কেননা ইতিমধ্যেই তারা আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি সম্মতি দেননি—কাজেই তারা ট্রান্সমিটার ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি টেলিফোন ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দুই শর্তের একটি অবশ্যই কার্যকরী হবে।

মাহবুব হাসান আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসার নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক প্রকৌশলী ঠিক এ কথাটা বলেছিলেন : বেলাল সাহেব আমাকে কেন জড়াচ্ছেন! বেতার কেন্দ্রে আমি তো দু'নম্বর। আপনি বরং নাজমুল আলম সাহেবের পারমিশন নিন। দুপুরবেলা হান্নান সাহেব জোর করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে কাজ করালেন, তার জন্যে কি যে বিপদ আসে, আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।

আমি বলেছিলাম : আর-ডি সাহেবের বাসায় তো টেলিফোন নেই, ওঁর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করবো।

তিনি বলেছিলেন : আলম সাহেব এখন এ-আর-ডি কাহ্হার সাহেবের বাসায়—ওখানে টেলিফোন করুন।

ঠিক সে সময় আমার খোঁজে এনায়েতবাজার থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বেতার ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। জনাব আবদুল কাহ্হারের বাসায় টেলিফোন করে আমি কাসেমকে কথা বলতে দিয়েছিলাম। নাজমুল আলম সাহেব ওখানে আছেন কিনা এটাই জেনে নিতে বলেছিলাম। ওদিকে থেকে এই অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাওয়া হলে কাসেম আমার কথা বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রিসিভার আমার হাতে এসে গিয়েছিল।

নাজমুল আলমের সংগে অলোচনা করে আবদুল কাহ্হার আমাকে যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে, বেতার ভবন বন্দরে নোঙ্গর করা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ বাবর', ' সোয়াত'-এর শেলিং-এর আওতায় যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুকবলিত হতে পারে। উত্তর হবে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ক্ষুদে স্টুডিওটি ব্যবহার করা—সেটি শহর থেকে বেশ দূরে—সে এলাকার পতন শীঘ্র হবার কারণ নেই। এ ছাড়া একযোগে দু'টি ঘর রক্ষা করার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি আবশ্যক। ট্রান্সমিটার ভবনটি ব্রডকাস্টিং পারপাস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে মাহবুব হাসান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক আর আমি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। গাড়িবারান্দায় আমাদের একজন মহিলা ঘোষিকা—তিনি একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেছিলেন : বেলাল ভাই, ইনি আমার চাচা ডাক্তার আনোয়ার—আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেন : আচ্ছা, আপনারা বেতার চালু করে কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন?

আমি বলেছিলাম : আগে চালু করার ব্যবস্থা করি, তারপর যা মুখে আসে বলবো। কথা তো সেই একটা, আমরা স্বাধীন।

তিনি সাইক্লোস্টাইল করা একটি ক্ষুদ্রকায় ঘোষণাপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন: এটা দেখুন তো! দুই বা তিন বাক্যবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পড়েই আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম : ভালোই হলো। এটা দিয়েই অধিবেশন শুরু করা হবে, আর এরই ভিত্তিতে প্রচার করা হবে সকল বক্তব্য।

আমি টুকরো কাগজখানা পকেটে নিয়েছিলাম। তারপরই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম ডাক্তার আনোয়ারকে বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রদর্শন না করে।

জেকস্-এর সামনে এসেই খেয়াল হয়েছিল আমাদের গাড়ি নেই। এখন উপায়! উদ্ধার করেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার—তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিলেন, সঙ্গে মোখিকা হোসনে আরা। ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেন : কালুরঘাট যাবেন তো আসুন আমার গাড়িতে।

মাহবুব হাসানের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

ট্রান্সমিটার ভবনে অবস্থানরত প্রকৌশলী বন্ধুরা তো তাদের শর্ত পূরণ ছাড়া সহযোগিতা দেবেন না। দেখা যাক আঞ্চলিক প্রকৌশলীকে বাধ্য করে এখানে থেকে একটা টেলিফোন করিয়ে দেয়া যায় কিনা। আমরা আগ্রাবাদ কলোনিতে আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায় গিয়েছিলাম—তিনি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে পরে চাপে পড়ে বলেছিলেন : আচ্ছা, আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আপনারা যান।

রাস্তায় ইতিমধ্যে কবি আবদুস সালাম আমাদের গাড়িতে এসে উঠেছিলেন। বললেন: নাতী বেলাল, আমাকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। আমি—এই দেখ্—একটা কথিকা লিখছি—দু'পাতা লেখা হয়ে গেছে, এটা প্রচার করবো। তুই দেখে দিস্।

মাহবুব হাসান বলেছিলেন : দেখুন, আর-ই সাহেব আসলে ট্রান্সমিটারে আদৌ ফোন করবেন না। এদিকে বিনা পারমিশনে ওঁরা দু'জন কাজ করবেন না। আমি বরং এক কাজ করি—আমি স্টেশন রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়েই এসে পড়বো। আপনারা এ গাড়িতে যান।

মাহবুব হাসান আর আমাদের সংগে যোগদান করতে পারেননি—শুধু দু'দিন পরে একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন।

কালুরঘাটগামী মোটর গাড়িতে আমরা তখন ছ'জন— হোসনে আরা, ডাক্তার আনোয়ার, কবি আবদুস সালাম, কাসেম ফারুক ও আমি। ট্রান্সমিটার ভবনের গেটের কাছেই আমি একরকম লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলাম। কেননা, দেখতে পেয়েছিলাম প্রকৌশলী বন্ধু দু'জন ততক্ষণে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠেছেন। রিকশা আগলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম—বলেছিলাম : আর-ই সাহেব পারমিশন দিয়েছেন (?) এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও এসে পড়বেন মাহবুব হাসানের সংগে। আপনারা দয়া করে চলে যাবেন না।

ওঁরা বলেছিলেন : আর-ই সাহেবের সংগে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, তিনি বলেছেন কিছু করলে নিজের দায়িত্বে করবেন। দেখুন, আমাদের চাকরি থাকবে না।

ডাক্তার আনোয়ার সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো পরম আনুকূল্য দিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছি কোনো গ্রামীণ অস্থায়ী ছাউনী থেকে যে কজন সশস্ত্র জোয়ানকে নিয়ে এসে সাময়িকভাবে ট্রান্সমিটারে মোতায়েন করার উপস্থিত ব্যবস্থা করেছিলেন—বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৌশলী বন্ধুদের দেয়া একটি শর্ত পূরণ করা গিয়েছিল।

কেন্দ্রের নাম ও প্রথম ঘোষণাপত্রটি আমি লিখেছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনের অফিসকক্ষে বসে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আমি 'হ্যালো' বলতেই ওদিকে থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল : বেলাল সাহেব, দেরী করছেন কেন? এখন তো প্রায় সাড়ে সাতটা—যা পারেন প্রচার শুরু করুন। লোক এখন রেডিওর

কাঁটা ঘোরাচ্ছে—আটটা বাজলেই কিন্তু আকাশবাণীর খবর শুনবে সবাই। আপনাদেরটা আর কেউ শুনবে না।

আমাদের বার্তা সম্পাদক সুলতান আলী। ধারণা করেছিলাম তিনি হয়তো ইতিমধ্যে আবদুল কাহ্হারের কাছ থেকে আমার কথা জেনেছিলেন। সুলতান আলী আমাকে প্রচারযোগ্য দু'একটি খবরও বলে দিয়েছিলেন।

হোসেন আরাকে আমি কণ্ঠ দিতে দিইনি— কেননা একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্রে আমাদের শ্রোতা সাধারণের জন্যে একটি মহিলাকণ্ঠের ঘোষণা বেমানান ঠেকতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। সেদিন অন্য একজন ঘোষক সেখানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন—সুলতানুল আলম। তবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম ঘোষণাটি সর্বপ্রথম আমার নির্বাচনক্রমে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। কবি আবদুস সালাম কথিকা প্রচার করেছিলেন।

অধিবেশন চলাকালেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জনাব এম, এ, হান্নান। তিনি তাঁর ভাষণের পূর্বাহ্নে নাম ঘোষণা করতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম : নাম ঘোষণা না করলেই ভালো হতো, কেননা আমরা শত্রুশ্রোতাদের কাছে যতটা সম্ভব নিজেদের অবস্থানকে দুর্জ্ঞেয় রাখতে চাই—সহজে যেন ওদের বোমাবর্ষণের টার্গেট নির্ণয় করতে না পারে। রাডারের সাহায্যে ওরা ঠিকই ধরে নেবে—তবে এক'-দুদিন অন্তত তা বিলম্বিত হবে।

জনাব হান্নান দ্বিপ্রহরের স্বনামে ব্রডকাস্ট করার কথা বললে আমি বলেছিলাম : তখন কেন্দ্রের নামকরণ হয়নি এবং অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাবাহিকতার পরিকল্পনা ছিল না।

আমার উদ্দেশ্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই তার মূল্যবান ও সময়োপযোগী ভাষণ প্রচার করেছিলেন।

বেতার ভবন থেকে আমার একটি টেপ হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রেকর্ডকৃত ও প্রচারিত গণসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গিটার বাদ্য ছিল— সেই টেপটিও এই অধিবেশনে বাজানো হয়েছিল।

আনুমানিক আধঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশন শেষে বাইরে এসে আমরা ডাক্তার আনোয়ার ও তাঁর সৌজন্যে মোতায়েনকৃত জোয়ানদের কাউকে আর দেখতে পাইনি। জনাব হান্নানও তার ভাষণ প্রচারের পর চলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত ডাক্তার আনেয়ারকে এর পর আর কোনোদিনই বেতারকেন্দ্রে দেখতে পাইনি এবং হোসনে আরা পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

আমি, কাসেম ও ফারুক পায়ে হেঁটে রাত সাড়ে দশটায় এনায়েতবাজারে ফিরে এসেছিলাম। পথটি ছিল ৭।৮ মাইল। (অংশ)

দৈনিক আজাদী, ২৬ মার্চ বিশেষ সংখ্যা ১৯৭*

---

* [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : পঞ্চম খণ্ড বইয়ে ভুলবশত ১৯৭.....এরপর কিছুই ছাপা হয়নি–সঙ্কলক সম্পাদক।]

# ৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্মকথা

মেসবাহ আহমেদ

... বাংলাদেশে ২৬শে মার্চের সূর্যোদয় হলো রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। ইথারে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র"। ঐ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে মনে হয়েছিল এ একটি অল্প বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র। তখনো জানা যায়নি কে বা কারা এই অসমসাহসী যোদ্ধা যাদের উদ্যোগে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও সুখ-দুঃখ-কান্নার কথা প্রথম বাতাসে ধ্বনিত হ'ল। অবশ্য পরে আমরা এদের সন্ধান পেয়েছি।

শত্রুসৈন্য চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করবার পর এই বেতার কেন্দ্রের অন্যতম কর্মী বেলাল মোহাম্মদের পরিচালনায় দশজনের একটি দল চট্টগ্রাম থেকে সরে গিয়ে কালুরঘাটে এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে প্রথম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করে। এই দলে ছিলেন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, শরফুজ্জামান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লা-আল-ফারুক, সুব্রত বড়ুয়া ও কাজী হাবিবউদ্দীন। কালুরঘাট পাকিস্তানি সৈন্যদের কবলে এলে পরে তাঁরা বাংলাদেশের অন্য এক মুক্তাঞ্চল থেকে কিছুদিন অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

২৫ শে মার্চ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রেও কয়েকজন বাঙালি কর্মী আটকা পড়েছিলেন। ২৮শে মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনে পুলিশ বাহিনী ও ই-পি-আর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাক ফৌজ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একদিন একরাত পর্যন্ত কয়েকজন বেতারকর্মীকে একটি স্টুডিওর মধ্যে আটকে রাখা হয়।

মুক্তাঞ্চল থেকে স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন নির্ভীক কর্মী জীবন বিপন্ন করে বেরিয়ে পড়েন বেতার ভবন থেকে। এই দলে ছিলেন অনুষ্ঠান সংঘটক মেসবাহ আহমেদ, অনুষ্ঠান সংগঠক আতাউর রহমান, অনুষ্ঠান প্রয়োজক অনু ইসলাম, অনুষ্ঠান প্রযোজক শাহজাহান ফারুক এবং বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন।

রাজশাহী বেতারের এই কর্মীদল ২রা মে মুজিবনগরে পৌছান। দু'চারদিন পরের কথা। তখন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান সাহেব তখন মুজিবনগরে ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী এসে গেছেন। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আরো উৎসাহ পেলাম।

ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার এবং জামিল চৌধুরী, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, বিশিষ্ট সাংবাদিক এম, আর, আখতার এবং চিত্রাভিনেতা হাসান ইমামও তখন মুজিবনগরে। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং শেখ সাহেবের প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশার সংগেও দেখা হলো।

আমরা সকলে মিলে মান্নান সাহেবের সংগে দেখা করলাম।

পর পর কয়েকদিন আলোচনা হলো। মান্নান সাহেবের পরিচালনায় উক্ত বিদ্যুৎ-শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারযোগে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের কয়েকটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণীত হলো।

ইতিমধ্যে ট্রান্সমিটার সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গেছে। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেনার জন্য ১৪ই মে মান্নান সাহেব আমাদের শ' দুই টাকা দিয়েছিলেন।

আমি, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক এম, এ, মোহাইমেন এম-পি-এ ঐদিনই প্রয়োজনীয় জিনিপত্র ক্রয় করি।

দু-তিনদিন ধরে আমরা প্রপোজাল রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট ফরম, আর্টিস্ট রেজিস্টার ইত্যাদি তৈরি করি। এসব কাজে অনু ইসলাম আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, যদিও তিনি তখন 'জয়বাংলা' পত্রিকায় কাজ করতেন।

এগিয়ে এল চরম মুহূর্ত। মান্নান সাহেবের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ কিলোয়াট শক্তি-সম্পন্ন ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঢাকা বেতারের সেই নির্ভীক 'তিন কর্মী' আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান এবং টি, এইচ, শিকদার মুজিবনগরে এসে পৌঁছেন। তারা এসেই এম-এন-এ তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং আমিনুল হক বাদশার সংগে দেখা করেন। তাদের সংগে ঢাকা থেকে আনীত কিছু মূল্যবান গানের টেপও ছিল।

২৫শে মে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশের বেতারকর্মীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিনই বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও দুঃখ-কান্নার শব্দ ধ্বনিত হয় বাতাসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে বাংলাদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বেতার প্রচার শুরু হলো।

কয়েকদিন পরেই ঢাকা বেতার থেকে আরো কয়েকজন এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, আলী রেজা চৌধুরী যহুর কাদের প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁরাও সাথে করে প্রয়োজনীয় কিছু গানের টেপ নিয়ে আসেন।

একটি আবাসিক বাড়ির সীমাবদ্ধ পরিবেশে ছোট্ট একটি ঘরকে স্টুডিও করে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। প্রথম কিছুদিন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার নিদারুণ অসুবিধার মধ্যেও অনুষ্ঠান প্রচার করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা সে সমস্ত অসুবিধা অনেকটা কাটিয়ে উঠছিলোম। স্টুডিওর অভাব, পর্যাপ্ত রেকর্ডিং সুবিধার অভাব এবং শিল্পী-সাহিত্যিকের ও কথকের অভাবের মধ্যে প্রথম দু'তিন মাস, যে কি কষ্টে আমরা অনুষ্ঠান চালিয়েছি তা আজ লিখে শেষ করা যাবে না। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের সেই দশজনের দলটিও এসে কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রথম দিকের ঝক্কি খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পর অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমগ্র দায়িত্ব ছিল তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এম-এন-এ আবদুল মান্নানের উপর ন্যস্ত।

কিছুদিনের জন্য সেক্রেটারি পর্যায়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব আবদুস সামাদও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভেতরে অনুষ্ঠান সংগঠন এবং কেন্দ্রের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন আমাদের সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার শামসুল হুদা চৌধুরী।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন আশফাকুর রহমান।

পরবর্তীকালে তথ্য ও বেতার সচিব হিসেবে আনোয়ারুল হক খান আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগে নিয়মিত কর্মী হিসাবে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হলেন : শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান, মেসবাহ আহমেদ, বেলাল মোহাম্মদ, তাহের সুলতান, টি এইচ সিকদার, মোস্তফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল্লা-আল-ফারুক, শহীদুল ইসলাম, শামসুদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুর কাদের (বাবুল আখতার), আবু ইউনুস প্রমুখ কর্মী।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেছেন আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, মইনুল হক, প্রণব রায়, মোহাম্মদ মহসিন ও শরফুজ্জামান।

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সংবাদ বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে তারা হচ্ছেন কামাল লোহানী, মোহাম্মদ মামুন, সুব্রত বড়ুয়া, মৃণালকৃষ্ণ রায়, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, নূরুল ইসলাম সরকার, আলী রেজা চৌধুরী, পারভীন হোসেন, জাহেদ সিদ্দিকী, শহীদুল হক ও জারিন আহমেদ।

আমাদের নিয়মিত লেখক ছিলেন তোয়াব খান, মুস্তাফিজুর রহমান, বদরুল হাসান ও নাসিম চৌধুরী।

ড্রামা প্রডিউসার ছিলেন রণেন কুশারী ও হাসান ইমাম। ইংরেজী অনুষ্ঠান প্রচারে ছিলেন আলমগীর কবীর ও আলী যাকের।

যেসব শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী অনুষ্ঠান সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, তাদের মধ্যে ডক্টর এ, আর, মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, ডক্টর আনিসুজ্জামান, শওকত ওসমান, গাজীউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সিকান্দার আবু জাফর, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, কল্যাণ মিত্র, নারায়ণ ঘোষ, সুভাষ দত্ত, জহির রায়হান, সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বুলবন ওসমান, আসাদ চৌধুরী, অনু ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, রাজু আহমেদ, নুরুন্নাহার মযহার, আইভি রহমান, উম্মে কুলসুম, জিল্লুর রহমান, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার, অজিত রায়, রথীন রায়, কল্যাণী ঘোষ, আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, রফিকুল আলম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারে কর্মী বলে নয়, একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে বলতে পারি, এই কেন্দ্র থেকে গত নয় মাসে প্রচারিত প্রায় সব অনুষ্ঠানই উন্নতমানের হয়েছে। বিশেষ করে 'চরমপত্র', 'অগ্নিশিখা', জল্লাদের দরবার', 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে', 'পুতুলনাচের খেল' অনুষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশিষ্ট সাংবাদিক এম আর আখতার 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের লেখক ও প্রচারক। 'জল্লাদের দরবার' লিখতেন প্রখ্যাত নাট্যকার কল্যাণ মিত্র। জল্লাদ, দুর্মুখ, নবাবজাদা, টিটিয়া খান,

পিয়াজী খান, গভর্নর এবং বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করতেন যথাক্রমে চিত্রাভিনেতা রাজু আহমেদ, চিত্র পরিচালক নারায়ণ ঘোষ, প্রসেনজিৎ, আজমল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতিখার, জাহিরুল হক ও বুলবুল মহলানবীশ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন আশরাফুল আলম। 'ইসলামের দৃষ্টিতে' অনুষ্ঠান প্রচার করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান আমাদের অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' এবং 'পুতুলনাচের খেল।' লিখতেন যথাক্রমে ফয়েজ আহমদ ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

গণসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গানের সুর সংযোজনা এবং কণ্ঠদানের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন—তাহের সুলতান, সমর দাশ, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, মান্না হক, কল্যাণী ঘোষ, সুজেয় শ্যাম, অজিত রায়, রফিকুল আলম, অনুপ ভট্টাচার্য, হরলাল রায়, রথীন রায় প্রমুখ শিল্পী। (অংশ)

'জয়বাংলা'/বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থে।

# পরিশিষ্ট—২

শিরোনাম : ৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার কার্যবিবরণী।
সূত্র : 'বেতার বাংলা' ডিসেম্বর, ১৯৭৮। তারিখ : ১০ অক্টোবর, ১৯৭১।

## MINUTES OF MEETING ON CO-ORDINATION ON PROPAGANDA AND PUBLICITY EFFORTS IN SUPPORT OF WAR ACTIVITY HELD ON 10-10-71

**Members Present :**

1. A. Samad, Secretary, Ministry of Defence.
2. Dr. B. Hossain, Adviser.
3. Mr. Alamgir Kabir.
4. Mr. Shamsul Huda Chowdhury.
5. Mr. Kamal Lohani.
6. Mr. A. Rahaman.
7. Mr. B. Mahmood

Progress of action on decisions taken in last meeting was discussed. Members from Radio Bangladesh assured that they are working on lines already decided upon and significant improvement will be noticeable from 15-10-71 onwards.

There was further discussion on measures which will contribute to improve the Radio Programme.

**DECISIONS :**

1. An office will be immediately set-up in the Radio Building and all Staff work done there.
2. The method of news composition will be changed and text will be the same for English, Bengali and Urdu Bulletin. In view of pressure of work Mr. A. Kabir will compose the night bulletin and Mr. K. Lohani will compose the morning and afternoon bulletins.
3. The Radio will be immediately provided with a typewriting machine, two portable tape-recorders and one Casette tape-recorder.

4. The Staff of the outside broadcast section will go out frequently to the field. They will be given T. A. as no conseyance can be arraged at present.
5. Dependence on patriotic songs should be reduced and in its place martial songs and music should be introduced.
6. Arragnement for bringing the microphone from Agratala should be immediately made.
7. Security checking will be made rigid from 15.10.71. In the meantime I. D. Cards should be issued where necessary.
8. Payments for script-writers and talkers should be regular.
9. The panel of Talents should be finalized immediately in consultation with Mr. A. Mannan, MNA-in-charge.
10. Programme shall be drawn up for 7 days at a time sufficiently in advance (at least 4 days). The responsibility of filling in the Programme shall lie with the respective Programme Ogranizer/ Section heads.
11. Arragnement shall be made by Secretary, Information for getting Pak Newspapers for the counter-propagnads section.

Sd/-A. Samad
Secretary
Ministry of Defence.

Memo No. D-003/76 (8) Dated 18.10.71

1. Copy forwarded to Mr. M. A. Mannan, MNA-in-charage, Information & Broadcasting for information.
2. Mr. Shamsul Huda Chowdhury, Swadhin Bangla Betar Kendra for information.

Secretary.

—